সূচী।

প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
অকলঙ্ক সৌহার্দ্দ (গল্প)	শ্রীমন্মথ নাথ সেন, বি-এ	২৭৭
অতৃপ্ত বাসনা (ঐ)	শ্রীহরিহর শেঠ	৮২
অধিকার তত্ত্ব	শ্রীধীরাজকৃষ্ণ সোম	৭১৬
অবসানে (পদ্য)	শ্রীগিরিজা কুমার বসু	৪৮৬
১৮৯৯ সালের সংক্ষিপ্ত ডায়রী	শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ	৬৯
আমাদের কর্ত্তব্য	শ্রীগিরিশচন্দ্র লাহা, এম্-এ	১২৯
আলেয়া	শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯৫
আর্শি (রহস্য)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ	১০৫
ইতিহাসের একপৃষ্ঠা	শ্রীহরিহর শেঠ	৭০৬
উদ্বোধন (পদ্য)	শ্রীহরিহর শেঠ	৩১
উপেক্ষিত	শ্রীহরিদাস দত্ত, বি-এ	৫৪৫
কবি ও কাক (রহস্য)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ	১৬৪
কবি প্রকৃতি (পদ্য)	শ্রীরসময় লাহা	২
কর্ণাটে কালিদাস	শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত, বি এ,	৭৪১
কলিকাতায় প্লেগ	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, এম্ ডি,	১৭১
কাল (পদ্য)	৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০৫
কুড়ান খাতা (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৫২৪
কেন? (পদ্য)	শ্রী—	১৭০
গল্প কি?	শ্রীমন্মথনাথ সেন, বি-এ	৫৫৮

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
গল্প নয়	"প্রতিবাসী" ১৮ই অগ্রহায়ণ .৩০৭	৬৩১
গ্রাজুয়েটের খেদ (পরিহাস কবিতা)	শ্রীতারকনাথ সরকার	৯৮
ঘটকর্পর ও শ্লিষ্ট কবিতাদি	শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত, বি এ	১৯৩
চন্দ্র	শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ.	৭২২
চন্দ্রশেখর—অনুশীলন	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ	১৮
চিন্তা (পদ্য)	৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০৫
জাতীয় নববর্ষ	শ্রীমন্মথনাথ রায়চৌধুরী	২৭২
জামাই সপ্তমী (গল্প)	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র গুপ্ত	৪৭৭
"থাক! আর নাম ক'রো না তাহার!" (পদ্য)	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, এম্ এ	৪৪৭
দাদামহাশয় (গল্প)	শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ	৭৭
দাদার অভিশাপ (গল্প)	শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, বি-এ	১৯৮
দাম্পত্য প্রণয়	শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ	৭১১
"দিবা যবে নিভে আসে!" (পদ্য)	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, এম্-এ	৫৪১
দুর্ভিক্ষে লর্ড্ কার্জন	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ	৩৪৭
নিদাঘ নিশায় (পদ্য)	শ্রীরসময় লাহা	২৫৫
নূতন পঞ্জিকা (রহস্য)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ	৪২২
পরনিন্দার পাঠশালা (রহস্য)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ	৩৫২
পঞ্চাননের বিপদ (রহস্য)	ঐ	৫৯৫
পরিবর্ত্তন (গল্প)	শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ	১৪৬
পদে পদে বাধা (রহস্য)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ	৫৫৩
পাপিয়া (পদ্য)	শ্রীরসময় লাহা	৬৩
পার্লামেণ্ট (সচিত্র)	শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ	১৭৫

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
পুনর্মিলন (পদ্য)	শ্রীমন্মথনাথ সেন, বি-এ	৩১৯
পূর্ব্বস্মৃতি (রহস্য)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ	২৯৯
প্রত্যাবর্ত্তন (পদ্য)	শ্রীরসময় লাহা	২১৮
প্রবাসের দ্বিতীয় বর্ষ	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ	১
প্রেম-ব্যাধি (রহস্য)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ	৩৩
ফুলের সাজি ৪৮,১১৭,১৭৮,২৪৫,৩০৮,৩৮০,৪৩৫,৫০১,৫৬৩,৬২৭,৬৯৭,৭৫০		
অতৃপ্ত পিয়াস	শ্রীহরিহর শেঠ	৬৯৭
অন্তিম শয়ন	শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার	৫৬৪
অস্ফুটে প্রস্ফুটে	শ্রীমতী সরসীবালা দাসী	৪৩৬
আত্ম সমর্পণ	শ্রীমন্মথনাথ সেন, বি-এ	৪৩৮
আমার যাচঞা	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৫৬৫
উচ্ছ্বাস	শ্রীলালবিহারী দত্ত	৫৬৪
উদ্দেশ্য সাধন	শ্রীধীরাজকৃষ্ণ সোম	১১৮
উদ্বোধন	শ্রীমন্মথনাথ সেন, বি-এ	৬৩০
একটি	শ্রী—	৬৯৮
একবার	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু	১৮২
কবি	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১১৯
কবির ভুল	শ্রীমতী সুবাসিনী সোম	৫৬৫
কি ক্ষতি আমার তায়	শ্রীমতী সরসীবালা দাসী	৫০
কুঞ্জমণি	শ্রীনীরদকান্ত মাইতী	৬৯৯
কে	শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ	৭৫১
কেনচাহ দেখিতে আমায় ?	শ্রীঅটলবিহারী দাস	৭০০
কোথা' সে' বিজন ?	শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী	৮১১
ছবি	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১৮১
জরা হ'তে মরা ভাল	শ্রীরসময় লাহা	৩০৯
তীর্থ দর্শন	শ্রীতারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়	৩১০
তুমি	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	৩০৯

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
তুমি	শ্রীনন্দকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ	৩৮০
ঐ	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	৫৬৫
ঐ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত	৭০০
তোরা	শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ	৩১০
দূরে	শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৭
ধারণাতীত	শ্রীকামিনীনাথ রায়	৫৬৮
নদীর উপর জল	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, এম্-এ	৭৫১
নব উপহার	শ্রীমন্মথনাথ সেন, বি এ	১৮১
নলিনীর প্রতি	শ্রীহরেন্দ্রকুমার মজুমদার	৫৬৮
নিভৃতে রেখেছি তারে	শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৭৮
নিমন্ত্রণ (পরিহাস)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৬২৭
নিরাশ	শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়	৫০৩
পরাণে পরাণে	শ্রীলালবিহারী দত্ত	৫০৩
পড়িয়াছে মনে ?	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু	৫১
পতিভক্তি	শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী	৫০১
পথিক	শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস	৩১১
পরিচয়	শ্রীকামিনীনাথ রায়	৩১৩
পিক	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	১১৯
প্রভাত	শ্রীমতী মৃণালিনী বসু	২৪৫
প্রভাতে	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	৭৫১
বঙ্গ-বিধবা	শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী	৩১২
বনবালিকা	শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়	৭৫২
বন্ধুত্ব	শ্রীপ্রমথকৃষ্ণ দেব	১৭৯
বসন্ত	শ্রী শ্রীপতি কবিরত্ন	২৪৭
বর্ষালীলা	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি এ	৫০৪
বর্ষা সঙ্গীত	শ্রীমনোমোহননাথ ঘোষ	৫৬৭
ব্যর্থ-প্রেম	শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী	২৪৯
বাঁশী	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	৭৫০
বাসন্তি-পঞ্চমী	শ্রীঅটলবিহারী দাস	১১৭
বাসন্তী	শ্রীঅনঙ্গমোহন কাব্যতীর্থ	১১৮
বিরহ	শ্রীনীরদকান্ত মাইতি	৪৪০
বিদায়	শ্রীঅটলবিহারী দাস	৪৪১

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
বিদায়	শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী	৬২৯
বিদায়ের পূর্ব্বে	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস	৬৯৮
বিভুপ্রেম	শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়	৩৮১
বিলাপ	শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য	১১৯
বীণা পূর্ণতান	শ্রীকামিনীনাথ রায়	১৮১
বেদনা	শ্রীমতী মৃণালিনী বসু	৫২
ভাগিরথী	শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী	৫০২
ভালবাসি কেন তারে ?	শ্রীযোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৫০৩
ভুল	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	৫,০
ঐ	শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী	৫৬৩
ভুলে	শ্রীরঙ্গলাল রায়	৩০৮
মনে পড়ে তার	শ্রীরাখালদাস রায়	২৪৫
ঐ	শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ	৬৩০
মধুনিশি	শ্রীমন্মথনাথ সেন, বি-এ	২৪৮
যদি ভালবাস	শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী	৩৮০
যোগী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস	৪৯
যৌবনে	শ্রীমন্মথনাথ সেন, বি এ	ঐ
রমণী-হৃদয়	শ্রীমতী অ— ———মিত্র	৪৩৫
শশ্মান ভূমি	শ্রীঅজিতনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৫৩
শ্রীমতার মালাগাঁথা	শ্রীচন্দ্রকুমার বসু	৩৮১
সন্ধ্যা	শ্রীমতী তমাললতা দাসী	১৭৯
সব যাবে	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক	৪৩৯
সারস্বত সম্মিলন	শ্রীরসময় লাহা	৪৮
সুখ দুঃখ	শ্রীবীরাজকৃষ্ণ সোম	২৪৬
সে	শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ	৫৬৪
সে আমার গেছে চ'লে	শ্রীঅনাথবন্ধু দে	৭৫২
স্বপনে	শ্রীঅটলবিহারী দাস	২৫০

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
হতাশের আক্ষেপ (ব্যঙ্গ)	শ্রীশ্যামাচরণ চৌধুরী	৪৯৯
হিমাদ্রি শিখরে	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬৬
বশিষ্ঠাশ্রম	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ	৪২৮
ব্রাহ্মণ	শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ	৬৪২
ব্রাহ্মণজাতি	ঐ	৬০০
বিদায় (পদ্য)	শ্রীমন্মথনাথ সেন, বি-এ	৩১৯
বিবাহ	শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায, এম্-এ	৩৯৮
বিহারিলাল (সচিত্র জীবনী)	শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ	৩,৬৫,১৩৬,২২৭,২৫৮, ৩৩৭,৩৮৪,৪৪৮ ৫১৪, ৫৭৯,৬৬২ ও ৭২৬
বিদ্যুতের জয় (রহস্য)	শ্রীসতীন্দ্রনাথ সরকার	৬৮৯
বিধির ভুল (পরিহাস কবিতা)	শ্রীরসময় লাহা	৪০৪
বিবিধ প্রসঙ্গ		৫৪,১২০,১৮৩ ২৫০,৩১৪,৩৮২, ৪৪১,৫০৫,৫৬৯,৬৩৪,৭০১ ও ৭৫৩
বুঝিবার ভুল (রহস্য)	শ্রীরসময় লাহা	৬১৫
ভুলে (পদ্য)	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	১১১
"ভেবোনা আমার চিত সতত চপল।"	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, এম্-এ	৬৪১
মন্ত্রির পত্র (গল্প)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ	৬০৪
মরীচিকা	শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত, বি-এ	৫৪২
মথুরা (সচিত্র)	শ্রীনিতাইকৃষ্ণ মিত্র	২৪০
মারের চোটে কবিরাজ (গল্প)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ	৩৮
মৃত্যু	শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ	২৯৪
মুক্তি	ঐ	৪৮৭
"যাও, যথা আছে যশঃ" (পদ্য)	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, এম্-এ	৩৮৩

বিষয়।	লেখক	পৃষ্ঠা।
যোগিনী (গল্প)	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস	৩৬৮
রচনা রহস্য	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ	২১৯
রণজিৎ প্রসঙ্গ (সচিত্র)	শ্রীমন্মথনাথ সেন, বি-এ	৪০৭
রাজসিংহ অনুশীলন	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ	৪৬১
রাণাকুম্ভ (সচিত্র)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ	৪৯৮
রিপোর্টারেব পত্র	শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত, বি-এ	৬২০
লক্ষ্ণৌ (সচিত্র)	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	৩৬০
শরতে (পদ্য)	শ্রীরসময় লাহা	৫৭৭
শান্তি (পরিহাস কবিতা)	ঐ	৩২
শুভকল্প (ঐ)	ঐ	৩৩৪
শুভনববর্ষ (ঐ)	ঐ	১৯১
শ্রী (পদ্য)	ঐ	১২৭
শ্রীগণেশজী	শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ	৫৩৮
শ্রীভাগবত ধর্ম্মঃ	শ্রীবসন্তলাল মিত্র	১০০,২৫৩,৩৬৪,৪৯০
শৈল (গল্প)	শ্রীঅনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬৭৫
সন্তান শিক্ষা (ঐ)	শ্রীমতী প্রবোধিনী ঘোষ	৩২০
সমালোচনা		৫৯,১২৬,১৯০,৩১৭,৪৪৫,৫১০,৫৭৫
সভ্যতার ঢেউ (পরিহাস পদ্য)	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	১৬৩
স্ফটিক প্রাসাদ (সচিত্র)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ	১১২
স্বদেশপ্রেম (পদ্য)	শ্রীধীরাজকৃষ্ণ সোম	৫৪৫
স্বপ্ন (রূপক)	শ্রীঅনাদিপ্রসাদ দাস	৬৪৮
স্বল্প গল্প (রহস্য)	শ্রীগৌরহরি সেন	৪১৪
সাত্ত্বিকা (পদ্য)	শ্রীরসময় লাহা	৫১৩
সূর্য্য	শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত	১১৩
হিন্দুকাব্য ও কবির কৌশল	শ্রীঅমৃতলাল বসু, বি-এ	৩০৩

চিত্রের তালিকা।

	চিত্র	সংখ্যা
১।	স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	জানুয়ারী।
২।	স্ফটিকপ্রাসাদ	ফেব্রুয়ারী।
৩।	পার্লামেণ্ট	মার্চ্চ।
৪।	মথুরা	এপ্রেল।
৫।	৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী	মে।
৬।	লক্ষ্ণৌ	জুন।
৭।	রণজিৎসিংহের সমাধি মন্দির	জুলাই।
৮।	রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ	আগষ্ট।
৯।	যোধপুর	সেপ্টেম্বর।
১০।	তাজমহল	অক্টোবর।
১১।	গোয়ালিয়ার	নবেম্বর।
১২।	এটক	ডিসেম্বর।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাস, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

প্রয়াস।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ।　　জানুয়ারি, ১৯০০ [illegible]　　[illegible] সংখ্যা।

প্রয়াসের দ্বিতীয় বর্ষ।

ঈশ্বরকৃপায় এবং সাহিত্য-সেবক সমিতির উদ্যোগে ও নবীন লেখকদিগের উৎসাহে "প্রয়াস" নির্ব্বিঘ্নে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্যই "প্রয়াসের" জন্ম, এবং এক বৎসরে "প্রয়াস" ৭১ জন নবীন লেখককে উৎসাহ দিয়াছে। ইহাতে সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি না সাধারণের বিবেচ্য। ঐ ৭১ জনের ভিতর ৮। ১০ জন ব্যতীত সকলেই সাহিত্য-সেবক সমিতির অপরিচিত, ইহা সমিতির নিরপেক্ষতার পরিচায়ক কি না, তাহাও সাধারণের বিবেচ্য। "প্রয়াস" নবীন লেখকদিগের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু তথাপি যে, সংবাদ পত্রাদিতে অযাচিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে ও গ্রাহকগণের প্রিয় হইয়াছে, তাহা "প্রয়াসের" পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এজন্য আমরা প্রশংসাকারীদিগকে ও গ্রাহকবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং যাঁহারা "প্রয়াসের" সামান্য ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরও নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। যে কতিপয় মহোদয় আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন ও "প্রয়াসে'র মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট আমরা চিরঋণী। তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া, ও ঈশ্বরের নাম

লইয়া "প্রয়াস" নূতন উৎসাহে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। আশা করি নবীন লেখকদিগের উদ্যম ও সাহিত্যানুরাগিগণের দীন "প্রয়াসে"র প্রতি উৎসাহ দান বা আদর বর্ত্তমান বর্ষে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইবে।

কবি প্রকৃতি।

(১)

দাঁড়াও দাঁড়াও দেবি! অমনি ক'রে,
সার্থক জীবন হোক্ তোমারে হেরে;
কর প্রেম সুধা দান
তৃষিত চকোর পান
করিয়া জুড়াক্ প্রাণ পুলক ভরে;
তোমার সুষমা রাশি
—এ চির পূর্ণিমা নিশি—
ভ'রে গেছে দশ দিশি সুধা সাগরে;
কি অমিয় প্রেমধারা বহে মন্থরে।

(২)

ওগো শান্তিময়ী দেবি, ঢাল শান্তি ধারা,
লভিয়া বিমল শান্তি জুড়াই আমরা;
এ হৃদয় মরুভূমি
খুলে দাও তথা তুমি
ওই কর পরশনে শান্তির ফোয়ারা।
ঘুচে যাক্ পরিতাপ
নিবুক ত্রিতাপ তাপ
দূরে যাক্ যত পাপ কলুষ পশরা
ত্রিদিবশান্তিতেপ্রাণ হোক্ মাতোয়ারা।

(৩)

এস গো করুণাময়ি! কর দান করুণা,
তুমি বিনা আমাদের আছে কেবা বলনা?
হেরিয়ে মোদের দুঃখ
বিদারিত তব বুক
মুছাইছ আঁখিজল হৃদয়ের বেদনা।
জগতের নিঠুরতা
হেরি হ'লে আবির্ভূতা
বাল্মিকী-রসনামূলে হে কমল আসনা,
জুড়'লে জগতে ঢালি' ত্রিদিবের করুণা

(৪)

কবির পরমারাধ্যা দেবি তুমি চিরদিন,
অন্তরে বাহিরে কিবা বিরাজিছ নিশিদিন
ধরিয়া তোমার ধ্যান
বিভোর কবির প্রাণ
তোমারি অনন্তরূপে দিগন্ত রয়েছে লীন;
তুমি প্রেম শান্তিময়ী
ত্রিদিব করুণাময়ী—
তোমার অসীম প্রীতি করেছে কামনাহীন
হয়েছি আপনাহারা শোধিতে তোমার ঋণ।

বিহারিলাল।

বীণাপাণির যে কয়জন বরপুত্রের অমৃতবর্ষী লেখনী জগতের কাব্য-সাহিত্যকে দিব্য-সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বলিত করিয়াছে, যে কয়জন গায়ক-কবির কলকণ্ঠ স্বর্গবীণার মধুর ঝঙ্কার, মরজগতের কবিতাকাননে প্রতিশব্দিত করিয়াছে, যাঁহাদের কীর্ত্তি অনন্ত প্রীতির আকর ও অবিনশ্বর, জগতের সেই অমর কবি কয়জনের মধ্যে বঙ্গের ৺ বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী একজন। কিন্তু কয়জন বঙ্গীয় পাঠকের সহিত তিনি অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত? যাঁহাকে কাব্যানুরাগিগণ বঙ্গের একজন প্রধান কবি বলিয়া গণ্য করেন, এবং কোন কোন সাহিত্যরসাভিজ্ঞ এবং খ্যাতনামা কবি ও সমালোচক যাঁহাকে বঙ্গের বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পূজা করেন, যাঁহার "সারদা মঙ্গল", "বঙ্গ-সাহিত্যের একটী অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, বঙ্গদেশীয় কবিত্বের একটী অনন্ত সাক্ষীস্বরূপ" বলিয়া, কাব্যরসজ্ঞদিগের নিকট সমাদৃত, সেই কবি ও তাঁহার কাব্য, কয়জন সাধারণ পাঠকের নিকট পরিচিত? বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্র বাবু, যে বিহারিলালকে তাঁহার কাব্য-গুরু ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মুক্তকণ্ঠে যাঁহার প্রতিভা-লোকজ্জ্বল কবিত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছেন,* সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচক স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু যাঁহাকে বর্ত্তমান কালের কবিগণের মধ্যে একটী সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন†—সমকক্ষ বিহীন "দুঃখের কবি" বলিয়াছেন, প্রথিতনামা দার্শনিক ও কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যাঁহাকে আদর্শকবি বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সমাদর করেন, কোন সুবিজ্ঞ

---

* সাধনা, ১৩০১, আষাঢ়। ১২৬ ও ১৩৪ পৃষ্ঠা।

† বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। ৪২ পৃষ্ঠা।

সমালোচক বঙ্গীয় সাহিত্যশিল্পিগণের মধ্যে যে বিহারিলালের নাম বঙ্কিম বাবুর পরেই উল্লেখ যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন*, রাজ-সকাশে তিনি নিজ গুণে বঙ্গের একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি বলিয়া পরিচিত হইয়া ছিলেন†, সেই কবি, সাধারণ পাঠকের নিকট সমুচিত আদর হইতে বঞ্চিত হইলেন কেন? "ভারতী" বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে যে "সারদা মঙ্গলে"র উচ্চকণ্ঠে গুণ কীর্ত্তন করিয়া আবেগ ভরে বলিয়া ছিলেন ‡ "এরূপ সরস কল্পনার জ্যোৎস্নাময় কাব্য আমরা আর দেখিয়াছি কিনা, কিম্বা অচিরাৎ আর দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ" সেই "সারদা মঙ্গল" এপর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ দর্শন করে নাই বা কেন? দোষ কবির না দুর্ভাগ্য আমাদের? সহৃদয় পাঠকের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁহারা একবার কবির কাব্যগুলি পাঠ করেন, তাহা হইলেই এই শেষের প্রশ্নটীর উত্তর পাইবেন।

সাধারণ পাঠকের নিকট বিহারিলালের সুপরিচিত না হইবার, অথবা প্রাপ্য আদর ও সুযশ না পাইবার কারণ, এবং সাহিত্য-বিপণি ক্ষেত্রে তাঁহার কাব্যের উচিত মূল্য নিরূপণের পথে অন্তরায় প্রধানতঃ তিনটী :—

প্রথম—বিহারিলালের কাব্যে কৌতুকাবহ বা নাটকোচিত কোন সামাজিক, ঐতিহাসিক, বা পৌরাণিক ঘটনার বর্ণন নাই, ঔপন্যাসিকত্বের সংস্পর্শ নাই, বীররসের অবতারণা বা সমরাঙ্গণের অস্ত্র ঝন্‌ঝনা নাই। কিন্তু কাব্য কাননের এই ফল গুলিই, জনসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মুখরোচক।

---

* ভারতী, ১২৮৬, শ্রাবণ। ১৯১ পৃষ্ঠা।

† Report on the Administration of Bengal—1880—81 Page 457.

‡ "ভারতী", ১২৮৬, মাঘ, ৪৫৪ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয়—তাঁহার কাব্যগুলি, অন্ততঃ "সারদামঙ্গল" খানি অনেকের পক্ষে, ইংরাজ কবি ব্রাউনিংএর কবিতার ন্যায় (যদিও ভিন্নতর কারণে), দুর্ব্বোধ। ভাষা সরল ও মধুময়, কিন্তু যিনি কবির হৃদয়-বীণার তন্ত্রী গুলির সহিত, আপনার অন্তরের সমতন্ত্রী গুলির সুর মিলাইয়া লইতে না পারিবেন, যিনি কবির ভাবে আপনাকে বিভোর করিতে না পারিবেন, তাঁহার পক্ষে "সারদা মঙ্গল"এর কবিত্ব বা সৌন্দর্য্য সম্যগ্‌-রূপে অনুভব করা অসম্ভব। কিন্তু কবির সমবেদক বা প্রকৃত কবিত্ব-রসজ্ঞ পাঠকের সংখ্যা এই জীবনসংগ্রামময় কঠোর সংসার ক্ষেত্রে কয়জন ?

তৃতীয়—কবি নিজের ভাবেই বিভোর থাকিতেন, তিনি জন-সাধারণের নিকট যশের প্রত্যাশী ছিলেন না ; তিনি অক্ষম, অরসিক পাঠকের মৌখিক সুখ্যাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন ; তিনি দেশীয় সমালোচক-আখ্যায়িত জনগণের, কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখতার কথা, আন্তরিক-তার অভাবের কথা বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের সমালোচনা অসার বলিয়া গণ্য করিতেন। বিহারিলাল বিষয়ী লোকের ন্যায় কার্য্য করেন নাই ;—তিনি সমালোচকদিগের দ্বারস্থ হইয়া, তাঁহাদের পৃষ্ঠে জয়ঢক্কা বাঁধিয়া দিয়া রাজমার্গে প্রেরণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন ! শুধু তাহাই নহে ; কবির মানস উদ্যানের গৌরব কুসুম "সারদামঙ্গল" বিকশিত হইবার পর, সেই পারিজাত-প্রসূ উপবনে আরও কত সুরমা ও সুরভি ফুল ফুটিয়া ছিল, কিন্তু কবি সে গুলিকে পুস্তকাকারে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, তাহাদের আদর বা অনাদর প্রাপ্ত হইবার অবসরও দেন নাই।

কিন্তু সমসাময়িক জনগণের নিকট সুপরিচিত বা সমাদৃত না হইলেও বিহারিলালের স্মৃতি বিনষ্ট হইবার নহে। ঔপন্যাসিকত্ব ও

সংগ্রাম কলহাদির অভাব সত্বেও বিহারিলালের কাব্যে এমন কোন বস্তু আছে যাহা অমর অক্ষয়, যাহা বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে বোধ হয় আর কোথাও নাই। তাঁহার কাব্যে যেরূপ আবেগময় গাম্ভীর্য্যময় অথচ মুরলী-মধুর উচ্ছ্বাস আছে, তাঁহার কাব্যে যেরূপ উদার বিশাল, পবিত্র সুন্দর, মৌলিক ও জাতীয় ভাবের একটানা স্রোত আছে প্রকৃত কবির প্রাণের নিগূঢ় কথা আছে, তন্ময়তা আছে, তাহা বোধ হয় বঙ্গের অন্য কোন কবির কাব্যে নাই। তাঁহার ন্যায় অকপটভাষী, শব্দকুশলী কবি সাহিত্যক্ষেত্রে অতি বিরল। তিনি সহজ সরল কথায় যেরূপ হৃদয়োদ্বেলক সুগভীর ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তিনি বসনভূষণের চাক্‌চিক্য বিহীন ভাষায় যেরূপ বিমোহিনী নগ্ন মাধুরী দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গের বর্ত্তমান কালের কাব্য সাহিত্যে প্রথম ও অতুলনীয়। তাঁহার শব্দসঙ্গীতময় কবিতাপ্রবাহ, কখন বা দিব্যকুসুম-সুবাসিত নন্দনমরুত-বিজিত মন্দাকিনীর কুলু কুলু রবের সহিত, অপ্সরী কিন্নরীর মৃদুমধুর নূপুর নিক্কণ তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত করিয়াছে, কখন বা কোমল গম্ভীর আরাবে, দিগন্তব্যাপী বিশ্বসঙ্গীতের সহিত ঐক্যতানে সম্মিলিত হইয়াছে।

কবি বিহারিলালকে কাব্যানুরাগিগণ, নানারূপ উপাধিতে অভিহিত করিয়াছেন। একজন লেখক * বলিয়াছিলেন কবিকুলরবি সেক্সপীয়র "Poets eye in a fine frenzy rolling" বাক্যে কবির যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিহারিলাল সেই শ্রেণীর কবি। কেহ তাঁহাকে "কবির কবি" বলিয়াছেন, কেহ "ধ্যানমগ্ন কবি" কেহ "দুঃখের কবি" কেহবা "সৌন্দর্য্যের কবি" বলিয়াছেন। উপাধিগুলির প্রত্যেকটীই বিহারিলালের উদ্দেশে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, অথচ

* শ্রীননিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ভূমি. ১৩০১ সাল ভাদ্র।

ইহাদের কোন একটীতে বোধ হয় তাঁহার বিশেষত্ব অভিব্যক্ত করা যায় না। প্রথমোক্ত, সেক্সপীয়র নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞাটী প্রকৃত কবিগণের সাধারণ সংজ্ঞা, সুতরাং উহা বিহারিলালের ন্যায় কবি মাত্রেরই প্রতি ব্যবহার্য্য। অস্তগত ও উদীয়মান অনেক বঙ্গীয় কবি, এই অপরিজ্ঞাত গায়কের নিভৃত সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন, এবং কবিরাই সেই সাধারণের অবোধগম্য বা অশ্রুত সঙ্গীতের মদিরতা ও গভীরতা অনুভব করিয়া বিহারিলালকে আদর বা সম্মান করিতেন বলিয়া, কোন সমালোচক * বিহারিলালকে "কবির কবি" বলিয়াছেন। সুকবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন "বিহারি বাবু সদাই কবিত্বে মজগুল থাকিতেন, তাঁহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা ছিল তাঁহার রচনা তাঁহাকে যতবড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা অপেক্ষা ও তিনি অনেক বড় কবি ছিলেন।" কবিবর হেমচন্দ্র, বিহারিলালকে "প্রকৃত কবি" বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার সকল কবিতাই "মধুরতাময় ও কবিত্বপূর্ণ" দেখিতেন। কবিকুলভূষণ নবীনচন্দ্র সেন বলেন "তাঁহার কবিতা বড় ভালবাসি, কোন কোন কবিতা আমার এখনও কণ্ঠস্থ আছে।" বর্ত্তমান বঙ্গের বরেণ্য কবি রবীন্দ্র বাবুর স্তুতিগানের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পরলোকগত কবি রাজকৃষ্ণ রায় ও অধরলাল সেন উভয়েই বিহারিলালের আন্তরিক উপাসক ছিলেন। খ্যাতনামা কবি অক্ষয় কুমার বড়াল তাঁহার আর একজন প্রিয় ভক্ত। কিন্তু বিহারিলাল যে কেবল এই স্বারস্বত-কুঞ্জ বিহারিগণেরই অন্তরঙ্গ একথা আমরা স্বীকার করি না বা স্বীকার করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। একথা বলিলে বঙ্গীয় সাহিত্যানু-রাগিগণের অপযশ প্রচার করা হয় এবং আমরা তাহাতে প্রস্তুত নহি।

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ ১২০১, ১০ম সংখ্যা।

বিহারিলালের জীবনীশক্তি গানে অপেক্ষা ধ্যানেই অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছিল বলিয়া, কোন বিচক্ষণ সমালোচক * তাঁহাকে "ধ্যানমগ্ন কবি" নাম দিয়াছেন। প্রকৃত কবি মাত্রেই ধ্যানশীল, এবং তাঁহাদের গান সেই অসীম ধ্যানের ক্ষণিক অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস মাত্র; সুতরাং ধ্যানের সহিত তুলনায় গান সঙ্কীর্ণ হইয়াই থাকে। বিহারিলাল প্রকৃত কবি ছিলেন পরন্তু তাঁহার কবিতায় আবর্জ্জনা নাই, সেই হেতু তাঁহার গানও সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ভক্তিভাজন সমালোচক যত সঙ্কীর্ণ বিবেচনা করিয়া কবিকে "ধ্যানমগ্ন" বলিয়াছেন তত সঙ্কীর্ণ নহে। তিনি বলিয়াছেন "কবি গিয়াছেন, কবিতা কিছু আছে। সে অতি কোমল কবিতা। কোমলাদপি কোমল। মিষ্ট মসৃণ মোলায়েম। আবেশময়ী; ইথর বৎ আকাশ বিহারিণী। * * কঠিন মাটির কর্কশ স্পর্শ সহে না। অতি সাবধানে তাহা ছুঁইতে হয়। নহিলে নবনীবৎ এলাইয়া যায়, নক্ষত্রবৎ ছুটিয়া যায়।" এরূপ কবিতার রাশি রাশি জন্ম এ জগতে হয় না। অতি অল্পই হয়; এবং বিহারিলাল সেই কবিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অন্যান্য কবিদিগের সহিত তুলনায় প্রচুর। তবে সমালোচক যে "কিছু"র কথা বলিয়াছিলেন, আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অধিক আছে। তাহা এখনো অপ্রকাশিত। আশা আছে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছিলেন † "তিনি যেমন দুঃখ ও মানসিক কষ্ট বর্ণনা করিতে পারেন, তেমন অন্য কোন বর্ত্তমান কবি পারেন না।" কিন্তু বিহারিলাল কেবল মাত্র "দুঃখের কবি" বলিয়া বড় নহেন এবং দুঃখই যে তাঁহার কবিতার

---

* শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। নব্যভারত ১৩০১ সাল, ৪র্থ সংখ্যা।

† বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ৪২ পৃষ্ঠা।

বিশেষত্ব এরূপ নহে। বিহারিলাল সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন বটে, কিন্তু কেবলমাত্র "সৌন্দর্য্যের কবি" বলিয়াও তিনি বঙ্গীয় কবিতা-শৈলের তুঙ্গ শৃঙ্গে দণ্ডায়মান নহেন ; এই সৌন্দর্য্যের সহিত আর একটী বস্তুর সংযোগ আছে—সেটী প্রেম ! বিহারিলাল সৌন্দর্য্যের কবি, বিহারিলাল প্রেমের কবি—ক্ষুদ্র মানব সৌন্দর্য্যের নহে, বিশ্ব সৌন্দর্য্যের, ইন্দ্রিয়-লালসা জড়িত প্রেমের নহে, বিশ্বপ্রেমের। তিনি যে দিব্য সৌন্দর্য্যের শান্তি-স্নিগ্ধ ছবি দেখাইয়া গিয়াছেন, তিনি আত্মহারা হইয়া, মোহকরী রাগিণীর মূর্চ্ছনাময় স্বরলহরীতে দিক্‌দিগন্ত উদ্বেলিত করিয়া যে বিশ্বপ্রেমের মধুময় গান গাহিয়াছিলেন, সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য ও অনন্ত প্রেমের মূর্ত্তি যুগযুগান্তর তপস্যা করিলে তবে মানবের ধ্যানে আসে। কবি শেলি কত সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন, কত আকুল ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তবে সে মূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিলেন :—

> "To thirst and find no fill—to wail a wander
> With short uneasy steps—to pause and ponder—
> To feel the blood run through the veins and tingle
> Where busy thought and blind sensation mingle ;
> To nurse the image of unfelt caresses
> Till dim imagination just possesses
> The half created shadow.—"

কবি বিহারিলালের তপস্যাও আজীবনব্যাপী, ঐকান্তিক ও কঠোর। নারী পূজায় তাঁহার এই তপস্যার আরম্ভ। যে রমণীকে তিনি

"জগতের তুমি জীবিত রূপিণী"

বলিয়া সম্বোধন করিতেন, যে রমণীজাতির সম্মানে তিনি জীবনে ও রচনায়, পাশ্চাত্য Age of chivalryর knight গণকে পরাস্ত করিয়া-ছিলেন, যে রমণী পূজার উদ্বোধন গীতি, তিনি "প্রেম প্রবাহিণী" ও "বঙ্গসুন্দরী"র হৃদয়দ্রাবণী কবিতায় উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়াছিলেন, যে রমণী

পূজার উচ্চাদর্শে কোন সুবিজ্ঞ লেখক* তাঁহাকে, শুধু বঙ্গের বা ভারতের নহে, সমগ্র জগতের রমণী-পূজক কবিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই রমণী-পূজাই ক্রমে সারদা পূজার সহিত অভেদ হইয়া পড়ে। কবি একান্তমনে সারদার উপাসনা করিয়াছিলেন—

ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে;
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।

বুঝি তাই সারদা তাঁহার প্রিয়ভক্তের কাতর সাধনা সফল করিয়াছিলেন। কবি সারদাকে পাইয়াছিলেন, ভয় ও ভক্তির পাত্রী আরাধ্যা দেবী বা মাতৃ ভাবে নহে, স্নেহ করুণার পাত্রী ভগ্নী ভাবে নহে, প্রাণের প্রাণ, সুখের স্বর্গ প্রেমময়ী প্রণয়িণীরূপে।

কবির যোগের সময়ের অনুভূতি তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করে রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমির রাশি
ভুবন ভরেছে আসি
অন্তরে জ্বলছে আলো, নয়নে আঁধার।
বিচিত্র এ মত্ত দশা
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতিঃ কি বিচিত্র জ্বলে।

---

* শ্রীঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায়। নব্যভারত, ১৩০১, শ্রাবণ। লেখক বিহারীলালের সহিত আর একজন বঙ্গীয় কবিকে এই রমণী পূজা বিষয়ে সমতুল্য আসন দিয়াছেন—ইনি ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। কিন্তু "সুরেন্দ্রনাথের "মহিলা" বঙ্গসুন্দরীর পরে রচিত ও বঙ্গসুন্দরীর একটী সমালোচনা হইতেই "মহিলা"র উৎপত্তি—চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ—১৩০১, ১০ম সংখ্যা।

কি বিচিত্র সুরতান
ভরপুর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে।

সেই যোগের সময় কাব্যমন্দিরে স্তিমিতনেত্রে ধ্যান নিমগ্ন কবিকে দেখিয়া বাগ্দেবীর অন্যান্য উপাসক উপাসিকাগণ বিস্ময়োৎফুল্ল বচনে তাঁহাকে যে ভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমাদেরও কবির সেই সুখস্বপ্নের অবস্থা স্মরণ করিয়া, তাঁহার নিজ ভাষায় তাঁহাকে সেইরূপ সম্ভাষণ করিবার বাসনা স্বতঃই মনে উদিত হয়—

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ঢুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও!
কমলা ঠমকে হাসি
ছড়ান রতন রাশি,
অপাঙ্গে ভ্রুভঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও!
ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ,
ইন্দ্রাসনে তুচ্ছ জ্ঞান,
হাসিয়ে পাগল বলে পাগল সকল।

*　*　*

*　*　*

যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এসনা এ যোগীজন তপোবন স্থলে!

কবিশেশি বলিতেন, কবিরা ধ্যাননিমগ্ন অবস্থায় যে দৃশ্য দেখিতে পান, তাহা যোগভঙ্গ হইলে তন্দ্রাবেশে দৃষ্ট সুখস্বপ্নের মত অস্পষ্ট ও বিলীন হইতে থাকে, সুতরাং অক্ষুণ্ণ ভাবে তাহা আঁকিতে পারেন না। সেই কারণেই বোধ হয় কবি বিহারিলাল বলিতেন—

"অতি অপরূপ রূপ
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।"

কিন্তু সেই পবিত্রমুহূর্ত্ত, সেই শুভযোগ চলিয়া যাইলেও কবি যে অতুল সৌন্দর্য্যের, যে অসীম প্রেমের মূর্ত্তি আঁকিয়া গিয়াছেন, সেই ছায়া দেখিয়া আনন্দে বিস্ময়ে নয়ন স্তিমিত হইয়া আসে, ধমনীর স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায়—

কহে সে রূপের কথা
বসন্তের তরুলতা
সমীরণে ডেকে বলে নির্জ্জনে কানন ফুল
শুনে, সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুল্ ঢুল্,

কবি সেই রূপসাগরে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, আপনার অস্তিত্ব লীন করিতে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। তিনি জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্রই সেই মূর্ত্তি বিরাজমানা দেখিতেন এবং সেই রূপরাশির ক্ষণমাত্র অদর্শনে জগৎ সংসার শূন্যময় অনুভব করিতেন—

.... এ বিশ্বথেকে
কান্তিখানি দূরে রেখে,
চাও, বিশ্ব পানে চাও—
কিছু কি দেখিতে পাও ?—
কোথা তুমি, কোথা আমি,
কে তোর্ জগৎ স্বামী ?
সূর্য্য চন্দ্র দিন রাত
কিছু নহে প্রতি ভাত
কোথা ? কোথা ? কোথা তুমি বিশ্ব বিকাশিনী !
এস মা। ঘোরান্ধকারে তিষ্ঠিতে পারিনি।
তুমিই বিশ্বের আলো, তুমি বিশ্ব রূপিণী।

আর সেই মূর্ত্তির যখন পুনঃ সন্দর্শন লাভ করিতেন, তখন কবি আনন্দ-উথলিত হৃদয়ে, আবেগে, উচ্ছ্বাসে, গাহিতেন—

অহো! বিশ্বপরকাশী
উদার সৌন্দর্য্য রাশি
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত;
যে দিকে ফিরিয়া চাই
সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাই
অত্যুল্লাসকরি, অয়ি
পরম আনন্দময়ী!
কে তুমি, মা! কান্তি রূপে সর্ব্বভূতে বিভাসিত?

ভক্তের আরাধনায় প্রীত হইয়া যখন সেই কান্তিময়ী, করুণাময়ী মূর্ত্তিতে, অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণে কবিকে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহার হৃদয়াসনে আসিয়া বসিতেন, যখন বিশ্বরূপের সহিত বিশ্বপ্রেমের মিলন হইত, তখন কবির হৃদয়ে আর মাতৃভাব থাকিত না, কবি তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব সারদাকে পাইতেন, এবং সোহাগ মধুর স্বরে বলিতেন—

দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দুনয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়!
দেখিয়ে মেটেনা সাধ,
কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি মাখা আছে ও শুভ আননে!
কি এক বিমল ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি;
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণে!

এই সুখ-সম্মিলন অবস্থায়, এই যোগের সময়, কবির নয়নপথে সৌন্দর্য্যের শত বিজলী খেলিতে থাকিত, অন্তরে প্রেমের শতউৎস উৎসারিত হইতে থাকিত, কবি অসীম উল্লাসে আত্মহারা হইয়া জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড করতলগত দেখিতেন, আপনার ক্ষুদ্রত্ব—মানবত্ব ভুলিয়া যাইতেন, এবং দেখিতেন, সেই বিশ্বব্যাপী শিবসুন্দরের ছায়া পূর্ণ-গৌরবে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মূর্ত্তিতে প্রতিবিম্বিত, তিনি সুখাতিশয্যে উন্মত্ত হইয়া প্রিয়পত্নীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হো'ক গে এ বসুমতী যার খুসি তার।

যে হৃদয়ের অধীর স্পন্দন এরূপ উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিত, সে হৃদয় চিরতরে শান্ত হইয়াছে; গঙ্গাতীরস্থ নিভৃত কুটীর হইতে আর সে পীযূষবর্ষী বাঁশরী বাজে না। কিন্তু সেই হৃদয়স্পন্দন, সেই বেণুরব যে বায়ুতরঙ্গ উদ্ভূত করিয়া গিয়াছে, তাহা বঙ্গীয় কাব্যগগনে চিরদিন সমবেগে বিকম্পিত হইতে থাকিবে; কোটী কোটী বৃহত্তর বা বিভিন্নতর তরঙ্গ তাহাদের মার্গচ্যুত বা প্রতিহত করিতে পারিবে না।

বিহারিলাল বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যের একটী সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। কোন সমালোচক * বলেন "বিহারিলাল বাঙ্গালার শেষ কবি। বিহারিলালের কবিতা বাঙ্গালাভাষার নিজস্বধন।" বস্তুতঃই তাই। "মধুসূদন হইতে নগণ্য ক্ষুদ্র কবির লেখায় পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছ কাব্যের ভাব প্রতিফলিত।" বঙ্কিম বাবু বলিয়া ছিলেন † "মধুসূদন হইলেন বাঙ্গালার মিল্টন, হেমচন্দ্র হইলেন পিণ্ডার,

---

* চিকিৎসাতত্ত্ব—বিজ্ঞান এবং সমীরণ, ১৩০১, ১০ম সংখ্যা।

† ৮ কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকা।

নবীনচন্দ্র হইলেন বায়রন, রবীন্দ্র হইলেন শেলি, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত হইলেন কি ? ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালার ঈশ্বরগুপ্ত।" সেইরূপ আমরাও বলিতে পারি বিহারিলাল বঙ্গের বিহারিলাল, এবং আর একটু বেশী বলিতে পারি ঈশ্বরগুপ্ত যদি বাঙ্গালার খাঁটি সোণা হয়েন, তাহা হইলে কবিত্বের স্বতন্ত্রতায় ও ভাবতন্ময়ে বিহারিলাল বঙ্গের মাণিক্য যাহার মূল্য নাই। কিন্তু বিহারিলাল যেমন বাঙ্গালার নিজস্ব কবিদিগের শেষ বংশধর, তিনি আবার বাঙ্গালার অধুনাতন কালের গীতিকবিতার প্রথম কবি। "বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারিলাল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিহারিলালের গীতিকাব্য বঙ্গসাহিত্যের যুগান্তরের কথা।" * তাই বলিতে ছিলাম বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে বিহারিলালের স্থান একটী বিচিত্র সঙ্গম স্থলে। তিনি একহস্তে বঙ্গের প্রকৃত জাতীয় কবিতাগারের দ্বারে বুঝিবা চিরতরে যবনিকা পাতিত করিয়া গিয়াছেন, আর এক হস্তে গীতিকাব্যকাননের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তিনি একাধারে অস্তগামী তপনের শেষ রশ্মি, আবার প্রভাত গগনের নব অরুণরাগ।

কোন সাহিত্যসেবক আক্ষেপ করিয়া ছিলেন যে বাঙ্গালার এখনকার "গীতিকাব্যের প্রবর্ত্তক বিহারিলালকে বাঙ্গালার পাঠক চিনিল না। যে সরল সত্য বাঙ্গালা কাব্য প্লাবিত করিয়াছে, সে সরল সত্যের উপাসক বিহারিলালকে বাঙ্গালার পাঠক না চিনুক, বাঙ্গলা কাব্যের যদি কখন ইতিহাস লিখিত হয়, বিহারিলালের নাম ইতিহাসের শীর্ষস্থানে থাকিবে †।" সমালোচক যে ইতিহাসের কথা

* চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ ১৩০১, ১০ম সংখ্যা।

† চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণ, ১৩০১, ১১শ সংখ্যা।

বলিয়াছেন, সে ইতিহাস লিখিবার বোধ হয় এখনও বিলম্ব আছে, কিন্তু আমাদের আশা ও বিশ্বাস বিহারিলালকে চিনিবার দিন আসিয়াছে, সুদূর ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। যে সময়ে বিহারিলালের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সে সময় অপেক্ষা বর্ত্তমান কাল তাঁহাকে বুঝিবার পক্ষে কিছু অনুকূল। এখন রবীন্দ্র বাবু প্রমুখ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিগণ যে সকল কাব্য লিখিতেছেন, এবং সাময়িক পত্রে যে সকল কবিতা অবিরত ধারে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে বীররস অপেক্ষা করুণ রসের প্রাধান্য—"মেঘনাদবধ" "বৃত্রসংহার" বা "পলাশীর যুদ্ধ" অপেক্ষা "সারদা মঙ্গলে"এর সম্বন্ধ,—অধিক বলিয়া বোধ হয়। বিহারিলাল চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গীয় কাব্য কাননে তাঁহার পরিত্যক্ত বীণাটীর ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। তিনি যেযুগের আবাহন গীতি গাহিয়াছিলেন বঙ্গে সেই গীতিকবিতার যুগ নবীন উদ্যমে আরব্ধ হইয়াছে; এবং কাব্যজগতে বোধ হয় এই যুগটীই বাঞ্ছনীয়। বঙ্কিম বাবু গীতি কাব্যের একটি সংজ্ঞা দিয়াছিলেন "গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতি কাব্য।" যদি তাহাই হয় তাহা হইলে গীতি কাব্যই বোধ হয় সকল কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য! পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের একজন মনীষী লেখক (Carlyle) এবং একজন কবি ও সুবিজ্ঞ সমালোচক (Coleridge) উভয়ে সমস্বরে বলিয়াছেন,* প্রকৃত কবিতা মাত্রেই গান;—যাহা গীত হইতে পারে না, যাহাতে

* "All old Poems, Homer's and rest are authentically songs. I would say in strictness all right poems are; that whatsoever is not sung is properly no poem, but a piece of Prose crumped into jingling lines—to the great injury of the grammar to the great grief of the reader for the most part!"

Carlyle—On Heroes.

সঙ্গীত নাই যাহা গদ্যে ব্যক্ত হইতে পারে তাহা ছন্দোবদ্ধ বাক্যে গ্রথিত হইলেও কবিতা বা কাব্য নহে।

যাঁহার অন্তরাত্মা জগৎব্যাপী রহস্যময় সঙ্গীতের আবেগে আলোড়িত হয়, যিনি পদার্থের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য, বা নিগূঢ় কারণ—যে নিয়ন্ত্রিত সুমধুর ঐকতান (harmony) গুণে জগতে তাহার অস্তিত্ব, তাহা, অনুভব করিতে পাবেন, তাঁহার ভাব এবং ব্যক্যও অনুভূতির অনুকারী হইয়া স্বতঃই সঙ্গীতময় হইয়া আসে ; প্রকৃতি তাঁহাকে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় গান গাওয়ায় এবং লোকে তাঁহাকে কবি বা গায়ক বলে।

এইরূপ গায়ক কবিদিগের সংখ্যা বড় বেশী নাই ; বিহারিলাল সেই বিরল সংখ্যক কবিদিগের মধ্যে একজন এবং প্রাগুক্ত আদর্শ অনুসারে বাঙ্গালায় অধুনাতন কালের কবিগণের মধ্যে বোধ হয় তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার "সারদা মঙ্গল গান" এবং অপরাপর অধিকাংশ রচনা যথার্থই গানে আরম্ভ, গানে বৃদ্ধি এবং গানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। এবং সেই গান বা গীতিকাব্য গুলির সৌন্দর্য্য ও মধুরতার তুলনা নাই।

বিহারিলালের কাব্যে যেমন ঔপন্যাসিকত্ব নাই, রণঘোষণার উন্মাদকর তূর্য্যধ্বনি নাই, তাঁহার জীবনও সেইরূপ অদ্ভুত, অশান্তিপ্রদ বা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা-বৈচিত্র্য পরিশূন্য। কিন্তু কবিতায় যেরূপ সমাদৃত হইবার অনুরূপ বিষয় থাকিতে পাবে কবিজীবনীতেও সেইরূপ সাহিত্যানুরাগিগণের প্রীতিদায়ক এবং অনুকরণীয় বিভিন্নতর বিষয় থাকিতে পারে। এই ভরসায় আমরা স্বর্গগত কবির জীবনী ও রচনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং সে সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টায় যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা "প্রয়াস"এর পাঠক গণের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

ক্রমশঃ

চন্দ্রশেখর—অনুশীলন।

আমরা বিষবৃক্ষ অনুশীলনে বঙ্কিম বাবুর সমস্ত উপন্যাস গুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি, প্রথম প্রাকৃতিক (Realistic), দ্বিতীয় অলৌকিক (Romantic)। যে উপন্যাসে সাংসারিক ঘটনাবলি এরূপ যথাযথভাবে বর্ণিত থাকে যে পড়িলেই উহা সত্য, অন্ততঃ সম্ভব বোধ হয়, তাহাই প্রাকৃতিকের অন্তর্গত। যথার্থ উক্তিই তাহার লক্ষ্য। এই কারণেই আমরা বঙ্কিম বাবুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস দ্বয়—"বিষবৃক্ষ' ও "কৃষ্ণকান্তের উইল"কে প্রাকৃতিকের অন্তর্গত করিয়াছি। যে উপন্যাসে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বা চরিত্র গুলির অতিরঞ্জিত চিত্রের সমাবেশ থাকে, অথবা যাহাতে ইতিহাস বর্ণিত দুই একটি চরিত্রের ছায়া মাত্র অবলম্বনে লেখকের স্বকপোল কল্পিত ঘটনা সমূহ উল্লিখিত হয় তাহাকেই এক কথায় অলৌকিক (Romantic) আখ্যা প্রদান করিয়াছি। এই অলৌকিক উপন্যাসের লক্ষণ অত্যুক্তি বা অস্বাভাবিকতা। "চন্দ্রশেখর" এই অলৌকিক শ্রেণীর অন্তর্গত, বর্ত্তমান অনুশীলনে ইহার দুই একটি কারণ নির্দ্দেশিত হইবে।

বিষবৃক্ষ অনুশীলনে আমরা দেখাইয়াছি যে প্রথমেই নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা ও প্রবল ঝটিকার অবতারণায় আখ্যায়িকার একপ্রকার পূর্ব্বাভাস প্রদত্ত হইয়াছে, পূর্ব্বাভাস গ্রন্থকারের স্বেচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য কি অজ্ঞানকৃত ভবিষ্যদ্বাণী (unconscious prophecy) তাহা বলা যায় না। চন্দ্রশেখরেও জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত পূর্ব্বাভাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমেই ভাগীরথী তীরে আম্র কাননে একটি সাত আট বৎসরের বালিকা ও একটি কিশোর বয়স্ক বালক দেখিতে পাই। বলিকার নাম শৈবলিনী, বালকের নাম প্রতাপ। বালিকা বালকের পদতলে

"নবদূর্ব্বা শয্যায় শয়ন করিয়া 'নবীরে' তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল ;" শেষপরিচ্ছেদে দেখিতে পাই ষোড়শ বৎসর "নীরবে" সেই বাল্য সহচরী' শৈবলিনীকে ভালবাসিয়া প্রতাপ পরের মঙ্গলের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন করিল। প্রথম পরিচ্ছেদে নব দূর্ব্বাশয্যায় সজীব স্বর্ণপ্রতিমা শয়ানা দেখিয়াছিলাম. শেষ পরিচ্ছেদে দেখিলাম "তৃণশয্যায় অনিন্দ্য জ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল"। পাঠক উভয় পরিচ্ছেদের ভাষার সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শীর্ষ "ডুবিল বা কে উঠিল বা কে।" ইহাতেও অজ্ঞানকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পরিচয় পাওয়া যায়—"প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিলনা, ফিরিল, সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল"। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শৈবলিনী—প্রতাপের মিলন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া উভয়ে পরামর্শ করিয়া ডুবিয়া মরিবার সংকল্পে সন্তরণ আরম্ভ করিল, প্রতাপ ডুবিল কিন্তু শৈবলিনীর সাহস হইল না।

শেষ পরিচ্ছেদে, প্রতাপ থাকিতে শৈবলিনীর সুখের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া প্রতাপ চিরতরে ডুবিল, পরের সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিল। শৈবলিনী পূর্ব্বে মরণ যন্ত্রণার ভয়ে ডুবিতে সাহস করে নাই, পরে নরক যন্ত্রণার ভয়ে সে মরিতে পারে নাই। পূর্ব্বে সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিয়াছিল, পরেও ভীষণ প্রায়শ্চিত্তরূপ সন্তরণদ্বারা কলঙ্ক-সাগর হইতে কূলে ফিরিয়া আসিয়াছিল। পাঠক দেখিলেন উপক্রমণিকায় জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত যে ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে, উপসংহারে তাহার কিরূপ বিষাদময় পরিণাম হইয়াছে। শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের বিবাহ কথাতেই উপক্রমণিকা শেষ হইয়াছে এবং ঐ বিবাহের আট বৎসর পরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে।

আখ্যায়িকাটি ছয় খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, যথা, প্রথম, "পাপীয়সী," দ্বিতীয় "পাপ," তৃতীয় "পুণ্যের স্পর্শ", চতুর্থ "প্রায়শ্চিত্ত", পঞ্চম

"প্রচ্ছাদন", ষষ্ঠ "সিদ্ধি"। এই ছয় খণ্ডে আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমরা পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বোক্ত উপযুক্ত ও অর্থবোধক খণ্ড গুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব। প্রথম খণ্ডে শৈবলিনী যে পাপীয়সী তাহারই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ভীমা পুষ্করণীতে সন্ধ্যাসমাগমে সুন্দরী যখন শৈবলিনীকে বলিল—

"ভাই সন্ধ্যা হইল আর এখানে না। চল বাড়ি যাই।"

শৈবলিনী বলিল—

"কেহ নাই, ভাই চুপি চুপি একটা গান গানা।
সু। দূর হ! পাপ! ঘরে চ।
শৈ: ঘরে যাব নালো সই!
আমার মদনমোহন আসচে ওই।
হায় যাবো না লো সই।"

শৈবলিনী যখন ঐ কথা বলে তখন লরেন্স ফষ্টরকে দেখিতে পাইয়াছিল কিনা ঠিক বুঝা যায় না, "আমার মদনমোহন আসচে ওই" ইহাতেই যে বুঝিতে হইবে লরেন্স ফষ্টরকে উদ্দেশ করিয়া ঐ কথা বলা হইয়াছে তাহার কোনও বিশেষ প্রমাণ নাই, সম্ভবতঃ উহা কোনও সঙ্গীতের অংশ হইতে পারে। যাহোক, অতি অল্পক্ষণ পরেই শৈবলিনী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সুন্দরীকে দেখাইল; সুন্দরী পুষ্করিণীর অপর পারে তালবৃক্ষতলে লরেন্স ফষ্টরকে দেখিতে পাইল. দেখিয়াই আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু শৈবলিনী সেই সন্ধ্যার সময় সাহেব দেখিয়া পলাইল না, একাকী জলমধ্যে থাকিয়া সাহেবের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। শৈবলিনী যদিও জলে ছিল তথাপি মনে করিলে যে পলাইতে পারিত না এরূপ বোধ হয় না,

কারণ ইংরাজ তখন পুকুরের অপর পারে ছিল, সুন্দরী পলাইলে তবে শৈবলিনীর নিকটে আসিল।

বাঙ্গালীরমণীর পক্ষে, বিশেষতঃ তদানীন্তন কালের বাঙ্গালী রমণীর পক্ষে সন্ধ্যার সময়ে একাকিনী নির্জ্জনে একজন সাহেবের সহিত অম্লানবদনে কথা কওয়া অস্বাভাবিক নহে কি? "চন্দ্রশেখর"কে অলৌকিক শ্রেণীভুক্ত করার ইহা একটি কারণ। আর এক কথা, গ্রন্থকার বলিতেছেন, "সুন্দরী পলাইয়া গেলে কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে তালগাছের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া ঘাটের নিকট আসিল।" কেন, ওরূপ সাবধানতা বা ভয় কিসের জন্য? সুন্দরী সেথা থাকিলে কি লরেন্স ফষ্টর তথায় আসিতে পারিত না? নির্জ্জনে দুইজন রূপবতী যুবতীকে দেখিয়া লরেন্স ফষ্টর শ্রেণীর লোকের ভয় না হইয়া বরং লোভ হইবারই কথা। তার পর লরেন্স ফষ্টর শৈবলিনীর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়াই যে অমন সুযোগ ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবে, ইহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। শৈবলিনী গৃহে আসিয়া স্বামীকে সমস্ত কথা বলিল বটে, কিন্তু ঠিক সত্য বলে নাই,— "একটা গোরা আসিয়াছিল, তা সুন্দরী ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায় ছিল আমায় ফেলিয়া পলাইয়া আসিল। আমি জলে ছিলাম ভয়ে উঠিতে পারিলাম না, একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি শৈবলিনী মনে করিলে পলাইতে পারিত। আর, তার ভয়ের ত চিহ্ন দেখিতে পাই না, বরং সাহসেরই পরিচয় পাই। স্বামীর নিকট ঐ বৃত্তান্ত বলিবার শৈবলিনীর এক কারণ ছিল, সে জানিত সুন্দরী চন্দ্রশেখরকে সমস্ত বলিবে, তাই হয়ত সে পূর্ব্বাহ্নে নিজদোষ স্খালনের চেষ্টা করিয়া ছিল। অবশ্য শৈবলিনী প্রথম প্রথম তৎকালের প্রচলিত প্রথা অনুসারে ফষ্টরকে

দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইত, পরে কেহ তাহাকে বলিল "ইংরেজ মনুষ্য ধরিয়া সদ্য ভোজন করে না, ইংরেজ অতি আশ্চর্য্য জন্তু; একদিন চাহিয়া দেখিও", শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল—দেখিল ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া সদ্যভোজন করিল না। সেই অবধি শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল। ইহার অস্বাভাবিকতা বুঝিয়াই বঙ্কিমবাবু ইহার স্বাভাবিকতা প্রমাণে এত যত্নবান হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি, সন্ধ্যাকালে একাকিনী সাহেবের সঙ্গে কথা কওয়া আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালী কুলললনার পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। ফষ্টরকে দেখিবামাত্র সুন্দরীর পলায়ন খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সুন্দরীর নাপিতানীবেশে নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করতঃ শৈবলিনীর উদ্ধারার্থ ইংরেজের নৌকায় গমন বড়ই অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়। যদিও তাহার স্বামী দূরে অবস্থিতি করিতেছিল, কিন্তু কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে ইংরেজের নৌকার বিরুদ্ধে কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার স্বামীর ছিল কি না, একথা কি সুন্দরী ঠাকুরাণী বা তাহার স্বামী একবারও ভাবেন নাই? সুন্দরী ঠাকুরাণী শৈবলিনীকে বলিতেছেন—

আমার জন্য ভাবিও না। বাঙ্গালায় এমন ইংরেজ আসে নাই যে সুন্দরী বামনীকে নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী, আমাদের মন দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রি মধ্যে বাড়ি যাইব। বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা।"

সুন্দরীর কথা গুলি অতিশয় দৃঢ়তা ব্যঞ্জক ও প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইংরাজ দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে যিনি পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার হঠাৎ ঐরূপ দৃঢ়তা স্বাভাবিক না বলিয়া অলৌকিক বলিতে ইচ্ছা করে। এই পরিচ্ছেদে শৈবলিনী যে পাপীয়সী তাহার নিজমুখেই তাহা জানিতে পারা যায়।

(সু। যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা ঘটিয়াছে—সেত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।

শৈ। কি সুখে? কোন সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু—

সু। কেন স্বামী? এ নারী জন্ম আর কাহার জন্য?

শৈ। সব ত জান—

সু। জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না)

০ ০ ০ ০ ০

(শৈ। কিন্তু যদি আর বাঁচি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না।")

আমরাও সুন্দরীর কথায় বলি পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে শৈবলিনীর মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে নারী স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষকে হৃদয়ে স্থান দেয় সে পাপিষ্ঠা নয় ত কি?

পাপচিন্তা কার্য্যে পরিণত না হইলেও উহা সমভাবে দূষ্য। বাইবেলে খ্রীষ্ট বলিতেছেন—

"Whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart."

(পাপ চক্ষে কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি চাহিলেই, তাহার সহিত ব্যভিচার করা হইল)। অর্থাৎ কু ইচ্ছা পাপ কার্য্যে পরিণত না হইলেও সেই পাপের ভাগী হইতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে স্বামী স্ত্রীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা, যে নারী, পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করে তাহার মত পাপিষ্ঠা আর কে আছে?

দ্বিতীয় খণ্ডের শীর্ষ "পাপ"। ইহাতে শৈবলিনীর পাপকার্য্য বিবৃত আছে। শৈবলিনী "এক পাপে পাপিষ্ঠা নয়" বটে, কিন্তু সে যে

প্রতাপকে পাইবার আশায় গৃহত্যাগ করিয়াছিল সেই তার মহাপাপ। তাহার পাপ অভিলাষ সার্থক হইল না বলিয়া তাহার পাপের লাঘব নাই, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পাপচিন্তা কার্য্যে পরিণত না হইলেও মনে উদয় হইলেই পাপ সঞ্চার হয়। শৈবলিনী প্রতাপকে অন্যায় দোষ দিয়া বলিয়াছিল।

"আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হ'তে, তোমা হ'তে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য।"

কিন্তু প্রতাপের দোষ কি? সে ত আর ওরূপ প্রণয়ে উৎসাহ দেয় নাই? দোষ শৈবলিনীর নিজের, চিত্তসংযমের অভাবই তাহার দোষ। প্রতাপ যথার্থই বলিয়াছিল—

"ঈশ্বর জানেন আমি কোন দোষী নহি, ঈশ্বর জানেন ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে তোমা হইতে দূরে থাকিতাম, তোমার বিষের ভয়ে বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া ছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা তাই আমার দোষ দাও, আমি তোমার কি করিয়াছি?"

ইহার উত্তরে শৈবলিনী যাহা বলিল তাহা অতি করুণ রসাত্মক বটে কিন্তু পাপযুক্তি পূর্ণ।

"তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে ওরূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? আমি কেন তোমায় দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমায় পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জাননা তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি তোমায় পাই সেই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছিলাম, নয় ত ফষ্টর আমার কে?"

ইহা শুনিয়া দুঃখও হয়, রাগও হয়। ছিছি! শৈবলিনী গৃহত্যাগিনী

হইয়া কুলটা রূপে প্রতাপকে পাইবার আশা করিয়াছিল। হায় সে জানিত না প্রতাপের হৃদয় তাহার হৃদয় হইতে কত উচ্চ! জানিলে তাহার এ দশা ঘটিত না।

তৃতীয় খণ্ডের শীর্ষ "পুণ্যের স্পর্শ"। শৈবলিনী নবাবের নিকট আপনাকে "রূপসী" বলিয়া পরিচয় দিয়া নবাবের অনুমতি ক্রমে অস্ত্রাদি লইয়া প্রতাপের উদ্ধারার্থ স্বয়ং ইংরাজের নৌকায় গমন করিল, কিন্তু অস্ত্রসাহায্য প্রয়োজন হইল না। সে উন্মাদিনী রূপে জলে ঝাঁপ দিল, প্রতাপও তাহার উদ্ধারার্থ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল; তার পর "অগাধ জলে সাঁতার"! সেই খানে গঙ্গা বক্ষে প্রতাপ শৈবলিনীকে শপথ করাইয়া লইল যে সে আর প্রতাপের চিন্তা করিবে না। শৈবলিনী অনিচ্ছা সত্ত্বে, প্রতাপ আত্মঘাতী হয় দেখিয়া, বলিল—

"শুন প্রতাপ তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

হাঁ, আজি হইতে কলঙ্কিনী শৈবলিনী মরিল বটে, কিন্তু মরিয়া পুনর্জীবন লাভ করিল। আজি হইতে পুণ্যের স্পর্শ আরম্ভ হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিবে প্রতিজ্ঞা করিল কিন্তু গৃহে ফিরিতে পারিল না। প্রতাপকে পাইবার আশায় এতদিন সে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল, এতদিনে সে আশালতা একেবারে ছিন্ন হইল। প্রতাপকে দেখিলে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না জানিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া হিংস্রজন্তু পরিবৃত পর্ব্বত-অরণ্যে প্রবেশ করিল। তথায় অনাবৃত মস্তকে অকাতরে ভীমপ্রভঞ্জন ও জলপ্রবাহ সহ্য করিয়াছিল।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল ঝড় থামিল না—কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র—অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল।"

শৈবলিনীর মানস আকাশের অবস্থাও অবিকল ঐরূপ। অনেকপরে তাহার উচ্ছ্বসিত অশ্রু বৃষ্টি থামিয়া ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রবৃত্তি ঝটিকা একেবারে থামে নাই, কতক মন্দীভূত হইয়াছিল মাত্র। আশা, আকাঙ্খা বিবর্জ্জিত হৃদয় আকাশে অন্ধকার আরও গাঢ়তর হইয়াছিল। বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তঃ প্রকৃতি যখন ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন, তখন কোনও মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল, "পুণ্যের স্পর্শ" ঘটিল, কারণ সে মনুষ্য আর কেহই নহে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর স্বামী, শৈবলিনীর দেবতা। স্বামীর স্পর্শই পুণ্যের স্পর্শ, এখন হইতে শৈবলিনীর মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইল; প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

চতুর্থ খণ্ডে এই "প্রায়শ্চিত্তের" কথা অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। শৈবলিনীর উন্মাদ অবস্থা পাঠে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়, তাহার প্রতি আর ঘৃণা থাকে না, তাহার জন্য সহানুভূতি হয়। প্রায়শ্চিত্ত-বলে ক্রমে শৈবলিনীর দিব্য চক্ষু ফুটিল, তাহার পর সে যাহা দেখিল তাহা এত সুন্দর যে উহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া শৈবলিনী দেখিল, একি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরু নিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমারে বলময় এদেহ যে রূপের শিখর। এই যে ললাট—প্রশস্ত চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখা বিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা—ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন। ইহার কাছে প্রতাপ! ছি। ছি। সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন—জ্বলিতেছে, হাসিতেছে ফিরিতেছে ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত তীব্রজ্যোতি, স্থির স্নেহময় করুণাময়, ঈষৎরঙ্গপ্রিয়

সর্ব্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম। এই যে সুন্দর, সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্র শোভিত শালতরু, মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি,—আধচন্দ্র আধভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়—আধজ্যোতি আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম, কেন মজিলাম কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গ রঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পবিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম, কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম! সেই যে হাসি ঐ পুষ্পপত্রস্থিত মল্লিকারাশি তুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য আমার সুস্বপন তুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই ভালবাসা সমুদ্রতুল্য অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গ ভীষণ, অগম্য, অজেয় ভয়ঙ্কর—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয় তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না। কে আমি? তাঁহার কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান, অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমা জ্ঞানে অশক্ত তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তার কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন হৃদয়ে বিস্মৃতি সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, পানে ধূলি, অনলে পতঙ্গ। আমি মজিলাম মরিলাম না কেন।

এত গুলি সুন্দর উপমা একত্রে কোন কবি কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কিনা জানিনা, এরূপ মনোহর বর্ণনা অন্যের কথা দূরে থাক লিপিকুশল বঙ্কিম বাবুরই অন্য কোনও পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

শৈবলিনীর কিন্তু চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিল, চন্দ্রশেখরকে ভাল বাসিল।

পঞ্চম খণ্ডে শৈবলিনীর কথা আদৌ নাই। ষষ্ঠ খণ্ডের শীর্ষ

"সিদ্ধি," ইহাতে শৈবলিনীর মুক্তি রূপ সিদ্ধি লাভ হইল বটে, কিন্তু বহুমূল্য প্রদান করিতে হইল ; প্রতাপ যখন শুনিল যে সে জীবিত থাকিতে শৈবলিনীর সুখ নাই, তখন শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রতাপ আত্মবলি দিল। প্রায়শ্চিত্তের পর, দিব্য জ্ঞান লাভের পরও যে শৈবলিনী প্রতাপকে বলিল,

"আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই,"

ইহাতে বিস্মিত হইতে হয় বটে, কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না ; বরং স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়, শৈবলিনী যথার্থই বলিয়াছে,

"স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কত দিন বশে থাকিবে জানি না, এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

প্রতাপ তাহাই করিল, জন্মের মত শৈবলিনীর নিকট হইতে, ইহজগৎ হইতে বিদায় লইল।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইল, অতএব আমরা প্রতাপ ও অবশিষ্ট প্রধান চরিত্রগুলি সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ সমাপন করিব। যে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল পরাজিত হইয়াছিল, প্রতাপ সে সংগ্রামে জয়ী হইল বটে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ গৌরব নাই। প্রতাপের পরাজয় নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের পরাজয় অপেক্ষা অধিকতর নিন্দাজনক হইত, কারণ তাহাদের অবস্থা ও প্রতাপের অবস্থা অনেক প্রভেদ। নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল যাহাদের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল তাহারা উভয়েই পতিহীনা, শৈবলিনীর পতি বর্ত্তমান। নগেন্দ্র কুন্দকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করিয়াছিল, ইহাতে কোনও পাপ নাই; গোবিন্দলাল বিধবা রোহিণীকে রক্ষিতা স্বরূপ রাখিয়াছিল, ইহাতে অবশ্য পাপ আছে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত গোবিন্দলালকে

ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সধবাকে হরণ করা আরও মহা পাপ বলিয়া বোধ হয়, প্রতাপ পরস্ত্রীহরণরূপ মহা পাপ করিতে অক্ষম, নিতান্ত নীচাশয় পশুপ্রকৃতি ব্যক্তি ভিন্ন মনুষ্যমাত্রেই ঐ মহা পাপ করিতে অক্ষম, ইহাতে প্রতাপের বাহাদুরী কিছুই নাই। প্রত্যেক মনুষ্যের যাহা করা কর্ত্তব্য প্রতাপ তাহাই করিয়াছিল মাত্র। কর্ত্তব্য পালনে প্রশংসা নাই, উহার অবহেলায় পাপ ও নিন্দা আছে। আরও এক কথা, প্রতাপ চন্দ্রশেখরের নিকট মহাঋণী, প্রতাপ অকৃতজ্ঞ নয়, নিজমুখে সুন্দরীকে বলিতেছে "তুমি কি জান না, আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে ?" শুধু পরস্ত্রী হরণে যদি মহাপাপ হয়, পরম উপকারী বন্ধুর স্ত্রী অপহরণে না জানি আরও কত পাপ ! প্রতাপ সেরূপ অকৃতজ্ঞতা ও নীচতার পরিচয় না দিয়া নিজ কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছে প্রত্যেক মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছে, ইহাতে বিশেষ প্রশংসার কথা কি আছে ? শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রতাপের আত্মোৎসর্গরূপ স্বার্থত্যাগেরও আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এরূপ স্বার্থত্যাগ নীতিশাস্ত্রানুমোদিত নহে। প্রতাপ শৈবলিনীর সুখের জন্য মরিল, ইহাতে নিজপত্নী রূপসীকে চিরদুঃখিনী করা হইল না কি ? বিনা দোষে পরিণীতা পত্নীকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া পরের সুখের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার অধিকার প্রতাপের নাই, শৈবলিনী তাহার কে ? নিজপত্নীর কথা প্রতাপের মনে হয় নাই কেন ? ইহাতে কি বুঝায় না প্রতাপ নিজপত্নী অপেক্ষা শৈবলিনীকেই অধিকতর ভালবাসিতেন ? ইহা প্রতাপের অবস্থায় স্বাভাবিক হইতে পারে কিন্তু ন্যায়ানুমোদিত নহে। প্রতাপ যে শৈবলিনীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত তাহা রামানন্দ স্বামীর নিকট মৃত্যুকালে নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু সে "ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্খা ।"

প্রতাপ পাপচিত্তে শৈবলিনীর প্রতি অনুরক্ত হয় নাই, এই পবিত্র ভালবাসার বলেই প্রতাপ চিত্ত সংযমে সক্ষম হইয়াছিল। এভালবাসা বাল্যকালের ভালবাসা, তাই এত পবিত্র, নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের ভালবাসা, ভালবাসাই নহে, উহা যৌবনসুলভ আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মোহ মাত্র, তাই তাহারা আত্মজয়ে সমর্থ হয় নাই। প্রতাপের ভালবাসা, নির্ম্মল ও কামনারহিত, বাল্যকালের ভালবাসার ন্যায় পবিত্র ভালবাসা জীবনে আর কখনও ঘটে না।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা সুন্দরী, দলনী বেগম ও চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। সুন্দরীর সহিত কমলমণির পারিবারিক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সুন্দরীকে কমলমণির কনিষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া বোধ হয়, সেই সরস প্রফুল্লতা, সেই পরদুঃখ কাতরতা, সেই মানসিক দৃঢ়তা। যে সুন্দরী শৈবলিনীকে গৃহে ফিরিতে অসম্মতা দেখিয়া বলিয়াছিল,—

"ভরসা করি তুমি শীঘ্র মরিবে, দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন তোমার মৃত্যু হয়।"

সেই সুন্দরীই আবার শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য প্রতাপের নিকট গমন করিয়াছিল। কমলমণিও সূর্য্যমুখীকে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইতে দেখিয়া প্রথমে দড়ি ও কলসীর বন্দোবস্ত করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে সূর্য্যমুখীর জন্য একান্ত কাতর হইয়াছিল।

দলনী বেগম কুন্দনন্দিনীর ভগ্নী, উভয়েই ভীরুস্বভাবা, উভয়েরই হৃদয় প্রগাঢ় প্রেমে পূর্ণ, উভয়েই প্রথমে স্বামী সোহাগিনী, পরে স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা। নবাব যখন দলনীকে গাহিতে বলিলেন দলনীর মুখ ফুটিল না।

দলনী মুখ ফুটাইতে কত চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটিল না।

ফোটে ফোটে ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন স্থল-কমলিনীর ন্যায় মুখ যেন ফোটে ফোটে তবু ফোটে না। ভীরু কবির কবিতা কুসুমের ন্যায় মুখ যেন ফোটে ফোটে তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মান কালীন কণ্ঠাগত প্রণয় সম্বোধনের ন্যায় মুখ ফোটে ফোটে তবু ফোটে না।"

চন্দ্রশেখরের বর্ণনা, শৈবলিনী দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া নিজমুখেই করিয়াছে, আমাদের অধিক আর কিছু বলিতে হইবে না। তবে এ কথা বলিয়া রাখি যে প্রতাপের স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা চন্দ্রশেখরের স্বার্থত্যাগ কোনও অংশেই ন্যূন নহে। প্রতাপ শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রাণ দিয়াছিল, চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুঁথিগুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল! ইহা কি কম স্বার্থত্যাগ! চন্দ্রশেখরের হৃদয় অতি উন্নত ও মহৎ, ক্রোধ বা ঘৃণা সে হৃদয়ে স্থান পায় না, তাই শৈবলিনীকে তিনি একটিও রূঢ় বা ঘৃণাব্যঞ্জক কথা বলেন নাই, বরং তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিলেন। প্রতাপ অপেক্ষা চন্দ্রশেখর চরিত্র আরও উন্নত বলিয়া বোধ হয়, প্রতাপের প্রতি সহানুভূতি হয়, চন্দ্রশেখরের প্রতি ভক্তি হয়। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের যে চিত্র দিয়াছে তাহা অতি মনোহর। সে চিত্র পাঠককে পূর্ব্বে উপহার দিয়াছি।

উদ্বোধন।

হয় যেন মাতঃ বাসনা পূরণ
সাধের "প্রয়াস" যতনের ধন
করে যেন তার কর্ত্তব্য সাধন
　　শত বাধা বিঘ্ন অবাধে ঠেলি;
সকলে মিলিয়ে আজি একপ্রাণে
যাচিতে করুণা এসেছি এখানে
রাখিয়া 'প্রয়াস' তোমার চরণে
　　বিমল ভকতি কুসুম-ডালি।

ফুটাও জননী হৃদয় সরসে,
নব নব ভাব সরোজ হরষে
যেন সে প্রসূনে সফল প্রয়াসে
　　পূজি চিরদিন সকলে মিলি।

শ্রীহরিহর শেঠ।

শান্তি।

(স্থান—মাসিকপত্র কার্য্যালয়; লেখক—শান্তিপ্রয়াসী।)

এস শান্তি সন্তর্পণে
আজি এই নিরজনে
হৃদয় শীতল কর সন্তোষ সলিলে—
(ওকি শব্দ! মুটে সব বই ফেলে দিলে।)

২

এস শান্তি—(থাম দেখি
দপ্তরী করেছে একি
উল্টোপাল্টা করে যত বেঁধেছে 'কভার'—
নিয়ে যাও ফিরাইয়ে নিকটে তাহার।)
এস শান্তি শান্তিদান
করিয়া জুড়াও প্রাণ
তোমারে লভিতে, দেবি এসেছি হেথায়,
সংসারেতে জ্বালাপালা
এখানে নাহিক জ্বালা
(চুপ্—ওবাড়ীর গিন্নি মেতেছে ঝগড়ায়।

৩

কোথা কোথা শান্তি রাণি—
আমার হৃদয় খানি
তোমারি চরণে চাই অর্পিতে উল্লাসে,
তুমি জগতের সার
দারা পুত্র পরিবার
অস্থির করিয়া তোলে দেহি দেহি ভাষে।
তোমারে লভিব ব'লে
এখানে এসেছি চ'লে
এস দেবি।-(ওকে হেথা 'প্রুফ' নিয়ে আসে?)
এস শান্তি দেবি মোর
(মহাশয় কি খবর
'প্রুফ' দেখা? রেখে দিন্—হবেনা এখন।
দেবি! দেবি! কোথা তুমি করেছ গমন?

৪

এইবার এস দেবি—
নীরব হয়েছে সবি
করিতেছি প্রীত মনে অপেক্ষা তোমার—
(নাই প্রুফ গেছে মুটে থেমেছে চীৎকার।
এস গো ত্রিদিব বালা
(আবার একি গো জ্বালা—
গ্রাহকের বিল চাই? আমিত জানিনি,
ম্যানেজার হেথাকার এখনো আসেনি।)
ওগো শান্তি—(এইবার
এসেছেন ম্যানেজার)
অন্তরের একমাত্র তুমিই আরাম,
কবি তব আরাধনা
লভিয়া করুণাকণা

থাকে জীব মহাসুখে শান্ত অবিরাম।
দেখি তব কৃপা বশে
রাখ মোরে পবিতোষে ;
(উহু উহু ছারপোকা দংশেছে বেজায়
চেয়ারে হ'লনা বসা বসিগে হোথায়।)
অধীনে একান্তে ফেলি'
নো শান্তি যেওনা চলি'
আমি যে নিতান্ত ভক্ত তোমারি পূজারি',
(কারা যায় পথ দিয়ে
শব দেহ কাঁধে নিয়ে
বিকট চীৎকার করি'—হাঁকে 'বল হরি'।)

৫

কোথা শান্তি—কোথা শান্তি ?
(হায় হায় একি ভ্রান্তি
তুমি কেন দেখা দাও?-চাহিনা তোমায়—
বঙ্কিম মানস-পটে
"আনন্দ মঠে"তে বটে
চালাও আরোহি অশ্ব মনের গুঁতায় ;
আন কেন অশান্তি এ সবল চিন্তায় ?)

৭

শান্তি শান্তি—(বৃথা চেষ্টা
সব মাটি হলো শেষ্টা
'নির্ব্বাচন' তরে আসে সভ্যেরা এখন।)
হে শান্তি কবির পূজ্য
আমারে কোরনা ত্যজ্য
স্নিগ্ধ কর শান্তিধারা করি' বরিষণ।
(এইবে সকলে মিলে
হট্টগোল জুড়ে দিলে)
শান্তি তুমি জীবনের সম্পদ সদাই ;
(আশ্চর্য্য কবিতা লিখে
ফেলিলাম কোন্ দিকে)
ওগো শান্তি।—(কে নিয়েছে একিগো বালাই
শান্তির কবিতা লিখি হেন শান্তি নাই।)

প্রেম-ব্যাধি।

একটু ঠাণ্ডা হইয়া ভাবিলে একাল ও সেকালে অনেক বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। কোনও কড়া-বিষয়ের চিন্তা করিয়া মাথা গরম করিতে বলি না, একটু মোলায়েম বিষয়েই মস্তিষ্ক চালনা করিয়া দেখা যাক্—এই যেমন প্রেম। কেমন ছোটখাট নরম চক্‌চকে কন্‌কনে কথাটি। আমি জোর কলমে লিখিয়া যাই প র আর ম লইয়া এমন একটি সর্ব্বজন মনোরঞ্জনকারী কথা আর হয় না।

সেকালে প্রেম কথাটি বিশ্বপ্রেম বা ভগবদ্‌প্রেমকেই বুঝাইত। বুঝাইলে কি হইবে তখনকার লোকত আর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ধার ধারিত না—কাযেই ঐ কথাদুইটীর মর্ম্ম বুঝিত না। একালের সুকুমারমতি বালকপর্য্যন্ত (অর্থাৎ যাহাদের পাথরে আছ্‌ড়াইলেও মরণ হয় না) বিদ্যালয়ে দুপুরবেলা টিফিনের ছুটির সময় "বার্ডসাই" মুখে করিয়া গভীর প্রেমতত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে পারে। অতএব এখনকার মাসিকপত্রে প্রেমবর্ণনা করিতে বসিয়া বেরসিকের মত যদি বিশ্বপ্রেম বা ভগবৎপ্রেমের ব্যাখ্যা করি, অমনি আমার পনর আনা পাঠক বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন, আর আমার দুরদৃষ্ট বা লিপিকরের ভ্রমবশতঃ যদি বারচেরেক ঐরূপ কথা থাকে তবেইত পাঠকের নিকট মূল্য আদায় করা দায়। কেহ বলিবেন খপরদার এটা ভণ্ডামি, কেহ বলিবেন সাবধান এটা 'সারমন্'।

পাশ্চাত্য কোনও বৈজ্ঞানিক কবি সম্প্রতি, অর্থাৎ দশ চল্লিশ দিন পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছেন যে এই প্রেম একরকম মশা হইতে উৎপন্ন হয়। বিদ্রূপ মনে করিবেন না—"There are more things in Heaven and Earth than are dreamt of in our philosophy." এই যেমন আজকাল নর্দ্দমার পাঁক হইতে পারিসহরে সুগন্ধি প্রস্তুত হইতেছে, দুগ্ধ হইতে বোতাম হইতেছে ইত্যাদি। কি হইতে কি হয় বলা যায় না ত। সেইরূপ এই মশা হইতে প্রেমবীজ উৎপন্ন হইয়া ম্যালেরিয়ার ন্যায় বায়ুস্তরে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তেমন তেমন লোক দেখিলেই নাকের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া দেয়। অজ্ঞলোকে মনে করে ইহা চক্ষুর ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছায়; কিন্তু অক্ষিশাস্ত্রবিদ্ যথার্থই গাহিয়াছেন—

"আঁখির কি দোষ বল।"

এই প্রেম-রোগের উপর কুপথ্য পড়িলে চিত্তবিকার জন্মায়, আর বিকারে রোগীর চিকিৎসা নাই। সুবিধার মধ্যে এই, প্রেমরোগগ্রস্ত লোক দেখিলেই চেনা যায়। এই রোগে একটু ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। রোগ সংক্রামক হইলে বেশী করিয়া সাবান মাখিবার ইচ্ছা হয়। ঘোর গদ্যময় প্রাণ হইতে পদ্য ফুটিতে থাকে। বিকার আরম্ভে রোগী জুড়িচড়ে, ছড়িধরে, ঘড়িপরে, টেরিকাটে ও দাড়ি ছাঁটে। ইহাদের অভাবে অর্থাৎ জুড়ি না থাকিলে রোগী জুড়ি ভাড়া করে; ছড়ি না থাকিলে কোঁচার আগার ফুল ধরিয়া থাকে, ঘড়ি না থাকিলে শুদ্ধ চেন ঝুলান থাকে, টেরি না হইলে কদম্ব পুষ্পবৎ মস্তকে তেল পমেড্ ঘসিয়া নরম করে, দাড়ি না থাকিলে দিনে দুবার খাউরি হন। আব এ সকল সত্ত্বেও যদি কড়ি না থাকে? অহো! তাহার আর দুর্দ্দশার সীমা থাকে না—সংসার তাহার মরুভূমি, চন্দ্র তাহার Cannon ball, অমৃত Hydro Cyannic Acid, কোকিল তাহার Royal Bengal Tiger, শয্যা তাহার সজীব Volcano, ফুল তাহার Cobra de Capello ইত্যাদি।

পরমেশ্বর নিরক্ষর করিয়াছেন করুন। দু'দশটা ভাই খুড়া জ্যাঠা এমন কি পিতামাতা পর্য্যন্ত না হয় নাই দিতেন। সংসারে কি সকলের সব থাকে? কিন্তু, হে প্রভো, টাকা দিও, আর সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটা। না, অতটা চাপাচাপি করিব না, শেষে চটিয়া হয়ত কিছুই দিবে না। চেহারা হয় বহুৎ আচ্ছা, না হয় ক্ষতি কি? চাঁদিকা জুতিসে সব্ ঠিক্ করে নেব।

প্রেম-রোগের আর একটু বৈচিত্র আছে অপর সাধারণ রোগের চরমে যেমন মৃত্যু হয় প্রেমরোগের কিন্তু সেরূপ হয় না, ইহার প্রারম্ভেই প্রাণান্ত। এই রোগে মৃত্যু আজকাল এত সাধারণ হইয়াছে

যে পথে ঘাটে সময় অসময়ে লোক প্রাণ হারাইতেছে। মুমূর্ষের ত সংখ্যাই হয় না। থিয়েটার দেখিতে যাও প্রতি রজনীতে কত প্রেমিকের প্রাণান্ত দেখিবে। নাটক নভেল ত প্রেমিক-প্রেমিকার শ্মশান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাব্যোদ্যান চিতাগ্নির ধূমে প্রধূমিত। বাঙ্গালীর শেষ কবি যথার্থই বলিয়াছেন সকলেরই—"দিন দিন তনুক্ষীণ প্রেমাধীন হয়ে।"

আমি বহু কষ্টে গতপ্রাণ প্রেমিকদের একটি তালিকা সংগ্রহ করিতে ছিলাম তাহা এখানে প্রকাশ করিলে একটি সজীব লোক দেখিতে পাইবেন কিনা সন্দেহ। যাহা দুই একজন আছে তাহারা প্রেম-রোগে মৃতের প্রেতাত্মা মাত্র। তালিকা হইতে দু'চারটি বিখ্যাত ব্যক্তির জীবলীলা সম্বরণের বিবরণ বোধ করি প্রয়াসের প্রেমিক পাঠক প্রেতাত্মাদের ভাল লাগিতে পারে।

কুলতিলক বাবু থিয়েটার দেখিতে গিয়া একটি মুচ্‌কি হাসিতে প্রাণ হারাইয়াছেন। শ্রীমান শশকেশ্বর শ্রীমতী পান্তুয়ালোচনীর একটি সুতীক্ষ্ণ নয়নবাণে আহত হইয়া অকালে কালকবলিত হইয়াছেন। সিভিল্ সার্জ্জনের মতে নয়নবাণটি বিষাক্ত ছিল।

শনিবার রাত্রে শ্রীমান কোমলপ্রাণ শ্রীমতী বিড়ালাক্ষীর চক্ষের জলে ভাসিয়া গিয়াছেন। পোষ্টমর্টেমে তাঁহার উদর হইতে অনেকটা লোণা জল বাহির হয়। শুনিয়াছি শনিবারের মৃতেরা একাকী যায় না। Daily Passenger দের বাড়ী যাইবার সেই দিন।

গত মকরের যোগে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া তিনটি ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধু এক বিধবা যুবতী দেখিয়া এককালে প্রাণ হারাইয়াছেন। মিউনিসিপালিটির এ বিষয়ে নজর রাখা কর্ত্তব্য। পর্ব্বোপলক্ষে

গঙ্গাস্নানের জন্য স্ত্রীলোকদের উপর টেক্স্ বসাইলে আয়ও হয়, অনেক প্রাণ রক্ষাও হয়।

চারুহাসিনীর একটি বঙ্কিম কটাক্ষে প্রেম কিঙ্করের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে এখন তাঁহার পিঠের দিকে চক্ষু হইয়াছে।

সেদিন মিটিংএ মিস্—র সহিত করমর্দ্দন করিতে গিয়া জৈব চুম্বকশক্তির আকর্ষণে মিঃ——র মূর্চ্ছা রোগ জন্মিয়াছে।

কোনও একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার আঁখি দ্বারা একটি যুবক আহত হইয়া পলায়ন পর হইলে তৎক্ষণাৎ একটি মৃদুহাসি তাঁহাকে একেবারে কাবার করিয়া ফেলে।

শ্রীকেরাণী বেচারা বাবু আপিষ হইতে বাড়ী আসিবার সময় পথের ধারের বারাণ্ডা হইতে একটি রক্তিমাভ গণ্ডস্থল কর্ত্তৃক অজ্ঞাত-সারে আহত হন। তিনি বাসায় যাইয়া মরিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত পত্রের আঘাতে, ফুলের ঘায, দীর্ঘনিশ্বাস ছুঁড়িয়া, মলের আওয়াজে, কত লোক যে প্রত্যহ মরিয়া আসিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। বিম্বোষ্ঠ, খঞ্জন নয়ন, কুঞ্চিত কুন্তল, প্রভৃতি মাথা হইতে মরাল বা গজেন্দ্রগমন ইত্যাদি পা পর্য্যন্ত যতগুলি উপমা কবিগণ ব্যবহার করেন, সকল গুলিই এক একটি প্রাণান্তকারী অব্যর্থ মৃত্যুবাণের নামান্তর মাত্র।

এই সকল শাণিত বা আগ্নেয়াস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া যে সকল জীবাত্মা প্রেতাত্মা প্রাপ্ত হয় তাহারাই বিশ্বপ্রেমিক বা ভগবৎপ্রেমিক আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

আর যে সকল লোক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় তাহারাই যথার্থ প্রেমিক।

প্রয়াধামের মাহাত্ম্য প্রকাশ অবধি বিশ্বপ্রেমিক বা ভগবদ্-

প্রেমিকদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস ও যথার্থ প্রেমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

মারের চোটে কবিরাজ।

(মলিয়ারের Le Medecin Malgre Lui অবলম্বনে।)

কোনও গ্রামে এক কাঠুরিয়া বাস করিত। সে মদ খাইয়া দিবারাত্র স্ত্রীর সহিত কলহ করিত, কখনও কখনও স্ত্রীকে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। একদা এইরূপে প্রহৃতা হইয়া কাঠুরিয়া-পত্নী প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে যাইতেছে, এমন সময় সেই পথে দুইজন লোক কথোপকথন করিতে করিতে আসিতে ছিল। তাহাদের কথোপকথন হইতে কাঠুরিয়া পত্নী বুঝিতে পারিল, যে তাহারা কোনও জমীদার-কন্যার দুরারোগ্য পীড়ার জন্য একজন সুদক্ষ চিকিৎসক অন্বেষণার্থ বহির্গত হইয়াছে। অনেক বড় বড় চিকিৎসকই দেখিয়াছেন কিন্তু কিছু করিতে না পারায়, যদি কোনও দৈববিদ্যা পারদর্শী চিকিৎসক পাওয়া যায় এই আশায় জমীদারের ঐ কর্ম্মচারীদ্বয় নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কাঠুরিয়া-পত্নী প্রতিশোধের এক নূতন ও সহজ উপায় সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ কর্ম্মচারীদ্বয়ের নিকট গিয়া বলিল "মশাই গো, আপনারা বদ্যি খুঁজ্‌ছ, তা একজন বদ্যি আছে, কি বল্‌ব যেন ধন্বন্তরি, কিন্তু সে এক রকমের মনিষ্যি যেতে রাজি হ'বে কিনা জানিনি।"

১ম কর্ম্মচারী।—তুমি তাঁ'র বাড়ি দেখাইয়া দাও, তা'র পর আমরা তাঁ'কে রাজি কর্‌ব, যত টাকা লাগে সে বিষয়ে চিন্তা নাই।

কাঠুরিয়া পত্নী।—টাকায় রাজি ক'র্‌তে আপনারা পারবে নি, তা'র যদি মর্জ্জি হয় তবে সহজেই যাবে, না হ'লে খুব না মার্‌লে সে রাজি হ'বে না, হয়ত বদ্যি ব'লে মান্‌বে না, সে একরকম পাগ্‌লা মনিষ্যি, আপন মনে গান গায় আর কাঠ কাটে।

২য় কর্ম্ম।—কি আশ্চর্য্য এরকম মানুষ ত দেখি নাই, যা হোক্ তাঁ'কে নিয়ে যেতে হ'বে।

কাঠুরিয়া পত্নী যেখানে তাহার স্বামী কাঠ কাটিতে ছিল, দূর হইতে সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। কর্ম্মচারীদ্বয় সেই স্থানে গিয়া কাঠুরিয়ার সাক্ষাৎ লাভ কবিল এবং তাহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেও অগত্যা তাহার তোষামোদে প্রবৃত্ত হইল। কাঠুরিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল "মশায়রা, আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ বদ্যি ছিল না, আপনারা ভুল ক'রে থাক্‌বেন।"

১ম ক।—ভুল করিবার যো কি? আপনার যশঃ জগদ্বিখ্যাত, এখন অনুগ্রহ করিয়া চলুন।

কাঠুরিয়া। মশায়রা সত্যি বল্‌ছি আমার বাপ্ পিতেমো চিরকাল কাট কেটে খেত, আমিও তাই করি, আমায় নিয়ে টানাটানি কেন?

কর্ম্মচারীবা যখন দেখিল অনুনয় বিনয়ে কোনও ফল হইল না তখন কাঠুরিয়া পত্নীর কথা স্মরণ কবিয়া উভয়ে মিলিয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। মারের চোটে কাঠুরিয়া আপনাকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল ও যাইতে সম্মত হইল। পরে তাহাকে উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া জমীদার সমীপে আনয়ন করা হইল। জমীদারের নাম আদিত্যনাথ এবং তিনি অশিক্ষিত। আদিত্য বাবু তাহাকে দেখিয়াই অবাক্, কিন্তু কি করেন সমাদর পূর্ব্বক বসাইলেন। কাঠুরিয়া আদিত্য বাবুকে একজন ডাক্তার মনে করিয়া বলিল "প্রেনাম

ডাক্তার বাবু'। আদিত্য বাবু ঈদৃশ সম্ভাষণে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কাকে ডাক্তার বলিতেছেন।"

কা—আপনাকে।

আ—আমি ডাক্তার নহি, আমার কন্যা পীড়িতা, সেই জন্য আপনাকে ডাকা হইয়াছে।

কা—"সে কি? আপনি ডাক্তার নন" এই বলিয়া একটি লাঠি লইয়া জমীদারকে প্রহার আরম্ভ করিল ও বলিতে লাগিল "এখনও বলুন ডাক্তার কিনা।" আদিত্যবাবু মার খাইয়া ক্রোধে ও অপমানে যে কর্ম্মচারীদ্বয় উঁহাকে আনিয়াছিল, তাহাদিগকে গালি দিতে লাগিলেন এবং ঐ অসভ্য পাগলটাকে বাহির করিয়া দিতে ভৃত্যদিগকে আদেশ দিলেন। কর্ম্মচারীদ্বয় আদিত্যবাবুকে সমস্ত বুঝাইয়া বলাতে তিনি স্থির হইলেন এবং কাঠুরিয়াকে কন্যার নিকট লইয়া গেলেন।

কা—এইটী আপনার কন্যা?

আ—হাঁ এই আমার একমাত্র কন্যা, ও মরিলে আমিও মরিব।

কা—মর্‌বে কি মশাই, ডাক্তার দেখ্‌লে না অমনি মর্‌বে?

আ—আপনি আমার কন্যাকে হাসাইতে পারিয়াছেন, এতদিন সে একবারও হাসে নাই।

কা—ভাল লক্ষণ, স্বয়ং চরক বলিয়াছেন "যে রোগীকে হাসায়, সে রোগীকে বাঁচায়।" বলত বাছা তোমার কি অসুখ?

লাবণ্য। (রোগীর নাম লাবণ্য) মুখে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া বলিল "হা, হি, হাউ।"

কা—"কি?" লাবণ্য আবার বলিল "হা, হি, হু, হাউ, হো।"

কা—কি আপদ্, এ কি হাবা নাকি?

আ—আজ্ঞে হাবা নয়, এইত রোগ, আগে এমন ছিল না হঠাৎ

কেন এমন হইল তা'র কিছুই কারণ জানিনা। এতদিনে বিবাহ হইয়া যাইত কিন্তু এই রোগ উপস্থিত হওয়াতে আপাততঃ উহা স্থগিত রাখিতে হইয়াছে!

কা—কেন স্থগিত রাখার প্রয়োজন কি ?

আ—বলেন কি ? এ অবস্থায় কে উহাকে বিবাহ করিবে ?

কা—যে না করে সে বোকা, অনেক ভাগ্যি থাক্‌লে তবে বোবা মাগ জোটে। আমার স্ত্রীর যদি এরোগ হয় আমি কাঁচাগোল্লার হরির নোট দিই। এ রোগ ভাল কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'বার দরকার কি ?

আ—মহাশয়, যদি আপনার ক্ষমতা না থাকে চলিয়া যাই তে পারেন, বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

কাঠুরিয়া দেখিল আদিত্য বাবু চটিয়াছেন। সে তখন গম্ভীর ভাবে নাড়ী দেখিতে লাগিল, কত প্রকার মুখভঙ্গি করিল ও দুই একটা খনার বচন আওড়াইয়া নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে লাগিল। যে কর্ম্মচারীদ্বয় তাহাকে আনয়ন করিয়াছিল, তাহারা অত্যন্ত প্রীত হইল এবং মোটা পুরস্কারের প্রত্যাশা করিতে লাগিল। কাঠুরিয়া তখন রোগীর জন্য ওল, অভাবে একটু ব্রাণ্ডি আনিতে বলিল। আদিত্য বাবু হঠাৎ ব্রাণ্ডি দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বলিল "জানেন না সাহেবেরা কাকাতুয়াকে কথা কহাইবার জন্য ব্রাণ্ডিতে একটু পাঁউরুটি ভিজাইয়া খাইতে দেয় ? আমিও রোগীকে ঐ পত্তি দিতে চাই, দেখি তাহাতে কথা কওয়াতে পারি কি না।" আদিত্য বাবু জমীদার লোক, পানাভ্যাস তাঁহার বিলক্ষণ ছিল, এবং সেই জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নানাবিধ পানীয় সর্ব্বদা তাঁহার গৃহে মজুত থাকিত। তৎক্ষণাৎ ব্রাণ্ডি আনা হইলে চাকিবার ছলে কাঠুরিয়া প্রাণভরিয়া

খানিকটা পান করিয়া লইয়া বলিল "হাঁ এতে চল্‌তে পারে, আপাততঃ আমি যা বল্লুম তাই দিন, আমি আবার কাল এসে দেখে যাব।" অতঃপর আদিত্য বাবু তাহাকে টাকা দিতে প্রস্তুত হইলে সে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিল "কি মশাই, আমাকে সে রকম লোক ঠাওরাবেন না, আমি টাকা চাইনে, পয়সা নিয়ে আমি তিকিচ্ছো করিনে।" দু' একবার অনুরোধের পর সে মৌখিক অনিচ্ছা ও আন্তরিক আনন্দের সহিত টাকাগুলি লইয়া প্রস্থান করিল।

পথে যাইতে যাইতে কাঠুরিয়া ভাবিতেছে "মন্দ কি দু'চার ঘা খেলে যদি এত টাকা আসে, আমি রোজ বদ্যি সাজতে রাজি আছি," এমন সময় একটি ভদ্রবংশীয় যুবক তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল "আমি অনেক্ষণ এই পথে আপনার অপেক্ষা করিতেছি।" কাঠুরিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত টিপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "আপনার নাড়ী অত্যন্ত খারাপ।" যুবক একটু হাসিয়া বলিল "আমি সে জন্য আপনার নিকট আসি নাই, আমার কোনও অসুখ নাই।"

কা। তা এতক্ষণ বল্লেই ত হ'ত ; তবে কি জন্যে আমার কাছে এসেছ ?

যু। সংক্ষেপে বলিতেছি শুনুন। আমার নাম বীরেন্দ্র, আপনি যে রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন সে আমার প্রণয়িনী কিন্তু তাহার পিতা তাহার সহিত অন্য এক ব্যক্তির সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে, তাই আমি আপনার কাছে আসিয়াছি। যদি আপনি আমাকে আপনার শিষ্য বলিয়া সেথায় লইয়া যান, তবে আমার এক উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়।

কা। কি, আমাকে এমন নীচ লোক মনে করেছেন, জানেন্ না

আমি একজন বদ্যি, গুপ্ত পীরিতে সাহায্য করা আমার ব্যবসা নয় ?

যু। মহাশয় চীৎকার করিবেন না—

কা। আমার খুশি চেঁচাব, তোমার তা'তে কি ? তুমি এত বড় অভদ্র একজন—

যু। মহাশয় আস্তে, বলি শুনুন—

কা। আমি কোনও কথা শুনিতে চাই না, আমি সে রকম লোকই নই।

যু। (কাঠুরিয়ার হস্তে গোটা দুই টাকা প্রদান করিয়া) মহাশয় আমার কথাই আগে শুনুন—

কা। (টাকা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে) হাঁ শুনছি বলুন, কি জানেন আমি আপনাকে অভদ্র বলি নাই, জগতে অনেক অভদ্র লোক আছে সেই কথাই বলছিলুম। তা, মশাইয়ের কি কর্‌তে হবে ?

যু। বলি শুনুন, যে রোগী দেখিলেন তাহার রোগ প্রকৃত নহে ছলনা মাত্র। অনেক বড বড ডাক্তার অনেক কথা বলিয়াছেন, কেহ বলেন যকৃতের দোষে ওরূপ হয়, কেহ বলেন মস্তিষ্কবিকার ইত্যাদি, কিন্তু প্রণয়ই ঐ রোগের মূল। লাবণ্য পিতার প্রস্তাবিত বিবাহ হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই ঐরূপ ছলনা করিয়াছে। চলুন এখান হইতে যাওয়া যাক্, কেহ দেখিতে পাইবে ? অন্যত্র যাইয়া আপনাকে সব বলিতেছি।

কা।—বাঃ বাঃ কি সু খবর, মশাই আমি আপনার সাহায্য করিব। হয় সে মরিবে না হয় আপনার হইবে।

নির্জ্জনে যাইয়া বীরেন্দ্র কাঠুরিয়াকে তাহার সমস্ত অভিপ্রায় জ্ঞাপন

করিয়া বলিলেন "মহাশয় এক্ষণে আমাকে গোটাকতক রোগের লক্ষণ ও ঔষধাদি শিখাইয়া দিলেই আমি আপনার শিষ্য সাজিতে পারিব।"

কা। তবে বলি শুনুন আমার চোদ্দ পুরুষ বদ্যি নয়, আমিও যা জানি আপনিও তাই জানেন।

বীরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল "সে কি ?" কাঠুরিয়া তখন তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে, খুব হাস্যের রোল উঠিল। উভয়ে উত্তমরূপে পরামর্শ আঁটিয়া লইল, এবং পরদিন শিষ্যবেশী বীরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কাঠুরিয়া জমীদার ভবনে উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া কাঠুরিয়া পরামর্শচ্ছলে আদিত্যবাবুকে সেই বৃহৎ ঘরের এক কোণের জানালায় লইয়া গেল, এবং ইতিমধ্যে শিষ্যকে নাড়ী দেখিতে বলিল। সে তখন আদিত্যবাবুকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অশেষ গুণগান করিতে লাগিল। সে দু'এক বৎসর এক কবিরাজের কাছে চাকরি করিয়াছিল এবং সেই জন্য দু'একটা কবিরাজি ঔষধের নাম জানিত, এক্ষণে সেই বিদ্যা খুব কাযে লাগিয়া গেল। আদিত্যবাবু নিজে অশিক্ষিত ; সুতরাং কাঠুরিয়ার পাণ্ডিত্য ধরিতে পারিলেন না। উভয়ে এইরূপে কথোপকথনে যখন মগ্ন, তখন লাবণ্য হঠাৎ বলিয়া উঠিল "না আমি বিবাহ করিব না।" আদিত্যবাবু লাবণ্যের মুখে এতদিন পরে কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কাঠুরিয়াকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কাঠুরিয়াও গম্ভীরভাবে বলিল "এ রোগের চিকিৎসার জন্য আমায় কি কম খাটতে হয়েছে, চরক সংহিতা ও মনুসংহিতা তন্ন তন্ন করে ঘাঁট্‌তে হয়েছে।"

লাবণ্য।—বাবা, বাক্‌শক্তি পাইলাম বটে, কিন্তু সে কেবল আমি বিবাহ করিব না এই কথা বলিবার জন্য।

আদিত্য বাবু কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সে কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। লাবণ্য নিতান্ত বালিকা নহে, ১৪। ১৫ বৎসরের হইবে। সে যখন কলিকাতার কোনও বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত সেই সময় বীরেন্দ্রের সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ, ক্রমে গাঢ় প্রণয় জন্মে। কিন্তু লাবণ্যের পিতা অন্য একজনের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিয়া তাহাকে কলিকাতা হইতে দেশে আনিলেন। উভয়ের মস্তকে বজ্রপাৎ হইল। লাবণ্য বীরেন্দ্রের কাছে শপথ করিয়াছিল 'আমি মরি সেও স্বীকার, কিন্তু তোমাছাড়া আর কাহাকেও স্বামী বলিতে পারিব না।' কিন্তু যখন দেখিল বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির, তখন বাক্‌শক্তি হীনতার ভাণ আরম্ভ করিল। বীরেন্দ্র ভদ্রবংশীয়, শিষ্ট, শান্ত ও শিক্ষিত হইলেও, "গুণরাশি নাশী" এক দারিদ্র্য দোষই তাহার প্রতিকূল। বীরেন্দ্র কোনও এক বন্ধুর দ্বারা আদিত্যবাবুকে আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন "গুণ থাকিলে কি হ'বে, ওরূপ দরিদ্র ব্যক্তিকে কন্যাদান করিলে আমার মাথা হেঁট হইবে, সমান অবস্থাপন্ন লোকের সহিত আমি কুটুম্বিতা করিব।" সেই অবধি বীরেন্দ্র ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিল।

আদিত্যবাবু যখন দেখিলেন লাবণ্য কোন মতেই তাঁহার কথা শুনিতে চায় না, অধিক পীড়াপীড়ি করিলে "আত্মহত্যা করিব" বলে, এবং আজকাল শিক্ষিতা রমণীরা কথায় কথায় যথার্থ আত্মহত্যাও করিয়া থাকে জানিয়া তিনি বড় দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন, এবং কাঠুরিয়াকে বলিলেন "মহাশয় আমার কন্যা যেরূপ ছিল সেইরূপ করিয়া দিন, অবাধ্য কন্যা অপেক্ষা বোবা কন্যা সহস্রগুণে ভাল।"

কাঠুরিয়া বলিল "রোগীকে আবার বোবা কর্‌বার ক্ষমতা আমার

নাই, তবে আপনাকে কালা করিতে পারি, তাহলেই ত আপনি আর উঁহার কোনও কথাই শুনিতে পাইবেন না? কি বলেন?"

আদিত্যবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "যাক্ যাক্ যথেষ্ট হইয়াছে।" তখন তিনি ক্রোধে ও ক্ষোভে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কাঠুরিয়া অনেক চিন্তা করিয়া বলিল "তাইত রোগটা বড় শক্ত দেখ্‌চি, তা আমাদের বদ্দি শাস্তরে কঠিন রোগের যে ব্যবস্থা নাই এমন নহে—"

আদিত্যবাবু ঈষৎ আশ্বাসিত হইয়া বলিলেন "দেখুন না মশাই যদি এই অবাধ্যতা রোগের কিছু করিতে পারেন, দোহাই আপনার।

কাঠুরিয়া। আছে বৈ কি, দাঁড়ান ভাবিতে দিন্। ভাল কথা আমার শিষ্যের বোধ হয় মনে থাকিতে পারে যে এরূপ অবস্থায় "পলায়ন জোলাপ" ও "বিবাহ বটিকা"ই একমাত্র ব্যবস্থা; আর যত শীঘ্র ঐ ঔষধ দেওয়া যায় ততই ভাল, কারণ রোগ ক্রমে বাড়িতে পারে। (শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া) তুমি না হয় রোগীকে পেছনের বাগানে নিয়ে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়াও আর নাড়ীটা বেশ করে' টিপ্‌তে থাক, মাথাটাও একটু দেখো। আর যে ওষুধ ব্যবস্থা কল্লুম উহা বোধ হয় রোগী সহজে খাইতে রাজি হবে না, তা তুমি চালাক আছ বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল্লেই রাজি হ'তে পারে।

তখন শিষ্য, লাবণ্য ও একজন পরিচারিকা বাড়ির পশ্চাদ্ভাগের উদ্যানে বায়ুসেবনার্থ গমন করিল। তাহারা চলিয়া গেলে আদিত্য বাবু বলিলেন "মহাশয় আপনি যে ওষুধের নাম করিলেন উহাত কখন শুনি নাই?"

কা—তা শুনবেন্ কোথা থেকে, সকলে কি ও ওষুধ জানে। ঐ যে "বিবাহ বটিকা" বলিলাম, যে সকল রোগী বিবাহ করিতে নারাজ

তাদের খাওয়ালে তখনই রাজি হ'বে। আর "পলায়ন বটিকার" গুণের কথা আপনাকে আব কি বল্ব, শাস্ত্রেই বলে "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।" ঐ গোলাপেব এবকম গুণ যে খেলেই শরীবের সমস্ত সর্দ্দি, পিত্তিটিত্তি পলায়ন কবে, সেই জন্যই উহাব ঐ নাম।"

আদিত্য বাবু তখন কবিবাজেব বিদ্যাবুদ্ধিব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পবেই পবিচাবিকা হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল "বাবু, সর্ব্বনাশ হযেছে, দিদিমণি বেড়াতে বেড়াতে মুচ্ছো গেলেন, ছোট কব্‌বেজ মশাই আমাকে জল আন্‌তে বল্লেন, আমি তাড়াতাড়ি জল নিয়ে গিয়ে দেখি, দিদিমণিও নাই, ছোট কব্‌বেজ মশাইও নাই, খিড়কিব দোব খোলা রযেছে"—

"অ্যাঁ! বলিস কি" আদিত্যবাবু এই বলিয়া কাঠুরিয়াকে ধবিয়া বাঁধিবাব হুকুম দিলেন, ও তাহাকে ভয় প্রদর্শন কবিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। তখন ক্রোধে থব থব কাঁপিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবব দিতে একজন লোক পাঠাইলেন। ঘণ্টাখানেকেব ভিতব পুলিসেব লোক আসিযা কাঠুবিয়াকে গ্রেপ্তাব কবিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম কবিতেছে, এমন সময়ে দ্বাবদেশে একখানি গাড়ি আসিয়া থামিল, এবং তাহাব ভিতব হইতে বীবেন্দ্র ও লাবণ্য অবতবণ কবিল। আদিত্যবাবু তাহাদিগকে দেখিযা পুলিশ কর্ম্মচারীকে বলিলেন "ইহাদিগকেও গ্রেপ্তাব করুন, ঐ আমার মেযে, আর ঐ ব্যাটা চোব আমাব মেযেকে ভুলাইযা বাহিব করিয়াছে।" তখন বীরেন্দ্র বলিল, আমি আপনাব কন্যাকে বিবাহ কবিব বলিয়াই ছলে বাহির করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এখন আব আপনার অসম্মতিতে বিবাহ করিতে আমাব ইচ্ছা নাই। আমি দরিদ্র বলিয়াই আপনি প্রথমে আপত্তি কবিযাছিলেন, কিন্তু আমি বাড়ি যাইবামাত্র খবর পাইলাম,

আমার কোনও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যু হওয়াতে আমিই তাঁহার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইয়াছি। এখন বোধ হয় আপনার আর আপত্তি নাই?" অদিত্যবাবু অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন, প্রীতও হইলেন; কিন্তু সহজে ওরূপ কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া, পুলিশ কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া সেই গাড়িতেই প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বহির্গত হইলেন। পরে যখন দেখিলেন উহা সত্য, তখন পুলিশ কর্ম্মচারীকে পুরস্কার ও বিদায় দিলেন, এবং মহাসমারোহে বীরেন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। কাঠুরিয়াও বহু অর্থ পুরস্কার পাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পত্নীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিল। সে তখন বলিল "ভাগ্যে আমি ঐ ফিকির করে'ছিলুম তাই ত তুমি অত ট্যাকা পেলে, তবু আমার সঙ্গে ঝগড়া কর কেন বল দিকি?" কাঠুরিয়া বলিল "কটে আর কি, তুই যে ফিকির করেছিলি তাতে জেল খাটতে খাটতে বেঁচে গিছি, এখন যাই অমনি অমনি বেঁচে এলুম তাই বাহাদুরী নেওয়া হচ্চে।" যা হোক অতঃপর তাহাদের মধ্যে বড় একটা বিবাদ হইত না।

—•++•—

ফুলের সাজি।

সারস্বত সম্মিলন।*

আজি এই সারস্বত মিলন উৎসবে,
হৃদয়ে বিরাজে বাণি তোমারি প্রতিমা;
মিলিয়া তোমার ভক্ত সন্তানেরা সবে;
গাহিছে মধুর কণ্ঠে তোমারি মহিমা।
উঠেছে মঙ্গলগীত ঝঙ্কারি রাগিণী,
মুখরিত করি দিব্য উৎসব ভবন;
কুন্দ পরিমল, উজল যামিনী,
তোমারি পবিত্র ভাবে রেখেছে মগন।
তোমার করুণা বলে সবল হৃদয়ে,
সুধী, জ্ঞানী, কবি, মিলি তুলেছে উল্লাস,
তোমার সম্পদ সুখে এ শুভসময়ে—
তব অর্চ্চনায় রত কমলার দাস।
এ শুভ মিলন হ'তে কেন চির তরে
প্রীতি সদাচারে বাঁধা থাকে পরস্পরে।

* ভারত সঙ্গীত সমাজের সারস্বত সম্মিলন উৎসবে রচিত—২২মাঘ১৩০৮।

যৌবনে।

কি সঙ্গীত রব আজি শুনিনু শ্রবণে ?
কেন এ আনন্দোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত মনে ?
আছিনু ঘুমায়ে যেন চির-বর্ষ-জুড়ে,
জীবন বহিতে ছিল স্বপনের পুরে !
সহসা কে জাগাইল ললিত পবনে ?
নূতন দেখিনু ধরা অলস নয়নে।
শ্যামল মেদিনী আর সুনীল গগন
হেন মধুময় যেন প্রকৃতি-আনন,
হেরি নাই পূর্ব্বে কভু এ মোর নয়নে—
চমকি' বিদায় দিনু শৈশব স্বপনে।
পড়েছিল ছিন্ন তন্ত্রী এ হৃদয়-বীণা,
কভু বেজে ছিল কিনা তাহাও জানিনা।
আজিকে সহসা তা'রে কে লইল তুলি' ?
বাজাইয়া দিল কা'র কোমল অঙ্গুলি ?

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

যোগী।

শ্যাম স্নিগ্ধ ধরণীর বুকে
মৃদু করি নূপুর গুঞ্জন
ব্রীড়া মগ্ন বালিকার মত
মৌন সন্ধ্যা করে আগমন।
আঁধার অঞ্চলে ধরা দেহ
আবরিয়া আসে ধীর পায় ;
সংসারের তীব্র কোলাহল
ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হ'য়ে যায়।
মোহময় কি মৃদু সঙ্গীত
ভেসে আসে ধরণীর বুকে ;
নয়নে কি আসে ঘুম ঘোর,
কি জড়তা প্রাণে আসি ঢুকে।
এহেন সন্ধ্যায় বসি যোগী
নীমিলিত আঁখি পাতা দুটি;
দিবসের শেষ স্বর্ণ রশ্মি
পড়িয়াছে ললাটেতে ফুটি।
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু বারি
উথলিয়া প্রক্ষালে চরণ,
যোগীকণ্ঠে মহান্ সঙ্গীত
কি গম্ভীর বিশ্ব বিমোহন।
স্তব্ধ, শুনি বন্য পশু পাখী,
স্তব্ধ, শুনি বিশ্ব চরাচর,
মহান্ সঙ্গীত শূন্যে উঠে'
বিমোহিয়া ধ্বনিয়া অম্বর।
সঙ্গীতে আকুল সিন্ধু প্রাণ
দিগন্তের কোলে পড়ে লুটে
ভূধর পাষাণ প্রাণ ভেদি,
প্রেমের নির্ঝর শত ছুটে।
ধন্য যোগি ! কি দেব সঙ্গীত
ঢালি বিশ্বে গম্ভীরা সন্ধ্যায়;
মোহমুগ্ধ জড় জীব কুলে
চেতনি লইছ ব্রহ্ম পায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

অহিবাহন।

ভুল।

না সজনি! ভুল তবে হয়েছে তোমার;
মৃগ আঁখি, ঘন কেশ,
বাম ধনু আঁকা বেশ,
আনন, জিনিযা শত কুমুদ কহ্লার;
কপোলে গোলাপী আভা,
ভুবন-মোহিনী বিভা,
নিভৃতে রচিত চারু যৌবন সম্ভার,
শুভ্র হাসি, বিহ্বলতা,
মধুময়ী দেহলতা,
চরণে অলক্ত-রেখা, ভঙ্গি অঙ্গিমার,
কুসুমমালা, মৃদুশ্বাস,
হৃদয়ে প্রেমের আশ,
বিক যদি শুধু মোরে ওপদে তোমার?
ঠোঁটে সরমের হাসি,
পরাণে পূর্ণিমা-রাশি
দেব-বীণা-ধ্বনি জিনি স্বরের ঝঙ্কার;
কোমলতা, প্রাণভরা,
পরাণে প্রীতির ধারা
ধরাতলে নাহি তুল প্রেম-গরিমার
এই সব, মোর তরে
তব হৃদি অভ্যন্তরে
রচিয়াছে জীবনের স্নেহ কারাগার।

শ্রীগিরিজা কুমার বসু।

কি ক্ষতি আমার তায়।

তুমি কি জানিবে বল
"কি ক্ষতি আমার তায়?
কি ক্ষতি মরুভূ মাঝে,
দহিলে লতিকা কায়?
কি ক্ষতি উন্মাদবন্যা
ভাঙ্গিলে সাধের সেতু?
কি ক্ষতি বিরহী প্রাণে,
জাগায় বসন্ত ঋতু?
যে স্নেহে গরল উঠে
সে স্নেহ ধরিবে বুকে।
"কি ক্ষতি আমার তায়
আমা বিনা বুঝিবে কে?
তোমারে কি বুঝাইব?
"কি ক্ষতি আমার তায়?
সে নামে বহিয়া আনে
কি আকুল দুঃখবায়!
সে নয়ন সে অধরে,
আছে কত মদিরতা।
স্মৃতির (ও) আবেশে যার
ঘুমায় মরম ব্যথা।
ভাঙ্গিতে যে হৃদি ভুল,
এসেছি কাননে ছুটে।
সে নন্দন পারিজাত,
কার কি হেথায় ফুটে?

দূরে আছি, আছি ভাল,
চাহিনা নিকটে যেতে;
চাহিনা সমীর বাহী
স্নেহের সৌরভ পেতে।
তৃপ্তি নাই যে সুবাসে,
আছে শুধু আকুলতা।
কাজ নাই চির দিন
বাড়াইয়া সে মমতা।
অসীম বারিধি কূলে,
তৃষিত পরাণ ল'য়ে।
কি আশা মিটিবে বল
চিরদিন চেয়ে চেয়ে?
আরো কি শুনিতে চাও?
"কি ক্ষতি আমার তায়?
তুমিও সুধাও যদি,
বুঝাইব কি ভাষায়!
নয়নের অন্তরালে;
ত্যজিয়া সে' মুখখানি।
দেখিতে চাহিনা আমি
সে মুখের ছবি খানি।
দূরে রেখে স্নেহ ভরা
মধুর মোহন বাণী
চাহিনা শুনিতে ওগো
তাই কি এ প্রতিধ্বনি?
ভুলিতে এসেছি যাহা,
একেবারে যাই ভুলে।
ছায়া দিয়ে মায়া কেন
বাঁধ আর হৃদি মূলে?
দিয়াছ যা দিতেছিল;
আছে যা দিওনা আর।
"কি ক্ষতি আমার তায়?
তুমি সুধায়ো না আর।

শ্রীসরসী বালা দাসী।

সাহাবাণপুর।

পড়িয়াছে মনে?

১

ঘুম ভাঙা উষারাণী মুখে লয়ে 'কুহু' বাণী
ফুলসাজে বসনে ভূষণে,
আসিতেছে পুর্ব্বপথে, কত স্মৃতি লয়ে সাথে
সোণামাখা বকুল কাননে
তা'রে আজ পড়িয়াছে মনে।

২

উঠেছে প্রখর রবি, লোহিত আরক্ত ছবি
মাখামাখি জ্বলন্ত আগুনে!
সে নীরব গৃহছায়, ভীষণ সাহারা প্রায়
মধ্যাহ্নের সুতপ্ত কিরণে—
তা'রে আজ পড়িয়াছে মনে!

৩

মধুর সাঁঝের বায়ে, সুরভি মাখিয়া গায়ে,
জুঁই গুলি ফুটিয়াছে বনে,
ফুলের সুবাস মাঝে, কুসুমের রাণী সাজে

প্রদোষের নিস্তব্ধ কিরণে
তারে আজ পড়িয়াছে মনে!

৪

আকাশে একটি তারা, বিরাম বিশ্রামহারা
চেয়ে আছে আকুল নয়নে
সে আকুলতার সাথে, হৃদয়ের ফুল পাতে
অভাগার পরাণের কোণে—
তারে আজ পড়িয়াছে মনে!

৫

জগৎ জোছনা ভরা, চৌদিকে বিস্তৃত ধরা
মাখা মাখি রজত কিরণে
সে, কিরণ মাঝে হায়, কিরণের স্বপ্ন প্রায়
দূরাগত বাঁশরীর তানে—
তা'রে আজ পড়িয়াছে মনে।

৬

সমুখেতে জলরাশি, নাচিয়া চলেছে হাসি
অতি মৃদু, মৃদু মধু তানে
সে লহরী মাঝে হায়, স্রোতের মালার প্রায়
পরাণের বাসনা উজানে—
তা'রে আজ পড়িয়াছে মনে!

৭

ঘুমিয়েছে পৃথ্বি ব্যোম, রবি তারা গ্রহ সোম
—একা আমি বসি বাতায়নে—
সে ভীম দোলার মাঝে, সংসারের শত কাযে
শত স্মৃতি শত অভিমানে
তা'রে আজ পড়িয়াছে মনে।

৮

মরি ভীম যাতনায়, কাঁদিছে পরাণ হায়
আঁখিজল বহিছে দুকানে!
সুখদুঃখ-বিজড়িত, অতিত স্মৃতির মত
বসন্তের দুরন্ত পবনে
তা'রে আজ পড়িয়াছে মনে!

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।
কালীঘাট।

বেদনা।

সুকুমার কমনীয় কুসুম কোমল দেহ
নবীনা যুবতী এক বসি জানালায়;
রক্তিম কপালে তার, মুক্ত বাতায়ন দিয়া
পড়িয়াছে সুধাংশুর ভায়।
গভীর নিশ্বাস ঘন হৃদয় বিদারি উঠে
মুখে তা'র কেন ম্লান হায়?
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শান্তিলভি' এসময়ে
সবে সুখে ভাসে, এ ধরায়।
কিন্তু কে বুঝিবে হায় কি দারুণ যাতনায়
ভেঙ্গেছে হৃদয় তার বিষম আঘাতে;
লেগেছে হৃদয়ে-বুঝি দারুণ বেদনা-শেল
কিম্বা শোক দুঃখরাশি অশনি প্রপাতে।
পেয়েছে বেদনা গুরু, কোমল হৃদয়ে, তাই
উঠিতেছে ঘন শ্বাস, প্রশ্বাসের ধ্বনি.
নাজানি কি বেদনায়! কে বলিতে পারে হায়
বলিতে পারেন শুধু অন্তর্য্যামী যিনি।

"ওরে নিদারুণ বিধি" কহিলা যুবতী,ধীরে
কেন মোরে দিলি এত জ্বালা!
কেন এত অনাদর কেন এত অবহেলা
কেমনে সহিবে এত বালা।"
ননীর পুতলি উপেক্ষিতে তোরে
জগতে আছে কি কেহ?
মরি! মরি! তোর সজল নয়ন,
গলায় পাষাণ দেহ।

শ্রীমতী মৃণালিনী বসু।

শশ্মানভূমি।

জাহ্নবা পুলিনে দেবি। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে
বিজনে তোমার বাস শিব-প্রণয়িনী!
তোমার এ ক্রোড়তল দেহিকের শেষস্থল,
শেষ অভিনয় তা'র মরত জীবনে
সমাপ্ত তোমারি অঙ্কে হয় গো জননি।

২

কি গভীর তপস্যায় বল কি সাধনে?
ভুলায়েছ ভোলানাথে—কথিত পুরাণে।
কভু ভস্ম মাখি গায়ে নাচে ভোলা মত্ত হ'য়ে
মৃতনর অস্থিমালা অঙ্গের ভূষণ,
কভু বা সমাধি মগ্ন যোগেন্দ্র রতন।

৩

ওই ত সংসার হোথা পূর্ণ শত আশে
সাজায়েছে মনোমত, সংসারী উল্লাসে;
সংসার বিপিনে তার, পুত্র কন্যা পরিবার,
ধন, জন, সুখে যেন পত্র, পুষ্প, ফলে—
সুন্দর শোভিছে গৃহ ধরা বন স্থলে।

৪

আর দেখ ওরি পাশে ভীষণ প্রান্তর
সংসারের মরুভূমি—দরিদ্র আলয়—
সন্তপ্ত কুরঙ্গী মত অভাগা অভাগী কত
আশামরীচিকাছলে ছোটে নিরন্তর—
বিনা দোষে দোষী দীন সমাজ ভিতর!

৫

কিন্তু তব ইন্দ্রজাল এমনি প্রধান
সংসারের পার্থকতা সমাজ বন্ধন
তব ভস্ম-স্পর্শে হায় ভস্মে পরিণত হয়—
নিয়তির পথে তুমি অনন্ত বিশ্রাম;
তব হৃদে আছে কত অজানা আরাম।

৬

তাই দেবি। আসিয়াছি তব সন্নিধানে
তব পথশ্রমে বড় হইয়ে কাতর
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা এসেছি গো শেষ বালা
যাতনা ভুলিয়ে তাই শুইয়ে এখানে;
সেহ শান্তি শান্তিময়। সন্তপ্ত জীবনে।

শ্রীঅজিত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শব্দের অক্ষর পরিবর্ত্তনে নূতন পদসৃষ্টি।—নিম্ন লিখিত বামদিকের কথাগুলির অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলে দক্ষিণদিকের অর্থবোধক কথাগুলির সৃষ্টি হইবে :—

Astronomers—No more stars
Catalogues—Got as a clue
Matrimony—In to my arm
Midshipman—Mind his map
Old England—Golden land
Parliament—Partial men
Penitentiary—Nay I repent it
Radical Reform—Rare mad frolic
Revolution—To love ruin
Sweet-heart—There we sat
Telegraphs—Great helps

* * *

কতিপয় অসাধারণ বালক। অদ্বিতীয় সঙ্গীতবিশারদ মোসার্ট (Mozart) চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে সঙ্গীতরচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এমন একটি স্বরলিপি রচনা করেন যাহা আর কেহ সহজে আয়ত্ত করিতে পারিত না। ভিয়েনাতে সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস্ ঐ বালকের অসাধারণ শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহাকে তাঁহার "ক্ষুদ্র যাদুকর" বলিতেন। আট বৎসর বয়সে মোসার্ট ইংলণ্ডে আসিয়া রাজসমীপে এবং বড় বড় কন্সার্টে বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সুবিখ্যাত হেণ্ডেল (Hendel) আর একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে হেণ্ডেল সঙ্গীত

রচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রুসিয়ার অধিশ্বর ফ্রেডারিককে মুগ্ধ করে। ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে হেণ্ডেল তিন খানি অপেরা লিখে। গষ্টেভস্ এডল্ফস্ ১৮ বৎসর বয়সে সুইডেনের রাজা হন। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি পিতার সহিত রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং বিদেশীয় দূতদিগের অভ্যর্থনাস্থলে উপস্থিত থাকিতেন। বাল্যকালেই তিনি, লাটিন জার্ম্মান্, ডাচ, ফরাসী ইটালিয়ান্ ও রুসীয় ভাষায় স্বচ্ছন্দে ও সুন্দররূপে কথা কহিতে পারিতেন, খ্রীষ্টিয়ান হায়েনরিক্ হায়েনেকেন্ (Christian Heinrich Heineken) ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মানির অন্তর্গত লুবেক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অসাধারণ শক্তির কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। চারি বৎসর বয়সের সময় ইঁহার মৃত্যু হয় কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত গণের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। দশ মাস বয়সে তিনি কথা কহিতে শিখেন ; এবং এক বৎসর বয়সে বাইবেলের প্রথমভাগের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সমস্তই জানিতেন ; এবং দুই বৎসর বয়সে প্রায় সমুদায় বাইবেল কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিন বৎসর বয়সে তিনি সমস্ত পৃথিবীর আদ্যোপান্ত ইতিহাস অবগত ছিলেন। চারি বৎসর বয়সে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস পাঠে প্রবৃত্ত হন, এবং শীঘ্রই এত বিখ্যাত হন যে তাহাকে ডেনমার্কের রাজার সহিত দর্শনার্থ কোপেনহেগেনে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই শুকদেব সদৃশ অদ্ভুত বালকের চারি বৎসর বয়সেই মৃত্যু হয়। হায়েনরিক্ যদিও সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস উত্তমরূপে অবগত ছিলেন কিন্তু তিনি অধিক লিখিয়া যান নাই। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক্ ঐ সালে অর্থাৎ ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে নুরেমবার্গে আর একটি অদ্ভুত বালক

জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম জন ফিলিপ্ ব্যারিটিয়ার (John Phillip Barrettier)। উনবিংশ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয় হয় বটে কিন্তু তিনি একাদশ খানি ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস সম্বন্ধে স্তূপাকার হস্তলিপিও রাখিয়া গিয়াছেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি ল্যাটিন, ফরাসী, ডাচ্ ও গ্রীক উত্তমরূপে পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন। এবং আটবৎসর বয়সে হিব্রু বাইবেল অনায়াসে ফরাসী বা লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিতে পারিতেন। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি Halle নগরে এম্ এ পাশ করেন, ও বার্লিনের রয়েল একাডেমির সভ্য মনোনীত হন। ইতালির বিখ্যাত কবি তাসো আটবৎসর বয়সেই বিখ্যাত হন, এবং হোমার ও ভর্জিল সম্বন্ধে তৎকালীন সুবিখ্যাত পণ্ডিতদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতেন। স্পেনের বিখ্যাত নাট্যকার, যিনি ষোড়শ শতাব্দীতে পাঁচশতের উপর নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, পাঁচ বৎসরের সময় স্প্যানিস্ ও লাটিন ভাষা অনায়াসে পড়িতে পারিতেন। সুবিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্যাস্ক্যাল্ (Pascal) ১৬ বৎসর বয়সে অঙ্কশাস্ত্র বিষয়ক একখানি পুস্তক লিখিয়া তৎকালীন বিজ্ঞতম অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের মধ্যে একজন সুবিখ্যাত বক্তা হারমজিনিস্ (Hermogenes) যিনি মার্কাস অরিলিয়াসকে বক্তৃতাবিদ্যা শিক্ষাদিতেন, ষোল বৎসর বয়সে একটি উচ্চ পদে নিযুক্ত হন ও গ্রীসের ভিতর একজন প্রধান বক্তা বলিয়া পরিগণিত হন।

উত্তম পুরুষ।—তোদের ক্লাসে সব চেয়ে চালাক ছেলে কে ;

ভাই পো।—আমার ইচ্ছা বলি আমি কিন্তু বাবা যে জাঁক করতে মানা করে।

পড়ে ঠিক।—ভৃত্য। ময়নাঠা আজ আবার একটা নুতন বোল শিখিয়াছে।

বালক। (তাহার বন্ধুর প্রতি) মাষ্টার মহাশয় আমাকে যা' বলেন ও তাই শেখে। (ভৃত্যের প্রতি) আজ আবার কি বল্‌চে রে।

ভৃত্য – "দুর গাধা তোর কিছু হবেনা।"

* * *

হাওয়া পুরুণ।—বাইক বিহারী—(অশ্বারোহীর প্রতি) আপনার ঘোড়াটা বড় রোগা আমার পম্পটা একবার নেবেন কি ?

* * *

বাবার কর্ম্ম।—১ম বালিকা। আমার বাবা পুলিশে চাকরি করে। তোমার বাবা কি করে ?

২য় বা। মা যা'বলে তাই করে।

* * *

ক্ষৌরকারের ধূর্ত্ততা। জর্ম্মণির মৃত মন্ত্রী বিষমার্কের ক্ষৌরকার প্রভুর চুল কাটিয়া নাকি বড়লোক হইতে চলিল। শুনাযায় সে মন্ত্রীবরের অতিকম ৮ বৎসরের চুল জড করিয়া রাখিয়াছে। এখন তাহা হইতে দুইএকগাছি লইয়া লকেট ব্রুচ ইত্যাদি অলঙ্কারের ভিতরদিয়া দরে বিক্রয় করিতেছে। সে এই চাল চালিবার জন্ত বিষমার্কের জীবদ্দশায় তাঁহার অনুমতি লইয়া রাখিয়াছিল।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক। একজন আমেরিকান রমণী ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে তাঁহার কোনও ইংরাজ মহিলা বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক কে" ? অবশ্য তিনি আশা করিয়াছিলেন, ইংরাজ মহিলা বলিবেন "এডিসন"; তাহা হইলে ইংলণ্ড অপেক্ষা আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন

হইবে; কিন্তু ইংরাজ মহিলা ধীরভাবে বলিলেন "আমার স্বামী"। "সেকি? কই তাঁকে ত এমন কোনও আবিষ্কার করিতে শুনি নাই"?

ইংরাজ মহিলা—তুমি শোন নাই বটে, কিন্তু আমি শুনিয়াছি। প্রতিদিন অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই সে প্রতিদিন নূতন নূতন ওজর আবিষ্কার করিয়া থাকে।

* * *

বিস্ময় উৎপাদন। রসিক বাবু—(সরল বাবুর স্ত্রীর প্রতি) ঐ আপনার স্বামী আস্‌ছেন, তাঁকে নিয়ে একটু তামাসা করা যাক, আমি ও আমার স্ত্রী এই দরজার পার্শ্বে লুকাইয়া থাকি, আপনি আপনার স্বামীকে বলুন "যাঁদের আস্‌বার কথা ছিল তাঁ'রা আসেন নাই"। তা'র পর আমরা বাহির হইয়া তা'র বিস্ময় উৎপাদন করিব। (তথাকরণ ও সরল বাবুর প্রবেশ)

সরল বাবুর স্ত্রী। (কথামত) রসিক বাবু ও রসিক বাবুর স্ত্রীর আজ আস্‌বার কথা ছিল কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহারা কথা রাখিতে পারিলেন না।

সরল বাবু। (সাহ্লাদে) আঃ বাঁচা গেল!

* * *

শিক্ষক। রবিবারের দিনে আমরা বেড়াইতে বাহির হইলে মাথার উপর কি দেখিতে পাই?

ছাত্র। নীল আকাশ।

শিক্ষক। বেশ, আচ্ছা বাদ্‌লার দিনে মাথার উপর কি দেখিতে পাই?

ছাত্র। ছাতা।

* * *

সমালোচনা।

আত্মবোধ। (প্রাচীন গ্রন্থ) শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত ও শ্রীআশু-তোষ সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল কর্ত্তৃক সাহেবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৹। "আত্মবোধ" অন্যূন শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বিরচিত, একখানি আধ্যাত্মরূপক কাব্য। গ্রন্থকারের নাম ৺জগদ্রাম রায়, নিবাস বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত, ভুলাইগ্রাম। সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্বাধীন সংশয়-বিচঞ্চল মনের, স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া মানবের সংসার তাপজাল হইতে মুক্তি লাভের উপায় নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ভাষা ও ভাবের জটিলতা নিবন্ধন আত্মবোধের অর্থবোধ করা কিছু আয়াস সাধ্য। কিন্তু আমাদের ধারণা আছে আধ্যাত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এই উভয় অন্তরায়েই সুপরিচিত এবং আশা করি তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে পশ্চাৎপদ হইবেন না। সম্পাদক-গণের সুলিখিত সূচনা ও টীকা তাঁহাদের সাহায্যার্থে আসিবে। প্রাচীন কালের সকল কীটদষ্ট গ্রন্থই যে মুদ্রিত করিয়া সঞ্জীবিত করিবার উপযোগী এ মতের আমরা পক্ষপাতী নহি কিন্তু কবি বলেন—

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে দেখ তাই
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

অন্ততঃ এই ভাবে দেখিলে এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের উদ্ধার সাধন প্রশংসনীয়।

***

আলো, মাসিকপত্র, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা।

কএকটি সুনির্ব্বাচিত প্রবন্ধে এই সংখ্যা পূর্ণ। শিশির প্রবন্ধে লেখক বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থা হইতে শিশির উৎপত্তির আধুনিক বিবরণ বিবৃত্ত করিয়াছেন। বেদ ও শ্রুতির নানাপদ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রীজী দেবতারা মূর্ত্তি বিশিষ্ট ইহা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ক্রিকেট খেলার প্রসঙ্গে লেখক শ্রীহরিপদ দত্ত বলেন যে "বর্ত্তমান বুয়র যুদ্ধে যে প্রীতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অষ্ট্রেলিয়া আগ্রহ সহকারে ইংলণ্ডকে সৈন্য সাহায্য করিতেছে তাহা প্রভূত পরিমাণে ক্রিকেট হইতে উৎপাদিত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই"। বুয়রেরা সমস্ত ইয়োরোপীয় শক্তি পুঞ্জের সহ ক্রিকেট খেলিয়া আসিলে আজ তাহাদের এ দুর্দ্দশা হইত না। আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। সাঁওতাল রাজ্য ও অন্ধ দুটিতেই জানিবার জিনিষ আছে।

* * *

ছাত্র।

ছাত্র কতিপয় ছাত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্র ১ম বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা—জীবনী সংগ্রহে মহাকবি কালিদাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। তিনটি আঙ্গুরীয় গল্পটি অসমাপ্ত। কৃষ্ণপান্তির সত্যবাদিতা ব্যতীত অপর সমস্ত গুলিই কবিতা, তন্মধ্যে পূর্ণশশী উল্লেখ যোগ্য। ছাত্রবৃন্দের নিকট হইতে যেরূপ আশা করা যায় ছাত্রে তাহাই আছে। আমরা তাহাদের উদ্যমের প্রশংসা করি। বার্ষিক মূল্য ৸৹ কলেবর হিসাবে আমাদের মতে কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে —

১৮৯৯ সালের সংক্ষিপ্ত ডায়ারি।

গতবর্ষ প্রারম্ভেই আমাদের বড়লাট বাহাদুর লর্ড কর্জ্জন চত্বারিংশৎ জন্মদিনে ভারতশাসনে নিয়োজিত হয়েন। জানুয়ারী মাসেই চাত্রা-নদীর সেতু ব্যবহারোপযোগী হইয়া খুলিয়া দেওয়া হয়। এই সেতুটী সুবৃহৎ ও সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাট বাহাদুরের সহপাঠী ওয়েলডন সাহেব কলিকাতার বিশপ পদে অধিষ্টিত হয়েন। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের পুনানগরীর হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত দুইটি লোক দণ্ডিত হয়। মার্চ্চ মাসে আধুনিক কালের সর্ব্বপ্রধান ভাষাজ্ঞ লীটনার সাহেবের মৃত্যু হয় ও শিলচার নগরে ভয়াবহ ঝটিকা কাণ্ডে অনেক ক্ষতি হয়। এপ্রেল মাসে সার মনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেবের মৃত্যু হয়। ইনি সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। ইনি ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার পিতা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সার্ভেয়রজেনেরল পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়া তিনি ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বোডেন প্রোফেসর হয়েন? তথায় সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চার জন্য ইণ্ডিয়ন ইন্‌ষ্টিটিউট নামক একটী সভা স্থাপনা করেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার সংস্কৃত ও ইংরাজী অভিধান সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেরই আদরের সামগ্রী হইয়া থাকিবে। ইনি ক্রমান্বয়ে বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই অভিধান রচনা করেন। মে মাসে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্র ভারতে যথেষ্ট আনন্দোৎসব হয়। জুন মাসে রঘুনাথ পুরুষোত্তম পারাঞ্জপ নামক জনৈক কংকান দেশীয়

ব্রাহ্মণ কাম্ব্রিজমাথামাটিকাল ট্রাইপোস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় কোনও ব্যক্তি সিনিয়র রাংলার হয়েন নাই। এই মাসে দক্ষিণে জাতিবিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহে প্রায় ১৫০টী গ্রাম ও বহুসংখ্যক লোক নিহত হয়। জুলাই মাসে দুইটী নূতন লৌহপথ স্থাপন আরম্ভ হয়। ১৩ই জুলাই বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন স্যার রমেশচন্দ্রমিত্রের মৃত্যু হয়। আগষ্ট মাসে পঞ্জাবের আশু দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে শ্রেষ্টিসম্বন্ধায় একটী নূতন আইনের প্রস্তাবন হয়। এই মাসেই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ২৯জন বাঙ্গালী কমিশনর ছোটলাট বাহাদুরের অবারণ নিন্দায় একযোগে তাঁহাদের পদ ছাড়িয়া দেন। এই মাসে দার্জ্জিলিং প্রদেশে কতকগুলি পর্ব্বত ধসিয়া পড়িয়া যায়; ইহাতে দেশীয় শত শত লোক ও নয়টী ইংরাজ বালক নিহত হয়। আর ভাগলপুরের আকস্মিক জলপ্লাবনে বিষম ক্ষতি হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর ধার্ম্মিক প্রবর রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু হয়। অক্টোবর মাসের ১১ই তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকা খণ্ডে বুয়রেরা ইংরাজরাজের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে। গ্লেন্‌কো নামক নগরে প্রথম যুদ্ধ হয় ও কিছুদিন পরেই ইলাণ্ডস্‌লাগটী নামক স্থানে দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। ইংরাজরাজ দয়া প্রকাশ করিয়া প্রথমে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন কিন্তু শত্রুরা অনেক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সর্দ্দার বিবেচনায় লর্ড রবার্ট্‌স্ সাহেবদ্বয়কে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেন। এ দিকে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে রুশরাজ রেলপথ বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। ডিসেম্বর মাসে পঞ্জাব প্রদেশে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ পায়।

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

স্ফটিক প্রাসাদ।
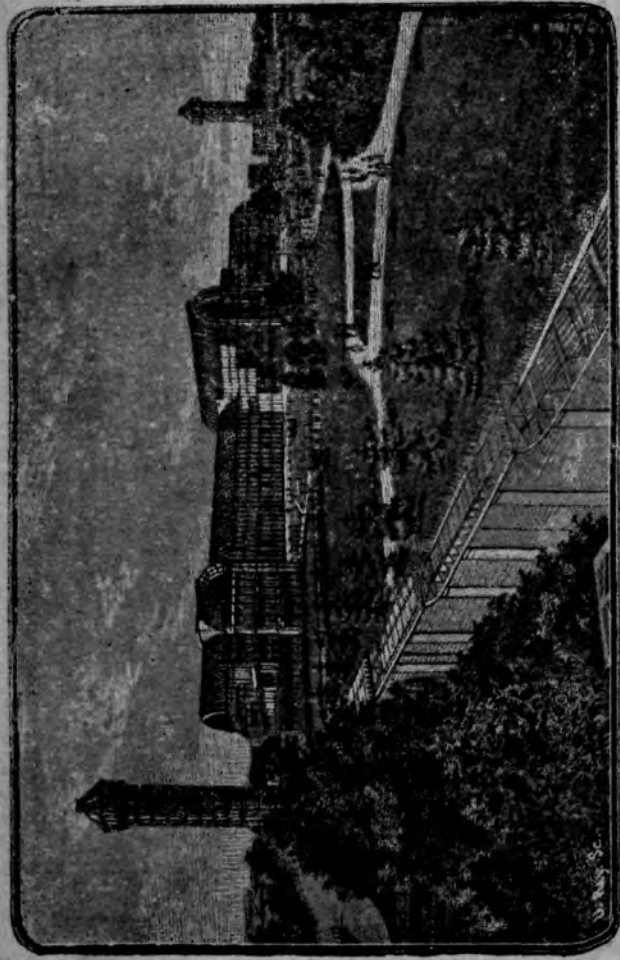
প্রয়াস, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

ELM PRESS, CALCUTTA

প্রয়াস।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ। ফেব্রুয়ারি, [illegible] সাল। [illegible]তীয় সংখ্যা।

পাপিয়া।
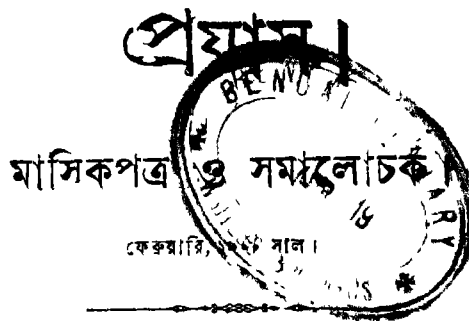
(কীট্সের "Nightingale" হইতে।)

(১)

বিলুপ্ত চেতনা মম, সুখ খিন্ন প্রাণ,
পারিজাত-বাস যেন, করেছি আঘ্রাণ।
সুখপ্রদায়িনী সুধা নিঃশেষি নিমেষে,
সন্তোষ সলিলে যেন, ডুবেছি আবেশে।
তোমারি সৌভাগ্যে আজি এদশা আমার
শান্তিপরিপূর্ণ চিতে সুখেতে তোমার
হ'য়েছি পরম সুখী। অয়ি বিহঙ্গিনি,
অয়ি বনদেবি, অয়ি, পাদপ বাসিনি,
ছায়ামগ্ন শ্যামকুঞ্জ হ'তে সুললিত,
ঢালিতেছে মুক্তকণ্ঠে অমিয় সঙ্গীত।

(২)

অহো!, সে অমিয় কণা পাই না লভিতে,
যে সুধা-বারতা গীত, ভাসিছে মহীতে?
শ্যাম-কান্তি, হোরিগান, নর্ত্তন, সুবাস,
শিশুর হাসিতে যা'র পাই ক্ষীণাভাস,
অমর সুলভ সেই বিশদ তরল,
পাত্রপূর্ণ সুধারস সুখদ সরল,
উচ্ছলিত বিম্বধার তট কোলে ভাসি',
দেখায় পেলবাধরে শান্তি ঢালা হাসি;
পেলে সে ত্রিদিব-সুধা ত্যজি' এ ভুবন,
মিশে যাই তব সনে নন্দন কানন।

(৩)

মিশে যাই—গলে' যাই—দূরে যাই চলে',—
মরতের অধীরতা দুঃখ জ্বালা ভুলে,
পরস্পর তোলে সদা মর্ম্ম-কাতরতা,
বিকল, বিলোল তনু স্থবিরেরা হেথা,
বিরস, মলিন-কান্তি তরুণ সকল,
করুণ-হৃদয়ে যাচে মরণ শীতল,
দারুণ-বিষাদ ভরা মরতের ধ্যান,
নিরাশায় ভ'রে আসে সজল নয়ান।
রজনীর অনুরাগ প্রভাতে ফুরায়,
প্রমদা নয়ন-জ্যোতিঃ পলকে হারায়!

(৪)

উধাও, উধাও হ'য়ে যা'ব তব পাশে,
—পারিনা থাকিতে বৃথা স্বর্গ সুধা আশে।—
যা'ব সুখে ভাবময় কবিতা পাথায়,
—যদিও মোহিত চিত্ত স্বপন বিভায়।—
এসেছি তোমার পাশে,—কি শান্ত যামিনী
বিরাজে গগনে শশী, প্রেয়সী রোহিণী,
যত তারা সখী সনে। হেথা অন্ধকার,
শ্যাম পত্রাচ্ছন্ন ঘন কুঞ্জ ছাবা, আর—
শৈবাল-শোভিত শুধু বক্র বীথিকায়,
নভঃ হ'তে মৃদু ভাতি আনে মন্দ বায়।

(৫)

কি যে ফুল ফুটে আছে মোর পদতলে,
কি কোমল গন্ধ দোলে তরুশাখা কোলে—
পাইনা দেখিতে কিছু—বিহরি' তিমিরে;
শুধু সে সুষমা ভাসে হৃদয় মন্দিরে—
যে সম্পদ-ডালি মধু ধরেছে সোহাগে,
সেজেছে প্রকৃতি বধু নব রস রাগে।—
মল্লিকা, মাধবী, যূথী, আতা চাঁপা ফুল,
দেখিতে দেখিতে ঝরে সুরভি বকুল,
বসন্ত উন্মেষ শোভা রসাল মঞ্জরী
অলিকুল মত্ত তাহে আসক্ত্যা গুঞ্জরী।

(৬)

শুনিতেছি ছায়াতলে। আধ প্রেমাবেশে,
কতবার ত্রিদিবের চির শান্তি আশে,—
ছন্দোবদ্ধ সুরে কত ডেকেছি মরণে,
মিশাতে পরাণ-বায়ু মন্দার পবনে।
মরিতে সন্তোষ কত আজি এ সময়,
জ্যো'স্নাপ্লুত এ নিশীথে লভিতে বিলয়।
দিশে দিশে প্রাণ ঢেলে গাহিছ যখন,
তুমি চির আত্মহারা পুলকে মগন,
এখনো গাহিছ গান—বৃথা এ শ্রবণ,—
ও মহান্ শান্তি-গীত হ'য়েছে জীবন।

(৭)

মৃত্যু বিজয়িনী তুমি পাপিয়া অমরী,
তোমারও শুদ্ধ কণ্ঠে মুগ্ধ নরনারী।
আজি নিশাশেষে ভাসে যে স্বর লহরী,
শুনেছে তা' পুরাকালে কি রাজা ভিখারী।
নির্ব্বাসিতা সীতাদেবী উদাস লোচনে,
একাকিনী বাল্মিকীর শুষ্ক তপোবনে
ভগ্নহৃদে শুনে ছিলা ও করুণ গান।
প্রিয়াহারা সীতানাথ ব্যথিত পরাণ,

চেয়ে ছিলা পম্পাশোভা ওসঙ্গীত শুনি,
নন্দন কানন-কোলে দোলে মন্দাকিনী।

(৮)

প্রিয়াহারা! সত্য বটে যেন ধীরে ধীরে,
স্বর্গহ'তে তুমি হারা একা এলুফিরে।
বিদায়,—ক্ষণিক এ যে কল্পনা ছলনা
ভুলিতে ছিলাম, কই ভোলাত হ'লনা।
বিদায়;—করুণ-গীতি যেতেছে মিলায়ে,
ভাসে শান্ত নদী পারে প্রান্তর ছাড়ায়ে।
গিয়াছে শিখরী শিরে; পশি সানুদেশে,
লভিলা বিরাম চির। এ কি মায়া-বশে,
হেরিনু জাগ্রতে স্বপ্ন?—ফুরা'ল সে ধ্বনি,
জাগ্রত কি সুপ্ত আমি বুঝিতে পারিনি।

বিহারিলাল।

শৈশবে।

বিহারিলালের জন্মস্থান কলিকাতা। বিডন উদ্যানের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে, ভাগীরথীর সন্নিকটেই একটী অত্যল্প পরিসর গলির মধ্যে, কবির পৈত্রিক আবাসভবন। গলিটীর নামের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পূর্ব্বে নিমতলা ষ্ট্রীট বায়লেন বলিত, এক্ষণে অক্ষয়চন্দ্র দত্তের লেন বলে। পল্লীটী বহুকাল হইতে জোড়াবাগান নামে পরিচিত। এইখানে চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের তিন চারি পুরুষ বাস,—তাঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল ফরাসডাঙ্গায়; কবির বংশের প্রকৃত উপাধি 'চট্টোপাধ্যায়' কিন্তু 'চক্রবর্ত্তী' নামেই ইঁহারা পরিচিত। কবির প্রপিতামহ ৺মনোহর চক্রবর্ত্তী হালিসহরের একজন সুবর্ণবণিকের দান গ্রহণ করিয়া পতিত হয়েন ও প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তদবধি চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা পুরুষানুক্রমে এই মহানগরীর সুবর্ণবণিক্ বংশীয়দিগের পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী। এই চক্রবর্ত্তী বংশীয়দিগের মধ্যে কবির পিতৃব্য ৺দ্বারিকানাথ

চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহাধ্যায়ী এবং ৺ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন। দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী একজন প্রতিভাবান মহা পণ্ডিত বলিয়া যশস্বী হইয়া ছিলেন এবং একসময়ে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ ইঁহাকে প্রদান করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু ইঁহাদের বংশ পতিত, এই আপত্তিতে তিনি ঐ পদ প্রাপ্ত হয়েন নাই।

পৌরহিত্য কার্য্যই চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের অর্থাগমের একমাত্র উপায় ছিল, ভিন্নতর উপায়াবলম্বনের প্রয়োজনও তাঁহারা বোধ করেন নাই। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের প্রতি কমলার কৃপাধিক্যের কথা, এবং তাঁহাদের প্রবলতর ধর্ম্মাচার নিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণভক্তির কথা সর্ব্বজন বিদিত। সুতরাং একথা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন, যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের বংশপরম্পরায় দারিদ্র্য ক্লেশ উপভোগ করিতে হয় নাই। তবে "ব্রাহ্মণ" ও "দরিদ্র" এই দুইটী শব্দের ঘনিষ্ঠতা অবিচ্ছেদ্য বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা কখনই ধনসঞ্চয় করিয়া সম্পত্তিশালী হইতে পারেন নাই, স্বচ্ছন্দে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের বসতবাটীটী ত্রিতল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র, অনুচ্চ পুরাতন ও স্থপতি-শিল্প সৌন্দর্য্য-বিহীন। এই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে, বঙ্গীয় ১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ, বিহারিলাল জন্মগ্রহণ করেন।

কবির পিতা ৺দীননাথ চক্রবর্ত্তীর উপরই তখন তদীয় বংশ রক্ষার আশা নির্ভর করিতে ছিল এবং তাঁহার কেবলমাত্র জননী ও পত্নীকে লইয়াই সংসার। নবজাত শিশুর আগমনে সেই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অনেক হর্ষ বিষাদের অশ্রু ঝরিয়াছিল—অনেক আশা সংশয়ের কথা উঠিয়াছিল। কারণ বিহারিলাল, তাঁহার পিতার তৃতীয় সন্তান হইয়াও প্রথমের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন;—দীননাথ চক্রবর্ত্তীর

প্রথম দুইটী পুত্রসন্তানকে, কঠিন মৃত্তিকাস্পর্শের অনুপযোগী ভাবিয়া, পরমপিতা শৈশবেই, নিজ ক্রোড়ে পুনঃগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুইটী সন্তানকে হারাইয়া বিহারিলালের জনকজননী তাঁহাদের একমাত্র জীবনাবলম্বন শিশুপুত্রকে কত সাবধানে, কত যত্নে, প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহা সহৃদয় পাঠক অনুভব করিবেন। বিহারিলাল, জীবনের প্রথম দুই বৎসর এই স্নেহ মমতার উপর একাধিপত্য করেন; পরে আর একটী পেলবতনু এই স্নেহ-রাজ্যের অংশভাগী হইয়া অল্পদিনের জন্য আসিয়াছিল বটে, কিন্তু শৈশব অজ্ঞানতা বশতঃ ও পিতামহীর নিত্যপরিবর্দ্ধিত আদরগুণে, বিহারিলাল বোধ হয়, সেই ক্ষুদ্রপ্রতিদ্বন্দ্বীর সত্তা অনুভব করিতে পারেন নাই।

এরূপ অবস্থায় শিশুবিহারিলালের "আদুরেছেলে" হওয়াই স্বাভাবিক, এবং বিহারিলাল হইয়াছিলেনও তাহাই। শিশুর সকল আব্দারই তাঁহার মাতা পিতা, বিশেষতঃ তাঁহার পিতৃজননী পূরণ করিতেন। স্বভাবতঃ নির্ভীক শিশুর নিকট চর্ম্মচক্ষে দৃষ্ট, বা কল্পনাচক্ষে প্রদর্শিত কোন পদার্থই ভয়ের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত না। শিশু ভাবিত যাবতীয় মানবাকার জীবের অস্তিত্ব কেবল তাহাকে আদর করিবার জন্য এবং তাহার উপদ্রব সহ্য করিবার জন্য। পিতামহী যদি চঞ্চল শিশুর দৌরাত্ম্যদমনে অনন্যোপায় হইয়া বিভীষিকাপ্রদ কণ্ঠে "জুজু"র সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, শিশু তাহা হইলে কৌতুহলোদ্দীপ্ত স্বরে, "কইজুজু" বলিয়া, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থটীকে করায়ত্ত করিবার জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিত।

এইরূপ আদরে আব্দারে বিহারিলালের জীবনের প্রথম তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু চতুর্থ বর্ষে—সুখের শৈশব অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিহারিলাল একটী অমূল্যরত্ন হারাইলেন; তাঁহার

স্নেহময়ী জননীর, অতৃপ্ত-পতিপুত্রপ্রেম-ভোগে অপূর্ণ যৌবনে, জীবনালোক নিভিয়া গেল। নিজ দুরদৃষ্টের পরিমাণ সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযোগী জ্ঞান বিকাশ, বোধ হয় তখনও বিহারিলালের হয় নাই, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই কুহেলিকাচ্ছন্ন শৈশবকালের, সুপ্ত জননীস্মৃতি, যখনই তাঁহার মনে জাগরিত হইত, তখনই সেই অকাল-বঞ্চিত স্নেহরাশির জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। যৌবন কালে প্রণয়িনীর ক্রোড়ে নিজ প্রথম সন্তানকে দেখিয়া কবির নয়ন হইতে পুত্রপ্রেমজনিত আনন্দবারির সহিত, আপনার জননীর সুকোমল অঙ্কের কথা স্মরণ করিয়া, শোকাসার বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি সেই সময়ে লিখিয়াছেন—

আমার জননী ছেলে বেলা ফেলে,
করেছেন দেবলোকে প্রয়াণ;
এখনো হঠাৎ তাঁর কথা এ'লে,
বুঝিলেম কেন কাঁদেরে প্রাণ।

জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই স্নেহ মধুর জননী স্মৃতি, কবির হৃদয়াকাশে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় করুণাকিরণ বিতরণ করিয়াছিল। মাতার মৃত্যুর অর্দ্ধশতাব্দী পরেও, তাঁহার ছায়াময়ী মূর্ত্তি মানসপথে উদিত হইলে, কবির হৃদয় কিরূপ করুণ ও গভীর ভাবে উদ্বেলিত হইত, তাহা "নিশীথে" নামক কবিতাটী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। সেই কাতর উচ্ছ্বাস হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

হৃদয়, আজিরে কেন আকুল হইলে হেন!
কত কাল দেখি নাই মায়ের স্নেহের মুখ,
অতি কষ্টে আধ আধ, তাও যেন বাধ বাধ,
প'ড়েও পড়েনা মনে;—জীবনের কি অসুখ!

সে কাল—কালিমা টুটে আজো কি উঠেছে ফুটে!
ফিরিয়া আসিছে যেন হারাবো পুরাণ সুখ।
চিনেছি মা আর আর। বিকাইব রাঙা পায়;
তুমিই দেবতা মম জাগ্রত রয়েছ প্রাণে,
বিপদে সম্পদে বাপ, অলক্ষ্যে আগুলে থাক;—
যখন যেখানে আছি, চেয়ে আছ মুখ পানে।
নিদ্রায় অকূল হোলে ঘুমাই তোমারি কোলে
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় করি তোমারই স্তন পান,
তুমি আছ কাছে কাছে, তাই প্রাণ বেঁচে আছে;
সর্ব্বদা সঙ্কট আছে, সদা কর পরিত্রাণ।
* * * * * * *
চারি বছরের ছেলে কেন ফেলে স্বর্গে গেলে?
আমি অতি শিশুমতি চিনিতে পারিনি গো।
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি তোমারে পূজিনি গো!

বাল্যে।

শৈশবে জননীবিয়োগ না হইলে বিহারিলালের চরিত্র ও জীবনের গতি কিরূপ হইত, বলা যায় না। মাতা এজগৎ হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিহারিলালের দুইবর্ষ বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাটীও বৃন্তচ্যুত মুকুলের মত বিশুষ্ক হইয়া গেল। মাতৃহীন শিশুবিহারিলাল পিতার ক্ষুদ্র ভবনে রাজরাজেশ্বর হইয়া যথেচ্ছাচার করিতে লাগিলেন। দীননাথ ঠাকুর পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে শিশুর ইষ্টানিষ্ট কিছুমাত্র হয় নাই। বিহারিলাল মাতার স্নেহ কোমল অঙ্ক হারাইয়া পিতামহীর আদরের ক্রোড় অধিকার করিয়াছিলেন। বিহারিলালের বিমাতাও সাধারণ বিমাতা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ছিলেন।

বিহারিলাল তাঁহার উপর উপদ্রব করিতে ত্রুটী করিতেন না, কিন্তু তিনি বয়স্থা হইয়াও প্রধানতঃ নিজ স্বভাবগুণে কতক বা স্বামীর শাসন ভয়ে, সে উপদ্রব অম্লানবদনে সহ্য করিতেন। পরন্তু তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন। দীননাথ ঠাকুর আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ও ভবিষ্যসুখাশা একমাত্র কুলপ্রদীপ বিহারিলালের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।

পিতামহীর আদরে বিহারিলাল ইতিপূর্ব্বেই 'আলালের ঘরের দুলাল' হইয়াছিলেন। স্নেহময় ও স্বকার্য্যেব্যস্ত জনকের শাসন অভাবে আদুরে শিশু ক্রমে দুরন্ত বালকে পরিণত হইল। বালকের পাঠাভ্যাসের আসক্তি এ সময়ে ছিল না, এবং পিতাও বোধ হয় পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই, সামান্যরূপ সংস্কৃত আয়ত্ত করিলেই বালক ভবিষ্যতে যজমান রক্ষা করিতে পারিবে,—বিদ্যার প্রয়োজন? ফলতঃ বালককে বিদ্যার্জ্জনের জন্য কেহ উৎপীড়িত করেন নাই, এবং বালকও নিয়মিতরূপে কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। প্রাথমিক শিক্ষা গৃহেই হইয়াছিল; কিন্তু মানসিক উন্নতি না হইলেও বালকের কায়িক পরিপুষ্টির অভাব ছিল না। দেহ-বলে এবং সন্তরণ পটুতায় বিহারিলাল তাঁহার বাল্যসহচরগণের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। বাটীর সন্নিকটস্থ নিমতলা ঘাট হইতে জাহ্নবীবক্ষ দুই তিনবার পারাপার হওয়া বিহারিলালের নিকট অতিরিক্ত আয়াস-সাধ্য বলিয়া বোধ হইত না।

বাল্যবয়স হইতে বিহারিলালের অপরিমিত দৈহিক শক্তির অনুযায়ী, আহারের মাত্রাও কিছু অতিরিক্ত ছিল। কিন্তু বালকের স্নানের স্থিতি কালটী, কখন কখন সকল পরিমাণের বহির্দ্দেশে গিয়া পড়িত। বালক এক একদিন প্রাতে সাত ঘটিকার সময় পাত্র সম্মার্জ্জনী স্কন্ধে বাটী

হইতে বহির্গত হইলেন, আর অপরাহ্ণ তিন টার সময় আর্দ্রবসনে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। মধ্যবর্ত্তী তিন প্রহরাধিক কাল অন্যত্র অতিবাহিত হয় নাই, স্নানই হইতেছিল। কোন কোন দিন বৃদ্ধা পিতামহী পৌত্রের আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া নিজেই হয়ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্থানীয় মথুরনাথ সেনের 'জোড়াপুকুরে' যাইয়া উপস্থিত হইতেন। জলক্রীড়া নিরত পৌত্র যেমন শুনিতেন তাঁহার "দাদা" আসিতেছেন; (বিহারিলাল সাদর সম্ভাষণে তাঁহার পিতামহীকে পিতামহের স্থলাভিষিক্তা করিয়াছিলেন।) অমনি তিনি পলক মধ্যে সলিল গর্ভে অদৃশ্য হইতেন এবং হয়ত পুষ্করিণীর পরপারে যাইয়া দেখা দিতেন।

যে বালকের সাধারণ কার্য্যপ্রণালী এতদূর নিয়ম বন্ধনের বহির্ভূত, তাহার পক্ষে প্রতিনিয়ত বিদ্যালয়ে আবদ্ধ থাকিয়া পাঠাভ্যাস করা অসম্ভব। সুতরাং বিহারিলালও সে পথে গমন করেন নাই। কিন্তু ভাবী কবি আর একটী স্বতন্ত্র পথে এই সময় হইতে বাগ্দেবীর সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন, অবশ্য লোকে সেটীকে বিদ্যাচর্চ্চা বলিয়া গণ্য করে নাই, এবং বিহারিলালের নিজেরও বোধ হয় সেরূপ ধারণা ছিল না। সেটী এই ;—বটতলা হইতে যত কিছু বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইত, বিহারিলাল সেগুলিকে অবহিত চিত্তে পাঠ করিতেন। পাঠক "বটতলা" নামে শিহরিয়া উঠিবেন না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা হইতেছে, সে সময়ে বঙ্গভাষার পাঠোপযোগী সমস্ত পুস্তকই প্রায় বটতলা হইতে বাহির হইত। বাল্যকালের এই বটতলার পুস্তক পাঠ হইতেই বিহারিলালের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার; এবং বয়সের সহিত এই অনুরাগ ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া উত্তর কালে তাঁহাকে জাতীয় সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত করে।

আরও কিছু শিক্ষা বিহারিলালের বাল্যকাল হইতে হইয়াছিল।

সেটী সত্যবাদিতা ও স্পষ্টভাষিতা, সৎ ও সুন্দরের প্রতি আন্তরিক আসক্তি এবং অসৎ ও অসুন্দরের প্রতি ঘোরতর বিতৃষ্ণা। এ শিক্ষাটী বিহারিলালের স্বতঃসিদ্ধ।

কৈশোরে।

দশম হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে বিহারিলাল কয়েক মাসের জন্য জেনারেল্‌ এসেমব্লিজ্‌ ইনিষ্টিটিউশনে গমনাগমন করিয়াছিলেন এবং অনুমান তিন বর্ষ কাল সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দীননাথঠাকুর অনুষ্ঠানের ক্রটী করেন নাই, পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য বাটীতে একটী পণ্ডিতও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পাঠের ও লিখনের উপকরণাদিরও বিহারিলালের অভাব ছিল না। দয়া পরবশ হইয়া তিনি সময়ে সময়ে সেগুলি হইতে দারিদ্র্যপীড়িত বন্ধুবর্গের মধ্যে বিতরণও করিতেন। সকলই ছিল, ছিল না কেবল বিহারিলালের পাঠাভ্যাসে প্রসক্তি।

যাহা হউক পাঠ্যপরীক্ষায় সুনাম অর্জ্জন করিতে অকৃতকার্য্য হইলেও বিহারিলাল সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে অন্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাহুবলের আস্বাদ পাইয়া অনেকানেক কলহপ্রবণ দুর্দ্দান্ত বালক তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। ছাত্রদিগের সমরাঙ্গনে তিনিই নেতা হইতেন, তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। যেখানে মারামারি সেইখানেই বিহারিলাল। কিন্তু তাঁহার স্বভাবানুযায়ী তিনি দুর্ব্বলের পক্ষই গ্রহণ করিতেন, এবং তাঁহার শক্তি কখন বিবাদবহ্নি সন্ধুক্ষিত করিতে ব্যয়িত হইত না, শান্তি বিধান কার্য্যেই পর্য্যবসিত হইত।

বিহারিলালের বিদ্যালয়ে শিক্ষা এই পর্য্যন্ত। কিন্তু বিদ্যাগারের বাহিরে কিছু কিছু শিক্ষা হইতে ছিল। মাতৃভাষা আলোচনার কথা

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা অধিকতর আগ্রহের সহিত এবং অবাধে চলিতে ছিল। আর একটী শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল, যদিও সেটীকে বিহারিলালের অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খলতার অন্যতম বলিয়া সে সময়ে জনসাধারণের নিকট পরিগণিত হইয়াছিল। এটী ভাবীকবির গান শিক্ষা ; অবশ্য এ শিক্ষাটীও কোনরূপ নিয়মাধীন ছিল না। বিহারিলাল বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, এবং যাত্রা পাঁচালী বা কবির গানের কথা শুনিলেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণসাধ পরিতৃপ্ত করিতেন। তখনকার যাত্রায় দেখিবার বড় বিশেষ কিছু থাকিত না কিন্তু সঙ্গীতরসজ্ঞদিগের শুনিবার এখনকার যাত্রা হইতে উৎকৃষ্টতর বিষয় থাকিত। গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী, গোপাল উড়ে, প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ সুশিক্ষিত ও সুরজ্ঞ গায়ক ছিলেন। বিহারিলাল তাঁহাদের গানের বিশেষ ভক্ত হইয়াছিলেন। সাময়িক কবিগায়কদিগের উপস্থিত রচনাশক্তি বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁহাকে প্রীত করিত এবং তাঁহাদের কবিত্ববিরল বাক্যকুশল সরস গানগুলি তখন তাঁহার বড় ভাল লাগিত,—আন্টুনি সাহেবের কয়েকটী গান তিনি সুরলয়ে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ৺দাশরথি কুণ্ডুর পাঁচালীর কথা শুনিলে এবং কবিওয়ালাদিগের বা হাফ্ আকড়াইয়ের গীতদ্বন্দ্ব শ্রবণে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন।

ভাবী কবি কেবল গীত শ্রবণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, বাটীতে আসিয়া সে গুলিকে সুরলয়ে পুনরাবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতেন এবং গীতের কোন অংশ বিস্মৃত হইলে তাহা নিজেই পূরণ করিয়া লইতেন। এইরূপ পররচিত গীতের অংশ পূরণ করিতে করিতে ক্রমে তিনি আপনি গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই বিহারিলালের কবিতা রচনার প্রথম উদ্যম।

সুকুমার বয়সের এই গান শিক্ষা ভবিষ্যতে বিহারিলালকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বিহারিলাল তাঁহার কবিতায় যে মধুর সঙ্গীত যোজনা করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃত সুরজ্ঞ ব্যতীত অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। বিহারিলালের এই সঙ্গীতালোচনা কিশোরেই অবসান হয় নাই—চিরজীবন চলিয়াছিল। শেষজীবনেও কবি অহরহঃ গুন্‌গুন্‌ স্বরে গান করিতেন। তাঁহার স্বর তাদৃশ শ্রুতিমধুর ছিল না, কিন্তু তাঁহার সুরলয় বোধ ছিল। এই সঙ্গীত চর্চ্চা প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা বোধ হয় উল্লেখ যোগ্য। বিহারিলালের প্রথম রচনাও গান, শেষ রচনাও গান। তিনি "সঙ্গীত শতক"এ তাঁহার আদিরচনা এবং "বাউল সঙ্গীত"এ তাঁহার শেষ রচনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অতীতপ্রায় কিশোরবয়সে একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে বিহারিলালের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত করিল। অনুমান পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতা ও পিতামহীর অজ্ঞাতসারে বিহারিলাল পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলেন। এই সময়ে বিহারিলালের পিতার এক নিঃসন্তান পিতৃব্যের পত্নীবিয়োগ হওয়াতে তিনি সংসারাশ্রমে বীতরাগী হইয়া তীর্থপর্য্যটন মানসে জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করেন। বিহারিলাল তাঁহাকে কিছু না বলিয়া পদব্রজে তাঁহার শিবিকার অনুসরণ করেন ও পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখা দেন। অগত্যা বৃদ্ধ বাধ্য হইয়া বিহারিলালকে সঙ্গে করিয়া লয়েন। বিহারিলালের এই আয়াস সাধ্য এবং বিপদসঙ্কুল তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য পুণ্যসঞ্চয় নহে। অন্যরূপ দুইটি কারণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম কারণটি বিহারিলালের, স্বপ্নবহুল যৌবনঊষার ঘুমঘোর—একটি রমণীমুখ সন্দর্শনের ইচ্ছা। বিহারিলাল নারীজাতির প্রতি উদার ভক্তি ও প্রেমে আজীবন অনুপ্রাণিত ছিলেন, সেই পবিত্র রমণীপ্রেমের উন্মেষ, সেই সৌন্দর্য্যতৃষা কিশোর বয়সেই

তিনি অনুভব করেন। কবির হৃদয় একটি পূজার প্রতিমা খুঁজিতে ছিল, এমন সময়ে একটি রমণীমূর্ত্তিকে দেখিয়া আবেগচালিত বিহারি-লালের মনে হয়, বুঝি সেই প্রতিমা তিনি পাইয়াছেন। কিন্তু অচিরেই বিহারিলালের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, তিনি বুঝিতে পারেন প্রতিমা অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে। তিনিও মনে কোনরূপ মাটির ভাবের ছায়া-মাত্র স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। এই ঘটনাটির উল্লেখে, কবি বায়রণের বাল্য-প্রণয় এবং কবি শেলীর গোপন পরিণয়ের কথা আমাদের মনে পড়ে। বায়রণের রমণীপ্রেম অতি পঙ্কিল ও কলুষিত। শেলী রমণীজাতির প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন বটে, তিনি তাঁহার কবিতায় যখনি রমণীর কথা কহিয়াছেন তখনি তাহার স্বর কোমল ও মধুর হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিহারিলালের রমণীপ্রেম বা পূজা এত মহান্ এত পবিত্র ও এত উদার, যে, রমণীপ্রসঙ্গে তাঁহার নামের সহিত, কোন বিদেশীয় বা দেশীয় কবির নামোল্লেখ করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। যাহা হউক বিহারিলালের উৎকল প্রবাসের এই কারণটি তিনি নিজেই তাঁহার কোন কোন বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—গোপনের কোন কারণও ছিল না।

দ্বিতীয় কারণটি তাঁহার দেশপর্য্যটন স্পৃহা, এবং পদপথে গমন করাতে, বৈচিত্রময় প্রকৃতির গিরি নদী উপবন কান্তারাদি নানাবিধ মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পড়ে এবং পরিশেষে তরঙ্গময় সাগরের অনন্ত বারিরাশি দর্শন করিয়া, তাঁহার স্বভাব-শোভা দর্শন লালসা পরিতৃপ্ত হয়। এই পুরুষোত্তম যাত্রা পথের একটি ঘটনা উল্লেখ যোগ্য। একদা সুদূর পথিমধ্যে কৌমুদী নিশামুখে তিনি একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার নিকট উপনীত হয়েন। স্থানটি বিজন স্বভাব-শোভাময় কিন্তু জলাশয়টি অগণ্য কুম্ভীর সমাকীর্ণ। এই বিপদ-সঙ্কুলতার কথা অবগত হইয়াও,

তিনি ঐ দীর্ঘিকার চন্দ্রকরোজ্জ্বল বিস্তীর্ণ-বক্ষে সন্তরণের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ঘটনাটি বিহারিলালের অতিবিক্ত সন্তরণ প্রিয়তার, দুঃসাহসিকতার, এবং অদম্য সৌন্দর্য্য উপভোগ স্পৃহার পরিচয় দান করে।

পুরীতে অবস্থান কালে, বিহারিলাল গভীর নিশীথ পর্য্যন্ত একাকী সমুদ্রসৈকতে উপবেশন করিয়া থাকিতেন। রজনীর অন্ধকার, শ্মশান-ময় বেলাভূমির গভীর নীরবতা, শিবার চীৎকার, তাঁহার সাগর-সহবাসজনিত আনন্দের ব্যতিক্রম করিতে পারিত না। তিনি নিজের ভাবে বিভোর হইয়া কখন বা জলকল্লোলময় সাগরের মহাগীতের সহিত আপনার কণ্ঠ মিলাইয়া ধরার সুখদুঃখ ভুলিয়া যাইতেন, আবার কখনবা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারিধির তরঙ্গভঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য্যপিপাসা শান্ত করিতেন।

সেই মহান্ গম্ভীর দৃশ্য দিনের পর দিন, বিহারিলালের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার অন্তর্জ্জগতে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটাইল। সাগরবারি রাশির বিশালতা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিল। সে মহাগম্ভীর দৃশ্য চিরজীবন বিহারিলালের মনে জীবন্ত ছবির আকারে বিরাজ করিত। তিনি শেষজীবনে বারিধিকে সম্ভাষণ করিয়াছেন—

> উদার অনন্ত নীল হে ধারন্ত অম্বুরাশি।
> আনন্দে উন্মত্ত হয়ে কোথায় ধেয়েছ ভাই?
> মহান্ তরঙ্গরঙ্গে কি মহান শুভ্র হাসি!
> বল কারে দেখিয়াছ? কোথা গেলে দেখা পাই।

এবং তাঁহার যৌনবচনা "নিসর্গসন্দর্শন" কাব্যের "সমুদ্রদর্শন" সর্গ এই সময়ের স্মৃতিপ্রসূত।

মাসত্রয় পরে যখন বিহারিলাল এই তীর্থাভিযান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সকলেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বাহ্য-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বাল্যচপলতা বিদূরিত হইয়া তাঁহার স্বভাবে যৌবন গাম্ভীর্য্য দেখা দিয়াছে।

ক্রমশঃ।

দাদা মহাশয়।

ইংরাজী নববর্ষারম্ভ উপলক্ষে আদালত বন্ধ। আদালতের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কারণ আমি এম, এ, বি, এল পাস করিয়া ঐ আদালতে ওকালতী করিয়া থাকি। এই সুযোগ পাইয়া মাতামহকে দেখিতে গিয়াছিলাম। পূজ্যপাদ মাতামহ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি; আপাততঃ কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। যুবাকালে বিশেষ শ্রমী ছিলেন ও ব্যবসায় বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় একমাত্র পুত্রটী কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তিনি ৺কাশীধামে বাস করিবার মানস করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম তাঁহার মুখশ্রী মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে; কিন্তু বোধ হইল যেন আমাকে দেখিয়া তিনি কিছু সুস্থ হইলেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, বিশেষ আদর অভ্যর্থনা কখনই করিতেন না। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"খগেন বাবু এসেছ, বোসো, ওকালতী চল্‌ছে কেমন?" আমি—"অ—মনি এক রকম বড় বিশেষ কিছু হয় না তবে—আপনাদের আশীর্ব্বাদে একরকম চলে' যাচ্চে"—

দাদা মহাশয়। কেন, ভায়া, ৫টা পাস ক'রেছ, কেবল আশীর্ব্বা-দের ধুয়ো ধরা তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমানের উচিত নয়।

আমি। তা না দাদা মশায় আজ কাল অনেক উকীল হ'য়েছে সেই জন্যই পশারটা বেশ জম্‌কাতে পাচ্ছি না।

দাদা মশায়। ভাই, তুমিও যা ভেবে উকীল হ'য়েছ তাহারাও তাই ভেবেছে;—তোমার জানা উচিত ছিল যে তোমার পথে অন্য লোকও আসিবে—তাহাদের সমকক্ষ হওয়া যদি তোমার অসাধ্য, তবে তুমি এ পথে গেলে কেন?

বৃদ্ধের বাক্যে কিছু অপ্রতিভ হইলাম কিন্তু ভাবিলাম যে ৫।৭ বৎসর ওকালতী করিয়া একটি বৃদ্ধের বাক্যের উচিতমত প্রত্যুত্তর দিতে পারিব না? এই ভাবিয়া বলিলাম "দাদা মহাশয় বলিব কি ওকালতী করিতে অনেক উপায় অভ্যস্ত থাকা আবশ্যক; সেগুলি না জানিলে ওকালতী জমকান অসম্ভব।"

বৃদ্ধ। ভাই, তুমি উকীল, তুমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। আমি বৃদ্ধ বুদ্ধি প্রায় লোপ প্রাপ্ত; কিন্তু একথা তোমাকে বলিতে পারি যে ওকালতীতে মন্দ উপায় অবলম্বন কখনই আবশ্যক হইতে পারে না। ওকালতী কর্ম্ম বিশেষ কঠিন বলিয়াই জ্ঞান করি। আমিও ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিন্তু আমার বোধ হয় না যে আমি কখন ওকালতী ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে পারি। ভাই এক্ষণে দেখিতে পাই সকলেই এই ব্যবসায় অবলম্বী হইবার চেষ্টা করে; কিন্তু ইহাতে আমাদের দেশের যুবকগণের মূর্খতা আরও পরিস্ফুট হয়। ওকালতী সকলের পক্ষে নহে ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যে আদালতী মোকদ্দমা হাঙ্গামা যাহাতে না হইয়া ক্রমশঃ বাণিজ্যের উন্নতি ও দেশের সুশ্রী সম্পাদন হয়। অকারণ অভিযোগের সংখ্যাই অধিক

দেখা যায়, কিন্তু তাহার জন্য উকীল সমাজের নিকট দায়ী। তুমি বোধ হয় বলিবে যে অভিযোগ অকারণ হইলেও যদি আমি প্রত্যাখ্যান করি তবে তখনই অন্য এক ব্যক্তি সেই অভিযোগ চালাইবে ও ব্যবসায়ে উন্নতি লাভের সুবিধা করিবে। কিন্তু ভাই একটী কথা বুঝিয়া দেখ, যে, যে ব্যবসায়ে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত নীতিজ্ঞানের আবশ্যক, সেই ব্যবসায়ে সুনীতির লেশমাত্রও রাখিতেছ না। আমি বোধ করি, যে কোন উপায়ে এই ব্যবসায় একেবারে বন্ধ করাই কোম্পানী বাহাদুরের উচিত। যাহাই হউক, আমরা বুড়া মানুষ আমাদের চুপ করিয়া থাকা ভাল।

আমি। দাদা মহাশয় আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কতক সত্য কিন্তু ঐ প্রকারে ওকালতী করিলে পশার জমে না। প্রথমতঃ যে কোন উপায়ে হউক, পশারটা একটু জম্‌কে নিয়ে, তার পর ধর্ম্মানুমত কায করা যাইতে পারে।

বৃদ্ধ। বাপু, তোমার মুখে ঐ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। বুঝিলাম, যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ সে কার্য্য তোমার উপযুক্ত নহে। সে কার্য্য মহৎ, তাহাতে মহৎ উদ্দেশ্য আবশ্যক, স্বার্থপরতার লেশমাত্র থাকিবে না। আমি অনেক সময় ভাবিয়া থাকি, যে শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু দেশের উন্নতি নাই কেন? দেখি যাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা আবশ্যক তাঁহারা নিতান্ত স্বার্থপর। তোমরা বোধ হয় মহৎ উদ্দেশ্যে ওকালতী আরম্ভ কর, কিন্তু সাধারণতঃ দারিদ্র্য প্রভাবে সে মহৎ উদ্দেশ্য লোপ হয়। সুতরাং বলি, যুবকদিগের পক্ষে এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করা উচিত।

আমি। ওকালতী ভিন্ন আমাদের আর অর্থোপায়ের গতি কি?

বৃদ্ধ। বাপু, সে কথাটা এতদিন জিজ্ঞাস্য ছিল। তোমার

চতুর্দ্দিকে যে কি হইতেছে, তাহা তোমরা কিছুই অবগত নহ। ইয়ুরোপীয় বণিক্‌গণ ভারতের সমস্ত দ্রব্য বিনা বিনিময়ে লইয়া যাইতেছে, তোমরা দৃষ্টিপাতও কর না। অর্থোপায় জন্য ওকালতী করা অতি গর্হিত কর্ম্ম।

আমি। তা বলা যায় না, ইহাতেই বা দোষ কি? সমগ্র ইয়ুরোপ-খণ্ডে এই প্রথা চলিতেছে।

বৃদ্ধ। সে কথা মিথ্যা; ইংরাজরাজ বা অন্য কোনও সমাজে আড্‌ভোকেট বা ভাকীল পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ফী এর জন্য দাবী করিতে পারেন না। আর অতদূরে যাইবার আবশ্যক কি? মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য পাঠ করিলে স্পষ্টই জানিতে পারিবে যে, তৎকালেও রাজা ও প্রাড্‌বিবাকের সমক্ষে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন জাতিই অভিযোগী বা আসামীর পক্ষে কথা কহিতে পারিত না, এবং কোনও ব্রাহ্মণ ঐ প্রকারে ওকালতী করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে, তাহাকে সামান্য অপরাধীর ন্যায় দণ্ডিত হইত। যাক্ পুরাণ কথায় কায কি? তোমা-দের ক্ষমতানুযায়ী কায করাই উচিত। যদি অর্থলোভী হইয়া থাক, তবে যে ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন হয় তাহাই কর। সভ্য সমাজের সমক্ষে নিজের মূর্খতা প্রতিপন্ন করা কি উচিত? চারি দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিয়া কি কর্ত্তব্য, কি কার্য্য তোমার উপযুক্ত বা কি কর্ম্মে তোমার অভিলাষিত বিষয় সিদ্ধি হইতে পারে, তাহাই কর।

আমি। তা ওকালতী না হয় ছাড়িলাম, করিব কি? ভদ্রঘরের সন্তানের উপযুক্ত অথচ অর্থোপায় হইবার সম্ভাবনা এমত কিছুই দেখিতে পাই না।

বৃদ্ধ। তবে শোন, আমাদের যুবকদের কত কায—দেশের উন্নতির জন্য কি করা আবশ্যক?

আমি। কি বলুন—

বৃদ্ধ। ভাই একটা কথা আজন্ম শুনেছ—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—যদি অর্থ প্রত্যাশা থাকে তবে বাণিজ্য কর। বাণিজ্যে অধিকার না থাকে, কৃষিকর্ম্মে মন দাও। আমাদের বাস্তবিক অবনতির কারণ,—এই দিকে দৃষ্টি না থাকা। রেলীব্রাদার্স, ইত্যাদী ইংরাজী হাউস ওয়ালাগণ কি প্রকার অর্থলাভ করিতেছে দেখিতে পাও; কিন্তু তুমি যে অতদূর পারিবে সে আশা আমি করি না, তবে সামান্য ভাবে যাহা পার তাহাই করা উচিত। বাণিজ্য দুই প্রকার—আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য। আভ্যন্তরিক বাণিজ্য অল্প পরিমাণ মূলধন সাপেক্ষ; বৈদেশিক বাণিজ্যে লাভ করিতে, তদপেক্ষা অধিক মূলধন আবশ্যক। আভ্যন্তবিক বাণিজ্যে কেবল মূর্খ ও নীচজাতীয় লোকেরা প্রতিপত্তি লাভ কবিতেছে—কিন্তু আভ্যন্তবিক বাণিজ্য যে নীচব্যক্তিব কার্য্য তাহা আমি স্বীকার করি না। এই সকল শিক্ষিত যুবক ক্রমশঃ এই পথে আসিলে, এই কার্য্যেব গৌবব যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে ও স্বদেশের উন্নতি লাভেব আশা থাকিবে। আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের বিষয় কিছু জানিলেই, ইহাতে সফল হইবার আশা ও সম্ভাবনা হইবে। তোমাদের স্বদেশবিষয়ে অজ্ঞতা তোমাদের অনিষ্টেব মূল। ইংবাজেরা যাহা না জানে, তাহা শিখিযা লয় ও তাহা হইতেই যথেষ্ট লাভ করে। তোমাদের দেশ হিতৈষীতা মুখেই আছে, কার্য্যে কিছুই দেখি না। ইংরাজ হাউসওয়ালা কত শ্রম স্বীকার করিয়া, কত দেশ, বিদেশ, অরণ্য, জঙ্গল মধ্যে যাইতেছে ও সর্ব্বত্রই তাহারা সফল হইতেছে, তাহারা মরুভূমিকে স্বর্ণভূমি করিতেছে। তোমরা ইচ্ছা করিলে এখনও ভারতের ইতিহাস পরিবর্ত্তন করিতে পার। তোমাদের যদি বাস্তবিক জ্ঞানোদয় হয়, তাহা হইলে কোন না কোন কালে আমাদের দেশের উন্নতি হইতে পারে।

দেশীয় বণিকেরা অতি সামান্য লোকের সাহায্যে ব্যবসায় চালাইয়া থাকে কিন্তু তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সাহাব্য পাইলে, তাহারা অধিক সাহসের সহিত বৈদেশিক বণিক্‌দিগের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিতে পারে। প্রথমতঃ, তোমাদের মহাজনী কর্ম্ম শিক্ষা করা উচিত। দেশীয় আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মোকামে রোকড়ে আড়দারী, ব্যাপারী এ সকল কর্ম্মই শিক্ষা করা আবশ্যক। কাহার কি কর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারিলে তোমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে এ সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। তোমাদের যে প্রকার বুদ্ধি আছে, তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ উদ্যম থাকিলে তোমরা পুনরায় ভারতকে সুফলা, শস্যশ্যামলা করিতে পারিবে। বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য কর উপকার হইবে।”

নববর্ষারম্ভে বৃদ্ধের ভর্ৎসনা লইয়া বাটী ফিরিলাম। মনে করিলাম, বৃদ্ধের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব, কিন্তু সে পরামর্শ একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। পাঠক, বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যে কথাগুলি নিতান্ত অসার নহে।

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

অতৃপ্ত বাসনা।

(১)

প্রথম যখন আমরা হুগলীতে আসি তখন আমার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর। আমি পিতার বৃদ্ধ বয়সের এক মাত্র পুত্র। আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহার জীবনের শেষ ভাগটা গঙ্গাতীরে অতিবাহিত

করিবার মানসে পাণ্ডুয়ার সন্নিকটস্থ আমাদের গ্রাম ত্যাগ করিয়া হুগলীতে আগমন করেন। সে সময়ে আমাদের পরিবারে পিতা, পিতার এক দূর সম্পর্কীয়া খুড়ী, আমার এক বিধবা পিসি ও তাঁহার এক পুত্র ও আমি। স্নেহময়ী মাতার ক্রোড়ে লালিত হওয়া আমার ভাগ্যে নাই। অতি শৈশবেই তিনি আমাদের ত্যাগ করিয়া পবিত্র ধামে চলিয়া যান, উক্ত পিসিমাতাই আমাকে লালন পালন করেন।

পিতা আমাকে ও দাদাকে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন ও বাটীতে পড়িবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। দাদা ও আমি এক শ্রেণীতেই পড়িতাম। আমরা প্রতিদিন নিয়মিত রূপে স্কুলে যাইতে লাগিলাম ও বাটীতে শিক্ষকের নিকট পড়িতে লাগিলাম। খেলিবার উপযুক্ত সঙ্গী ছিল না; সেই জন্যই বাবা সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোপালজেঠার সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিতেন। ইনি আমাদের বাটীতে বহুদিন ছিলেন বাবা তাহাকে গোপাল দাদা বলিতেন আমরাও গোপালজেঠা বলিতাম।

এই সময়ে রমাপ্রসাদ মিত্র নামে একজন সব্ জজ বীরভূম হইতে হুগলী বদলী হইয়া আমাদের পার্শ্বের বাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রমাপ্রসাদ বাবুর বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর। তিনি একজন আমোদপ্রিয় সচ্চরিত্র সদালাপী ব্যক্তি।

সব্ জজ বাবু যে দিবস হুগলীতে আসেন, সেই দিবসেই বাবার সহিত আলাপ করেন। এখন বাবা প্রায় প্রতি দিবসই তাঁহার বাসায় যাইতেন এবং জজ বাবুও সুবিধা পাইলেই আমাদের বাটীতে আসিতেন। আমিও এই সময় হইতে সময়ে সময়ে বাবার সহিত তাঁহাদের বাটীতে যাইতে লাগিলাম। জজ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র যামিনীর

সহিত আলাপ করাই আমার যাইবার উদ্দেশ্য। যামিনী আমা অপেক্ষা বোধ হয় দুই তিন বৎসরের ছোট; জজ বাবু উহাকে সেই সময়ে কোন বিদ্যালয়ে দেন নাই, বাটীতে শিক্ষকের দ্বারা পড়াইতেন; আমি যে সকল পুস্তক পড়িতাম, সেও প্রায় তাহাই পড়িত। জজ বাবুদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হইতে লাগিল।

(২)

এই সময়ে আমার পিতার খুড়ীর মৃত্যু হয়। যথা সময়ে তাহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে জজ বাবু তাঁহার কন্যা বীণাকে লইয়া আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আসিয়াছিলেন। বীণাকে আমি সেই প্রথম দেখি। বীণাব হাত ধবিয়া বাটীর ভিতর লইয়া আসিতে ছিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন "জজ বাবুর মেয়ে এসেচে হাত ধরে' ভিতর বাড়ীতে লইয়া যাও"। পাঠক জানিবেন আমার নাম সুরেন্দ্র নাথ। জজ বাবুর কন্যা অর্থাৎ যামিনীর ভগ্নী শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ সেই সুহাসিনী বালিকার সুকোমল হস্ত ধারণ কবিয়া পিসিমার নিকট লইয়া গেলাম, এবং বলিলাম "পিসিমা এটি জজ বাবুর মেয়ে বেশ করে আদর যত্ন করো"।

বালিকা অতিশয় লজ্জাশীলা ও সুশীলা। তাহার বয়স আট নয় বৎসব। পূর্ব্বের ন্যায় যামিনীদের বাসায় প্রায় প্রতিদিনই যাইতাম, সেও আমাদের বাটীতে আসিত। ক্রমশঃই আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইতে লাগিল, এখন আমরা উভয়ে উভয়কে না দেখিলে কাতর হইতাম। বীণা এখন আর আমাদের সহিত কথা কহিতে লজ্জা করে না বরং আমার সহিত খেলা করিতে ও আমার নিকট গল্প শুনিতে ভালবাসে।

এখন এক দিন উহাদের বাসায় যাইতে না পারিলে বীণা কারণ জিজ্ঞাসা করে ও দুঃখিত হয়। জজ বাবু এবং তাঁহার স্ত্রীও আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন ও যত্ন করিতেন।

(৩)

এই রূপে দুই বৎসর কাটিল; এই বৎসর আমরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিব। যামিনী এখন শুধু বাটীতে পড়ে না—হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও যামিনীদের বাটীতে যাই কিন্তু এখন যামিনীর জন্য যাই না—বীণার জন্য। যামিনীর সহিত হাসিয়া কথা কহি, খেলা করি কিন্তু শত চেষ্টাতেও পূর্ব্বের ন্যায় মনের ভাব দেখাইতে পারি না। কখন বীণার সহিত অনেক ক্ষণ ধরিয়া একত্রে বসিয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতে লজ্জা করে। জানিনা যামিনী ইহা বুঝিতে পারিত কিনা।

পরীক্ষার সবে মাত্র আর তিন মাস আছে। আমার চমক্ ভাঙ্গিল, টেষ্ট পরীক্ষার সন্তোষ জনক ফল হইল না। মনে বড় ভয় হইল। অধিক রাত্র জাগরণ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বৈকালে একবার বীণাদের বাটী যাইতাম; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া আসিতাম। একমাস, পনর দিন, দশ দিন, করিয়া ক্রমে পরীক্ষা নিকটে আসিল; যেরূপ লিখিলাম তাহাতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইব এইরূপ আশা হইল। মন কিছু খারাপ হইল; দাদা বেশ লিখিয়াছেন শুনিয়া আমি সুখী হইতে পারিলাম না।

এখন আমাকে আর স্কুলে যাইতে হয় না। যামিনী স্কুলে যায়, আমি এখন প্রায়ই সমস্ত দিন বীণাদের বাটীতে থাকি, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া প্রাণের কথা আমি বীণাকে বলিতাম, বীণা আমাকে বলিত। জীবনে যদি কখন সুখী হইয়া থাকি তবে এই সময়ে। একদিন

কথায় কথায় বীণাকে বলিয়াছিলাম "ভাই! তোমার বিয়ে হ'লে ত আর এমন্ করে কথা কইতে পার্বে না, তখন আমি কেমন করে থাক্ব।" তাহাতে বীণা উত্তর দিয়া ছিল "তোমার সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তবেই করব্ নতুবা কখনই বিয়ে করব না"। বালিকার বালিকা সুলভ কথা শুনিয়া তখন হাসিয়া ছিলাম। বীণা আরও বলিল "তোমার বিয়ে হ'লে কি আর আমায় ভাল বাস্বে ?" কথাটী যেন একটু নূতন নূতন ঠেকিল কোন উত্তর দিতে পরিলাম না ; চুপ্ করিয়া রহিলাম।

(৪)

জ্যৈষ্ঠ মাস। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এক দিন আমি, বীণা ও যামিনী আমাদের বাটির ছাদের উপর বসিয়া ভাগিরথীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছি, ও নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় ব্রজবাবু তাঁহাদের জানালা হইতে আমায় ডাকিলেন; আমি আলিসার নিকট হইতেই উত্তর দিলাম। ব্রজবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সুরেন্ আমাদের কি খাওয়াবে বল, তোমাদের পাসের খবর বেরিয়েচে।" আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না বলিলাম "কোন বিভাগে বলুন্।" ব্রজ বাবু বলিলেন আমি প্রথম বিভাগে ও দাদা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমাদের পাসের সংবাদে বাবা, পিসিমা, বীণা, যামিনী প্রভৃতি সকলেই আনন্দিত হইলেন। বলা বাহুল্য আশাতিরিক্ত ফললাভে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কিন্তু দাদা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া কিছু দুঃখিত হইলাম।

গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিল, আমি হুগলীকলেজে ভর্ত্তি

ছইলাম। জজ বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া বাবা দাদাকে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পাঠাইলেন।

নূতন উৎসাহে নূতন নূতন বিষয় সকল মনোযোগের সহিত শিখিতে লাগিলাম। আমি যামিনীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসি কিন্তু পূর্ব্বের ভাব আর আমাতে ছিল না। বীণা এখনও বালিকা, তবে এখন সে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। অপরের সাক্ষাতে আমার সহিত সে এখন সকল কথা কহিতে পারে না।

জল তরঙ্গের ন্যায় জীবনের আরও দুইটী বৎসর সুখে অতিবাহিত হইল। আমি দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইলাম। যামিনী এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করিল ২০৲ টাকা বৃত্তি ও কলেজ হইতে একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইল। আমাকে ডাক্তারি শিখাইবার সাধ বাবার অনেক দিন হইতেই ছিল। এণ্ট্রান্স পাস করিয়াই মেডিকেল্ কলেজে পড়িতে পাওয়া যাইত। কিন্তু একাকী কলিকাতায় থাকিতে পাছে আমার কোন কষ্ট হয় এই আশঙ্কায় বাবা সে সময় মত করেন নাই। এই-বার মামাদের বাসায় থাকিয়া মেডিকেল্ কলেজে পড়াই স্থির হইল।

(৫)

আগামী কল্য কলিকাতায় যাইতে হইবে। বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাড়ী ফিরিতে প্রায় রাত্রি ৯টা বাজিল। পড়িবার ঘরে যাইতেছি দেখিলাম জজ বাবু ও বাবা বৈটকখানায় বসিয়া আছেন। আমার পড়িবার ঘর ঠিক্ বৈঠক খানার পার্শ্বে, সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমি চেয়ারে বসিতে যাইতেছি জজ বাবুর মুখে আমার নাম শুনিয়া কৌতূহল বশতঃ কপাটের আড়াল হইতে শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম আমারই বিবাহের কথা হইতেছে।

বাবা বলিলেন "বীণার মত মেয়েকে পুত্র বধূ করিতে কা'র না সাধ? রমাপ্রসাদ বাবু! এর জন্ত আর অনুরোধ কি? আর আপনার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়াত সৌভাগ্যের কথা।"

জজ বাবু। আপনার পুত্র গুণবান্। বীণার অপেক্ষা অনেক সুন্দরী মেয়েব সহিত বিবাহ হইতে পারে; তবে সুরেনের সহিত বীণার যেরূপ ভালবাসা জন্মেছে তাতে ইহাদের বিবাহ হইলে বড়ই সুখের হইবে।

বাবা। অনেক দিন থেকেই বীণাব সঙ্গে সুবেনের বিবাহ হয় আমার ইচ্ছা। প্রায়ই মনে করি এক দিন আপনার কাছে এ বিষয়ের কথা তুলব; যা'হোক মহাশয়েরও যখন ইচ্ছা হয়েচে তখন ভালই হয়েচে।

আরও অনেক কথা শুনিলাম। আমাদের বিবাহ যে নিশ্চয়ই হইবে তাহা মনে স্থির জানিলাম। জজ বাবু চলিয়া গেলেন আমিও চেয়ারে বসিয়া শত শত সুখ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

আজ কলিকাতায় যাইব। মন বড খারাপ হইল। পাঁচ বৎসর হুগলীতে আছি এক দিনের তরেও অন্য কোথাও যাই নাই। কেমন করিয়া কলিকাতায় থাকিব? যে বীণাকে এক দিন না দেখিলে জগৎ আঁধার দেখি তাহাকে ছাড়িয়া কেমনে থাকিব?

আহারের পর বীণাদের বাসায় গেলাম; যামিনী তখন কলেজ গিয়াছে জজ বাবুও কাছারিতে। বীণা আমার জনাই অপেক্ষা করিতেছিল। কথা কহিতে আমার চক্ষে জল আসিতে লাগিল। আমাদের বিবাহের কথা যাহা আমি শুনিয়াছিলাম সব বলিলাম। বীণা অধিক কথা কহিল না, আমার কলিকাতার ঠিকানা লিখিয়া লইল। শীঘ্র আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিল, আর চক্ষের জলে আমার বক্ষঃ ভিজাইল।

সাড়ে তিনটা বাজিল, যামিনী কলেজ হইতে আসিল। আমি পাঁচটার ট্রেণে যাইব সুতরাং অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। যামিনীর সহিত অল্পক্ষণ কথা কহিয়াছি উহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি জল না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না। আসিবার সময় অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রণাম করিলাম। তিনি অঞ্চল দিয়া আমার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন "বাবা ছুটী হ'লেই বাড়ী এসো।"

(৬)

রাত্রি আন্দাজ ৮টার সময় চাঁপাতলায় মামাদের বাসায় পৌঁছিলাম। রাত্রে মাতুল মাতুলানী দিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আমার কষ্টের অনেক লাঘব হইল। রাত্রি বেশ কাটিল। গোপাল-জেঠা প্রাতেই চলিয়া গেল। ৫।৭ দিন ধরিয়া মামাত ভ্রাতা দিগের সহিত মিউজিয়ম্ ইডেন গার্ডেন ইত্যাদি দেখিয়া এক রকমে কাটিল। কিন্তু ক্রমেই আবার যে কষ্ট সেই কষ্টই আসিয়া জুটিল। সকলেই শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। জন কোলাহল পূর্ণ কলিকাতার পথের দিকে চাহিয়া থাকি; আমার সমস্তই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। সে সময়ে আমার কলেজের পড়া শুনা ছাড়া কাযের মধ্যে বীণাকে ও অপরাপর বন্ধু দিগকে পত্র লেখা।

এক দিন বৈকালে টাউনহলে একটা বড় মিটিং ছিল তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। বাটী আসিয়া দেখি আমার টেবিলের উপর দুই খানি পত্র রহিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার বশতঃ লেখা বেশ বুঝিতে পারিলাম না; বাহিরে আসিয়া দেখিলাম একখানি যামিনীর অপর খানি বীণার লেখা। উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাড়াতাড়ি দীপালোকে চিঠি দুই খানি পড়িলাম, ক্ষণেকের জন্য যেন আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল,

মাথা ঘুরিতে লাগিল, জগৎ অন্ধকারময় দেখিলাম। উভয় পত্রেরই মর্ম্ম জজ বাবু বাঁকিপুরে বদলী হইয়াছেন, বুধবারেই যাত্রা করিতে হইবে। পত্রপাঠ মাত্রেই হুগলীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। বীণা পত্রের একস্থানে লিখিয়াছে "সুরেন্! তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হচ্চে সত্য, কিন্তু আমার মনে হচ্চে আমরা যে দেশে যাচ্চি তোমার সঙ্গে বিবাহ ত দূরের কথা বোধ হয় এ জনমে আর দেখা হবে না। ভাই! মনের সাধ মনেই রহিল, বোধ হয় এ জনমে আর আশা মিটিল না, যদি পার তাহা হইলে চির দিনের মত তোমার বীণাকে একবার দেখা দিতে এসো।"

যে দিন চিঠি পাই সে দিন মঙ্গলবার। রাত্রেই হুগলী যাইব মনে করিলাম কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হইল না; আমারও মনের আশা মনেই রহিল।

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে বাবা বাটি যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। আমি উত্তরে লিখিলাম পরীক্ষা নিকট, এখন বাটী যাইলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। বাবা পত্র প্রাপ্তে আবার যাইতে লিখিলেন কিন্তু আমি যাইলাম না। শেষে গোপালজেঠা আসিয়া আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। বাস্তবিক হুগলীতে যাইতে আমার আর ইচ্ছা হইত না। বাটি গিয়া বুঝিলাম বাবা আমার প্রতি কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। পিসিমাও অনেক স্নেহের ভৎর্সনা করিলেন। আমি আহার করিতেছি পিসিমা কথায় কথায় আমার বিহাহের প্রস্তাব করিলেন। তখন জানিতে পারিলাম বীণার সহিত আমার বিবাহ হইবে না; আমাদের সমাজিক নিয়মানুসারে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। শুনিলাম তাহাদের সহিত আমাদের ঘর মেলে না; তাঁহারা এদেশীয় নয়। সেই কারণে গ্রামের স্বজাতীয় মহোদয়গণ বিবাহে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

পিসিমার কোন কথায় আমি উত্তর দিলাম না, বোধ উত্তর দিবার ক্ষমতাও ছিল না। আহারান্তে শয়ন গৃহে গমন করিলাম ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। সে রাত্রে যে আমার মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝান আমার ক্ষমতার বহির্ভূত।

পর দিন প্রাতে কলিকাতায় আসিলাম।

(৭)

দিনের পর দিন মাসের পর মাস গত হইতে লাগিল। অন্ততঃ মাসের মধ্যে একবার বাটি আসিতেই হইত; বাটি অপেক্ষা কলিকাতা ভাল লাগিত। বাটি গিয়া এক রাত্রের অধিক প্রায় থাকিতাম না।

কালী পূজার ছুটীতে পিতার অসুখের নিমিত্ত আমি স্বইচ্ছায় বাটী আসিলাম। বৃদ্ধ গোপালজেঠা আমার হাতে একখানি পত্র দিল। পাঁচমাস পরে দূরদেশ হইতে প্রাণের বীণা আমায় এই পত্র দিয়াছে; আমি যেন কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে এইরূপ লিখিয়াছে "সুরেন্ অনেক দিন পরে আজ তোমায় আমি চিঠি লিখ্‌চি অবশ্যই তুমি শুনে থাক্‌বে জেঠামশাই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিবেন না। বাবা এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই এই খানে এক বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিবার স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও আমি আমার বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা যে কোন প্রকারে হউক পালন করিব।·········বোধ হয় এই আমার শেষ।

তোমারই বীণা"

বালিকা বীণার জন্য অনেক ভাবিলাম; এই বালিকা বয়সে বিবাহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য না জানি সেই অবোধ বালিকাকে কত নির্যাতনই ভোগ করিতে হইবে।

বাবার সামান্য জ্বর হইয়া ছিল শীঘ্রই আরোগ্য হইলেন। আমার এক দিন কলেজ কামাই হইল, আমি কলিকাতায় আসিলাম।

(৮)

কলিকাতায় এইরূপে আমার তিনটী বৎসর কাটিল। এখন বাবাও সময়ে সময়ে বিবাহের কথা তোলেন; আমার একই উত্তর এখন বিবাহ করিব না।

কিছুদিন পরে হঠাৎ গোপালজেঠা, মধ্যম মাতুল ও তাঁহার পুত্র আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "গোপালজেঠা হঠাৎ এখানে?"

গোপালজেঠার কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাতুল মহাশয় বলিলেন "তোমায় এখনি হুগলী যেতে হ'বে, বিশেষ প্রয়োজন আছে আমিও যাব।"

মনের ভাব মুখেই অনেকটা প্রকাশ পায়। আমি মামার কথায় ভুলিলাম না; বলিলাম, "আমায় শীঘ্র বলুন কি প্রয়োজন? আপনাদের কথা শুনিয়া আমার কোন বিশেষ বিপদাশঙ্কা হচ্চে।"

গোপাল। না এমন কিছুই নয়। বাবুর জ্বর হ'য়েচে তাই তোমায় দেখ্‌তে চাচ্চেন।

আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। তখনই যাত্রা করিলাম। বাটি পৌঁছিতে ৯টা বাজিল। বাটীর সম্মুখেই দেখিলাম প্রসাদ ডাক্তারের গাড়ী। তাড়াতাড়ি বাটির ভিতর গেলাম পিসিমা আমাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাবার ঘরে গিয়া দেখি যাহা ভাবিয়াছি তাহাই হইয়াছে—বাবার শয্যাপার্শ্বে ডাক্তার বাবু ও দুই তিনটি ভদ্র লোক বসিয়া আছেন। আমি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলাম। বোধ হয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রের ক্রন্দনে ক্ষণকালের জন্য পিতার

চৈতন্য হইল। কি বলিতে যাইতেছিলেন, পারিলেন না—ভাবে বুঝিলাম নিকটে যাইতে কহিতেছেন। আমি নিকটে যাইলে অনেক কষ্টে তিনি হাত তুলিয়া আমার মস্তকে দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না।

ডাক্তারের পরামর্শে গোপালজেঠা ও মামা, প্রতিবেশীদের সাহায্যে বাবাকে তীরস্থ করিলেন। বেলা আন্দাজ ১টার সময় সব ফুরাইল। জীবনের এক মাত্র অবলম্বন চিরদিনের জন্য হারাইলাম। আমার আঁধার জীবন আরও আঁধারে আচ্ছন্ন হইল।

(৯)

মাতুল মহাশয়দিগের ও প্রতিবেশীদিগের সাহায্যে যথা সময়ে শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। মাতুল মহাশয়দিগের বিশেষ অনুরোধে প্রায় এক পক্ষ কলিকাতায় থাকিয়া বাটি আসিলাম। দাদাকে বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া বাটি আসিতে পত্র লিখিলাম; দাদা আসিলেন।

সব শেষ হইয়াছে। আর কেন? কিসের আশায় সংসারে থাকিব? দাদার হাতে ধরিয়া যাহাতে আর শিবপুর না যান তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম; আমাদের সংসারে থাকিয়া সকল বিষয় তত্ত্বাবধারণ করিতে কহিলাম। বৃদ্ধ গোপালজেঠাকেও তাহাই কহিলাম। কাহারও নিষেধ না মানিয়া "শীঘ্র ফিরিব" এই বলিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

প্রথমেই বৈদ্যনাথে তৎপরে বৃন্দাবন, দিল্লী, আগরা, লাহোর, ইত্যাদি অনেক রমণীয় স্থানে কোথাও দশ দিন কোথাও পনর দিন কোথাও বা এক মাস কাটাইলাম। এইরূপে প্রায় তিন বৎসর নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কানপুরে আসিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটিরেই

আমার উপযুক্ত বাসস্থান বিবেচনা করিয়াই তাঁহার অবস্থানই স্থির করিলাম।

শোক তাপ বিরহ ইত্যাদি উপশমের নিমিত্ত সময়ই একমাত্র ঔষধ। কালে পিতৃবিয়োগ জনিত শোকেরও অনেক হ্রাস হইল। ব্রাহ্মণের পুত্র কন্যা কেহ ছিল না—আমাকে বিশেষ যত্ন করিত। আমিও তাহার সংসারের সকল ব্যয় ভার বহন করিতাম। এমন নিৰ্জ্জন স্থানই আমার অধিক ভাল লাগিত। দিবসের অর্দ্ধেক অংশ পাহাড়ে পাহাড়েই বেড়াইতাম; অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজন হইলে রোগী দেখিতে যাইতাম; কাহারও নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিতাম না।

প্রায় এক বৎসর পরে আমার চিকিৎসায় বেশ পসার হইল, এমন দূরেও অনেক ভদ্রলোকের বাটীতে যাইতে হইত।

(১০)

তিন বৎসর পরে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। তাহার যাহা কিছু সামান্য অর্থ ছিল; তাহাতে আমি আর কিছু দিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলাম। আমি সেই কুটীর মধ্যেই বাস করিতে ছিলাম; কিন্তু কতকগুলি স্থানীয় ভদ্রলোকের অনুরোধে সহরের ভিতর একজন ভদ্র লোকের বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে আরও চারি বৎসর কাটিয়া গেল। এখন আমি সহরের মধ্যে প্রধান ডাক্তার বলিয়া পরিচিত। অনেক ধনী লোকের সহিত আমার আলাপ। নিঃস্বার্থ হইয়া চিকিৎসা করাই আমার প্রধান ব্রত ও আনন্দ।

শ্রাবণ মাস। সমস্ত দিন অবিরল বৃষ্টি হইতেছে। বেলা ৫টা বাজিয়াছে, মনে হইতেছে যেন সন্ধ্যা হইয়াছে। ঐ সময়ে আমাদের বাটির দরজায় একখানি গাড়ি থামিল। দরোয়ান আসিয়া আমাকে

সংবাদ দিল "বসন্তপুর হইতে একজন বাবু আসিয়াছেন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, আসিতে কহিলাম। তিনি আসিলে তাঁহাকে সাদরে বসাইলাম। তিনি আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া কহিলেন "আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া এখনই একবার যাইতে হইবে।" আমি পত্র পাঠে অবগত হইলাম বসন্তপুর হইতে ডাক্তার অক্ষয় কুমার দত্ত লিখিতেছেন তথাকার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের বাটীতে একটী জ্বর অতিসারের রোগী আছে তাহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে; অতএব আমাকে শীঘ্র যাইতে হইবে।

আমি বিলম্ব না করিয়া বাবুটীর সহিত গমন করিলাম। এক বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে গাড়ী থামিল। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে হঠাৎ আমার হৃদয় কম্পিত হইল। ভয়ে ও বিস্ময়ে শ্রীহরি নাম স্মরণ করিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলাম।

শুনিলাম আমি যাহাকে দেখিতে আসিয়াছি তিনি স্ত্রীলোক। প্রায় দুই মাস ধরিয়া জ্বর অতিসার রোগে ভুগিতেছেন। যখন রোগীর নিকট আমায় লইয়া গেল, তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। রোগীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিলাম। আমি নাড়ী দেখিবার জন্য হস্ত বাহির করিতে বলিতেছি—দেখিলাম রোগীর সমস্ত অঙ্গ দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছে; রোগী মূর্চ্ছিত হইল। গাত্রের আবরণ খুলিয়া দিতে বলিলাম ও বাতাস করিতে বলিলাম। যোগেশ বাবু ও বাটীর সকলেই বড়ই চিন্তিত হইলেন। আমি সাহস দিয়া বলিলাম কোন ভয় নাই এখনই আরোগ্য হইবেন। বৃদ্ধ যোগেশ বাবু মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার বিনদা, বিনদা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে মূর্চ্ছা ভাল হইল—একবার চাহিয়া দেখিল।

মুখ দেখিয়া মনে হইল এ মুখ পরিচিত, যেন কোথা দেখিয়াছি; কিন্তু কবে দেখিয়াছি মনে হইল না। অল্পক্ষণ পরেই রোগী সুস্থ হইল। দেখিলাম জ্বর অতি সামান্য আছে। বাম হস্ত দেখিয়া নাড়ীর অবস্থা ভাল মনে হইল না, দক্ষিণ হস্ত দেখিতে যাইতেছি, দেখিলাম হস্তের মণিবন্ধে কি একটী লেখা আছে। একটু মনোযোগের সহিত দেখিলাম একটী ইংরাজী "S" অক্ষর। অকস্মাৎ যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। নাড়ী দেখিতে ভুলিয়া গিয়া সপ্তদশ বৎসরের পুরাতন স্মৃতি মনে আসিল, সমস্ত অঙ্গে যেন তাড়িৎ প্রবাহ ছুটিল; বীণার মুখ পানে চাহিয়া দেখিলাম আপাঙ্গে অশ্রু। আমাকে বলিল এখনও চিনিতে পারিলে না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে উত্তর দিলাম "বীণা! চিনেছি! চিনেছি!" বীণা আমাকে কাঁদিতে নিরব করিয়া বলিল "আজ আমি অনেক ভাল আছি।" আমি বলিলাম "এখন তোমার জ্বর অল্পই আছে ভয় কিছুই নাই শীঘ্রই ভাল হ'বে।"

বীণা। সে আশা আর নাই তোমাকে আর একবার দেখ্‌ব বলে' এখনও মরিনি।

সেই ঘরে যাহারা ছিলেন সকলই আমাদের কথোপকথন শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

বীণা যোগেশ বাবুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন "বাবা! ইনিই আমার স্বামী।"

আমি অনেক কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তাঁহার গৃহ চিকিৎসক অক্ষয় বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম।

ঔষধ আনিলে আমি স্বহস্তে এক দাগ খাওয়াইলাম। অদ্য আর বাটী যাইলাম না। রায় মহাশয়দের বাটীতেই রহিলাম এবং যথা নিয়মে নিজেই ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলাম। পরদিন পুনরায় জ্বর হইল। রোগীর

অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল। বৈকালে যখন ঔষধ দিতে যাই তখন বীণার নিকট কেহই ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বীণা এখন কেমন আছ?" বীণা ক্ষীণ স্বরে কহিল "এখন কোন যন্ত্রণা নাই বেশ ভাল আছি।"

আমি ঔষধ দিতে যাইতেছি বীণা কহিল "আর কেন আমায় কি বাঁচাতে পার্‌বে?" আমায় কাঁদিতে দেখিয়া কহিল, "সুরেন্‌! আর কেঁদোনা আমার এই শেষ সময়। তোমায় দেখে আমার সব সাধ মিটিল। বাহিরে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু আমার অন্তরে এক দিনের জন্য তুমি ভিন্ন কেহ স্থান পায় নাই। তুমিই আমার গুরু, তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব স্বামী।" আমার কোন কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। বীণা জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এখানে কবে এলে?" আমি অতি সংক্ষেপে আমার গত ঘটনা সকল বর্ণনা করিলাম। বীণার চক্ষের জলে উপাধান ভিজিল। আমি আমার বস্ত্রের দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া দিলাম।

বীণা। আমার কথা কহিতে বড় কষ্ট হচ্চে। ইচ্ছা ছিল এ হতভাগিনীর আজন্ম দুঃখ কাহিনীও তোমায় শুনাব—আরও অনেক কথা বল্‌ব কিন্তু আর বলা হ'ল না। আমার শেষ অনুরোধ তুমি বিবাহ করিয়া সংসারী হও।

আমি। বীণা! তোমার সব অনুরোধ রাখিতে পারি, কিন্তু এইটী পারিব না আমায় ক্ষমা কর। বীণা আরও কি বলিতেছিল এমন সময়ে ঘরে লোক আসিল আর বলা হইল না।

তখন আমার মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা প্রকাশ করিবার শব্দ বোধ হয় ভাষায় নাই, সন্ধ্যার পর পুনরায় জ্বর আসিল। রাত্রে লক্ষণ সকল ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। বৃদ্ধ যোগেশ বাবু কাতর স্বরে

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কেমন দেখিলেন ?" আমি বলিলাম "এই জ্বর ছাড়িবার সময় বিশেষ আশঙ্কা আছে।" বৃদ্ধ আর স্থির থাকিতে পারিল না কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্থির হইতে বলিলাম। বৃদ্ধ বলিলেন "একটা পাখী পুষিলে সেটা মরে গেলে কত কষ্ট হয়, আর বিনদা ১৪।১৫ বৎসর আমার বাড়িতে আমার মেয়ের মত আছে, তার মৃত্যু আমি কেমন করে' স্বচক্ষে দেখ্‌ব ?"

রাত্রি দুইটার পর হইতে জ্বর কমিতে আরম্ভ করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই দেহ এক বারে শীতল হইল। হস্ত পদে অগ্নির উত্তাপ দিতে কহিলাম। ঔষধ দিলাম উদরস্থ হইল না, দুগ্ধ দিলাম গিলিতে পরিল না। আমার সকল যত্ন সকল চেষ্টা বিফল হইল। অনেক বার বীণা! বীণা বলিয়া ডাকিলাম কিন্তু কোন উত্তর নাই। নিশ্চল, নিস্পন্দ। সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া বাহিরে আনিল। সেই গভীর মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল, বীণা জন্মের মত চলিয়া গেল।

শ্রীহরিহর শেঠ। চন্দননগর।

গ্রাজুয়েটের খেদ।

সরস্বতি,

"তুমি যা দিয়েছ বিদ্যে ফিরে কেন নাওনা,
(আমার) 'কাগজ কলমের কড়ি ফিরাইয়া দাওনা।'"
রাত জেগে পেটে খেটে, বাত্ যে ধরেছে গেঁটে
গেঁটের পয়সা নিয়ে,(এখন্)কথাটী যে কওনা!

ডিস্কাউন্ট্ কেটে নাও,　　বাদ বাকী ফিরে দাও,
ঝক্মারির জরিমানা কেটে নয় নাওনা।
মনোগত কথা ছাই,　　বলে ফেল বুঝে যাই,
পাইলে পরের কড়ি দিতে বুঝি চাওনা ?
তবে এক কায কর,　　আমার বচন ধর,
সমাজের চোকে কেন ধূলো-ছানি দাওনা।
নোবিলিটি অভিমান,　　কেটে কর খান খান,
ঘরে না থাকিলে নুণ দোকানেতে যাওনা ;
এটিকেট্ একতায,　　সভ্যতার একেতায়,
দেশখানা ছারখার দেখিতে কি পাওনা ?
চেলেছ সাবাস্ চাল,　　গিয়েছে সে মোটা চাল,
সকচালে সকচাল, (এখন) চাল তুলে দাওনা !
তোমার চাপরাস্ খান,　　ভেঙ্গে করি খান্ খান্,
এই বেলা মানে মানে খুলে কেন নাওনা,
সমাজের চোপে থুই,　　মাজি, ঘসি, কত ধুই,
তবু পোড়া ধরে কই দেখিতে কি পাওনা ?
মরি কি কদর তার !　　কালে কস্কে পাওয়া ভার,
(চারে) তামাক্-সাজা-সার্টিফিকেট্—বুঝে কেন নাওনা !
ধোঁকায় বোকার সাজে,　　এতদিন বাজে কাযে,
খাটায়ে নিয়েছ বেশ,—ছুটি কভু দাওনা,
আর নয় নাকে খৎ,　　দেখি মাগো অন্যপথ,
প্রাণ খুলে কেঁদে বাঁচি—ছেড়ে কেন দাওনা,
ফেরে দেখি হাসে হাল্,　　উমেদার পালে পাল,
চাকুরি ওথুরি তবে ; (বলে) "য়্যাপ্রেন্টিসও নাওনা।"
কাগজ, কলম, কালি,　　কিনে হ'ল হাড় কালি,
সমাজের গালে পোড়া—চুণ কালি দাওনা
'লেখা পড়া করে যেই,　　গাড়ী, ঘোড়া চড়ে সেই,'

এখন সেদিন নেই দেখিতে কি পাওনা ?

সেদিন গিয়েছে উঠে, সুখী যে মজুর মুটে,

গোবর হাসে পোড়ে ঘুঁটে, দেখে কেন যাওনা

দিন যায়, দিন আনে, রোগ শোক নাহি জানে,

একদিনে পায়ে হেঁটে—বিশ কোশ রওনা,

তোমার প্রসাদ যারে, যত রোগ ধরে তা'রে,

শুনি সদা তা'রি ঘরে,—"মিকশ্চার খাওনা"

নেমা ফিরে বিদ্যে তোর, দেমা ফিরে কড়ি মোর,

হাঁড়ির দোকান করি ;—কথাটি যে কওনা

সেও ভাল খাই কাঁজি, ফেলে দিই পুঁথি পাঁজি,

না হয় সাধের সাজি আজি কেন নাওনা !

শ্রীতারকনাথ সরকার।

শ্রীরামপুর।

শ্রীভাগবত ধর্ম্মঃ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে মানবচিত্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তদ্ব্যতীত অনেক কথাই লিখিবার রহিয়াছে এবং পাঠক মহোদয়দিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব, কিন্তু চিত্তের সহিত আত্মার ঘন সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্তই প্রসঙ্গাধীন আত্মতত্ত্ব ও বলিতে হইতেছে। যথা—

সূর্য্য যেমন নির্ম্মল জলে প্রতিবিম্বিত হন—আত্মা বা পুরুষও তেমনি স্বসন্নিধিস্থ চিত্তসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হন। সূর্য্য প্রতিবিম্বিত জলাংশ যেমন অবিবেকীর দৃষ্টিতে সূর্য্যাকারে দৃষ্ট হয়, সূর্য্য পরিমিত বলিয়া বোধ হয়, পুরুষপ্রতিবিম্বিত চিত্তসত্ত্বও তেমনি, আত্মার মুগ্ধা-

বস্তাতে চেতন বলিয়া দৃষ্ট বা গ্রাহ্য হন। চিত্তের চৈতন্যাকার হওয়া অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত হওয়া, আর আত্মার চিত্তকে জানা তুল্য কথা।

নির্ম্মল জলে সূর্য্য যে প্রকার উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হন, অপরিষ্কার জলে সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হন না, সুতরাং তাদৃশ জল ও বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না। সেইরূপ রজস্তমঃ মলের দ্বারা চিত্ত অস্বচ্ছ হইলে আত্মা বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে ঐ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না, সুতরাং সেই অস্বচ্ছ চিত্ত ও সম্পূর্ণরূপে বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না। কিন্তু মানবচিত্ত রজঃ ও তমোগুণের উপদ্রব শূন্য হইলে সমস্ত বস্তুই প্রকাশ করিতে পারে।

দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ যদি দৃশ্যে অর্থাৎ চিত্তসত্বে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত বা প্রতিচ্ছায়ীকৃত হন, তাহা হইলে, তাদৃশ নির্ম্মল চিত্ত তখন সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে, ইহা যোগী দিগের যুক্তি সিদ্ধ। ভাবার্থ এই যে, অয়স্কান্ত সন্নিধিস্থ লৌহে যেমন নিসর্গ-নশতঃ ক্রিয়াশক্তি আবির্ভূত হয়, রজঃ ও তমোগুণের উপদ্রব শূন্য চিত্তসত্বে ও তেমনি চৈতন্য সন্নিধান বশতঃ পরিপূর্ণ প্রকাশ ক্রিয়া আবির্ভূত হয়।

ঋষিরা কোন ব্যক্তিকে দর্শন মাত্রেই, বিনা জিজ্ঞাসায় তাহার নাম ও মনোগত ভাব যে জানিতে পারেন, এই নির্ম্মল চিত্তই তাহার কারণ। ফটোগ্রাফ যন্ত্রে লেন্স (মুকুর) দ্বারা যেমন কোন বাহ্য বস্তুর রূপ ক্যামেরার অভ্যন্তরস্থ সংস্কৃত কাচে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আগন্তুক ব্যক্তির রূপ চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা ঋষির চিত্ত সত্বে প্রতি-বিম্বিত হয় এবং তৎকালে ঐ ব্যক্তির চিত্তে যে ভাবগুলি উদিত থাকে, সেই মনোগত ভাবগুলি ও ঋষির চিত্তে প্রতিভাত হয়, সুতরাং ঋষি

দর্শন মাত্রেই সমস্ত জানিতে পারেন। আমাদেরও সেই চিত্ত আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে বিনা জিজ্ঞাসায় কাহারও মনোগত ভাব জানিতে পারি না। ইহার সমাধান এই যে "যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা" অর্থাৎ জলের পরা প্রকৃতি স্বভাবতঃই নির্ম্মল, প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ। কিন্তু শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসে ঐ জল মৃত্তিকার সংসর্গে অস্বচ্ছ (ঘোলা) হইয়া থাকে, সুতরাং তাদৃশ জল যেমন কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না সেইরূপ আমাদের চিত্ত স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও অনবরতঃ জড়বিষয় চিন্তারূপ মৃত্তিকার সংসর্গে অস্বচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং কাহারও মনোগত ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় না। আমরাও যদ্যপি আমাদিগের চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারি, তবে আমরাও ঋষিদিগের ন্যায় বিনা জিজ্ঞাসায় সমস্ত অবগত হইতে পারিব। যদি বলেন যে চিত্ত নির্ম্মলের উপায় কি? উত্তর—"যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা" অর্থাৎ জলকে যে প্রকারে নির্ম্মল করিতে হয়, এই চিত্তও সেই উপায় অবলম্বনে নির্ম্মল হইয়া থাকে। যথা—একটি পাত্রে খানিকটা ঘোলা জল রাখিয়া দাও, কিন্তু সাবধান। ঐ জল আন্দোলিত না হয়। অর্থাৎ যে মৃত্তিকার সংসর্গে ঐ জল ঘোলা হইয়াছে অথবা ঐ জলের মধ্যে যে মৃত্তিকাগুলি রহিয়াছে, সেই মৃত্তিকাগুলির সহিত জল আন্দোলিত হইলে, কোন কালে ঐ জল নির্ম্মল হইবে না। অতএব জল কিছু কাল স্থির থাকিলেই, জলস্থ মৃত্তিকাগুলি ক্রমশঃ ঝরিয়া ঝরিয়া তলস্থ হইবে এবং জলও পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল ও প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইবে। সেইরূপ যে যে জড়বিষয়গুলি অনবরতঃ চিন্তা করিয়া আমাদের চিত্ত অস্বচ্ছ হইয়াছে, সাবধান! আর যেন সেই বিষয়গুলির চিন্তা না করা হয়। কিছু কাল দুর্ব্বিষয়রূপ সাংসারিক চিন্তা হইতে নিরস্ত থাকিতে পারিলে চিত্তের মলস্বরূপ বিষয়কামনা, সম্ভোগলালসা, ধন, মান, যশ,

লোভ, পুত্র, কলত্র, নিকেতন প্রভৃতির কামনাগুলি ক্রমশঃ ঝরিয়া যাইয়া চিত্ত ও ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে থাকিবে।

যদি বলেন এ প্রকার হইতেই পারে না, কেন না, বিষয় গ্রহণ করাই চিত্তের স্বভাবতঃ ধর্ম্ম। বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইলে, চিত্তের লয় হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব বিষয়গ্রহণ হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হইতে আদৌ পারে না। যদি ইহাই সত্য হয় তবে এরূপ কোন বিষয় চিন্তা করা হউক, যে বিষয় জড়ের অতীত!! কেন না জড় চিন্তায় চিত্তশুদ্ধির আশা নাই। যদি বলেন যে, জড়ের অতীত এরূপ কি বিষয় হইতে পারে? উত্তর—পরমার্থ তত্ত্বস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরই জড়বর্গের অতীত!! অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ঈশ্বরে সর্ব্বদা চিত্ত অর্পিত থাকিলে, অর্থাৎ সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে সাধিত হইলে, জীবের চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হয়। এই জন্য শাস্ত্রে উপদেশ আছে যথা "সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবঃ।"

শ্রীভগবানই জগৎ সংসারের পতি (প্রভু)। প্রভুর আজ্ঞাপালন রূপ সংসারিক কার্য্য দ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতি সাধনই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রোক্ত উপদেশ যথা প্রাতঃকৃত্য :—

> त्रैलक्यचैतन्यमयादिदेव, श्रीनाथविष्णोभवताज्ञयैव।
> प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं, संसारयात्रा मनुवर्त्तयिष्ये॥
> जानामि धर्म्मं नचमे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्म्मं नचमे निवृत्ति।
> त्वया हृषिकेश हृदिस्थितेन, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि॥

অস্যার্থঃ—

হে ত্রিলোকের চৈতন্যময়! হে আদি দেব! হে লক্ষ্মীনাথ! হে বিষ্ণু! প্রভু! আপনারই আজ্ঞায় প্রাতঃকালে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, এবং আপনারই প্রীতি সাধন জন্য এই সাংসারিক কার্য্যের

অনুগমন করিতেছি। দয়াময়! আমি স্বয়ং কিছুই করিতেছি না, আপনি যাহা করাইতেছেন আমি তাহাই করিতেছি। কেন না, সৎকর্ম্ম জানিয়াও সেই সাধুকৃত্য সকলে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না, এবং অধর্ম্ম অর্থাৎ আমার কর্ত্তব্য নহে, অথবা এই কার্য্য অত্যন্ত ঘৃণিত ইহা বুঝিতে পারিয়াও সেই পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। সুতরাং হে হৃষিকেশ! (হৃষিকানাং অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ক জ্ঞানানাং ঈশঃ প্রবর্ত্তক), ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞানের নেতা! আপনি আমার হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া যে কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছেন আমি অবশে সেই কার্য্য সম্পাদন করিতেছি।

এই প্রকারে সর্ব্বদা ঈশ্বরে আনুগত্য করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতি সাধন উদ্দেশে সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইলে জীবের ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, এবং ঐ নির্ম্মল চিত্তে ক্রমশঃ আনন্দময় শ্রীভগবানকে অনুভব করিতে করিতে, তদীয় লীলামৃত কথা আস্বাদনে, শ্রবণে, এবং পরম শ্রেষ্ঠের সুধাময় নাম কীর্ত্তনে রুচি জন্মায়। সুতরাং যে পরিমাণে শ্রীভগবচ্চরণে জীবের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, ঠিক সেই পরিমিত সাংসারিক হেয় বিষয়ে জীবের অনাশক্তি হইয়া থাকে যথা চারি আনা রকম আশক্তি ভগবানে হইলে, ঠিক চারি আনা বৈরাগ্য সাংসারিক বিষয়ে হইবে অর্থাৎ বার আনা আশক্তি সংসারে থাকিবে। এইরূপে বার আনা রকম আশক্তি ভগবানে হইলে, বার আনা বৈরাগ্য সংসারের প্রতি হইবে অর্থাৎ চারি আনা প্রবৃত্তি সংসারে থাকিবে। ক্রমে শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে ভক্তিযোগ সাধনের পরিপাকে ১৬ আনা রকম আশক্তি ভগবানে জন্মিলে অনিত্য সাংসারিক বিষয়েও পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই পূর্ণ বৈরাগ্য আর চিত্তশুদ্ধি একই কথা। কেন না "অহং," "মম"

এই অভিমান হইতে উত্থিত হইতেছে যে চিত্তের বিষয় কামনারূপ যাবতীয় মল ঐ সকল মল যখন মানব চিত্ত হইতে ঝরিয়া ঝরিয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়, তখন আর কোন প্রকার ঐহিক কি পারলৌকিক সুখ-সম্ভোগ রূপ বিষয় কামনা থাকে না, সুতরাং মানবচিত্তের এই বিশুদ্ধ অবস্থাকে সর্ব্বত্র ভোগ বিরতি রূপ পূর্ণ বৈরাগ্য অথবা সন্ন্যাস বলা যায়। জীব ভক্তিযোগ সাধনের পরিপাকে এই অবস্থাকে প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে আর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় না, কেননা কর্ম্ম সকলই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, অতএব এই অবস্থার আর একটী নাম নৈষ্কর্ম্ম লাভ।　　ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তলাল মিত্র।
শ্রীবৃন্দাবন।

আর্শি।

মনুষ্যের স্বভাব এমনই সামঞ্জস্য রহিত যে, যাহা আমি নিজে বলি বা করি, অপরে আমাকে যদি ঠিক সেই কথা বলে বা সেই কার্য্যে সহায়তা করে তবেই আমি একেবারে চটিয়া যাই, যথা, আমরা সকলেই কত শত বার বলি "আমি কি বোকা" কিন্তু আর কেহ যদি আমাকে বলে "তুমি কি বোকা," তাহা হইলে হয় কোপানলে মদনবৎ সে তৎক্ষণাৎ আমার নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হউক আর নাই হউক, মনে মনে যে আমি তাহার মুখাগ্নির বন্দোবস্ত করিব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর একটি উদাহরণ দিই—আর্শি। আর্শি বা আয়নাতে সকলেই মুখ দেখে, এবং সকলেই কখনও কখনও নানাবিধ মুখভঙ্গি করিয়া নিজেকে কিরূপ দেখিতে হয় তাহাই দেখিয়া থাকে।

"There was never yet fair woman, but she made mouths in a glass" (Lear) কিন্তু যদি অপর কোনও সময়ে, অথবা সেই সময়ে, ঐ ব্যক্তির ঐরূপ মুখভঙ্গি দেখিয়া ডারউইনের মতাবলম্বী কোনও অর্ব্বাচীন, মানুষ যে বানর হইতে সমুদ্ভূত তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার সম্মুখে একখানি দর্পণ ধারণ করে, বল দেখি সেই ব্যক্তি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া যায় কি না? নিজের বিকৃতমুখ নিজে দেখিয়া মানুষ চটে না কেন তাহার কারণ আমি দৈবযোগে একদিন এক সন্ন্যাসীর নিকট অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছি। আমার এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহাজ্ঞান বিনা মূল্যেত সকলকে প্রদান করিবই, অধিকন্তু চিরপ্রথা অনুসারে ন্যায্য প্রাপ্য সবেমাত্র তিন টাকা ডাক মাশুলও লইব না। আমার এই অসাধারণ স্বার্থ ত্যাগের কথা *আমার কোনও বন্ধু যেন আবার খবরের কাগজে প্রকাশ করিয়া না* দেন। শুনা যায় বন্ধুরা সময়ে সময়ে এরূপ অনেক বেয়াদবি করিয়া থাকেন, আমি দুএকখানি পুস্তকের ভূমিকায় দেখিয়াছি "কেবল কয়েকজন বন্ধুদের অনুরোধে এই পুস্তক ছাপাইতে বাধ্য হইলাম;" আবার এমনও শুনা গিয়াছে কোন কোন ধনবান্ লোক কোনও একটা সৎকার্য্যে কিছু দান করিয়া সমস্ত বন্ধুদিগকে ডাকিয়া বার বার তাঁহার সেই বদান্যতার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেও তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ না কেহ প্রকাশ করিবেই করিবে। কিন্তু এই দুষ্কার্য্যের জন্য দাতা ও তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে মনোমালিন্য হইবার কথা শোনা যায় নাই, বরং সদ্ভাব বৃদ্ধি হইতেই দেখা গিয়াছে।

সন্ন্যাসী বলিলেন "ঈশ্বর একদিন অতি মনোযোগের সহিত শত শত সুন্দর জীব সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়া যাইবার পর, তাড়াতাড়ি

যা'হোক্ তা'হোক্ করিয়া একটি জীব সৃষ্টি করিয়া সেদিনকার মত বিশ্রাম লাভ করিলেন। অবশ্য সে জীবটী তত সুন্দর হইল না, বরং অতি কুৎসিতই হইল। এখন, ঈশ্বরের ঘর বুঝিতেই পারিতেছ, খুব ভালরূপে সজ্জিতই ছিল, অন্যান্য আস্‌বাবের সহিত, দুই ধারের দেওয়ালে দুইখানি প্রকাণ্ড দর্পণও ছিল। দৈবক্রমে ঐ নূতন সৃষ্ট কুৎসিত জীবটি যেখানে তখন পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, ঐ দর্পণদ্বয়ের একখানি তাহার সম্মুখেই ছিল, সে ঐ আর্শিতে আপনার কুৎসিত চেহারা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল (সেই হইতে অদ্যাবধি শিশু ভূমিষ্ঠ হইযাই ক্রন্দন করে, সে যে কুৎসিত বলিয়া কাঁদে তা নয়, শুধু ভাল হাকিমের ন্যায় নজির মানিয়া চলিবার জন্য।) যাহোক্ তাহার ক্রন্দনে দয়াবান্ ঈশ্বরের দয়া হইল, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে দর্পণে আপন মুখ দেখিয়াই শিশু কাঁদিতেছে। তখন বলিলেন "আজ হইতে, আমি বলিতেছি, যে যতই কুৎসিত হউক না কেন, দর্পণে আপন মুখ দেখিযা সে কখনই অসন্তুষ্ট হইবে না।" তদবধি মনুষ্য অন্য কর্তৃক "কুৎসিত" এই শব্দে অভিহিত হইলে, দর্পণের সম্মুখে আসিয়া বলে "কই না আমি এমন কি কুৎসিত, তবে সাক্ষাৎ কন্দর্প নয় বটে, তা'তে আসে যায় কি, এ চুলের বাহার কত? এই টেরিতেই আমায় ঠিক্ কার্ত্তিকের মত মানিয়েছে।" এইরূপে কেহ বা কেশ, কেহ বা নাক, কেহ বা চোক, কেহ বা গোঁফ, কেহ বা দাড়ি, একটা না একটাতে পরম পরিতুষ্ট থাকে। এ ত গেল যা'দের লোকে কুৎসিত বলে তাহাদের কথা। সুশ্রী পুরুষ বা সুন্দরী রমণীরাও অতিশয় আর্শিপ্রিয়। ঐ দেখ ঐ একটি নবীন যুবক প্রায় একঘণ্টা আর্শির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, আমি জানালা হইতে দেখিতেছি এ যুবকটি সাত বার টেরি কাটিল, একবার মাঝখানে, একবার বামে ঈষৎ হেলাইযা, আর একবার আরও

ঈষৎ হেলাইয়া, দক্ষিণ দিকেও ঐরূপ দুইবার, একবার এলবার্ট ফ্যাসানে, আর একবার বিনা এলবার্টে, কিন্তু কিছুতেই মনঃপূত হইল না অবশেষে অতিশয় যত্নের সহিত দুএক গুচ্ছ কুঞ্চিত কেশ ভ্রুযুগলের ঈষৎ উপরিভাগে এরূপ ভাবে রাখিয়া দিল যেন উহা আপনা আপনি ঐ ভাবে পড়িয়াছে, উহাতে যেন ঐ যুবকের কিছুই মনোযোগ নাই (অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে Studied indifference বলে) অথচ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রায় একঘণ্টা চেষ্টার পর উহা সাধিত হইয়াছে। আরও দেখিয়াছি ঐ যুবক কলেজের পরিষ্কার সার্শিতে বা স্বচ্ছ পুষ্করিণীতে, যখন যেরূপ সুবিধা হইয়াছে অমনি একবার ঐ টেরিটা ঠিক্ আছে কিনা দেখিয়া লইয়াছে, না থাকিলে হস্তদ্বারা আবার উহা পরিপাটি করিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে পাওয়া যায় নার্‌সিসাস্ (Nercissus) নামক কোনও যুবক এত সুন্দর ছিল যে সে নিজের প্রতিবিম্বের সহিত প্রেমে পড়িয়াছিল। উহা কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয় না, নিজের রূপে মুগ্ধ হইতে অনেককেই দেখা যায়, বিশেষতঃ সুন্দরী নারীগণের মধ্যে। ইহার এক কারণ বোধ হয় সুন্দরী নারীগণের অদৃষ্টে সকল সময়ে সুন্দর পুরুষ যোটে না, কাযেই তাহারা আর্শিতে নিজ নিজ মূর্ত্তি দেখিয়াই মনোকষ্ট নিবারণ করে। শুধু তাই নহে, সুন্দরীগণ অনেক সময়ে আর্শির নিকট সৌন্দর্য্য অধ্যয়ন করেন, অর্থাৎ কিরূপে হাসিলে দাঁতের মাড়ি দেখা যাইবে না, অথচ কুন্দদন্তগুলি ঈষৎ দেখা যাইবে, কিম্বা যদি ইচ্ছা হয় তবে কিরূপে হাসিলে দন্ত মোটেই দেখা যাইবে না, বিম্বাধরে কেবল মাত্র মুচ্‌কি হাসি দেখা দিবে, গণ্ডস্থলে টোল (Dimple) দেখা দিবে, কিরূপ ভাবে কটাক্ষ করিলে পুরুষের হৃদয়ে একেবারে "দম্‌দম্‌বুলেট্" প্রবেশ করিবে, কিরূপ কটাক্ষে ঈষৎ কুপিত

ভাব ইত্যাদি একশত এক রকমের চাহনি, উনপঞ্চাশ রকমের হাসি প্রভৃতি নানাবিধ সৌন্দর্য্যের বিষয় অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। (ভাল কথা, "দম্ দম্ বুলেটের" অর্থ দম্ দমায় যে একপ্রকার অতি সাংঘাতিক গুলি প্রস্তুত হয়, কেহ যেন আবার দুষ্টামি করিয়া "দম্ দেওয়া বুলেট বা গুলি" এরূপ অর্থ করিয়া না বসেন, কারণ যদিও শোনা যায় সুন্দরী রমণীরা সময়ে সময়ে কটাক্ষপাতে হতভাগ্য পুরুষের প্রাণে বিষম দম্ দিয়া থাকেন বটে, তথাপি তাঁহারা যে "দম্বাজ" একথা বিশ্বাস করিতে আমি প্রস্তুত নহি অন্ততঃ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ্য মাসিকপত্রে লিখিতে সাহসী নহি।)

আমি যে বাজে কথায় প্রয়াসের কলেবর পূর্ণ করিতেছি তজ্জন্য একটা কৈফিয়ৎ চাই। কৈফিয়ৎ এই যে আমার লেখা যতই অপদার্থ হউক না কেন বিষয়টি অতি গুরুতর, আর্শি যেন সামান্য জিনিষ কেহ না মনে করেন। এরূপ গুরুতর বিষয়ে গভীর গবেষণা পূর্ণ পুস্তক বা প্রবন্ধাদি কেন যে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, উনবিংশ শতাব্দির তাহা একটা বিষম সমস্যা। আশা করি শীঘ্রই আমাপেক্ষা কোনও উপযুক্ত ব্যক্তি "আর্শিতত্ত্ব" লিখিয়া (আঃ কি আপদ, তুমি কালা না কি হে, আর্-সি দত্ত নয় "আর্শিতত্ত্ব।") পৃথিবীর মহা-উপকার সাধন করিবেন। আর্শি যে সামান্য বিষয় নহে তাহার একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। একদা প্রাচীন গ্রীক্ দিগের তিনটি দেবতা তিনটি বস্তু সৃজন করেন, একখানি সুন্দর অট্টালিকা, একটি নধর বলীবর্দ্দ, ও একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্য। পরে কাহার সৃষ্টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হওয়াতে সকলে বিচারার্থ জুপিটারকে মধ্যস্থ মানিলেন। জুপিটার উত্তমরূপে তিনটি বস্তুই নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় তবে তিনটিতেই একটু খুঁৎ রহিয়া গিয়াছে।"

তিন জনেই অবাক্, আমাদের সৃষ্টিতে খুঁত? জুপিটারকে খুঁত দেখাইয়া দিতে বলিলেন। তখন জুপিটার বলিলেন "দেখ, এই যে অট্টালিকা, ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না, এই ইহার খুঁৎ। এই যে ষাঁড়টি ইহাও বেশ হৃষ্টপুষ্ট, দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু চোখের উপরিভাগে ইহার সিং থাকাই ইহার খুঁৎ, কারণ সে যখন শত্রুকে গুঁতাইবে, কোন খানে গুঁতাইতেছে দেখিতে পাইবে না, হয়ত শত্রুকে গুঁতাইবার জন্য ঘাড় হেঁট করিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুঁতাইল এক বৃক্ষকে। কারণ শত্রু উহার ঘাড় হেঁট করা দেখিয়াই পাশ কাটাইয়াছে। আর এই যে মানুষটি, এটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু ইহার বুকে আর্শি না থাকায় ইহার মনের ভিতর কি আছে কেহই দেখিতে পায় না; ইহাই ইহার খুঁৎ।" এখন প্রতিপন্ন হইল ত আর্শি কিরূপ গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বস্তু, এমন কি ইহা না থাকাতেই মনুষ্য অসম্পূর্ণ। এই আর্শি না থাকাতেই ত, আমি তোমার বাড়ি গেলে তুমি যে বিলক্ষণ বিরক্ত হও এবং মনে মনে বল "জলখাবার ধ্বংসে যায় বুঝি, এ আপদ অমনি অমনি গেলে বাঁচি" তাহা আমি বুঝিতে পারি না, তোমার মৌখিক আলাপে আমি মনে করি বাস্তবিকই তুমি আমার আগমনে "কৃতার্থ" হও। এই আর্শি না থাকাতেই ত মধ্যে মধ্যে ভদ্রবেশধারী কোন কোন রসিক, এক জন ভদ্র লোকের বাড়িতে গিয়া কত আত্মীয়তা জানাইয়া, হয়ত বা গরম লুচি, কপির তরকারী, নূতন গুড়ের সন্দেশে উদরের সেবা করিয়া, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রস্থান কালে উক্ত সরলচিত্ত ও আতিথেয় ভদ্রলোকের সুবর্ণ ঘড়িটি সুবর্ণ চেন সমেত তাঁহার অজ্ঞাতসারে রসিকতা পূর্ব্বক নিজস্ব করিয়া লইল। ভদ্রলোক পরে জানিতে পারিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। হায়!

এই আর্শি থাকিলে অনেকের করাঘাতটা বাঁচিয়া যাইত! এই আর্শির অভাব বশতঃই ত অনেক ঘোর ভণ্ড সমাজে পরমসাধু বলিয়া বেশ চলিয়া যাইতেছে। অনেক মেকি চলিয়া যাইতেছে অথচ আসল পড়িয়া রহিতেছে; কুচক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া অনেক নিরীহ নির্দ্দোষ মারা পড়িতেছে, অথচ ঐ কুচক্রীর ধন বা উচ্চপদ সাহায্যে সমাজের শীর্ষস্থানে অধিকার করিতেছে। (দোহাই যেন কেহ মান হানির নালিশ না করিয়া বসেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি কোনও ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করি নাই।) এই আর্শির অভাবেই কেহ বা সতী স্ত্রীর উপর অকারণ সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতেছে আবার কেহ বা যথার্থ কুলটা স্ত্রীর মনভুলান কথায় আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেছে ও দুগ্ধ দিয়া কালসর্প হৃদয়ে পুষিতেছে, পরে কাল সর্পের দংশনে জ্বলিয়া মরিতেছে। থাক্ উদাহরণ আর কত দিব, সকলেই রাশি রাশি উদাহরণ কল্পনা করিতে পারেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে আজকাল X Rays এর দ্বারা মনুষ্যের শরীরের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান সাহায্যে এমন এক Y Rays কিম্বা Z Rays কি আবিষ্কার হইবে না যাহার দ্বারা মানুষের মনের অভ্যন্তর দেখা যায়?

ভুলে।

১

হাসিতে বাঁশীতে গেছি আপনা ভুলে!
স্বপনে গোপনে দেখা যমুনা কূলে!
কোমল মলয় বায়,
নীল নদী বহে যায়
লহরী শিহরি' উঠে পরশে দুলে।
কুশল সাঁঝের বেলা,
কলিতে অলিতে খেলা
গুঞ্জরে মধুপ বধূ ললিত ফুলে।
হাসিতে বাঁশীতে গেছি আপনা ভুলে!

২

হাসিতে বাঁশীতে গেছি আপনা ভুলে!
দেখেছি আপনা খেয়ে নয়ন ভুলে!
চারিধারে কুহুতান,
মুহূর্ত্ত কাঁপিল প্রাণ
শিথিল কবরী বুঝি গেছিল খুলে,
সঙ্গীতে স্বপনে মোহে,
দুজনে দেখিনু দোঁহে
মদির মরম মাখা মরম মূলে!
হাসিতে বাঁশীতে গেছি আপনা ভুলে!

৩

হাসিতে বাঁশীতে গেছি আপনা ভুলে!
সুখিনী দুখিনী এত কে লো গোকুলে!
যেকথা শুনিতে বাকি,
বলেছে তা নীল আঁখি
আবেক বলেছে বাঁশী সুধা উথলে!
মধুমাখা সুর বাঁধা
সে আকুল "রাধা রাধা"
রাধার কি ছিল সাধ ফিরিতে কুলে।
হাসিতে বাঁশীতে গেছি আপনা ভুলে!

৪

হাসিতে বাঁশিতে গেছি আপনা ভুলে।
কি সুধা ক্ষরিল মরি মনোমুকুলে!
জলভরা নীল মেঘে,
বিজলী রয়েছে লেগে
শিরে শিরে ইন্দ্রধনু চিকণ চুলে!
ললিত মালতী হার,
যেন খির নীর ধার!
শিহরি ঢাকিনু তনু নীল দুকূলে!
হাসিতে বাঁশীতে গেছি আপনা ভুলে!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

স্ফটিকপ্রাসাদ।

লণ্ডনের অনতিদূরে সিডেনহ্যাম্ নগরের স্ফটিকপ্রাসাদ অদ্ভুত মানব-কীর্ত্তির একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই বৃহৎ প্রাসাদ লৌহফ্রেমে প্রস্তুত এবং ইহার চতুর্দ্দিকে পাতলা কাচ আঁটা। স্ফটিকপ্রাসাদটি তিন ভাগে বিভক্ত। মধ্য স্থলে আড়াআড়ি ভাবে একটি বড় খিলান করা লম্বা হল, এবং উভয় পার্শ্বে বহু বিস্তৃত দুইটি ঘর; এই দুইটি লম্বা ঘরের দুইপ্রান্তে উচ্চ কাচের স্তম্ভাকৃতি দুইটী গম্বুজ আছে। এই প্রাসাদের বহির্ভাগে মনোরম উদ্যান, শ্যাম সমতল ক্ষেত্র, হংসকারণ্ডবপূর্ণ পয়ঃপ্রণালী, পত্রপুষ্প শোভিত কুঞ্জবন,

প্রস্তর মূর্ত্তিসকল, বিচিত্রবর্ণের নির্ঝরিণী প্রভৃতি থাকায় দর্শকের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। স্ফটিকপ্রাসাদের অভ্যন্তরের দৃশ্যও আরও চমৎকার ; ইহার মধ্যস্থলে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচিত্র কারুকার্য্যময় প্রস্তর খচিত পথ এবং উভয় পার্শ্বে তুষার ধবল মর্ম্মর প্রস্তরের মূর্ত্তিপুঞ্জ সজ্জিত। উর্দ্ধ হইতে বিলম্বিত সুচারু লতা বল্লরী বিচিত্র স্তম্ভ গুলিকে জড়াইয়াছে, কোথাও ফোয়রা নিক্ষিপ্ত জলকণা স্ফটিকাধারে পড়িতেছে। সূর্য্যরশ্মি জলকণার উপর পতিত হইয়া সহস্র নীলপীত লোহিত বর্ণে স্ফটিক খণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইতেছে— যেন বহুমূল্য প্রস্তর থরে থরে চতুর্দ্দিকে খচিত রহিয়াছে। মানবের কল্পনা এবং কৌশলে যাহা কিছু যোগাইতে পারে তৎসমুদয়ই স্ফটিক-প্রাসাদকে অপার্থিব সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিলে দর্শকের নয়ন প্রাণ বিমোহিত হয়। এখানে অনেক তামাসা প্রদর্শিত হয় এবং বহুদ্রব্য বিক্রয়ার্থও থাকে ; তন্মধ্যে চিত্রাগারের নানাবিধ চিত্র ও বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের মূর্ত্তি উল্লেখ যোগ্য।

সূর্য্য।

সূর্য্য এক তেজোময় জড় পদার্থ। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে পৃথিবী নিশ্চল ভাবে অবস্থিত আছে এবং সূর্য্য ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। নিঃসংশয়িতরূপে ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে সূর্য্যমণ্ডল, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, হর্শেল, নেপচুন্ ও পৃথিব্যাদি গ্রহগণের মধ্যবর্ত্তী, এবং গ্রহগণ উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য নিজে গ্রহ নহে ; আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী এক গ্রহ।

সূর্য্যের দাহিকা শক্তি আছে কারণ, দেখা যায়, যখন একখানি আতস কাচ (Burning glass.) কোন দাহ্য পদার্থের উপর এরূপ ভাবে রাখা যায় যে একত্রীকৃত সূর্য্যকিরণ তাহাতে পতিত হইলে তাহাকে দগ্ধ করে। পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলের দূরত্বের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগকে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা সূর্য্য হইতে প্রায় নয় কোটী ত্রিংশ লক্ষ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এমন কি যদি কোন কামানের গোলা প্রতি ঘণ্টায় দুইশত ক্রোশ করিয়া গমন করে, তথাচ দ্বাবিংশ বৎসরেও সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না। তবেই পৃথিবী এতদূরে অবস্থিত হইয়াও, যখন সূর্য্যকিরণে পৃথিবীবাসী জীবজন্তুগণ সন্তপ্ত হয়, তখন অগ্নি হইতে সূর্য্য যে কত তেজোময় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সাধারণতঃ ইহা হইতেই প্রতীত হয়, যে আমরা যতই পৃথিবীর ঊর্দ্ধে উঠিব এবং সূর্য্যমণ্ডলের যতই নিকটবর্ত্তী হইব, ততই সূর্য্যের প্রাখর্য্য অনুভব করিব, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রমাণ করিয়া দেখিয়াছেন তাহা নহে। কারণ মনুষ্য শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকিলে যেমন শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তাপ বস্ত্রদ্বারা রক্ষিত হয়, সেইরূপ স্বর্ণরেণুবৎ সূর্য্যরশ্মি এই জগতীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎসম্ভূত উত্তাপ, পৃথিবীর নিম্ন প্রদেশে বায়ুর গুরুভাবে, ঊর্দ্ধপ্রদেশ অপেক্ষা রক্ষিত হয়। যদিও পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বায়ুর দ্বারা আবৃত, কিন্তু পৃথিবীর যত ঊর্দ্ধে উঠা যায় তথায় বায়ুভার এত লঘু হয় যে এমন স্থান পাওয়া যায়, যেখানে বায়ুসঞ্চার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং নিম্ন প্রদেশের গুরুভার বিশিষ্ট বায়ু ঊর্দ্ধপ্রদেশের লঘুভার বিশিষ্ট বায়ু অপেক্ষা অধিকতর উত্তাপ রক্ষা করে। বায়ুই সূর্য্যের উত্তাপ রক্ষার একটী প্রধান কারণ এবং সেই কারণেই অত্যুচ্চ স্থান ও পর্ব্বতময়

প্রদেশ সকল অধিকতর শীতল ও চিরতুষারাবৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

তেজোময় সূর্য্যের তেজ হইতেই আমাদের আবাসভূমি ধরিত্রী এবং সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহ সকল তাহাদের দূরত্বানুসারে অধিকতর ও স্বল্পালোকিত হইয়া থাকে। বুধগ্রহ (Mercury) সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী থাকায় পৃথিবীস্থ সূর্য্যালোক অপেক্ষা উহাতে প্রখরতর আলোক পতিত হয়। আবার নেপচুন্ গ্রহ সূর্য্য হইতে অতি দূরবর্ত্তী বলিয়া পৃথিবীস্থ সূর্য্যের উত্তাপ অপেক্ষা উহার উত্তাপ অনেক অংশে কম। এমন কি, বোধ হয় এজগতের দ্রবময় তরল পদার্থ নেপচুন্ গ্রহে নীত হইলে তাহা প্রস্তরময় কঠিন হইয়া উঠে।

সূর্য্য দেখিতে গোলাকার হইলেও থালার ন্যায় গোল নহে; ইহার আকার বর্ত্তুলের ন্যায়। সৌরজগতে যত গ্রহ ও উপগ্রহ আছে পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা বসুন্ধরার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে সূর্য্য এত বৃহৎ বলিয়া বোধ হয় যে আমরা সহজে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে হইলে যদি কামানের গোলার ন্যায় সূর্য্যের আয়তন হয়, তাহা হইলে আমাদের আবাসভূমি পৃথিবী সর্ষপ অপেক্ষা বৃহৎ নহে। বিদ্যোৎসাহী অনুসন্ধানোৎসুক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সূর্য্যের পরিদৃশ্যমান উপরিভাগ কিরণমালায় পরিপূর্ণ, কেবল মণ্ডলের চারিধারে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কবৎ যে সকল চিহ্ন দেখা যায়, তাহা স্থির ভাবে নিরীক্ষণ করিলে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বরের ন্যায় বোধ হয়। ভূমণ্ডল সম্বন্ধে সূর্য্য স্থিরভাবে আছে; গ্রহ ও উপগ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। গ্রহগণের এইরূপ

পরিভ্রমণ করাকে তাহাদের বার্ষিক গতি কহে। অর্থাৎ যে সময়ে তাহারা এক একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে সেই সময় প্রত্যেক গ্রহে এক একটী সম্বৎসর হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রহগণ ঘুরিতে ঘুরিতে শকটচক্রের ন্যায় আপনাপনি এক একবার আবর্ত্তিত হয়; এই প্রকার আবর্ত্তনকে আহ্নিকগতি বলে। পৃথিবীর সূর্য্যকে এই প্রকার পরিভ্রমণ করিতে প্রায় তিনশত পঞ্চষষ্টি দিবস এবং স্বয়ং আবর্ত্তিত হইতে এক দিবস লাগিয়া থাকে। পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহগণের পরিভ্রমণ কালে যখন যে যে ভাগ সূর্য্যসম্মুখীন হয়, তখন সেই সেই ভাগ দিনমান ও অপরাপর ভাগকে রাত্রিমাণ বলা হয়। এইরূপে সূর্য্য হইতে গ্রহগণের সম্বৎসর, দিনমান, রাত্রিমাণ ও ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

এই যে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত সমীরণ, যাহার নিমেষমাত্র সঞ্চালন রুদ্ধ হইলে সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যায়, জীবগণের প্রাণবায়ু বিয়োগ হইয়া থাকে, সূর্য্যই সেই সঞ্চালনের মূলীভূত কারণ। এই যে আকাশব্যাপী মেঘমালা, যাহা হইতে বারিবর্ষণ হইয়া বসুন্ধরা শ্যামলশস্য উৎপাদন করিতেছে, মহার্ণব শোষক তপনদেব সেই বারিদশ্রেণীর উৎপত্তির নিদান। আবার ওই যে নভোমণ্ডলে রজনীর শোভা তারাপতি চন্দ্র, যাহার স্নিগ্ধ কমনীয় কৌমুদীকিরণে নিশার ঘোর অন্ধকার দূরীভূত হইতেছে, সেই নিশাপতি চন্দ্রও সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়া রজনীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, ভাবুকের চিত্ত পুলকিত করিতেছে। প্রেমিকের প্রেম উথলিয়া দিতেছে। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণ সূর্য্যের এত উপকারিতা দর্শনে সূর্য্যকে দেবতারূপে অর্চ্চনা করিতেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।

———:*:———

ফুলের সাজি।

বাসন্তি-পঞ্চমী।

সাজিল প্রকৃতি, অতি মনোহরা,
বসন্ত পঞ্চমী বঙ্গেতে আজ,
বিশ্বের তিমির নাশিয়া চরণে,
চন্দ্রমা পরিল মোহন সাজ।
চলিল তটিনী, 'কুল কুল' স্বরে—
হৃদয়ে ধরিয়া কৌমুদী রাশি,
মহীরুহ শিরে সমীর আইল,
বাজা'য়ে যেনবা মোহন বাঁশী।
ফুটিল কুসুম, হরষে, সরসে,
তুলিল মধুপ ঝঙ্কারি' তান;
গাহিল কোকিল, দোয়েল পাপিয়া,
সুকণ্ঠে, বসন্ত মঙ্গল গান।
ত্রিদিবের শোভা, মরতেতে আজি,
হেরিয়া নয়ন বিমুগ্ধ অতি;
শ্যামল বসনে আবরিয়া কায়া
হাসিছে কেমন বসুধা-সতী।
দিক্ দিগন্তর, স্বর্গ সুষমায়,
শোভিয়াছে আজ কেমন আহা,
অনন্ত বিশ্বের, সে সৌন্দর্য্য রাশি,
হারিল লেখনী বর্ণিতে তাহা।
এহেন সুদিনে, আইলেন বঙ্গে,
আশিসি সন্তানে বঙ্গের মাতা,
পূজহ তাঁহারে, প্রফুল্ল অন্তরে,
দিয়ে প্রেম পুষ্প, ভকতি-গাঁথা।
দরিদ্র, মহান, জ্ঞানী বা অজ্ঞান,
পূজ'বে তাঁহার চরণ দু'টী;
হৃদয় কাননে ফুটা'বে কুসুম,
যা'র শত চিন্তা, নিমিষে টুটি'।
গাও হৃদি ভ'রে, তাঁর প্রেম-গান,
নবীন, প্রবীণ একত্র হ'য়ে;
অশান্তি পীড়ন, থাকিবে না আর,
সুখেতে জীবন যাইবে ব'য়ে।
বিশ্ব-সেবা ব্রত করমে জাগিয়া,
থাকবে অবোধ মানব মন;
করিবেন মাতা, অক্ষয় আশিস্,
অর্জ্জিতে পারিবে বহুল ধন।
শুধু অর্থ নয়,— জ্ঞান, বুদ্ধি আর,—
এজগতে যাহা অমূল্য অতি;
অবশ্য পাইবে, সে অমূল্য ধনে,
যদি ভক্তি থাকে তাঁহার প্রতি।
লহ এই ক্ষুদ্র, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি
চরণ-পঙ্কজে দাওগো স্থান;
মিটাও ভক্তের হৃদয় পিপাসা
জুড়াও তাপিত, তৃষিত প্রাণ।
কর বর দান, অহে মা বরদে,
নাশ'হে অজ্ঞান-তিমির রাশি;
পুরাও আজি এ জীবন কামনা,
হৃদয় বীভৎস-কলুষ নাশি'।

শ্রীঅটল বিহারী দাস, বারুইপাড়া।

কোথা' সে' বিজন ?

১

দূর হ'তে দূরতরে, যথা' সে, মধুর স্বরে
বহিল করুণ গীতি সহ সমীরণ ;
তাপিত নিশ্বাস ফেলি, প্রকৃতিরে অবহেলি,
যথা' সে' কোকিলকণ্ঠ তুষিল শ্রবণ .
যথায় সমীর-শ্বাস, বিতরি' কুসুম-বাস,
জুড়াইল অভাগার আকুল জীবন ,
কোথা' সে' বিজন ?

২

সংসারে যাতনা-ভার পরাই'ছে শোকহার,
কি ভীষণ বিভীষিকা করে প্রদর্শন।
সতত সংসার-কোলে, অশান্তির ঘোর রোলে
শুনি ক্ষীণ মানবের বিষাদ-ক্রন্দন !
সাজিয়া নীহার-নীরে, ব্রততী কম্পিত শিরে
সোহাগে পাদপে যথা করয়ে চুম্বন ;
কোথা' সে' বিজন ?

৩

যথায় প্রসারি' কর, তরুকুল নিরন্তর,
তাপিত পথিক চয়ে করে সম্ভাষণ ;
তামসী বসন পরা যথা, সে' সুষমা ভরা
প্রকৃতি, অনিল হৃদে আশার স্বপন !
কোথা' সে' বিজন ?

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

বাসন্তী।

কে গাঁথি কুসুম মালা, পরাইল তোর গলে ?
কে সাজালে অঙ্গ তব, নব কিশলয় দলে ?
মৃদুল নিশ্বাসে কেবা, ঢালি দিল পরিমল ?
নূতন মাধুরী অঙ্গে, কেবা আনি দিল বল ?
কোকিল কাকলী তুলি, করি অলি গুঞ্জরণ
কেন আসি নিরন্তর, করে তব সম্ভাষণ ?
কাহার সোহাগে বল, মুখে মৃদু মৃদু হাসি ?
কে দিল মাখিয়া অঙ্গে, এহেন অমিয় রাশি?
কে রচিল ফুল শয্যা, কে বসি' ল এ বাসর ?
ফুলে ফুলে ফুলরাশি, মরি কিবা মনোহর।
মধুর পরশে করে পুলকিত কলেবর।
এ সুখ বাসরে তব, কেবা অভিনব বর ?
তুই যে মানিনী মেয়ে, পদে পদে অভিমান
কে তোর বুঝিবে মান, না করি হৃদয় দান?
তুই যে মানিনী মেয়ে মান ভরে দিশে হারা।
কত ধূলি ধূসরিত, থাকিস্ পাগল পারা।
পরিহরি ফুল সাজ, সাজিস বিধবা বালা,
আবার পরিস অঙ্গে, প্রফুল্ল কুসুম মালা।
কভু বা মলিন মুখে, সদা অশ্রু বরিষণ,
ঘোর তর হুঙ্কারে, চমকিত ত্রিভুবন।
তুই যে মানিনী মেয়ে, যে বুঝিবে তোর মান
সেই তোর প্রেম নীরে, রবে সদা ভাসমান।
কে সাজালে অঙ্গ তোর, এহেন মোহনবেশে
বাসন্তী প্রকৃতি বল, আছে সেই কোন্‌দেশে ?

শ্রীঅনঙ্গ মোহন কাব্যতীর্থ, মেহেরপুর।

উদ্দেশ্য সাধন।

জীবন-উদ্দেশ্য যাহা, নিবিষ্ট অন্তরে তাহা
ভাবি মনে করহ নিশ্চয়—

বিদ্যা বা সম্পদ ধর্ম্ম, অথবা মহৎ কর্ম্ম,
যে বাসনা হৃদে তব হয়।
প্রতিজ্ঞা করহ তবে, সাধিতে উদ্দেশ্য ভবে
যত দিন দেহেশ্বাস বয়।
বৃথা যেন দণ্ডপল, নাহি যায় অনুপল,
সদা যেন কার্য্য সিদ্ধি হয়।
বিষম বিপদ-পাতে ভয়ে ভীত হয়ে তাতে,
ছেড়না উদ্দেশ্য কোন মতে;
যত সব মহাজন, এপথে ল'য়ে শরণ,
হয়েছেন খ্যাত এজগতে।
পুরুষত্ব যদি চাও, অটল ভাবেতে রও,
কর্ত্তব্য সাধনে হও রত;
আর সব তুচ্ছ করি,' কর্ত্তব্যের ধ্বজাধরি,'
অগ্রগামী হও অবিরত।

শ্রীধীরাজ কৃষ্ণ সোম।
হরিণাকুণ্ডা।

পিক।

অনন্ত কুহেলি ঘেরা মর্ত্ত্য মানবের
কলঙ্কের নগ্নশোভা পিয়াসা আগারে,
আসিয়াছি পিক আমি নব বসন্তের,
কামনার সম্পূর্ণতা ল'য়ে ধরা'পরে;
সরমে কুণ্ঠিত অতি বিবশ বিহ্বল,
শুনাইতে শুধু মোর দুচারিটী গান,
মুহূর্ত্তের দেখা মাঝে, এসেছি কেবল,
হৃত আশা, ক্ষীণকণ্ঠ, রেখো ভগবান্!
প্রকৃতির কারাকুঞ্জে, সঙ্গীত-কাননে,
এ মোর তাপিত তান, রবিরশ্মি সম,
হয় যদি উন্মেষিত, কুসুম-বিতানে,
এ তুচ্ছ উচ্ছাস যদি ফুটে উঠে মম,
স্বপ্নরাজ্যে বহি দিব, অমৃত তরল,
তোমাদের পরাণের হিল্লোল-কল্লোল।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

কবি।

পৃথিবীর রোগশোক মূর্ত্তিমতী হয়ে
যেদিন আসিল কাছে দেখিলাম চেয়ে
মরণের ভয়ঙ্কর কঠোর মূরতি,
মনেহ'ল এজগৎ নিঠুর যে অতি।
সেদিন তুমিই কবি দেখাইলে মোরে।
জগতের নবমূর্ত্তি; গাহি' সপ্তস্বরে
প্রেমময় বিধাতার অতুল সে স্নেহ;
সেদিন বুঝিনু আমি নহে অহরহ
শুধু দুঃখ শুধু শোক শুধু অশ্রুরাশি
ঝরি'ছে নির্ঝর সম কিবা দিবানিশি;
সেদিন বুঝিনু আমি যেন এ মরতে
অমর আলোকরাশি পড়ি'ছে আসিয়া;
সেদিন বুঝিনু আমি যেন এ জগতে
দেবতা-আশিস্ ভাতি আসিছে নামিয়া।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিলাপ।

১

মনে কেন শান্তি নাই, কেন দুঃখে অন্ত নাই
কেনবা সবারি কাছে আপদ বাধাই?

মনে যেন কি ভাবিয়া নিরাশাকে সম্ভাষিয়া
চক্ষুজলে কেন হায় হৃদয় ভাসাই ?

২

ক’রেছি বহুল পাপ তাই জাগে অনুতাপ
তাইকি ঘুচেনা মোটে মনের উত্তাপ ?
না আসিতে যুবাকাল নিদারুণ ব্যাধিজাল
তাই কি আমার সনে দেখায় প্রতাপ ?

৩

স্মৃতি কেন হৃদিপটে মাঝে মাঝে উঠি ফুটে
গোপনে পাপের ছায়া দেখায় ভীষণ ?
কিসে ওহে নারায়ণ, লভি তব শ্রীচরণ
এ দাস পরমানন্দে ধরিবে জীবন ?
বল বিভো! কবে হবে সুদিন এমন ?

শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ক্রেতা। লেবু কি দর হে ?

বিক্রেতা। এজ্ঞে আনায় পাচটা বাবু।

ক্রেতা। বোসো দেখি, আনায় পাঁচটা হলে, চারটে তিন পয়সায়, তিনটে দুপয়সায়, দুটো এক পয়সায়, আর একটা অমনি—আমি একটাই নিলুম বাবু।

* * *

আপেলের উপকারিতা।—আপেল কতদূর উপকারী ফল তাহা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না। শয়ন করিবার পূর্ব্বে আপেল খাইলে শরীরের বিশেষ উপকার সাধিত হয় ও ভালরূপ নিদ্রা হয়। অপর কোনও ফল অপেক্ষা ইহাতে অধিক পরিমাণে ফস্‌ফরিক্ এসিড্ থাকাতে মস্তিষ্কের বিশেষ উপকারী। অধিকন্তু ইহা পরিপাক শক্তির সহায়তা করে ও গলনালীর সকলপ্রকার রোগের প্রতিষেধক। মাদকসেবীদের অদম্য পিপাসা শান্তি করিবার ক্ষমতা লেবুর নাচে আপেলেরই অধিক।

* * *

স্ত্রী। আচ্ছা তুমি এত লেখা পড়া শিখেছ, দুই একটা বহুমূল্য ধাতুর নাম বল দেখি?

স্বামী। কেন স্বর্ণ, রৌপ্য; তুমি যে আমায় ঠকাইতে আসিয়াছ, কই, তুমি এ ছাড়া দুই একটা মূল্যবান্ ধাতুর নাম কর দেখি?

স্ত্রী। ইরিডিয়ম্ (Iridium), প্লাটিনম্ (Platinum) হাঁ ক'রে রইলে যে? স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান কুড়িটি ধাতু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্বামী। (স্বগতঃ) তার গয়নার বায়না ধর্‌লেইত গেছি!

* * *

বিজ্ঞাপনের কৌশল।—পাশ্চাত্য দেশ সমূহের বিজ্ঞাপনই বাণিজ্যোন্নতির অন্যতম কারণ। তাহাদের বিজ্ঞাপন দিবার প্রণালী এবং কৌশল অবগত হইলে অনেক সময় চমৎকৃত হইতে হয় এবং এ সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয়গণ কতদূর পশ্চাৎপ্রদ ও সংকীর্ণচেতা তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়।

ফ্রান্সে এবং স্কটলণ্ডে রেলের ধারে পাহাড়ের গায় এরূপ কৌশল করিয়া অক্ষরের আকারে ফুল গাছ পোতা আছে যে নানা রঙের ফুল ফুটিয়া রেলবিহারী যাত্রীগণের নয়নরঞ্জন করে, অধিকন্তু পুষ্পরচিত বিজ্ঞাপনগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্কটলণ্ডের কোন ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতের বেতন সঙ্কুলান না হওয়াতে তত্রস্থ এক সাবান বিক্রেতা নিজ বিজ্ঞাপন উপাসনাগারের গ্যালারির ঠিক্ সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিবার বিনিময়ে বৎসরে অনূ্যন ১৮০০৲ টাকা পুরোহিতের বেতন স্বরূপ দিয়া থাকে।

আমেরিকার অনেক প্রদেশে মেঘাচ্ছন্ন দিবসে মেঘের উপর

ম্যাজিক লণ্ঠনের দ্বারা আলোকময় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। পথিকের আকাশের দিকে চাহিলেও বিজ্ঞাপন না দেখিয়া নিস্তার নাই।

কুইবেক সহরে কোন ফন্দিবাজ জুতাওয়ালা প্রতিজোড়া জুতার তলায় 'অমুকের জুতা' বড় বড় লোহার অক্ষরে লিখিয়া দেয়। ইহাতে তাহার প্রত্যেক ক্রেতা প্রতি পদক্ষেপে তুষারের উপর জুতাওয়ালার নামের ছাপ দিয়া বিক্রয়ের সহায়তা করে।

নিউইয়র্কের কোনও নাট্যশালার অধ্যক্ষ এক একখানি বিজ্ঞাপন-পত্রের সহিত একখানি ৪ সেণ্টের (প্রায় তিন পয়সা) চেক পাঠাইয়া দেন। পত্রে লেখা থাকে "মহাশয়, আপনার বাৎসরিক আয় ১৫০০০ ডলার হিসাব করিয়া এবং 'সময়ই মুদ্রা' এই চলিত বাক্যে আপনার আস্থা আছে জানিয়া, এতৎসহ—ব্যাঙ্কের উপর একখানি ৪ সেণ্টের চেক পাঠাইলাম। আপনি পর পৃষ্ঠায়—থিয়েটরের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া দু মিনিট সময় অপচয় করিলেন তাহার মূল্য উপরোক্ত হারে—৪ সেণ্ট।" ৪ সেণ্টের চেক ভাঙ্গাইবার জন্য প্রায় কেহই ব্যাঙ্কে যায় না। এ সকল চেক ভাঙ্গাইয়া পয়সা আনিলেও যাহারা স্বেচ্ছায় এত ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত তাহারা কিরূপ উদ্যমশীল একবার বিবেচনা করুন দেখি। আমেরিকার অনেক বিজ্ঞাপনেই মাসে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আট দশ জন ভদ্রবেশধারী লোক পারি সহরের রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা সময়ে সময়ে কোন স্ত্রীলোকের সম্মুখে সারিবন্দি হইয়া এককালে টুপি খুলিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত। স্ত্রীলোকেরা প্রথমে চম্‌কাইয়া উঠিত, পরে হাসিয়া প্রস্থান করিত। প্রথম প্রথম এই বাক্‌হীন ব্যক্তিগণ ফরাশিশ রাজধানীতে একটা হুজুগ হইয়া দাড়াইল—বিশেষতঃ যখন জানা গেল

যে এই কয়েকজনের মাথার খুলি পরিষ্কার ক্ষৌরি করা এবং তাহার উপর নীল কালীতে বড বড় অক্ষরে লেখা—"অমুক হোটেলে আজ সন্ধ্যা ৭ টার সময় কন্সার্ট।" এইরূপ নূতন ধরণের বিজ্ঞাপন কর্তৃপক্ষের নিকট বেয়াইনী হইতে পারে না। কিন্তু শুনা যায় কোনও কর্ম্মচারী সেই সময় এক আইন জাহির করিলেন যে প্রত্যেক বিজ্ঞাপন দাতাকে কিছু টেক্স দিতে হইবে এবং টেক্স দেওয়া হইলে সেই বিজ্ঞাপনে একটী সরকারি ছাপ বা টিকিট মারা থাকবে এবং টিকিট বিহীন বিজ্ঞাপনী বাজেয়াপ্ত করা হইবে। তৎকালে পরচুলদ্বারা খুলি ঢাকিয়া অনেক কষ্টে এই বিজ্ঞাপন ধারীরা নিজ নিজ মুণ্ডিত মস্তক সরকারি ছাপ বা বাজেয়াপ্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

***

বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।—অনেকেই মনে করেন কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্যই বায়ুর প্রয়োজন, ইহা হইতে অপর কোন পার্থিব উপকার পাওয়া যায় না।

বায়ু না থাকিলে শিলাবৃষ্টির সময় শিলা খণ্ড সজোরে বন্দুকের গুলির ন্যায় আঘাত করিয়া আমাদিগকে ধরাশায়ী করিত।

সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যে বায়ু ব্যবধান থাকায় উহা সূর্য্যোত্তাপ সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং রাত্রে উত্তাপ বিতরণ করে। বায়ু না থাকিলে দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মি আমাদিগকে দগ্ধ করিত এবং রাত্রের শৈত্য তুষারের ন্যায় জমাইয়া ফেলিত।

বায়ু ব্যতীত শিশিরের উৎপত্তি হইত না এবং শিশির অভাবে বৃক্ষলতার জন্ম ও বৃদ্ধি হইত না।

বায়ু না থাকিলে আমরা উষারাণীর মুখ দেখিতাম না। দিবা ও

রাত্রির মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিত না—একবারে প্রখর আলোক হইতে গাঢ় অন্ধকার হইত।

বায়ু না থাকলে আকাশের বিচিত্র বর্ণ নয়নগোচর হইত না। দ্রব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি হইত না, পাথরে পালকে সমান হইত। পৃথিবী হইতে শব্দের একবারে তিরোভাব হইত। কোকিলের কুহুতান, বীণার ঝঙ্কার অথবা স্ত্রীর গঞ্জনা কেহ শুনিত না। অগ্নি জ্বলিত না কাজেই রন্ধন হইত না, আর সঙ্গে সঙ্গে যত কিছু ভোগ বিলাসের দ্রব্য যথা—কল কারখানা, রেলপথ, গ্যাসালোক, এসেন্স, মদ্য, মিষ্টান্ন প্রভৃতি অগ্নি অভাবে লোপ পাইত। যদি বায়ু অভাবে জীবের জীবন ধারণ সম্ভব হইত, তবে এজীবন নিতান্তই দুঃখের হইত সন্দেহ নাই।

* * *

অভ্যাস থাকে ত্যাগ কর।—বোধকরি অনেকেই জানেন যে একদৃষ্টে অন্যমনস্ক ভাবে কোন উজ্জ্বল জিনিসের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে একটু মাথা ঘুরিয়া উঠে এবং চক্ষু জড়াইয়া আসে। মেস্মেরিসমের ইহাই পূর্ব্বলক্ষণ। এইরূপ শূন্যমনে যত অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকা যায়, ততই মস্তিষ্কে জড়তা অনুভূত হয়, চক্ষুর সম্মুখে কুয়াসার মধ্যে বিচিত্র বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। অনেকে ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার বিষময় ফল হয় ত তাঁহারা জানেন না। একটু মনের দৃঢ়তা সহকারে এইরূপ কোন বিশেষ দ্রব্যের প্রতি চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অজ্ঞাতসারে নিদ্রাভিভূত হইতে হয়। কোন Hypnotiser নিদ্রাভঙ্গ না করিলে এ নিদ্রা চির নিদ্রায় পরিণত হয়। দেহস্থ স্নায়ুমণ্ডলের অত্যধিক ক্লান্তি প্রযুক্ত এই নিদ্রাবেশ হয় এবং অনেক নিরীহ প্রকৃতির

লোক এইরূপে কাল কবলিত হইযাছেন। আর্শির ভিতর নিজমূর্ত্তির চক্ষুর প্রতি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইযা থাকিলে ব্যক্তি বিশেষের শীঘ্রই এরূপ ঘটিতে পারে। মেস্‌মেরিসম প্রক্রিয়া খেলার জন্য নহে।

* * *

দুটি ছোট বালিকা এক বিছানায় ঘুমাইতেছিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে বড়টি বলিল "কাল এক মজার স্বপন দেখিয়াছি—আমি যেন একটা বড় ময়রার দোকানে বসিয়া যত খুসি সন্দেশ রসগোল্লা খাইতেছি।" ছোটটি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমি কি তোমার সঙ্গে ছিলাম?"

—"না"। ছোট বালিকাটি ফোঁপাইতে আরম্ভ করিল!

* * *

আমগাছে পোকা নিবারণের উপায়।—চিনির সিরা প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত গন্ধক চূর্ণ বা তাম্রচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তৎপরে উহাতে দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ আর্সেনিক অর্থাৎ সেঁকো চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষের শাখায় শাখায় লেপন করিতে হইবেক। উক্ত প্রলেপ বিষাক্ত বস্তু, সুতরাং যাহাতে উহা কাহারও উদরস্থ না হয় সে বিষয় দৃষ্টি রাখিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত উহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কৃষিতত্ত্ব, মাঘ, ১৩০৬।

* * *

ঘরের ভিতর একপাত্র জলে একমুষ্টি শুষ্ক তৃণ রাখিয়া দিলে তথায় তামাকের ধোঁয়া গন্ধ থাকে না।

* * *

ক্রেতা। আচ্ছা তুমি দোকানের সম্মুখে ঐ বড় আয়না খানা ঝুলাইয়া রাখ কেন?

মুদি—ঝিয়েরা ওজনের কাঁটার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে না বলিয়া।

সমালোচনা।

কৃষিতত্ত্ব। কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা। আমরা এই প্রয়োজনীয় ও সুখ পাঠ্য মাসিক পত্রখানির পুনর্জ্জীবনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি এবং ইহার মঙ্গল ও দীর্ঘজীবন অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি। ইহাতে হতাশ প্রণয়ের হা হুতাশ বা আজকালকার ঐরূপ অন্যান্য ব্যাধি নাই, যাহা আছে সকলই জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় ও সুখপাঠ্য। ইহাতে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইবে :—

(১) বীজবপণ, (২) গাছরোপণ (৩) জলসিঞ্চন, (৪) হাপর প্রস্তুত করণ (৫) সার দেওন (৬) চারা নাড়িয়া বসান (৭) দেশ বিদেশের চাষ আবাদ করণ (৮) গাছের পোকা নষ্ট করণ (৯) জমির নোনা নিবারণ (১০) কলম প্রস্তুত করণ (১১) সর্ব্বপ্রকার দেশীয় ও বিদেশীয় পুষ্প, ফল ও মূলের রহস্যময় তত্ত্বলিপি প্রকাশিত হইবে। (১২) রন্ধন প্রণালী। উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত নানা প্রকার আয়কর দ্রব্যের (যথা, চা, কাফি, পাঠ, শণ, তুলা, তামাক, নীল প্রভৃতি) আবাদের প্রণালী ও পদ্ধতি যথাবিহিত রূপে কৃষিতত্ত্বে স্থান পাইবে। "কৃষিতত্ত্বের" বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। ইহা কিছু অধিক বলিয়া বোধ হইল। কাগজ ও ছাপা সুন্দর।
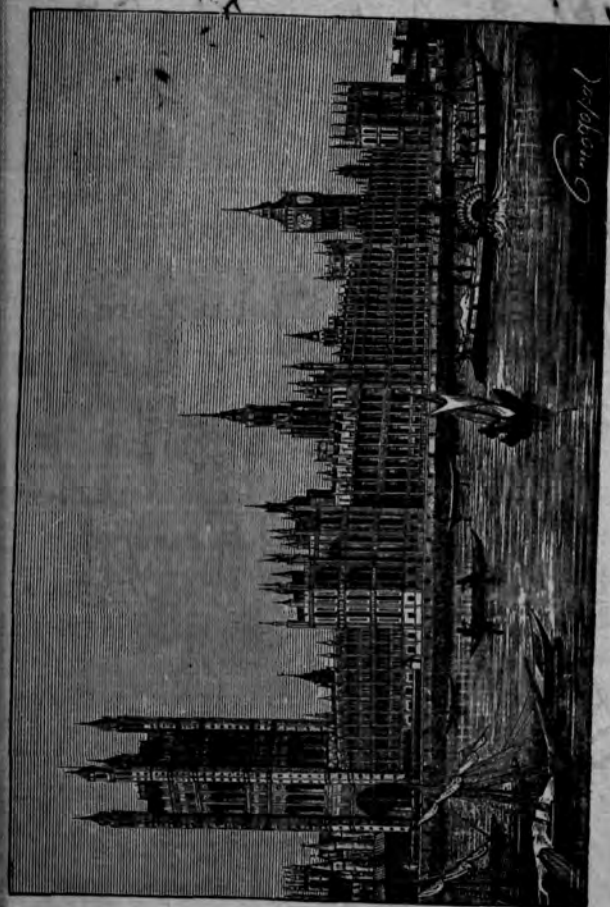
পার্লামেণ্ট মহাসভা ।

প্রয়াস ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ।

ELM PRESS, CALCUTTA

প্রয়াস।

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ। মার্চ্চ, ১৯০০ সাল। তৃতীয় সংখ্যা।

(১)

এসগো সৌন্দর্য্যরাণি, চির শুভ প্রদায়িনী,
কবির সাধনাতীত ধ্যান ধারণার ;
তোমার পবিত্র মায়া, অনন্ত উদার ছায়া,
মানব হৃদয়ে করে মাধুরী সঞ্চার।
অসীম শকতি ভরে, বিচর এ চরাচরে,
যথা ফুল হ'তে ফুলে পবন বিহরে ;
মধুর কিরণে তব, ফোটে ভাব অভিনব,
সৌন্দর্য্য কুসুম হাসে মানব অন্তরে।

(২)

চকিত নয়ন মেলে, চাও যবে কুতূহলে,
মানব বদনে ভাসে সুষমা তরল ;
যেমতি কৌমুদী হাসে, গিরি তরুবর পাশে,
অথবা তারকা লোকে ভাসে মেঘদল।
নবরাগে সন্ধ্যা যথা, গেয়ে সুললিত গাথা,
চলে যায়, ভাসে প্রাণে তিরোহিত তান,
তেমনি তুমিগো সতি, হৃদয়ে ঢালিয়া প্রীতি,
না জানি আবার কোথা করগো প্রয়াণ।

(৩)

কোথা কোথা গেলে তুমি, ম্লান করি' মনোভূমি,
হে মানস রাজলক্ষ্মি, হৃদি বিলাসিনী ;
হ'লে দেবি তোমা হারা, দু'নয়নে বহে ধারা,
শূন্য এ পরাণ কাঁদে কাতর পরাণী।
তোমার পবিত্র কান্তি, বিতরে হৃদয়ে শান্তি,
সৌন্দর্য্যে উথলি' উঠে মানস ভুবন ;
তমোময় চিত্ত ভূমি, উজ্জ্বল করিয়া তুমি,
মাঝে মাঝে কেন তবে হও অদর্শন?

(৪)

এ রহস্য বোঝা দায়, কে বুঝিতে পারে হায়।
রচেনা সতত কেন তপন কিরণ—
সুরঞ্জিত করি [illegible], বিচিত্র জলদ ধনু,
গিরি প্রস্রবণ বুকে মানস মোহন ?
কেন যে আজিকে ম্লান, সময়ে সে দীপ্তিমান,
ধরার আনন্দে কেন বিষাদ কালিমা ?
কেন মানবের মাঝে, প্রীতি, ঘৃণা, দোঁহে রাজে
আশা ও নিরাশা কেন বদ্ধ এক সীমা ?

(৫)

ধ্যানী, জ্ঞানী, ধ্যানে জ্ঞানে, এবারতা নাহি জানে
পুরাণে রয়েছে বৃথা দেবাদির নাম ;
দৈবে কি সন্দেহ বলে, অনিত্য জগৎ চলে,
পারিনা বুঝিতে শুধু হেরি অবিরাম।
আছে শক্তি বিমোহিনী, অনিত্য সে কুহকিনী,
নির্ণয় করিতে নারে ঘটে কি কারণে ;
অমায়িক তবজ্যোতিঃশোভা, সত্য নিত্যপ্রীতি
বিতরে এ জীবনের অশান্ত স্বপনে।

(৬)

নৈশ বায়ু ধীরে আসি, নীরব তন্ত্রীতে পশি'
যেমন ঝঙ্কারি' তোলে সুধাময় গীতি,
তেমতি দাঁড়াও হাসি, নিশীথ কৌমুদী রাশি,
অথবা ভূধরে ভাসে তুষার যেমতি।
বিভিন্ন মেঘের মত, আসে যায় অবিরত,
শ্রদ্ধা, আশা, ভালবাসা মানব হিয়ায় ;
নশ্বর আমরা তাই, পেয়েও নাহিক পাই,
বুঝিতে শকতি নাই হে দেবি, তোমায়।

(৭)

তুমি দেবি, ফুল্লাননে [illegible] প্রিয় সখীগণে,
জাগাও সহানুভূতি [illegible]লোক বিকাশি',
সুভাব উথলি ওঠে, হৃদয়ে মাধুরী ফোটে,
যেমন প্রদীপ জ্বলে তিমির বিনাশি'।
যখন তোমার ছায়া, পরশিবে এই হিয়া,
দাঁড়ায়ো আসিয়ে দেবি, তুমিও তখন,
হৃদয় অনিত্য ভাবি, যেওনা যেওনা দেবি,
তুমি হারা হ'লে ধরা বৃথা এ জীবন।

(৮)

কতবার ছেলে বেলা, খুঁজিতে যেতাম মেলা
শূন্য গেহে কি কন্দরে আসিলে যামিনী,
আনতে বিশ্বাস মনে, ডাকিতাম প্রেতগণে,
কেহই দিতনা সাড়া কারেও দেখিনি।
হৃদয়েতে শান্তি নাই, গভীর ধেয়ানে তাই
জীবন অদৃষ্ট কথা ভাবিতাম মনে,
আচম্বিতে একদিন, হেরিনু ভাবনাহীন,
হইল মানস মম কি এক কিরণে।

(৯)

পুলকিত করি হিয়া, পড়িল তোমার ছায়া,
উল্লাসে ভরিল হৃদি সেই শুভক্ষণে,
বহিল বসন্ত বায়ু, সঞ্চারে লভিল আয়ু,
ফুটিল কুসুম পাখী গাহিল গহনে।
সেই দিন হতে দেবি, আমার যা' কিছু সবি'
দিয়েছি তোমায় আর তব সখীগণে,
অর্পেছি জীবন প্রাণ, হৃদয়ে তোমারি ধ্যান,
তোমারি চেতনা শুধু জাগে এ স্মরণে।

(১০)

যত শত চিন্তা রাশি, এখনো মানসে আসি,
হৃদয় চঞ্চল করি চোকে আনে জল;
এখনো জানেনা তারা, তোমার সুষমা ধরা,
করেছে ললাট মোর প্রশান্ত উজ্জল।
এখনো সে চিন্তাচয়, হেরে ধরা তমোময়,
তুমি মুক্ত করি' দাও আশাপূর্ণ করি,
লভিয়া নয়ন জ্যোতিঃ, দেখুক এ বসুমতী
হাসিছে আনন্দে ধরি' তোমার মাধুরী।

(১১)

সরল সত্যের সম, অলস যৌবনে মম,
দিয়েছ যেমন শক্তি দাও সেই মত;
জীবন যেতেছে চলে, দাও দেবি, শান্তি ঢেলে,
দাও শক্তি এ হৃদয়ে তুমি অবিরত।
পূজি' তোমা আর তাই, তব সত্তা যাহে পাই,
মোহিনী শকতি তব রেখেছে বাঁধনে:
তোমাতে পরাণ সঁপি, আনন্দে জীবন যাপি'
তোমারি এ বিশ্ব মাঝে প্রেম বিতরণে।

আমাদের কর্ত্তব্য।

আমাদের কর্ত্তব্য কি? যাহাতে আমাদের দেশের প্রকৃত, উন্নতি লাভ হইতে পারে তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য।

অধিবাসীবর্গ লইয়াই দেশ; সুতরাং অধিবাসী সকল যখন প্রকৃত উন্নত হয় তখনই দেশের প্রকৃত উন্নতিলাভ হইয়া থাকে। অধিবাসীগণ যখন স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে ও তদনুসারে কার্য্য করে তখনই তাহাদিগকে প্রকৃত উন্নত বলা যায়; সুতরাং দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে যাহাতে প্রত্যেক অধিবাসী তাহার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে ও সেই কর্ত্তব্যানুযায়ী কার্য্য করে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। এই কর্ত্তব্যজ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প, কৃষি প্রভৃতির উন্নতিও রক্ষা হইতে থাকে।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিল্পিগণের মধ্যে এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব বলিয়া, দেশে যাহা কিছু শিল্পকার্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাও উৎসন্ন যাইতেছে। শিল্পিগণের মধ্যে যে অমিতব্যয়িতা, অপরিণাম দর্শিতা ও মাদক প্রিয়তা দেখা যায় তাহা তাহাদের

কর্ত্তব্যজ্ঞানাভাবের ফল। তাহাদের যে কথার ঠিক্ থাকে না, তাহার কারণও এই। কর্ত্তব্য জ্ঞান হীনতা নিবন্ধন শিল্পি গণের এই দোষ সকলই তাহাদের অবনতি, মর্য্যাদাহীনতা ও দারিদ্র্যের প্রধান কারণ ও শিল্পোন্নতির প্রধান অন্তরায়।

কর্ত্তব্যজ্ঞানই প্রকৃত উন্নতির একমাত্র পথ, এবং যতদিন না আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মনে এই জ্ঞান সর্ব্বদা জাগরুক থাকিবে ততদিন আমাদের দেশের উন্নতি হইবে না। ইংরাজ দিগের মধ্যে এই কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে বলিয়াই ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই কর্ত্তব্য জ্ঞান বলেই নেলসন্ (Nelson) সামান্য অবস্থা হইতে ইংলণ্ডের প্রধান নৌ-সেনাপতি হইতে পারিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাঁহার যে কি কর্ত্তব্য, তাহা তিনি সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন ও তদনুসারে কার্য্য করিতেন এই জন্যই তিনি কখন অকৃতকার্য্য হন নাই। বিখ্যাত ট্রাফালগার যুদ্ধে "ইংলণ্ড প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আশা করেন" (England expects every man to do his duty) এই সাঙ্কেতিক পতাকা স্বীয় রণতরীতে উড্ডীয়মান করিতে অনুমতি করেন। এই উপায় দ্বারা তিনি তাঁহার অধীন যাবতীয় নৌসৈনিক্ গণকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে উত্তেজিত করেন। সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল বলিয়া কোনও রণতরীতে কোনও বিশৃঙ্খলা হয় নাই। ইহারই ফলে ইংলণ্ড এই বিখ্যাত যুদ্ধে ফরাসী দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ডেকের উপরে যখন শত্রু পক্ষনিঃসৃত গোলা বৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া নেলসন সৈনিক বৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধনরূপ স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে ছিলেন তখন বিপক্ষের

একটী গোলাদ্বারা তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হন ও ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে যুদ্ধে জয় লাভের কথা বলা হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি' (Thank God I have done my duty).—যুদ্ধে জয়লাভ তাঁহার নিকট কর্ত্তব্য কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এইরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞান যতদিন না আমাদিগকে কার্যক্ষম করে ততদিন আমাদের উন্নতি সুদূর পরাহত।

এই কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রচার কেবলমাত্র অবাধ শিক্ষা Mass education বিস্তার দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে। প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবে, সুতরাং যে, যে পথ অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে সে তাহাতেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। অতএব যাহাতে সর্ব্বসাধারণে সুশিক্ষিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে প্রত্যেকেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত। অবাধ শিক্ষা প্রচলন দ্বারা যে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির মন কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইবে ও তাহার ফলস্বরূপ যে ব্যক্তি যে কার্য্যেই মনোনিবেশ করুন না কেন সেই কার্য্যই যে তিনি সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন ইহার নিদর্শন অনেক পাওয়া গিয়াছে। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে লর্ড মেকলে পার্লামেণ্ট মহাসভায় "শিক্ষা সম্বন্ধে রাজ্যের কি কর্ত্তব্য" (The duty of the state with regard to education.) এই বিষয়ে যে সার গর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি স্কটলণ্ডবাসিগণের সপ্তদশ শতাব্দীর অবস্থার সহিত তাহাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থা তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আজ যে জাতি পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত, কেবলমাত্র অবাধ শিক্ষা প্রচলন দ্বারা সেই অধঃপতিত জাতি অল্প কাল মধ্যে

কি বাণিজ্য, কি শিল্প, কি রাজকার্য্য সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু আমাদের দেশে যে শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত আছে তাহা দেশের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে শিক্ষার প্রকৃষ্ট পথ নহে। ইহার দুইটী প্রধান কারণ নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং আধুনিক শিক্ষায় বহু ব্যয় ও সময়ের আবশ্যকতা।

প্রচলিত প্রণালীতে যে প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা হয় না ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট দেখা যা বে; শিক্ষিত দিগেব মধ্যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের চিহ্ন অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বীয় কর্ত্তব্যজ্ঞানেব প্রতি অমনোযোগিতা নিবন্ধন শিক্ষিত দিগেব মধ্যে অনেক স্থলে চরিত্রের দুর্ব্বলতা, অমিতব্যয়িতা এমন কি সময়ে সময়ে মাদক প্রিয়তাও পরিলক্ষিত হয়। ইহা ঘটিবার কারণ এই যে এদেশে শিক্ষার সহিত নীতির আদৌ সংশ্রব নাই। বাল্যকাল হইতেই বিদেশীয় ভাষা অধ্যয়ন করিয়া বিদেশীয় ভাব, রীতি, গুণ ও দোষ সকল আমাদের মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়। জলের মত মনুষ্যের স্বভাব নিম্নগামী সুতরাং দোষ সকল শীঘ্র অনুকরণ করিতে সমর্থ। আমবাও তদ্রূপ শিক্ষার সহিত ইংরাজ দিগের দোষ সকলের অনুকরণ করিয়া থাকি। উহাদের গুণ সকল গ্রহণ কবিতে কুণ্ঠিত হই। উহারা স্বাধীন জাতি উহাদের গুণ সকল উহাদের সম্ভবে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই—সুতরাং আমরা শিক্ষিত হইলেও কি বাণিজ্য, কি শিল্প, কি উন্নত ও কঠিন বিদ্যাবিষয়ক শাস্ত্রচর্চ্চা কোন বিষয়েই উহাদের সমকক্ষ হইতে পারি না চেষ্টাও কবি না। যদি নীতি আমাদের শিক্ষাব প্রধান অঙ্গ হইত, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহাদের মনে সর্ব্বদাই

জাগরুক থাকিত ও তাহা হইলে তাঁহারা কি বাণিজ্য, কি শিল্প কি বিদ্যা চর্চ্চা সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন।

সম্প্রতি কোথাও কোথাও নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিরূপ নীতিশিক্ষা আমাদের প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে কিছু গোলযোগ আছে। নৈতিক নিয়ম সাধারণতঃ দ্বিবিধ—সার্ব্বভৌমিক ও প্রাদেশিক। সার্ব্বভৌমিক নীতি সকল দেশে, সকল সময়ে ও সকল লোকের পক্ষে খাটে। যেমন চুরি করা, বিনা কারণে নরহত্যা, মিথ্যা বলা, পরের মনে অকারণ কষ্ট দেওয়া প্রভৃতি সার্ব্বভৌমিক নীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু প্রাদেশিক নীতি দেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আমাদের দেশের পূর্ব্ব পুরুষগণ দৈহিক ও মানসিক মঙ্গলের জন্য যে সকল নিয়ম বহুদিবস ব্যাপী অভিজ্ঞতাও গবেষণাদ্বারা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সেই সকলই আমাদের দেশের প্রাদেশিক নীতি। যেমন মদ্যপান আমাদের দেশে অনাবশ্যক বরং অনিষ্টকর সুতরাং এখানে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; কিন্তু শীত প্রধান দেশে ইহার ব্যবহার অনেক স্থলে শরীর রক্ষার্থ বিশেষ রূপে আবশ্যক সুতরাং তথায় মদ্যপান বিশেষ দোষাবহ নহে। প্রকৃতির নিয়মানুসারে দেশ কাল পাত্রভেদে মনুষ্যের স্বভাব ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন সুতরাং প্রাদেশিক নীতি যে ভিন্ন ভিন্ন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বরং ইহার বিরুদ্ধাচরণই অমঙ্গল-দায়ক। সুতরাং দেশের আশা স্বরূপ শিক্ষিতদিগের চরিত্র গঠন দৃঢ় করিতে হইলে শিক্ষার সহিত আমাদের দেশেরই নীতি সংমিশ্রণ করিতে হইবে। শুধু শিক্ষার সহিত শুষ্কনীতির সংযোগ করিলে তত সুফলের সম্ভাবনা নাই। যাহাতে দেশের নীতির উপর শিক্ষেচ্ছুগণের আস্থা থাকিতে পারে তাহার জন্য বাল্যকাল হইতে তাহাদের মাতৃভাষার প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করা উচিত।

আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর অপর দোষ ব্যয় ও সময় বাহুল্য। দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য কি ধনী, কি নির্ধন সকল শ্রেণীরই শিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দেশে ধনবানের সংখ্যা অতি অল্প ও নির্ধনের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। পক্ষান্তরে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষার ব্যয়ভার এত অধিক যে কেবল ধনবানেরাই উহা বহন করিতে পারেন। ধনহীনের পক্ষে এরূপ ব্যয় সঙ্কুল শিক্ষায় স্বীয় সন্তান দিগকে শিক্ষিত করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। যাহাদের দৈনিক জীবিকা-হরণই এক বিষম সমস্যা তাহারা যে বহু ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ শিক্ষাদ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে ইহা আশা করা যায় না। সুতরাং এমন শিক্ষা প্রচলনের আবশ্যক যাহাতে সকলেই কিছু না কিছু উপকৃত হইতে পারে। দেশীয় ভাষায় শিক্ষা বিস্তার করিতে পারিলে কি ধনী কি নির্ধন সকল শ্রেণীরই লোক যে অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতে সক্ষম হইবে ইহা আশা করা নিতান্ত অন্যায় নহে। এইরূপ শিক্ষার প্রচলন দ্বারা সাধারণ শিক্ষা ৫।৬ বৎসরে শেষ হইতে পারে এবং যদি কাহারও উচ্চ বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় তিনি আরও ৫।৬ বৎসর অভ্যাস করিলে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন; আজকাল বিদেশীয় ভাষায় ততদূর শিক্ষা করিতে ১৭।১৮ বৎসর লাগিয়া থাকে। এই ১০।১২ বৎসর মধ্যে চেষ্টা করিলে ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষায়ও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবে, ন্যূনপক্ষে কার্য্যের মত যে যথেষ্ট ইংরাজী শিখিতে সক্ষম হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, চিকিৎসা, কৃষি, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যার স্বাধীনভাবে শিক্ষা দেওয়া হউক সঙ্গে সঙ্গে রাজভাষা যে ইংরাজী ভাষা ভাষারূপে তাহার শিক্ষা চলুক। এইরূপ শিক্ষা প্রণালীই দেশের উন্নতি সাপেক্ষ।

এইরূপ শিক্ষা পদ্ধতির বিপক্ষে দুইটী আপত্তি উঠিতে পারে। ১ম প্রাদেশিক ভাষা সকল এতদূর পরিপুষ্ট হয় নাই যে তাহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করা যাইতে পারে। ২য় রাজার সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত একপ উদ্দেশ্য কথনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

প্রথম আপত্তিটীর অর্থ যে প্রাদেশিক ভাষা সমূহে বিজ্ঞান, দর্শন গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের ভাবপ্রকাশক শব্দের অত্যন্ত অভাব। প্রাদেশিক ভাষায় যে এইরূপ শব্দের অভাব তাহার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু তাই বলিয়া কিছু আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে এই অভাব আপনা আপনি দূরীভূত হইবে না। অভাব যেমন বর্ত্তমান আছে আমাদেরও তেমন চেষ্টা ও কার্য্যকারিতা দেখাইবার সুযোগ রহিয়াছে। চেষ্টা দ্বারা আমাদের মাতৃভাষাকে এই সকল রত্নাভরণে ভূষিত করিলে যে শুধু আমাদের সজীবত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ বংশের ও উন্নতির সোপান উন্মুক্ত হইবে। সুতরাং বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রণয়ন শিশুদের জন্য কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় আপত্তির মর্ম্ম এই যে রাজা না অনুমোদন বা সাহায্য করিলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের কোন ফল নাই। রাজা হয়ত ভ্রম বশতঃ এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের অনুমোদন না করিতে পারেন; কিন্তু পরে ভ্রম বুঝিলে ইহার অনুমোদনও করিতে পারেন—সুতরাং রাজার মুখাপেক্ষী হইয়া আমাদের এবিষয় হইতে বিমুখ হওয়া উচিত নয়—সভ্যরাজা সুফল দেখিলেই অবশ্যই আহ্লাদ সহকারে আমাদের কার্য্যের অনুমোদন করিবেন। রাজার সাহায্য না পাইলে কি বিদ্যা শিক্ষার বিস্তার হইবে না?

মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে এতদিন পর্য্যন্ত চতুষ্পাঠী সকল চলিয়া আসিয়াছিল কিরূপে? দেশের মহানুভব ধনীবৃন্দই চতুষ্পাঠী সকলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা এখনও ইচ্ছা করিলে অক্লেশে অবাধ শিক্ষা বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিতে পারেন। দেশের উন্নতি কল্পে এইরূপ সাহায্য করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

বিহারিলাল।

শিক্ষামন্দিরে।

জগতের চক্ষে কিশোর বয়স পর্য্যন্ত বিহারিলালের কোন শিক্ষাই হয় নাই। কবি তাঁহার প্রকৃতি ও কার্য্যগুলিকে মানব গঠিত নিয়ম নিগড়ে আবদ্ধ রাখিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, সুতরাং সমাজ তাঁহার বাল্যশিক্ষা বিষয়ে সন্দিহান। কিন্তু সমাজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগৃহ ব্যতীত, প্রকৃতি মানবের অন্তর্জগতে যে একটী শিক্ষাক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, বহির্জগতের শিক্ষাক্ষেত্রের তাড়না পীড়িত আমরা সেই আভ্যন্তরীণ বিদ্যালয়টীর অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া যাই, ভিতরে যে বিবেক বলিয়া একটী শিক্ষক আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সাবকাশও পাই না। যে একটু স্বর্গীয় বহ্নিকণা আমাদের মনো-মন্দির প্রদীপ্ত করিয়া রাখে—

"তা শুধু শিশুই জানে!
যে দূর সঙ্গীত শোনে মনে মনে,
ফুটেতা বলিতে পারেনা বচনে,
হাসিয়া কাঁদিয়া যতই ব্যাকুল
চাহিয়া স্বরগ পানে।"

বয়োবৃদ্ধির সহিত সমাজ নিয়ন্ত্রিত বহির্জগতের তীব্রজ্যোতিঃতে ভিতরের সে আলোক বিন্দু নিষ্প্রভ বা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। বিহারিলালের সেই দুর্ভাগ্য ঘটে নাই। জননী প্রকৃতি বিহারিলালকে ক্রোড়ে করিয়া বলিয়াছিলেন—

আমিই লইব বাছুর আমার,
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি দুয়েরই ভার,
আমাসনে থাকি শৈলে, সমতলে,
মরতে, গগনে, কুঞ্জে, বনমাঝে,
বুঝিবে বাছনি এক মহাবলে.
উত্তেজিছে তারে বাধিছে বা কারে। *

তাই বিহারিলালের অন্তরস্থ আলোকে কোনরূপ ছায়া পড়ে নাই,—তিনি পঙ্কিল সংসারের রাশি রাশি আবর্জ্জনা ও আবিলতার মধ্য দিয়া তুষার খণ্ডের মত গড়াইয়া গিয়াছিলেন, মৃত্তিকার অণুমাত্র মলিনতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি দুরন্ত ছিলেন, অবাধ্য ছিলেন কুসংসর্গেও মিশিয়াছিলেন কিন্তু যেরূপ কার্য্যকে লোকে পাপ বলে, যে কার্য্যের জন্য, অপরের নিকট না হউক নিভৃতে বিবেকের নিকট মানবকে লজ্জাবনত হইতে হয়, সেরূপ কোন কার্য্য বিহারিলাল জীবনে কখন করেন নাই।

তাহার পর শিক্ষা,—ভাবী কবির যেরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত, যে শিক্ষা পাইলে, ম্যাথু আর্নল্ডের কথায় কবি স্বভাব বিবৃতি শক্তি (interpretative power) পাইতে পারেন, বিহারি লালের সুকুমার বয়সে ঠিক সেইরূপ শিক্ষাই হইয়াছিল। ভিতরের বহ্নিকণা টুকু গণিত ব্যাকরণের শীতলবারি সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত না করিয়া,

* Wordsworth.

তিনি মাতৃভাষার অনুকূল ক্ষেত্রে, দেশীয় কবিগণ প্রসূত ইন্ধনে, এবং গীত সঙ্গীতের মৃদুপবনে ধীরে ধীরে অধিকতর দীপ্তিমান করিয়াছিলেন। বাল্যের এই দেশীয় পুস্তক পাঠ বুভুক্ষা এবং সঙ্গীত শ্রবণ ও কবিত্ব আস্বাদন স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে এতই বলবান ছিল, যে ইহা ক্রীড়া বা আমোদের মধ্যে পরিগণিত না হইয়া, তাঁহার অন্তরে ইহাই ঐকান্তিক শিক্ষা ও কঠোর সাধনার স্থান অধিকার করিয়াছিল। উৎকল দেশীয় বনকুসুমের মধুর সুবাসে, বিজন কাননের পত্রমর্ম্মর শব্দে, বিহগ কলতানে, স্রোতবাহিনীর কুল কুল নাদে, বারিধির তরঙ্গ সংঘাতে সেই প্রাথমিক শিক্ষার সমাধান হইল।

প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বিহারিলালের, সমাজে যাহাকে শিক্ষা বলে, সেই শিক্ষা আরম্ভ হইল। জীবন সসীম, শিক্ষা অসীম, প্রত্যক্ষদর্শন অনন্তে বিন্দুর মত, এই সত্য এতদিনে বিহারিলালের হৃদয়ে প্রতিভাত হইল, তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা জাগিয়া উঠিল। কালক্ষেপ হইয়া গিয়াছিল, আন্তরিক উদ্যম ও পরিশ্রম সে ক্ষতি পূরণ করিল। তিনি বুঝিলেন, শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য উপযুক্ত গুরুর আবশ্যক, সৌভাগ্য ক্রমে তিনি মনোমত গুরুও প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমে কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব রাজসচিব শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিহারিলাল সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ খানি অধ্যয়ন করেন এবং কাব্য পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। পরে রিপন্ কলেজের প্রিন্সিপাল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অগ্রজ স্বর্গীয় রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাদমূলে তিনি শিষ্যরূপে উপবেশন করেন। রাম কমল বাবুর জ্ঞান ও গবেষণা অনন্যসাধারণ ছিল। তিনি বিহারিলালের যত্নে ও আগ্রহে প্রীত হইয়া হৃদয়ের সহিত

তাঁহাকে শিক্ষাদান করেন। বিহারিলাল বুঝিয়াছিলেন যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গণের ন্যায় কবিরাও শিক্ষক, এবং তিনি নিজ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া কাব্যালোচনা কার্য্যেই আপনাকে বৃত করেন। প্রগাঢ় অধ্যবসায় গুণে কয়েক বৎসরের মধ্যেই আর্য্য কবিগণের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিবার দ্বার বিহারিলালের নয়ন পথে উদ্ঘাটিত হইল। বিহারিলাল স্বাধীন ভাবে সংস্কৃত কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই কাব্যালোচনার আরম্ভ হইল যৌবনে, কিন্তু শেষ হইয়াছিল জীবনের সহিত। এবং তিনি চিরদিনই ইহাতে পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতির গ্রন্থাবলীই তাঁহার প্রিয়পাঠ্য ছিল, কিন্তু কবিগুরু বাল্মীকির রামায়ণই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম গ্রন্থ ছিল। তিনি বলিতেন রামায়ণের ন্যায় কাব্য গ্রন্থ জগতে আর নাই। বিহারিলালের কাব্যে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রামায়ণের প্রভাব তাঁহার জীবনে এত অধিক যে উহার কথা স্বতঃই তাঁহার কবিতায় দুই এক স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেষ জীবনে চাঁদের মুখ দেখিতে দেখিতে, রামায়ণের কথা বিহারিলালের মনে কত নৈসর্গিক ভাবে উদিত হইয়াছিল, এবং সেই চিন্তা কত সুন্দর ভাবে কবিতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার "নিশীথ সঙ্গীত" নামক কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

সব চেয়ে সুধাকর　　তব মুখ মনোহর,
বিহ্বল হইয়া যাই হেরিলে তোমায়;
ভূত ভাবী বর্ত্তমানে　কত কথা জাগে প্রাণে,
জানকী অশোক বনে দেখেছে তোমায়।

কেকয়ী বিষাক্ত শর জব জব মর মর
থব থব কলেবব পাগলের প্রায়—
কি চক্ষে হে। দশরথ দেখিল তোমায়,
তুমিই বলিতে পাব তুমিই বলিতে পাব
ভাবিয়া বিহ্বল মন বুঝা নাহি যায়।
ওইবে জীবন দীপ নেবো নেবো প্রায়,
ওইবে অন্তিম আশা আঁধাবে মিশায়,
মনেব সকল সাধ ফুবায ফুবায়—
কোথা বাম বাজা হবে বনে কেন যায়!

সংস্কৃতেব সঙ্গে সঙ্গে বিহারিলাল ইংরাজি শিক্ষাও অভিনিবেশের সহিত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভাষা শিক্ষার প্রথম কয়েক সোপান তিনি পূর্ব্বেই অতিক্রম করিয়াছিলেন; এক্ষণে অন্তবেব প্রবল আগ্রহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি কয়েক বৎসবেব মধ্যেই ইংবাজি ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। এই ভাষা শিক্ষা বিষয়ে বিহারিলাল প্রথমে ৺ বাম-কমল বাবুব নিকট, পবে তাঁহাব পরম সুহৃদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল বাবুব নিকট সবিশেষ সহায়তা লাভ কবেন; বিহারিলালেব ইংবাজি শিক্ষাব প্রধান উদ্দেশ্য শ্বেতদ্বীপেব কবিদিগের সহিত সখ্যতা স্থাপন। ইংলণ্ডীয় বিপুল গদ্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিব তিনি উল্লেখ যোগ্য কোন অনুশীলন কবেন নাই, এবং শেলী, কীট্‌স্‌, টেনিসন্‌ প্রভৃতি নবযুগের কবিদিগেব সহিতও তাঁহাব পবিচয় ছিল না। বিহারিলালের ইংবাজি সাহিত্যে অভিজ্ঞতা কয়েকটী মাত্র সংখ্যা সাপেক্ষ লেখকগণেব মধ্যেই সীমা নিবদ্ধ ছিল। তিনি মেকলেব সন্দর্ভগুলি (Macaulay's Essays) এবং হিউম ও স্মলেট্‌এর (Hume and Smollet's History of England) ইতিহাস মধ্যে

মধ্যে পাঠ করিতেন। এবং একসময়ে তাঁহার ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠের নিরতিশয় আগ্রহ হইয়াছিল। তিনি অহোরাত্র এই পাঠে নিযুক্ত থাকিয়া গ্রীসের বড় ইতিহাস খানি আদ্যোপান্ত এবং আরও কয়েকখানি ইতিহাস পাঠ করেন। কিন্তু সৌহার্দ্য ছিল তাঁহার, পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্যের গৌরবটীকা সেকস্‌পীয়রের সহিত। বায়রন্‌ এই সখ্যতার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং গোল্ডস্মিথ্‌ তৃতীয় স্থান।

সেকস্‌পীয়রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হ্যামলেটের অধিকাংশ স্থল বিহারিলালের কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি তাঁহার পুত্রগণকে হ্যামলেটের অর্থবোধ করাই-তেন। "হ্যামলেট" নাটকের প্রতি অনুরাগ বিহারিলালের অন্তরে এরূপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত হইয়াছিল, যে তিনি অনুকরণের একান্ত বিদ্বেষী হইয়াও, তাঁহার যৌবন রচনা প্রেমপ্রবাহিণীতে হ্যাম্‌লেট নাটকের দুইএকটী পংক্তি অনুবৃত্তি করিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারেন নাই।

বায়রণের প্রতি বিহারি লালের আকৃষ্ট হইবার প্রধান কারণ বোধ হয় ঐ ইংরাজ কবির জ্বলন্ত প্রতিভা ও জ্বালাময়ী ভাষা। বায়রণের উদ্দাম ও অসংযত দুঃখনীতি এবং অপ্রীতিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস এই অনুরাগের অন্যতম কারণ। এই কয়টী বিষয়েই বিহারিলালের ন্যূনাধিক সহানুভূতি ছিল। কিন্তু নীতিজ্ঞান ও সৌন্দর্য্য প্রেম প্রভৃতির উচ্চতম অনুভূতি বিষয়ে উভয় কবির মধ্যে স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যবধান। যাহা হউক বিহারিলাল বায়রণকে বড় ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কবি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। এই বায়রন্‌ প্রিয়তাও বিহারিলাল তাঁহার যৌবন রচনায় প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন নাই। নিসর্গ সন্দর্শনে বিহারিলাল সাগরকে সম্ভাষণ করিয়া "গড়াও

গড়াও তুমি আপনার মনে” প্রারম্ভিত যে কয়েকটী ছত্র লিখিয়াছেন তাহাতে বায়রণের চাইল্ড হ্যারল্ড (Child Harold) কাব্যের "Roll on thou dark and deep blue Ocean" প্রারম্ভিত অমর পংক্তি কয়েকটীর যেন একটী ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

গোল্ডস্মিথের Vicar of Wakefield পুস্তকের এডুইন্ এবং এঞ্জেলিনা নামক সুপরিচিত গাথাটীর বিহারিলালকে অবোধবন্ধু পত্রিকার ধর্ম্মাচার্য্য নামক গল্প লেখকের অনুবাদ কার্য্যে সহায়তা করিতে হয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত বিহারিলালের সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত। বিহারিলালের পরবর্ত্তী রচনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের আভাষ আদৌ নাই। অনুবাদের প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই, অনুকরণের প্রতি তাঁহার প্রকৃতিগত ঘৃণা ছিল। জীবনের অপরাপর কার্য্যের ন্যায়, কবিতা রচনাতেও তিনি তাঁহার স্বাবলম্বন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় নবীন কবিদিগের পাশ্চাত্য অনুকরণ স্পৃহায় ব্যথিত হইয়া গাহিয়াছিলেন—

এখন ভারতে ভাই কবিতার জন্ম নাই,
গোবে বোসে অট্টহাসে কেবে কার্ ছায়া ?
হা ধিক্। ফেরঙ্গ বেশে এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস্ সব উঙ্কিমুখী আয়া ?
নেকড়ার্ গোলাপ ফুলে বেঁধে খোঁপা পরচুলে
ছিটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল ;
পরস্পরে গলাধরি' নাচিছেন যেন পরী
কি আশ্চর্য্য বিধাতার বুঝিবার ভুল।
কেন এ অলীক ভূষা সরস্বতী অকলুষা,
ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে

হেলিয়া নলিনী রাণী কোন্ প্রাণে খুঁজে আনি
গাঁথিয়া যোপাটী মালা দিব শ্রীচরণে ?
দু মিনিটে ঝরে যা'বে মরে যাবে ক্ষুদ্র প্রাণী,
দিওনা মায়ের পায়ে প্রমাদি কুসুম আনি।

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবিগণের মধ্যে কবিকঙ্কণকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিতেন এবং অধুনাতন কালের কবিদিগের মধ্যে মধুসূদনের কাব্য গুলি পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। কবিকঙ্কণ, চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ এতদিন বঙ্গদেশে ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষের নিকট আদর পাইয়া আসিতে ছিলেন ; তাঁহাদেব রচনা গুলিকে সার্ব্বজনীন সাহিত্য হিসাবে আলোচনা করিবাব প্রথম পথপ্রদর্শক দিগের মধ্যে বিহারিলাল একজন অগ্রণী।

বিহারিলাল ইংরাজিতে কথোপকথন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে ঐ ভাষায় রচনা করিতে পারিতেন, এরূপ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

যৌবনে।

ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বিহারিলালের ৺কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের কন্যা অভয়া দেবীর সহিত প্রথম বিবাহ হয়। বিহারিলালদের আবাস ভবনের সংলগ্ন বাটীতেই পাত্রীদের বাসস্থান ছিল, এবং উভয় পরিবার পূর্ব্ব হইতেই নিকট সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ; সুতরাং নববধূ অপরিচিতার ন্যায় পতিগৃহে আসেন নাই। কিন্তু বিহারিলালের কাব্যরসাসক্ত অন্তরে পূর্ব্বরাগের সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহার পত্নী পক্ষে সে বিষয়ে বিষম অন্তরায় ছিল, পরিণয় কালে পাত্রী দশমবর্ষীয়া বালিকা মাত্র। বালিকা সুরূপা, কিন্তু এতই কুসংস্কারাপন্না যে স্ত্রীলোকে বিদ্যাভ্যাস করিলে বিধবা হয় এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধ মূল। ক্রমে

পতির উপদেশ ও শিক্ষায়, বালিকার হৃদয় হইতে অজ্ঞানান্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া আসিল, নবযৌবন বিকাশে পতিসোহাগিণীর অন্তর স্বামী প্রেমানুরাগে ভরিয়া আসিল, বালিকা চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে সন্তান-সম্ভবা হইলেন।

কিন্তু দীননাথ ঠাকুরের সংসারশান্তিসুখে বোধ হয় এখনও কোন অভিশাপ ছিল। তাঁহার নিজ ভাগ্যে যেরূপ ঘটিয়াছিল, প্রিয় পুত্র বিহারিলালের অদৃষ্টেও এবার তাহাই ঘটিল; বিহারিলালের বালিকা পত্নী একটি মৃত সন্তান প্রসবের পর সুতিকা গৃহে বিকার-গ্রস্ত হইয়া সতীস্ত্রীর পুণ্যলোকে গমন করিলেন। বিহারিলালের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস তিনি তাঁহার "বন্ধু বিয়োগ" কাব্যে, "সরলা" নামক সর্গে লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন। কবিতাটি সরল কারুণ্যে পরিপূর্ণ।

বিহারিলালের প্রথমা পত্নী বিয়োগ জনিত মনঃক্লেশ স্থায়ী হইতে পায় নাই। এই শোক ঘটনার অল্পদিন পরেই পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়, দীননাথ ঠাকুর তাঁহার পত্নীহারা পুত্রকে পুনরায় পরিণয় বন্ধনে গ্রথিত করিলেন। এ বিবাহও এই রাজধানীতেই হইল,—বহুবাজার নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কাদম্বরী দেবীর সহিত। বিহারিলালের হৃদয় তরুণ বয়স হইতে যে রমণী প্রতিমার অন্বেষণ করিতে ছিল, এতদিনে বিহারিলাল সেই মূর্ত্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন। নবপত্নী স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ-সুষমা গুণে অচিরেই সহৃদয় পতির অন্তর হইতে যাহা কিছু বিষাদের ক্ষীণছায়া অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিদূরিত করিলেন। সৌন্দর্য্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী বিহারিলালের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, তাঁহার প্রতি নিয়তিদেব এইবার কত দূর সুপ্রসন্ন।

দীননাথ ঠাকুরের মনেও বিলুপ্তপ্রায় সংসারসুখাশা পুনরায় উদিত হইল। লক্ষ্মী সদৃশা পুত্র বধূর শুভ আগমনে তাঁহার শ্রীহীন সংসার, এইবার শ্রীমন্ত হইল। এবং শিশু পৌত্রের ক্রীড়া হাস্যে অনতিবিলম্বেই তাঁহার নিবস ভবনে সুখশান্তির উৎস উৎসারিত হইল। পিতামহের অঙ্কে তাঁহার পৌত্র-প্রোত্রিগণের প্রথম আগন্তুক শ্রীমান অবিনাশচন্দ্রকে দেখিয়া এবং বালক বালিকা পরিবৃত আনন্দ কোলাহলময় সংসারের ভাবী সুখস্বপ্নে ব্রাহ্মণকে মগ্ন রাখিয়া, আমরা তদীয় যুবক পুত্রের সাময়িক সাহিত্যসেবা সম্বন্ধে এস্থলে দুই একটি কথা বলিব।

বিহারিলালের যৌবনকালটি পরিশ্রমে ও সদ্ব্যবহারে অতিবাহিত হয়। তিনি যৌবনের অধিকাংশ সময় জ্ঞানার্জ্জনে এবং অবশিষ্ট কাল সাহিত্য সেবায় একান্ত মনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার বাল্য বয়সের সঙ্গীত রচনার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কবির দ্বিতীয়দার পরিগ্রহণের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের রচনা সেই সঙ্গীত গুলি ও আরও কয়েকটি গীত, "স্বপ্নদর্শন" নামক একখানি গদ্য পুস্তিকা, "পূর্ণিমা" নামক একখানি স্বল্পায়ু মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি গদ্য প্রবন্ধ ও কবিতা, এবং "বন্ধুবিয়োগ" নামক একখানি খণ্ড কাব্য, "সঙ্গীত শতক" এর কতকগুলি গীত, "নিসর্গ সন্দর্শন" ও "প্রেম প্রবাহিনী" নামক আর দুই খানি খণ্ড কাব্য, এবং "বঙ্গসুন্দরী"র কয়েকটী কবিতা, বিহারিলালের দ্বিতীয় পরিণয় ও পুত্রলাভের অব্যবহিত পরেই রচিত হয়। কবির সাহিত্যউদ্যানের এই প্রথম মুকুল ও প্রসূন গুলির পরিচয় আমরা স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিব।

ক্রমশঃ

পরিবর্ত্তন।

(গল্প)

এলাহাবাদ, ১০ই আশ্বিন, ১২৮০ সাল।

আজ হঠাৎ কেন যে আমার আত্মকাহিনী লিখিবার সাধ হইল তাহা বলিতে পারি না। এ তিক্ত, জর্জ্জরিত, দগ্ধজীবনের কথা পড়িবে কে? লোকে দুঃখী দেখিলে দয়া করে, দুইটা সহানুভূতির কথা বলে, কিন্তু আমাকে দেখিলে, লোকের সান্ত্বনাবাক্য রসনাগ্রে আসিয়াও রুদ্ধ হইয়া যায়—আতঙ্কে, ঘৃণায়, লোকে দশ হস্ত সরিয়া যায়। আমি কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্ত। যদি কখন কোন পাঠকের হস্তে এই পাণ্ডুলিপি পড়ে, তিনি হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন; কাগজে বিষাক্ত জীবাণু আছে মসীতে পূতিগন্ধ আছে ভাবিয়া, সন্ত্রস্ত ভাবে, বরবপুর নিকট হইতে ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করিবেন। কিন্তু এই অস্পৃশ্য জীবের যে কি ভয়ানক যন্ত্রনা তাহা সুখ-স্বাস্থ্যবান পাঠক, আপনি কি বুঝিবেন। আমার মর্ম্মতলে কি যে বেদনা, গাত্রক্ষত দেখিয়া তাহার সহস্রাংশের একাংশও অনুমিত হয় না, সে দুঃখ প্রকাশ করিবার ভাষাও আমি জানি না। আমারও একদিন, প্রফুল্লমুখে যৌবন কান্তি ঢল ঢল করিত। আমিও একদিন ধন-জন-সুখ-স্বাস্থ্যে ঐশ্বর্য্যবান ছিলাম। সেও বেশীদিন নহে পাঁচ বৎসরের কথা।

হায়! বাল্য বয়সের সেই শারদসপ্তমী প্রভাতের ঘটনা মনে পড়ে। বাটীতে মহোৎসবে দুর্গোৎসব, আমি দীর্ঘিকা হইতে অগণিত কুমুদ কহ্লার চয়ন করিয়া, বক্ষে মস্তকে স্কন্ধে সেই ফুলভার বহন করিয়া আর্দ্রবসনে চঞ্চলচরণে দেবীসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম—পশ্চাতে পরিচারকগণ সশঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে পাছে পিতা

আমাকে তদবস্থ দেখিয়া, তাহাদের কর্ত্তব্য হানির জন্য বিরক্ত হয়েন। সুসজ্জিত দালান ও বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন জনাকীর্ণ। সকলে দেবীকে ছাড়িয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। জনৈক ব্রাহ্মণ মনোভাব গোপন রাখিতে না পারিয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বিজয়কৃষ্ণ বাবু আপনার পুত্রটী সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয়, আমরি মরি! বালকের এমন রূপত কোথাও দেখি নাই।" কথাটি অন্তঃপুরে পৌছিতে বিলম্ব হইল না। মা আমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "বাবা নলিনী, লক্ষী আমার, এলোগায়ে বাইরে বেরিও না, লোকে নজর দেবে।"

আর মনে পড়ে আমার সেই বিবাহ উৎসবের কথা। লোকে বলিয়াছিল "এমন ঘটার বিবাহ বারিন্দীপুরে কখন হয় নাই," দীন দুঃখীরা মুক্তকণ্ঠে পিতার জয়ধ্বনি করিয়াছিল। পাকস্পর্শের দিন ঘোষালপুরের সীতানাথ বাবু পিতাকে উদ্দেশ করিয়া যে কথা বলিয়া ছিলেন, তাহা এখনো কাণে বাজিতেছে—"অমন দয়ালু লোক নহিলে কি লক্ষীর অত কৃপা হয়, না অমন রূপে গুণে বিদ্যায় রত্নবিশেষ ছেলে হয়; বউটীও কি ঠাকুর তেমনি মিলিয়ে দিয়েছেন যেন ঠাকরুণ প্রতিমে।" ও! পাঁচ বৎসরে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন। বিবাহের, দুইমাস অতীত না হইতেই পিতৃদেব, প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার বিজয় কৃষ্ণ রায়কে নিজ কাছারিঘরে বিচারাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় এক উচ্চতম বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য জোর তলব হইল, একটী কথা বলিবার অবকাশ দিল না। সিবিল সার্জ্জন মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোন অজ্ঞাত কারণে পিতার হৃৎপিণ্ড সহসা স্বকার্য্য সাধনে বিরত হইয়াছিল। পতিপ্রাণা জননী ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সে শয্যা তাঁহাকে অচিরেই ত্যাগ করিতে হইল। আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় তাঁহার নয়ন জল নয়নেই শুকাইয়া গেল।

আমার,—তাঁহার একমাত্র বংশধর জীবন সর্ব্বস্ব আমার দেহে, মহা-ব্যাধির অভ্রান্ত পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পিতা বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, মা আমার জন্য কত অর্থই ধুলিমুষ্টির ন্যায় ব্যয় করিলেন। কত ডাক্তার বৈদ্য হাকিম হোমিওপ্যাথ্‌ দেখিল, কত বড় বড় সাহেব Specialist কে তাঁহাদের গুণপনা দেখাই-বার জন্য প্রচুর অবসর দেওয়া হইল। পীড়ার কিছুই হইল না। জননীর অনুরোধে কত মাদুলী কবজ ধারণ করিলাম, কত মন্ত্রতন্ত্র চরণামৃত পদরজের শরণাপন্ন হইলাম। কত "জাগ্রত" ঠাকুরের কাছে মা 'হত্যা' দিলেন কত পীর পয়গম্বরকে 'সিন্নি' স্বীকার করিলেন, কত দেবদেবীকে বৈদ্যস্থলাভিষিক্ত করিলেন। পরে আত্মবিশ্বাসে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণের দায়ে পাশ্চাত্য পরিমার্জ্জিত মন্ত্রতন্ত্রেরও (Mesmerism, Spiritualism) আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তিন বৎসর এইরূপ ভাবে চলিল। এতদিন ব্যাধি গলিতাকার ধারণ করে নাই কিন্তু বিচক্ষণ ভিষ-কেরা বলিয়াছিলেন উহা সেই শ্রেণীর (Leprosy Tuburcular) এবং এইবার স্পষ্টতঃই পীড়া সেই আকারে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। মাতা ও এই সময়ে সংসার যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। আমার বুকে দুইখানি পাথর চাপিয়া ছিল এক খানি খসিল, আরএক খানি রহিল। কেনই বা বিবাহ করিয়াছিলাম সেই একাদশবর্ষীয়া বালিকার অনিন্দ্যসুন্দর সরল মুখখানি মনে পড়ে। বিবাহের পর আর তাহার সহিত দেখা হয় নাই ; শ্বশুর মহাশয় তাহাকে আমাদের বাটীতে পাঠাইবার জন্য বার বার উপযাচক হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলাম বলিয়া আমি একেবারে অপদার্থ হৃদয়হীন স্বার্থপর হই নাই, আমি শ্বশুর মহাশয়ের প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম।

হায়! কেন সেই সোণার প্রতিমাকে অকূল পাথারে ভাসাইলাম। লোকে বলে আমাদের বিবাহ অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্মবন্ধন, ইহাপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের বিবাহ আর জগতে কোন দেশে নাই; আমি বলি হিন্দুর ধর্ম্মবিবাহ অপেক্ষা অহিন্দুর সামাজিক চুক্তি পরিণয় শতগুণে শ্রেষ্ঠতর। এদেশে যে উন্নতিশীল সম্প্রদায় সেই বিবাহ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি, তবে তাঁহাদের আর একটু অগ্রসর হওয়া উচিত, অনুকরণটা পূরা চাই, চুক্তিবন্ধন ইচ্ছামত শিথিল ও ছিন্ন করিবার প্রথাটাও প্রচলিত হওয়া উচিত। আহা! সে বিধির যদি আমাদের সমাজে প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে আমার বুকের ভার কত সহজে লাঘব করিতে পারিতাম। কত আনন্দে আমি আমার বালিকা পত্নীকে চুক্তি বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া আসিতাম! কিন্তু তাহা হইল না, তাহাকে আমার বিপুল বিভবের অর্দ্ধাংশের ভাবী অধিকারিনী করিয়া, এবং অবশিষ্ট অংশ আত্মীয় স্বজন ও পরিবার বর্গকে ও দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণার্থে উইল করিয়া, প্রায় দুই বৎসর হইল আমি পৈত্রিক ভবন হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছি। পাছে শ্বশুর মহাশয় সন্ধান লইয়া আমাকে বিরক্ত করেন এই ভয়ে আমি আমার গন্তব্য স্থানের কোন কথাই বলিয়া আসিনাই, কেবল সংবাদ দিলে প্রয়োজন মত টাকা পাঠাইবার জন্য ম্যানেজারকে আদেশ দিয়া আসিয়া ছিলাম। কিন্তু সে টাকা চাহিবার আবশ্যক হয় নাই; ভারতের স্থানে স্থানে সকল ব্যাঙ্কেই প্রায় নিজ নামে টাকা জমা রাখিয়া ছিলাম এবং নিজেও প্রচুর অর্থ লইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাতেই চলিয়া গিয়াছে এবং আরও বহু দিন চলিবে। আমার সঙ্গে এক মাত্র অনুচর "দীননাথ"। পিতার পরলোকগত নায়েবের সন্তান, দীনু, মাতৃ পিতৃ-

হীন হইয়া আমাদের বাটীতেই প্রতিপালিত হয়; সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, ও আমাপেক্ষা কয়েক বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। দীনুর গুণের কথা আর কি বলিব, বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে উহার সহিত আমার রক্ত সম্বন্ধ ছিল। দীনু আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে; সে যেরূপ ঘৃণা বিরক্তি পরিত্যাগ করিয়া কয়বৎসর রাত্র দিন আমার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে আমার সহোদর থাকিলে সে আমাকে অত যত্ন করিত কিনা,—ছায়ার ন্যায় আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিত কিনা সন্দেহ। এই জীবন মরুভূমে দীনুই আমার সজল শ্যামল ওয়েসিস্, আমার ব্যথার ব্যথী বিপদে সহায়, অন্ধের যষ্টি। দীনুর ঋণ আমি কখন পরিশোধ করিতে পারিব না সে অকৃত্রিম স্নেহ মমতা টাকায় বিনিময় হয় না। আমি তাহাকে উইলে বাৎসরিক দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছি। দীনু তাহা জানে না এবং সে অর্থের প্রত্যাশী বলিয়াও বোধ হয় না।

আমি উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে ভারতের কত স্থানেই ফিরিলাম। পীড়া কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিয়াছে; আমাকে পঙ্গু করে নাই কিন্তু আমাকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। রোগের অসহ্য যন্ত্রনায়, মনের ঘৃণায় এক এক বার ইচ্ছা হয় নিজেই এই তুষানল দগ্ধ জীবনের শেষ করি। কিন্তু তাহাও পারি না; প্রাণের মমতায় জন্য নহে, এই ঘৃণিত যাতনাময় জীবনে আবার মমতা কি? লোকান্তরে নরক ভোগের ভয়ে নহে,—যে নরক ভোগ করিতেছি ইহাপেক্ষা নিকৃষ্টতর নরক কল্পনায় আসে না; কিন্তু আত্মহত্যা ভীরু অসহিষ্ণু কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া আমার বিশ্বাস, আর কাপুরুষ দিগের উপর আমারএই অস্পৃশ্য ব্যাধিময় দেহ অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা। তাই মরিতে পারি না। অথচ পীড়ার চরমসীমা আসিয়াও আসে না।

এরূপ অবস্থায় কত দিন থাকিব। কিছু দিন একস্থানে থাকিলেই লোকে আমার বিকৃত গাত্রচর্ম্ম, পরে প্রকৃত দুরবস্থা লক্ষ্য করে, তাহাদের ঘৃণাব দৃষ্টি সহ্য করিতে পারি না। স্থান পরিবর্ত্তন করি। দুই মাস এলাহাবাদে আছি, শীঘ্রই মুঙ্গেরে যাইব স্থির করিয়াছি। সেখানে আমার কেহ পরিচিত লোক নাই।

মুঙ্গেব, ২০শে চৈত্র, ১২৮০।

আজ প্রায় ছয়মাস হইল মুঙ্গেরে অসিয়াছি। এত দিন ইতি পূর্ব্বে কোন স্থানেই থাকি নাই। এ স্থানের কিছু আকর্ষনী শক্তি আছে, অথবা আমার মনের কোনরূপ পবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিছুই ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। প্রত্যহ অপরাহ্ণে তরণীযোগে "মন্ পাথল্"এ বেড়াইতে যাই। সেই ভাগীরথী গর্ভস্থ স্রোত পরিবেষ্টিত নির্জ্জন শৈলময় দ্বীপোপরি সায়ংকাল অতিবাহিত করি। "মন্ পাথল্"এ সূর্য্যাস্ত শোভা দর্শন করিয়াই কি মনের এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল? সে শোভার কিছু বিচিত্র ক্ষমতা আছে বৈ কি,—এক দিকে সান্ধ্য গগনের রক্তিম ছায়ায় জাহ্নবীর চঞ্চল জলরাশি উজ্জলিত করিয়া তপন দেবের বিদায় হাস্য, অপর দিকে বঙ্গদেশীয় মুসলমান গৌরবের শেষসাক্ষ্য—নবাব মীরকাসিমের সুদীর্ঘ দুর্গ প্রাকার; এক পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ বিজন সৈকত ভূমি, অপর পার্শ্বে মুঙ্গের সহর,—দূরে প্রাসাদচূড় পীরপাহাড়, ও অন্য দিকে জামালপুরের দিগন্ত ব্যাপী শৈলতরঙ্গ—জরাসন্ধ গড়; পদতলে চতুষ্পার্শে তটশালিনী, ভাগীরথী-উরসে তরঙ্গ খেলা, উপরে অনন্ত আকাশে বিচিত্র মেঘমালা! এ মহান দৃশ্যে দুঃখ সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি আসিতে পারে বটে, কিন্তু আমার মনের উপর বাহ্য প্রকৃতির কোন রূপ ক্ষমতা আছে বলিয়া বোধ হয়

না। আমি আরো কত বিজন প্রকৃতিশোভার চিরনিকেতন, কত শান্তিময় স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি কোথাও আমার ব্যাধিপীড়িত হৃদয়ের দহন জ্বালা প্রশমিত হয় নাই। আর শুধু মনের নহে, দেহের ও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মুঙ্গেরে আসিয়া প্রথম কয়েক সপ্তাহ কি ভয়ানক গাত্র যন্ত্রনাই ভোগ করিয়া ছিলাম, কিন্তু পরে অল্পে অল্পে গাত্রের ক্ষত ও ব্যাধি চিহ্নিত স্থান গুলাব প্রদাহ নিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। রোগের হ্রাস বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এরূপ ত কখন হয় নাই। বহুদিনের পর পুনরায় যেন আমি শরীরে বল পাইয়াছি, মনেও যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি আসিতে চেষ্টা করিতেছে, কত বিস্মৃত সুখস্বপ্নের কত পরিত্যক্ত বাসনার, প্রস্রবন আমার এই বিশুষ্ক অন্তরকে প্লাবিত তরঙ্গায়িত করিতেছে, আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি না আমার কি হইল।

মুঙ্গের, ২১শে চৈত্র ১২৮০।

আজ আমি কষ্টহারিনীর ঘাটের অনতিদূরে একটী আঘাটায় স্নান করিতে ছিলাম, এমন সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমাকে সৌৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় আমি মাসদ্বয় কাল আপনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সুযোগ পাই নাই, শুনিলাম আপনি পীড়িত, ও স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনাকে দেখিলেত পীড়িত বলিয়া বোধ হয় না। আপনার কি পীড়া, মহাশয়?"

আমি লোকটীকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলাম, মনে করিলাম লোকটী বিদ্রূপ করিতেছে, কিন্তু তাহার শান্ত সরল

মুখভঙ্গী দেখিয়া লোকটীকে ভদ্র সন্তান বলিয়া বোধ হইল। আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া লোকটী নিজেই বলিল—

"আপনার আপত্তি থাকেত বলিবার প্রয়োজন নাই, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমিও বিদেশী, জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া এখানে সারিবার আশায় আসিয়াছি, আমি চিকিৎসা ব্যবসায়ী—।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া লোকটীকে বাধা দিয়া বলিলাম "মহাশয় আমাকে অভদ্র ভাবিবেন না, আমি বড় একটা কাহারো সহিত আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। আমার পীড়া সর্ব্বাঙ্গে জাজ্বল্যমান, আমি আজ পাঁচ বৎসর গলিতকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত।"

লোকটী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আমার অনাবৃত অঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল "মহাশয় আপনার চিকিৎসক দিগের ভ্রম হইয়া থাকিবে, আপনার অন্য কোনরূপ চর্ম্ম রোগ হইয়া থাকিবে, কুষ্ঠ রোগ নহে, গলিত কুষ্ঠ কি আরাম হয়।"

আমি বড় বড় ডাক্তার কবিরাজদের কথা স্মরণ করিলাম, এবং লোকটির ভৈষজ্যবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইয়া আমার হাস্য আসিল। আমি অবজ্ঞার স্বরে বলিলাম "হইবে," এবং প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ত্বরিতপদে বাসায় ফিরিলাম। ব্যবহারটা কিছু রূঢ় হইয়াছিল, আর সেই অবধি মনেও যেন কেমন একটা সন্দিগ্ধ ভাব রহিয়া গিয়াছে। বাসায় আসিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম, কোথাও অস্বাভাবিক স্ফীত, বর্ণপার্থক্য বা ক্ষত নাই! ব্যাধি চিহ্ন গুলি অবধি প্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে পীড়ার প্রাবল্য প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু এরূপ ত কখন হয় না। আমার হইল কি? আমি কি বাতুল হইলাম!

মুঙ্গের, ২২শে চৈত্র, ১২৮০।

দীনুটাও বোধ হয় পাগল হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদ হইতে এখানে আসিবার দিন কয়েক পূর্ব্বে এক দিন আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছিল,—আমি উদাস নয়নে বসিয়া ছিলাম। এমন সময়ে দীনু আসিয়া কাছে বসিল, ভ্রাতৃস্নেহে আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, কত সান্ত্বনা করিল। তাহার অকৃত্রিম যত্নে আমি সেদিন বিগলিত হইলাম। আমি কৃতজ্ঞতার ভার লাঘব করিবার আশায় তাহাকে উইলের কথা বলিয়া ফেলিলাম। দীনু শুনিল যে আমার অবর্ত্তমানে সে একজন ধনীলোকের মধ্যে পরিগণিত হইবে—জমিদার হইবে। হায়! কেনইবা তাহাকে সে কথা বলিলাম, লোকটা সুখে ছিল, সেই দিন হইতে তাহাকেও দুঃখী করিলাম। লোকে বলে টাকায় সব পাওয়া যায়। আমি বলি টাকায় যখন সুখ পাওয়া যায় না, সন্তোষ পাওয়া যায় না, তখন কিছুই পাওয়া যায় না। টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলাম, কই টাকাত আমাকে রোগমুক্ত করিতে পারে নাই—টাকাত আমার ব্যাধিক্লিষ্ট জীবনে একদিনের তরেও শান্তি দিতে পারে নাই। আর এই দীনুটা বেশ স্বচ্ছন্দে ছিল, যেমন ভাবী অর্থলাভের কথা বলিলাম, লোকটার সুখ যেন সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব টাকার ভারে নিষ্পেষিত বিমথিত হইয়া গেল। সেই অবধি যে কয়দিন আমরা এলাহাবাদে ছিলাম, সে থাকিয়া থাকিয়া কোথায় চলিয়া যাইত। যখনি তাহাকে দেখিতাম, সে যেন অন্যমনস্ক, যেন কি অনির্দ্দিষ্ট বিপদভয়ে সদাই সে সশঙ্কিত। স্থান পরিবর্ত্তন করিলাম, লোকটার বিমর্ষভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। সে দিন দিন শীর্ণ, মলিন, কি যেন একরকম হইয়া যাইতেছে। আমার দিকে সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে না, আমি তাহার দিকে চাহিলে, সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

আমার উপর যত্ন পূর্ব্বেরই ন্যায় আছে বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার এরূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন সদুত্তর দিতে পারে না, কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে; নিশ্চয়ই টাকার ভাবনাতেই তাহাকে এরূপ করিয়াছে। আমি তাহাকে অমৃত ভ্রমে গরল দিয়াছি! দান প্রতিগ্রহণ করিতে নাই, নতুবা আমি তাহাই করিতাম।

মুঙ্গের, ১লা বৈশাখ, ১২৮১।

একটা ভয়ানক সত্যের আবিষ্কার করিয়াছি। আমার মস্তিষ্কের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। সে দিনরাত্রে ঘরের বাহিরে বসিয়া ভাবিতেছি। রজনী অন্ধকারময়ী, কিন্তু নালাকাশে শত সহস্র চক্ষু মেলিয়া, যেন অসংখ্য লোক আমার দিকে করুন দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। অনতিদূরে একজন অমিয়কণ্ঠে প্রাণ ঢালিয়া গাহিতেছিল—

"সই, চাহনি মোহনী থোর!
মরমে বান্ধিনু　　হেরিয়া ভুলিনু
রূপের নাহিক ওর।"

সেই গীতের মুর্চ্ছনায় মুর্চ্ছনায় কত পাখীর গান, ফুলের সুবাস, জ্যোৎস্নামাখা জলকল্লোল বহিয়া আসিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি চাঁদ পানা বালিকামুখ মৃদুমন্দদক্ষিণা বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া আমাকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল। একবার যে সংসার স্রোতের একটী উত্তাল তরঙ্গ আমাকে প্রচণ্ডবেগে প্রস্তরময় তটে ফেলিয়া দিয়া জড়-পিণ্ড করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, সেই খরবাহিনী স্রোতস্বিনীমুখে আবার গা ভাসাইবার জন্য পোড়া প্রাণ আকুল ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। হায়! দেহ ভাঙ্গিয়া গেল, স্মৃতি মুছিয়া গেল না কেন, বাসনাই বা আবে

কেন? উচ্ছলিত হৃদিবেগে, আমার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম বলিতে পারি না, হঠাৎ কে আমার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। আমি চকিত হইয়া নক্ষত্রালোকে দেখিলাম ও চিনিলাম—দীনু। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দীনু এ আবার কি?" সে উত্তেজিত স্বরে বলিল "নলিনী বাবু, আমাকে মারিয়া ফেলুন, কাটিয়া ফেলুন—ফাঁসি দিন, আমার মতন কৃতঘ্ন, মহাপাতকী, খুনী আর কেহ নাই। আমি আপনাকে বিষ খাওয়াইয়াছি।"

কিছুদিন পূর্ব্বে একথা শুনিলে বোধ হয় দীনুকে আশীর্ব্বাদ করিতাম, কিন্তু কি জানি সে দিন তাহা পারিলাম না। কম্পিত কণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কবে—কখন?" সে উন্মত্তের ন্যায় বলিল "মুঙ্গেরে আসিয়া প্রথম দুইমাস প্রত্যহ জলের সঙ্গে। যে বিষ দিয়াছিল সে বলিয়াছিল 'দুইমাস খাওয়াইলেই যথেষ্ট হ'বে,—অল্পে অল্পে বিষের কায হবে দুই মাসের মধ্যেই সব ফুরাইবে, কোন ডাক্তার ধরিতে পারিবে না, বলিবে কুষ্ঠ রোগেই মৃত্যু হইয়াছে।' দুইমাস বিষ খাওয়াইয়া ছিলাম—তাহার পর চারিমাস হইয়া গিয়াছে,—বিষের কোন কায হয় নাই, লোকটা মিথ্যা বলিয়াছিল। কিন্তু আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে,—আমার মাথায় আগুন জ্বলছে—আমি খুনী—আমি পাগল হ'ব।"

"বিষ খাওয়ালে কেন?"

"কেন?—আপনার টাকার জন্য—আপনি অত বিষয়ের লোভ দেখালেন, আর শয়তান এসে আমাকে পেয়ে বস্‌ল। আপনার এত দয়া মমতা সব ভুলে গেলাম,—সময় অপেক্ষা করিতে পারিলাম না—অর্থলোভে পিশাচ হ'লাম"

"বিষ পেলে কোথায়?"

"এলাহাবাদে একজন মার্কিন ডাক্তারের কাছে, সে দাঁতের ডাক্তার কিন্তু এমন কুকায নাই যা' সে টাকা পেলে করে না।"

আমি ভাবিলাম দীনু যাহা বলিতেছে তাহাতে, প্রকৃত বিষ হইলে বহুদিন পূর্ব্বে আমার ভবযন্ত্রণার মুক্তি হইত, বলিলাম "সে বিষ আর আছে?"

দীনু বলিল "আছে।" এবং স্খলিত পদে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া আমার হস্তে একটী ছোট শিশি দিল। দীপালোকে দেখিলাম ইংরাজি হস্তাক্ষরে শিশির গাত্রে লেখা আছে "Potio de Crotalus Horridus" আমেরিকার র‍্যাটল্ সর্পের (Rattle Snake) বিষ। পড়িয়াছিলাম এই সর্পের দংশনে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হয়, ক্রমে শরীর গলিত হইয়া মৃত্যু হয়। তড়িৎ বেগে আমার দেহ ও মনের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, ব্যাধি চিহ্নের অদর্শন, অপরিচিত ডাক্তারের কথাগুলি মনে পড়িল।—দেশীয় চিরপ্রচলিত—"বিষে বিষক্ষয়" বচনটী ও হোমিওপ্যাথদিগের মূলমন্ত্র "Similia Similibus Curantur" বাক্যটী যুগপৎ মানসপথে উদিত হইয়া আমাকে বিহ্বল, করিল। অচিন্ত্যপূর্ব্ব আশায়—সংশয়ে আমার জ্ঞানশক্তি বিদায় গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল। আমি বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া পড়িলাম।

কলিকাতা ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১।

দীনুকে ধর্ম্মাধিকরণের হস্তে সমর্পণ করি নাই—কিন্তু তাহাকে বিদায় দিয়াছি। অনুসন্ধান লইয়াছি, এলাহাবাদের সেই মার্কিন ডাক্তার পলাতক। দীনুর বিষ প্রয়োগে ইচ্ছানুরূপ ফল না হইলেও সে ন্যায়তঃ হত্যাপরাধে অপরাধী। কিন্তু আমিই তাহার পাপের মূল কারণ, আমার অর্থ প্রলোভনই তাহার নিষ্পাপ অন্তরে অনর্থ

ঘটাইয়াছিল। আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম দূরদেশে পবিত্রভাবে থাকিলে তাহাকে ভরণপোষণ করিব প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, ভীষণ অনুতাপের সময় তাহাকে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু হায়! বিধাতা তাহাকে ক্ষমা করিলেন না, সে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। সে এখন বাতুলাশ্রমে। তাহার প্রতি যাহাতে সদ্ব্যবহার ও যত্ন করা হয়, তাহার যাহাতে সুচিকিৎসা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি।

আজ একমাস হইল আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। সাহেব বাঙ্গালী, অনেক বড় বড় চিকিৎসককে দিয়া আমার দেহ পরীক্ষা করাইয়াছি, সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন আমি রোগমুক্ত। একজন নবাগত ইংরাজ ডাক্তারকে আমার ব্যাধি ও ঔষধের কথা (দীনুর কথাটা গোপন রাখিয়া) বলাতে তিনি আমাকে বাতুলাশ্রমের অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আর একজন বড় ইংরাজ ডাক্তার (Brigade Surgn. Lieut-Col) যিনি চারি-বর্ষ পূর্ব্বে আমার চিকিৎসায় সহস্রাধিক টাকা উদরসাৎ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান, আমার নিকট হইতে ঔষধের শিশিটি প্রার্থনা করেন এবং মাত্রার কথা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন। দীনুর পাপের চিহ্ন শিশিটী ফেলিয়া দিয়াছিলাম এবং মাত্রার কথাও জিজ্ঞাসা করিনাই। সুতরাং ডাক্তার সাহেবের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারি নাই—কেবল বিষের নামটী বলিয়াছিলাম। তিনি পরীক্ষা করিবেন বলিয়াছেন।

পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে অতল গহ্বরে পড়িতে পড়িতে অর্দ্ধপথে রক্ষা পাইলে, যুগ যুগান্তর ব্যাপী, ঘোরঅন্ধকার, নিস্তব্ধ—ভয়াবহ অন্ধকার হইতে সহসা সুখময় আলোকে আসিলে, মানবের যে অবস্থা ঘটে,

আমার এখন সেই অবস্থা। অতিরিক্ত সুখে আমি জ্ঞান হারা। আমার সকল কামনা বাসনার শেষ হইয়াছিল, কি করিয়া তাহাদের পুনরায় রচনা করি তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না—অথচ তাহাদের শত সহস্র অস্পষ্ট মূর্ত্তি যেন কোলাহল করিয়া আমার দিকে আসিতেছে। জগৎকে কে যেন নূতন করিয়া গড়িয়াছে!

আমি দুই খানি পত্র লিখিয়াছিলাম, এক খানি আমার পৈত্রিক ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ম্যানেজারকে, আর এক খানি শ্বশুর মহাশয়কে। আমার আরোগ্য সংবাদ দিয়াছিলাম, ও আমি শীঘ্রই গৃহে ফিরিব এই কথা জানাইয়াছিলাম। শ্বশুর মহাশয়ের হস্তে আমার বিষয়ের অর্দ্ধেক উপস্বত্ব (বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা) সমর্পণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম, সুতরাং তিনি এবং আমার এক প্রকার অপরিচিতা স্ত্রীই বা আমার প্রত্যাবর্ত্তন বার্ত্তা কি ভাবে লইবে তাহা জানিতাম না, সেই জন্য পত্রে লিখিয়া দিয়াছিলাম—আমার উইল যাবজ্জীবন অপরিবর্ত্তিত থাকিবে এবং আমার পত্নীর স্বামী গৃহেবাস করা বা না করা তাহার স্বেচ্ছাধীন। প্রত্যুত্তরে তিন খানি পত্র আসিয়াছে। ম্যানেজার আন্তরিক আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন ও আমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন বলিয়াছেন। আর দুই খানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীমান নলিনীকান্ত রায়

কল্যাণ বরেষু—

বাবাজি তোমার সুস্থ সংবাদ এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের মানস অবগত হইয়া আমি আনন্দে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত হইয়াছি। গত দুই বৎসর তোমার অন্বেষণে যে অশেষ ক্লেশ পাইয়াছি সে সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইয়াছে। আমার কন্যার বিষাদমলিন অশ্রুসিক্ত মুখ অহরহ

দেখিয়া তোমার উপর যে অভিমান ও রোষ হইত তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি পত্রে উইলের কথা উত্থাপন করিয়া আমার যে অবমাননা করিয়াছ, তোমার সে অপরাধও হৃষ্ট চিত্তে মার্জ্জনা করিয়াছি। তোমাকে শুভদর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিলাম। তোমার সম্পত্তি তোমারই আছে; আমার কন্যা তাহা হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ করে নাই। আমি নিজ ব্যয়ে তাহাকে ব্রত ধর্ম্ম করাইতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু সে বলিয়াছিল যে স্বামী-সেবা ভিন্ন তাহার অন্য ব্রত—অন্য কামনা নাই; সেই মহাব্রতে যখন সে বঞ্চিতা, তখন সাগরের অভাবে কূপে স্নান করিতে সে ইচ্ছা করে না। তোমার উপযুক্ত করিবার জন্য তাহাকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলাম, সে বুদ্ধিমতী, ও এখন আর বালিকা নহে। সুতরাং তাহাকে সান্ত্বনা করিবার আমি কোন কথা খুঁজিয়া পাই নাই। কেবল তোমারই অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম। আমরা বারিন্দীপুরে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমায় সুমতি দিউন, তুমি সুখী হও।

মঙ্গলাকাঙ্খী

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।"

"স্বামিন্

আপনি দাসীকে চরণ দর্শন করিবার অনুমতি দিয়াছেন। অনেক দিন—বহুবর্ষ প্রতীক্ষার পর এই অনুমতি আসিয়াছে; দুঃখিনীর সুখের আজ শেষ নাই। এতদিন আপনি আমায় পায়ে ঠেলিয়া ছিলেন কি ভাবিয়া, কি দোষে, তাহা জানি না। আমি ঢের কাঁদিয়াছি, কি অপরাধে আমি পতিসেবার অনধিকারিনী ছিলাম তাহা বুঝিতে

পারি নাই। কেন যে বিধাতা আমাকে আমার দুঃখের সুখ পীড়িত স্বামীর শুশ্রূষা কার্য্যে বঞ্চিতা রাখিয়াছিলেন, কেনই বা আপনার দুঃখের অংশভাগিনী হইবার জন্য লালায়িতা হইয়াও আমার সে সাধ মিটে নাই, তাহা আমি জানি না। কি পাপে যে আমার এই কঠোর শাস্তি, অনেক কাঁদিয়াছি, ভাবিয়াছি, ঠিক করিতে পারি নাই। এত দিনে বুঝি দুঃখিনীর আকুল ক্রন্দন দয়াময়ের কর্ণে পৌঁছিয়াছে। বড় পিপাসার পর চাতকী মেঘ দেখিয়াছে জল পাইবে কি না এখনো ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। আমি বারিন্দাপুরে—আমার নিজ গৃহে চলিলাম। স্বামিন, বলিতে হইবে কি দাসী আশাপথ চাহিয়া রহিল।

আপনার

সরোজিনী।"

শেষের পত্র খানা পড়িতে গলাটা কিরকম ভার হইয়া আসিয়া-ছিল চক্ষু দুটায় ঝাপ্‌সা দেখাইতে ছিল। এত দিন আমার ধারণা ছিল, দুঃখবাদটা বুঝি চিরদিনের জন্য আমার নিজস্ব, এখন বোধ হইতেছে, সে বিশ্বাসটা আমার ভ্রম। আর হিন্দু বিবাহটাকে অহিন্দুর চুক্তি বন্ধন পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তিত করিবার স্বপক্ষে আমার সেই যুক্তি তর্ক গুলার কথা এখন মনে পড়িতেছে; সে গুলা নিজের মনেই রাখিয়া ছিলাম, প্রকাশ করি নাই, তাই রক্ষা। ও! আমি কি নির্ব্বোধ।

বারিন্দীপুর ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

আজ গৃহে ফিরিয়াছি। শ্বশুর মহাশয় ও গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, আত্মীয় পরিজনগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহাদের

আশীর্ব্বচন, সাদর সম্ভাষণ ও অগণ্য দরিদ্র দিগের আনন্দধ্বনি শুনিতে শুনিতে অন্তঃপুরে, এবং পরিশেষে কম্পিতপদে নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম। গৃহ বিশৃঙ্খল ও শ্রীভ্রষ্ট রাখিয়া গিয়াছিলাম, দেখিলাম অট্টালিকার অপরাপর অংশের ন্যায় আমার পরিত্যক্ত গৃহটিও পরম-যত্নে পরিষ্কৃত নিপুণ নির্ব্বাচনে সুসজ্জিত। গৃহের এক পার্শ্বে একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী তন্বী নত মুখে দণ্ডায়মানা। চিনিতে বিলম্ব হইল না—সাদরে করযুগল গ্রহণ করিলাম, গদগদ কণ্ঠে গৃহলক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ কি ?"

স্বর্ণ বল্লরী কাঁপিতে ছিল, এই শুষ্ক তরু আশ্রয় করিল, প্রিয়ার সুকোমল বাহু অভাগার দেহে বেষ্টিত হইল, প্রিয়ার নয়নাসার এই তাপিত বক্ষ শীতল করিল।

সহসা কক্ষদ্বারে শঙ্খধ্বনি হইল। দেখিলাম, ও পরে অবগত হইলাম আমার শ্যালিকা উমা। আমার বিবাহের সময় তাহাকে ক্ষুদ্র বালিকা দেখিয়া ছিলাম, সে এখন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া, তাহার সীমন্তে সিন্দুর রেখা। তাহার নয়নে রহস্যের বদনে হাস্যের উজান বহিতে ছিল, সে বলিল "দিদি, সেবার গাঁটছড়াটা ভাল বাঁধা হয় নাই. এই বার হাতেই সে কার সার—জোর করে বাঁধ।"

এই কথা বলিয়াই উমা দ্রুতপদে কক্ষান্তরে যাইয়া আমার বাস্তু-দেবতা নিরানন্দের বিপক্ষে কম্বুমুখী তুমুল দ্বন্দ্ব ঘোষণা করিল। ইত্যবসরে তাহার দিদির অপেক্ষা না করিয়া আমিই উমার কথা মত কার্য্য করিলাম—অধরে অধরে, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রিয়াকে ভাল করিয়া বাঁধিলাম।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

সভ্যতার ঢেউ।

(১)

সভ্যতার ঢেউয়ে বঙ্গে উঠেছে তুফান,
স্বদেশের সব কাজে,
'ফ্যাশান' আগুন-মাঝে,
আহুতি প্রদানি সবে বঙ্গে ভাসমান,
বলিহারি। Westএর Civilization

(২)

নাই সে জ্ঞানের চর্চ্চা—দেবের সম্মান,
সে উৎসাহ, সে আগ্রহ,
তেজপূর্ণ সেই দেহ,
রাজহংস পুচ্ছ মাঝে লইযাছে স্থান,
ভেঙ্গেছে হাতের হাড় লিখে Petition

(৩)

নাই সে সন্তান নিষ্ঠা ভক্তি, স্থির Guide,
সে প্রেম স্বদেশ প্রতি,
সে একতা, সে উন্নতি,
'অনুকরণে'র এবে পূর্ণ Tide,
অশনে, বসনে সবে Anglicised

(৪)

স্ত্রীশিক্ষা? লজ্জার কথা, Thing immoral,
নাহি সে যুক্তি, মতি,
সেই খনা, লীলাবতী,
বিস্মৃত, ঘৃণিত, শুধু তাদের কঙ্কাল,
বঙ্গের সাহিত্য Roomএ খেলে ইন্দ্রজাল

(৫)

ছিছিছি। সাগর যাত্রা কি বলিব ওরে!
এতে কি 'টিকির' মান,
থাকে কভু বর্ত্তমান,
বর্ত্তমান দগ্ধ যাক্ তাদের উদরে,
যারা চাহে উচ্চশিক্ষা—তাদের অন্তরে।

(৬)

যাইয়া সাগর পারে সুদূর ব্রিটেনে
হয় কি উত্তম শিক্ষা,
বজায় কি থাকে দীক্ষা,
বসি ম্লেচ্ছ বিরচিত কাঠের আসনে?
বলিয়া পণ্ডিত 'শিখা' নাড়িল সঘনে।

(৭)

নাহি দোষ কিন্তু যদি Peliti-ভবনে,
গিয়া হর্ষে, তাজা তাজা,
রঘুপতি পক্ষী ভাজা,
সাদরে উদরে দাও অতি সঙ্গোপনে,
তাহাতে রহিবে ধর্ম্ম, যাবেনা জীবনে।

(৮)

হা শাস্ত্র! নয়ন তোর সুচির তামসে,
গিয়াছে মিলায়ে কিরে,
ভীষণ ব্যাখ্যার ভরে,
ফাজিয়া কি গিয়াছিস্ মৃঢ় বঙ্গদেশে
যুক্তির জনম দাতা আদি দেব প্যাশে?

(৯)

গাও হে আনন্দে সবে বঙ্গের বিজয়,
ত্যজি সবে নিজ পাঠ,
কোট, প্যাণ্ট, সোলা হ্যাট
লইয়াছে Hurrah বলি, আর কিবা ভয়?
কবি কহে তোমাদের Anglo-phobia য়।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

কবি ও কাক।

সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্র সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আবার খোদ সূর্য্যদেব যখন স্বীয় প্রখর কিরণে প্রকৃতিদেবীর পরীক্ষা করিতেছিলেন, এ হেন সময়ে কোনও কবি কাগজ কলম লইয়া কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্বভাব বর্ণনা ফাঁদিয়া বসিলেন, অক্ষর না গুণিয়া একেবারে দুই ছত্র লিখিয়া ফেলিলেন—

ছাতা করে ছাতি ফাটে চলেছে পথিক।
দেহ পোড়ে ধুলা ওড়ে বড় বেগতিক।

কিন্তু এই দুই ছত্র লিখিয়া কবির হঠাৎ স্মরণ হইল যে গ্রীষ্মবর্ণনা অপেক্ষা বসন্তবর্ণনাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও কাব্যানুমোদিত। অমনি দারুণ গ্রীষ্মের দিনে মধুর বসন্ত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন, যে হেতু কবির হৃদয়ে চিরবসন্ত বিরাজমান, তবে যে তিনি কখনও ঘামেন না, বা ঘামিলে পাখার বাতাস খান না এমন কথা বলিতেছি না, কারণ ইহা বড়ই গদ্যময়। কিন্তু বসন্তবর্ণনা করিতে হইলে মলয় পবন ও কোকিল চাই, সেই জন্য কবি নিজ হৃদ্‌কুঞ্জ হইতে একটি কোকিল ছাড়িলেন, শুধু তাই নয় উহাকে জোর জবরদস্তি করিয়া ডাকাইলেন এবং সেই ডাকে বিভোর হইয়া সবে মাত্র লিখিয়াছেন—

কেনরে কোকিল তুই আকুল অন্তরে।

এবং সবে মাত্র উহা আটবার পড়িয়াছেন, এমন সময়ে কর্কশস্বরে কা কা রবে কোনও কাক খাঁটি গদ্যে ডাকিয়া উঠিল। ভাবের তরঙ্গে ব্যাঘাত ঘটাতে কবি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া 'হুস্' করিয়া উহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করায়, কাক নাচিতে নাচিতে পার্শ্ব হইতে একটু সরিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কাকের এবম্প্রকার দুশ্চরিত্র এবং ধৃষ্টতায় কবির ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, কলম ছুঁড়িয়া মারিলেন, অবশ্য উহা গায়ে লাগিল না, কখনও লাগে না। তখন অপ্রতিভ কবি বিস্ময়াম্বিত হইয়া শুনিলেন কাক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মনুষ্যের স্বরে বলিতেছে "হে কবিবর আমি তোমার কি করিয়াছি যে তুমি আমায় মারিতে উদ্যত হইয়াছ?"

অতঃপর কবি ও কাকে যে কথোপকথন হইয়াছিল নিম্নে অবিকল তাহা প্রদত্ত হইল।

কবি—কি করিয়াছ? আমার ভাবের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছ, আমার কাব্য নদীতে একেবারে ভাটা পড়াইয়া দিয়াছ?

কাক—আমার কি অপরাধ, আমি তোমার ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়াছিলাম, তোমার "কেনরে কোকিল তুই আকুল অন্তরে" শুনিয়া আমি চারিদিক চাহিয়া যখন দেখিলাম কোকিল রাজ্যে নাই তখন ভাবিলাম আমাকে দেখিয়া তোমার কোকিল ভ্রম হইয়া থাকিবে, তাই ভাবিলাম আমার স্বর শুনিলে তোমার ভ্রম দূর হইবে, কিন্তু মানুষের চরিত্র কি বিচিত্র, কেহ ভ্রম দেখাইয়া দিলেই অমনি তাহার উপর চোট্।

কবি—হে কাককুলধুরন্ধর দর্শনবিদ্ পণ্ডিত, তুমি নিজে ভুল বুঝিয়াছ, আমি তোমাকে কখনও কোকিল মনে করি নাই, কেন আমার কি চক্ষু নাই?

কাক—মানসচক্ষু থাকিতে পারে, চক্ষু নামক ইন্দ্রিয় সব সময়ে থাকে না, এই কোকিলই তাহার প্রমাণ। আর যদি ভুলই হয় নাই, ভাল জেনে শুনে মিথ্যা কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে কিরূপে?

কবি—মূঢ় তুমি কবিতার মর্ম্ম বুঝিবে কিরূপে, তুমি যাহাকে মিথ্যা কথা বলিলে আমরা তাহাকে কল্পনা বলি, এই কল্পনাই কবি ও কবিতার জীবন।

কাক—ভাল, কল্পনাও ত সত্য হইতে পারে, তবে মিথ্যা কল্পনার প্রয়োজন কি? তুমি কোকিলের উপর না লিখিয়া আমার উপর কবিতা লিখিলে না কেন?

কবি—কি আপদ্, তুমি কি জান না ঠিক সত্য কথাটুকু লিখিলে পদ্য হয় না, উহা গদ্য হইয়া যায়? তোমার ডাক গদ্যময়, উহাতে বিরহিণীরা কাতর হয় না, কবিরাও মোহিত হইয়াছেন এরূপ প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

কাক—কেন বিরহিনীরা কাতর হন না? মনে কর কোনও বিরহিনী বিরহ যন্ত্রনায় অধীরা হইয়া আহারান্তে অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাইয়া সকল জ্বালা ভুলিবেন মানস করিয়াছেন, এমন সময় আমি যদি সেই ঘরের জানালায় বসিয়া প্রাণ খুলিয়া তান ধরি তাহা হইলে তিনি কাতর হন কিনা বল দেখি? আর কবিরা আমার ডাকে কেন মোহিত হন না, আমার এ কাকবুদ্ধিতে তাহা আসে না। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে কবিরা ঘোর পক্ষপাতী।

কবি—কিসে?

কাক—কেন তোমরা সুগন্ধবিশিষ্ট ফুলের উপর কবিতা লিখিয়া থাক, সুস্বাদ ফলের উপর লেখ না কেন?

কবি—আবার গদা? ফুলের সহিত ফলের তুলনা? মল্লিকা, মালতী, গোলাপ প্রভৃতির সৌরভে দিক আমোদিত হয়, সৌন্দর্য্যে প্রাণ স্নিগ্ধ হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর উড়িয়া আসে, উহাতে কত কবিত্ব রহিয়াছে!

কাক—আর আম, কাঁটাল প্রভৃতি ফলের সৌরভে চিত্ত প্রফুল্লিত হয় সৌন্দর্য্যে প্রাণ অর্থাৎ উদর ঠাণ্ডা হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরের পরিবর্ত্তে লাখে লাখে মাছি এবং মনুষ্য আসিয়া যোটে, (কাকের ত কথাই নাই) ইহার কবিত্ব না থাকিলেও যথেষ্ট মিষ্টত্ব আছে।

কবি—রে মূর্খ, দেখিতেছি কবিতা তোমার পক্ষে সুপক্ক বেল স্বরূপ, ইহার রসাস্বাদ তোমার পক্ষে অসম্ভব, তুমি ঘোর গদ্যময় উদর লইয়াই ব্যস্ত।

কাক—হে কবিবর, আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে, তুমি জ্যোৎস্নার সরবৎ পান করিয়া বা রামধনুচূর্ণ সেবন করিয়া কতদিন থাকিতে পার? মলয়পবন, ভ্রমর গুঞ্জন ও কোকিল কুজন বিনা ভোজনে ভাল লাগে কি? উদর গদ্যময় হইলেও তোমার পদোর অগ্রে। আরও দেখাইতেছি তোমরা কিরূপ পক্ষপাতী। তোমরা স্বভাবোপাসক বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাক। কিন্তু স্বভাবের পোনের আনা তিন পাই জিনিষের তোমরা আদৌ উপাসনা করনা, কেবল সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট কয়েকটি ফুল (সিমুল প্রভৃতি অবশ্য বাদ), সৌন্দর্য্য ও সুস্বর বিশিষ্ট কয়েকটি পক্ষী (শকুনি চিল, প্রভৃতি পাখীর মধ্যেই নহে) এবং বাছা বাছা কল্পনা-কল্পিত কয়েকটি রমণীরই তোমরা উপাসনা করিয়া থাক (নিজ গৃহিনীদিগের উপাসনা সকল সময়ে করনা, কারণ তোমাদের ঝগড়া ও গালাগালি আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, আর যদিই বা কর ত সে কেবল ভয়ে)।

কবি—আমরা স্বভাবের উপাসক বলিয়া স্বভাবের যাবতীয় বস্তুর উপাসনা করিতে হইবে এরূপ কথা নাই। আর তুমি যাহা বলিলে তা ছাড়া আরও অনেক জিনিষের উপাসনা করি সে সমস্ত তোমার বুঝিবার শক্তি নাই। সুধু তোমার কথা লিখিনা বলিয়াই তোমার এত রাগ।

কাক—রাগ বিশেষ নহে, তাহা হইলে তোমার মাথায় ঠোক্‌রাইতাম, তবে ক্ষোভের বিষয় বটে। আমরা এত করিয়াও তোমাদের মন পাইনা, দেখ বিনা বেতনে আমরা মিউনিসিপ্যালিটির কন্‌সারভেন্‌সি বিভাগে কায করি, আমরা না থাকিলে, মরা ইন্দুর প্রভৃতি রাস্তায় ও গৃহে পচিয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিত। আর আমাদের একতার বিষয় অধিক আর কি বলিব, উহা তোমাদের অনুকরণ যোগ্য।

কবি—হে কাক প্রবর তোমার আশ্চর্য্য বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া আমি হত বুদ্ধি হইয়াছি, তুমি ইংরাজিও জান দেখিতেছি।

কাক—হে কবিবর, আমাদের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়, সুতরাং নানা ভাষা আমরা জানি, কিন্তু আমরা মাতৃভাষার অধিক সমাদর করিয়া থাকি, চিন, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমাদের যে স্বজাতীয়েরা বাস করে দেখিবে তাহারা মাতৃভাষার মধুর “কা কা” রব ভোলে নাই, আর তোমরা দুই চারি বৎসর বিলাতে বাস করিলে দেখাও যে মাতৃভাষা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ। একটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা বিনা চেষ্টায় তোমাদের ভাষা শিখি, এবং তোমাদের পালিত কুকুরেরাও তোমাদের ভাষা অনায়াসে শিখে, অথচ তোমরা আমাদের ভাষা বুঝিতে পার না।

কবি—আমরা জানোয়ারদিগের ভাষা শিখিবার চেষ্টা করিতেছি, সার্ জন্ লবক্ নামে একজন মহাপণ্ডিত পিপীলিকার ভাষা প্রায়

শিখিয়া ফেলিয়াছেন, আর একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বানরের ভাষা শিখিবার জন্য স্বয়ং পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া বানরসংকুল স্থানে বাস করিতেছেন।

কাক—উক্ত মহাপণ্ডিতের লাঙ্গুল আছে নাকি?

কবি—দূর মূর্খ মানুষের কি আবার লাঙ্গুল থাকে না কি? এই না তুমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছ?

কাক—সেই জন্যই ত বলিতেছি, অনেকের থাকে, অনেকে আবার ঐ লাঙ্গুলের জন্য কত লালাইত, কত অর্থব্যয় ও তোষামোদ করে।

কবি—ওঃ তুমি উপাধি বা টাইটেল্‌কে লাঙ্গুল বলিতেছ? যাক' ও সব কথায়। আমায় কেন তোমার ভাষা শিখাইয়া দাও না? কিন্তু এক কথা, তোমার ভাষায় পদ্য লেখা যাইবে ত?

কাক—যিনি কিষ্কিন্ধ্যার ভাষা শিখিতেছেন, তিনি কি ঐ ভাষায় পদ্য লিখিবেন বলিয়া শিখিতেছেন। আর, আমাদের ভাষা শিখিতে তুমি পারিবেনা, মানুষের কথা জানোয়ারেরা বুঝিতে পারে, কিন্তু জানোয়ারের কথা বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। তবে যদি তুমি চতুর হও তাহা হইলে যা ইচ্ছা তাই লিখিয়া তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া দিবে যে উহাই কাকজাতির ভাষা, সকলে তোমাকে অদ্বিতীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলিয়া ধন্য ধন্য করিবে। কিন্তু আমার আর সময় নষ্ট করিলে চলিবে না, এখনি আহারের চেষ্টায় যাইতে হইবে, তবে একটি কথা বলিয়া যাই যে যদি তোমার কবিতা লিখিতে একান্ত সাধ যায় তবে অন্যভাষায় না লিখিয়া মাতৃভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিও, এবং সত্যের অপলাপ করিও না।

শ্রী—প্রয়াসের রিপোর্টার।

কেন?

১

রভসে অবশে কেন মাধবী তলে
বিরহিনী বিনোদিনী গেছিলে ছলে
শ্যামল তমাল ছায়,
নীপশাখ, ধীর বায়,
জাননা কি শশীমুখী যমুনা জলে,
নিশীথে, সকালে, সাঝে
কুসুম বিতান মাঝে
মুকুল, আকুল কার চাহনি-বলে?
রভসে অবশে কেন মাধবী তলে?

২

মুকুল আকুল কেন বকুল বনে
একাকিনী ব্রজবাণী আপন মনে
নূপুর মুখর পদে
বিকশিত কোকনদে
গেছিলে তটিনী তটে চারু-নয়নে!
কপট, কঠিন, কালা
দিয়াছিল যত জ্বালা,
সকলি কি গেছ ভুলে প্রেম-স্বপনে
মুকুল আকুল কেন বকুল বনে?

৩

বাঁশীশুনে, সুলোচনে, যমুনা-তীরে
কলকল ছলছল বিমল নীরে
ব্যাকুলা বিরহ-শোকে
ম্রিয়মানা মনোদুখে
বালিকা রাধিকা কেন গেছিলে ধীরে?
জাননা কি সে বাঁশরী
খেলে শুধু লুকোচুরী
ডাকিয়া না দেয় দেখা পলায় ফিরে
বাঁশী শুনে, সুলোচনে যমুনা তীরে?

৪

পিককুল কুহরিত মধুভবনে
কুসুমিত সুরভিত ঘন গহনে
একাকিনী অভিসারে
বাধা আর যাস্‌নেরে
চতুরালী বনমালী শ্যামের সনে।
ফেলি ফাঁদে রমণীরে
ভাসায়ে বিষাদ নীরে
চলে যাবে ব্যথা দেবে কোমল মনে
পিককুল কুহরিত মধু ভবনে।

কলিকাতায় প্লেগ।

অস্বাস্থ্যকর স্থান হইতে যে প্লেগের উৎপত্তি হয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, এবারে এক্ষণে যে প্লেগ হইতেছে তাহা জোড়াবাগান, বড় বাজার প্রভৃতি অপরিষ্কার স্থান হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। আমরা এমন স্থানে রোগী দেখিতেছি যে সেখানে দিনের বেলায় গিয়া বাতি জ্বালিয়া রোগী দেখিতে হইতেছে। ময়লার গন্ধ, বায়ু সঞ্চালন রাহিত্য এবং অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর অবস্থার তো কথাই নাই, অধিক পরিমাণে জলের অভাবও দেখা গিয়াছে।

অতএব স্বাস্থ্যের নিয়ম ও উপায় অবলম্বন করা প্লেগ নিবারণের প্রধান উপায়, যাহারা পরিষ্কার থাকেন, বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখেন, ধোপাকে কিছু বেশী পয়সা দেন তাহাদের মধ্যে প্লেগের প্রাদুর্ভাব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিতে সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার ড্রেনগুলি পীড়ার পীঠস্থান কলিকাতার ড্রেণ সমুদায় যাহাতে উত্তমরূপে পরিষ্কার থাকে তাহা সর্ব্বদা দেখা উচিত।

পীড়া বলিয়া মানসিক একটা আত্যন্তিক ভয় হওয়া রোগ হইবার আর এক কারণ। ইহা যে কেবল প্লেগ সম্বন্ধেই খাটে তাহা নহে সকল প্রকার রোগেই ইহা অতীব অনিষ্টকর। ওলাউঠাও বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সময়ে যে সমুদায় লোক অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে তাহাদিগের এই সমুদায় রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা। আমরা দেখিয়াছি, বসন্ত রোগ বা ওলাউঠার সময়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া যাঁহারা পলাইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কঠিন রোগ আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

অতএব প্লেগ প্রভৃতি মহামারী রোগের সময় মনস্থির রাখিয়া অথচ সাবধানে আহার বিহার করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে সকল স্থলেই রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, প্লেগ হইয়াছে বা হইবে এই ভয় করিয়া অধিক পরিমাণে ও নানাবিধ ঔষধ সেবন করা কখনই উচিত নহে, সামন্য একটু অসুখ হইলেই প্লেগ হইবে ভয় করিয়া ক্রমাগত ঔষধ সেবন করা উচিত নহে।

আমাদিগকে অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন কোন্ ঔষধ প্রতিষেধক স্বরূপ ব্যবহার করা যাইবে। কলিকাতায় প্লেগ প্রায় শীতকালের শেষে ও গরম পড়িবার সময়ে আরম্ভ হয়, এই সময়ে সকাল বৈকালে ও রাত্রিকালে বায়ু শীতল থাকে, দিবসে বড় গরম হয়।

এই অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক মতে একোনাইট, ডলকেমারা ও রসটক্স এই তিনটি প্রধান ঔষধ। আমরা অনেক সময়ে এক ফোঁটা পরিমাণ রসটক্স (৬ষ্ঠ ডাইলিউশন) অর্দ্ধ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সকালে একবার করিয়া খাইতে দিয়াছি।

আবার যখন গাত্র বেদনা, কোন গ্রন্থি (গ্লাণ্ড) স্ফীত হইয়াছে বা তৎসঙ্গে শরীর খারাপ বোধ হইয়াছে তাহাও ঐরূপে রসটক্স সেবনে আরাম হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ গ্রন্থি স্ফীতির পক্ষে ডলকেমারাও মন্দ নহে তাহাও রসটক্সের মত ব্যবহার উচিত।

গাত্রবেদনা, গ্রন্থিস্ফীতি. জ্বরভাব, নাড়ী মোটা ও চঞ্চল থাকিলে একোনাইট উত্তম। ইহার ৩য় ডাইলিউশান, অর্দ্ধ আউন্স জলে মিশাইয়া একবার করিয়া খাইতে দিলে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অনেক সময়ে এই অবস্থাতে এই কয়েকটি ঔষধ উপরি লিখিত রূপে ব্যবহার করিলে রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

রোগ প্রকৃতরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িলে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নহে কারণ প্লেগ অতি শীঘ্রই ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া জীবন নাশ করিতে পারে।

এ বিষয়ে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা যে ভাল নহে তাহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের মধ্যে যাঁহারা সত্যপরায়ণ তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও যে খুব ভাল তাহাও আমরা বিশেষ রূপে বলিতে পারি না কারণ ইহাতে আমাদের অধিক বহুদর্শিতা নাই। তবে এবিষয় স্থির, চেষ্টা করিয়া লক্ষণ অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিলে ফললাভ হইতে পারে।

ইহাও আমাদের মনে বিশ্বাস আছে যে ওলাউঠা প্লেগ অপেক্ষাও ভয়ানক রোগ এবং ওলাউঠায় প্লেগ অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং ওলাউঠার হোমিপ্যাথিক ঔষধের কার্য্য যখন এত শীঘ্র হয় তখন প্লেগ সম্বন্ধেও যে তাহা হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং আমরা যে সমুদয় প্লেগরোগী দেখিয়াছি ও আরোগ্য করিয়াছি তাহাতে আমাদের সংস্কার হইয়াছে যে হোমিও-প্যাথিক ঔষধে প্লেগ আরাম হইবে।

প্রথমেই জ্বর আরম্ভ হইয়া প্লেগ প্রকাশ পায়, সুতরাং জ্বর আরাম করাই ইহার প্রথম কর্ত্তব্য, এই জ্বরের পক্ষে হোমিওপ্যাথিক মতে অনেক ঔষধ আছে। লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা উচিত।

জ্বর অত্যন্ত অধিক, অস্থিরতা, গাত্র বেদনা, গ্রন্থি স্ফীতি প্রভৃতি থাকিলে রসটক্স ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ইহাতে উপকার বোধ না হইলে এবং চক্ষু লাল নিদ্রালুতা, মাথা ধরা, প্রলাপ, পিপাসা, গ্রন্থি স্ফীতি থাকিলে বেলেডনা ৬ষ্ঠ ঐরূপে দেওয়া উচিত।

বেলেডনায় উপকার না হইলে ও চক্ষু লাল, মাথাধরা, বমন, নিদ্রালুতা উদরাময় প্রভৃতি থাকিলে ভেরেট্রম ভিরিডি ৩য় ঐরূপে দেওয়া যায়।

যদি রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ শ্বাসকষ্ট, ভয়ানক প্রলাপ ও জ্ঞান শক্তি লোপ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ল্যাকাসিস ৩০-বা কোব্রা ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন প্রত্যেক ঘণ্টায় এক এক মাত্রা দেওয়া কর্ত্তব্য।

গ্রন্থি স্ফীতির পক্ষেও ঐ দুই ঔষধ অতীব উপকারী। নাড়ী ক্ষুদ্র বা অপ্রাপ্য হইলে ও তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি থাকিলে আর্সেনিকে বিশেষ উপকার হয়, ইহা আমরা শেষ অবস্থায় ব্যবহার করিয়াছি। ইহাতে উপকার না হইলে অনেকে কার্ব্বভেজ ৩০ দিতে উপদেশ দেন।

অনেকে অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন। প্লেগের ফোড়া হইতে বিষ লইয়া বিউবনিক নামক এক প্রকার ঔষধ আবিস্কৃত হইয়াছে। তাহাতে উপকার হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

উপযুক্ত চিকিৎসক পাইলে তাহার হস্তে রোগী ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

শ্রী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্ ডি।

("প্রতিবাসী" হইতে উদ্ধৃত।)

পার্লামেণ্ট মহাসভা।

পার্লামেণ্টের ক্ষমতা অসীম। সকল আদালতের ক্ষমতা বহির্ভূত প্রতিকার, পার্লামেণ্টের ক্ষমতাধীন। পার্লামেণ্ট মনে করিলে রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, রাজ্যের এবং এই মহাসভারও গঠন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এই মহাসভা দুইভাগে বিভক্ত, লর্ডসভা বা হাউস্ অব্ লর্ডস্ ও সাধারণ সভা বা হাউস অব্ কমন্স্। লর্ডসভার কোন স্কচ্ বা আইরিষ্ সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সাধারণ সভার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই, আবার সাধারণ সভার সভ্য নির্ব্বাচন লর্ডসভা হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। উভয় সভার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। ব্রিটিস উপনিবেশের উপরও পার্লামেণ্টের আধিপত্য আছে, তবে সাধারণতঃ উপনিবেশের জন্য পার্লামেণ্ট কোনও আইন প্রস্তুত করে না। কিন্তু কোনও আইন উঠাইয়া দিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে।

রাজা বা রাজ্ঞী, লর্ডসভা ও কমন্স সভা এই তিনটি লইয়াই পার্লামেণ্ট মহাসভা গঠিত। রাজা বা রাজ্ঞীর উপর সমস্ত শাসনভার ন্যস্ত, মন্ত্রীগণের সাহায্যে ও রাজ্যের আইন অনুসারে তাঁহাকে শাসন করিতে হয়। ঐ মন্ত্রীগণ আবার পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। রাজ অনুমতি বিনা পার্লামেণ্টের মহাসভা বসিতে পারে না, যদিও দ্বিতীয় চার্লসের প্রত্যাবর্ত্তন কালে ও ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় এই দুইবার সাধারণ সভা রাজ অনুমতি বিনা বসিয়াছিল। কোন আইন পাশ করিতে হইলে রাজ সম্মতির প্রয়োজন। দূত আহ্বান ও প্রেরণ, সন্ধি বা যুদ্ধ বিষয়ে রাজার অধিকার আছে।

রাজ সাহায্যে আইন প্রস্তুত করা, রাজস্ব সংগ্রহ করা, মন্ত্রীগণ ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণের কার্য্য তত্ত্বাবধান করা, এবং গুরুতর বিষয়ে রাজাকে উপদেশ দেওয়া, ইহাই পার্লামেণ্টের কার্য্য।

সরকারি আয় ব্যয় ও ট্যাক্স্ বা কর সংক্রান্ত যাবতীয় আইন প্রস্তুতের ক্ষমতা সাধারণ সভার আছে, লর্ড সভার নাই। তবে লর্ডসভার ও রাজার সম্মতি আবশ্যক। লর্ড সভায় আপীল-আদালতের ক্ষমতা আছে, সাধারণ সভা কাহারও নামে অভিযোগ আনিলে লর্ড সভায় বিচার হইবে। সাধারণ সভায় ৬৫৮জন সভ্য আছেন, যথা—

	কাউন্টি	বরো	বিশ্ববিদ্যালয়	মোট
ইংলণ্ড ও ওয়েল্স	১৬২	৩৩৪	৪	৫০০
স্কট্ল্যাণ্ড	৩০	২৩	০	৫৩
আয়র্ল্যাণ্ড	৬৪	৩৯	২	১০৫
	২৫৬	৩৯৬	৬	৬৫৮

পার্লামেণ্টের সভায় বাৎসরিক ব্যয় ১৫৮,৩৬৯ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৩,৭৫৫৩৫, তেইস লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচ শত পয়ত্রিশ টাকা তন্মধ্যে ৭২,৬৮৪ পাউণ্ড, অর্থাৎ দশ লক্ষ নব্বই হাজার দুই শত ষাট কেবল মাত্র ছাপার খরচ। অবশিষ্ট বেতনাদির খরচ। সাধারণ সভায় Speakerএর বাৎসরিক বেতন ৭৫, ০০০ টাকা।

পার্লামেণ্টের উৎপত্তি।

নর্ম্মাণ-বিজয়ের সহিত ইংলণ্ডের শাসন বিষয়ে বহুপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। নর্ম্মাণ-বিজয়ের বহু পূর্ব্বাবধিও ইংলণ্ডের রাজগণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন না; 'উইটেনা গেমোট' (Witena-gemote) বা জ্ঞানিদিগের

সভার দ্বারা তাঁহারা পরিচালিত হইতেন। রাজা আলফ্রেড আদেশ করিয়াছিলেন যে এইরূপ সভা বৎসরে দুইবার আহ্বান করিতে হইবে এবং এতদ্দ্বারাই শাসন কার্য্য পরিচালিত হইবে। নর্ম্মাণ-বিজয়ের পর এই সভা গ্রেট কাউন্সিল (Great council) নামে পরিচিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণ (Bishops and abbots) ও ভূস্বামি বর্গই (Earls, Barons and Knights) ইহার সদস্য বা মেম্বর ছিলেন। ফ্রেঞ্চ (French) ভাষায় ইহাকে পার্লামেণ্ট (Parliament) বলিত। রাজা জন্ (King John) ১২১৫ খৃঃ অব্দে ভূস্বামিদিগের যে সনন্দ (Magna Carta) প্রদান করেন তাহাতে এই সভার তৎকালীন গঠন জ্ঞাত হওয়া যায়। রাজাজ্ঞায় শেরিফ ও বেলিফেরা (Sheriff and bailiffs) সভাধিবেশনের চল্লিশদিন পূর্ব্বে ধর্ম্মাচার্য্যগণ ও ভূস্বামিদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিতেন। এই সভায় তৃতীয় হেন্‌রির রাজত্বকালে আর্ল সাইমনের (Earl Simon) উদ্যমে প্রধান প্রধান নগরের অধিবাসীরা নির্ব্বাচিত ব্যক্তি পার্লামেণ্ট সভায় সদস্য রূপে পাঠাইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। সাইমনের মৃত্যুর সহিত নাগরিকদিগের এই ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। তৃতীয় হেন্‌রির মৃত্যুর পর এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজা হন ; এডওয়ার্ড ন্যায়বান্ রাজা ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের প্রত্যেক বিভাগের (Shire) ও নগরের অধিবাসিদিগকে পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচিত ব্যক্তি পাঠাইবার ক্ষমতা প্রদান করেন। এই সকল নির্ব্বাচিত ব্যক্তি, ভূস্বামিবর্গ ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ দ্বারাই এখন হইতে পার্লামেণ্ট গঠিত হইল। কালক্রমে এই পার্লামেণ্ট দুই ভাগে বিভক্ত হয়—ভূস্বামীদিগের গঠিত সভা (House of Lords) এবং নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদিগের গঠিত সভা (House of Commons). এই সভার ক্ষমতা যে শুদ্ধ রাজ্যের মঙ্গলদায়ক আইন বিধিবদ্ধ কার্য্যে আবদ্ধ

অর্থ সাহায্য করা এবং এই অর্থ সংগ্রহার্থ কর বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা রাজাকে প্রদান করাও পার্লামেণ্টের আয়ত্বাধীন ছিল। এই কারণ বশতঃই প্রজাগণ তখন পার্লামেণ্ট অধিবেশন অতীব ভীতির চক্ষে দেখিত কারণ এরূপ সভা আহ্বান দ্বারা কর বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভব। আবার এখন যেমন প্রজাবর্গ পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার জন্য সমুৎসুক তখন সেরূপ ছিল না। কারণ নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণকে বহুদূর পর্য্যটন করিয়া আসিতে হইত এবং পর্য্যটন তখন বহু ব্যয়সাধ্য ছিল, ও পথ সুগম ছিল না। আবার নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ পার্লামেণ্ট কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইলে তাহাদিগকে গুরুতর অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। সুতরাং তখন কেহ নির্ব্বাচন ভাল বাসিত না।

ফুলের সাজি।

নিভৃতে রেখেছি তারে।

(১)

সারাটী জীবন ধরে প্রেমের সোহাগ ভরে
নিভৃতে রেখেছি তারে হৃদি পুলিনে;
প্রেমের শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া তাহার হিয়া,
মুছিয়া দুঃখের আশা আপন মনে,
নিভৃতে রেখেছি তা'রে হৃদি পুলিনে।

(২)

প্রেমের বিরাগ ভরে পরাণ আকুল করে
ভাসিয়া চলেছি যবে সাগর পানে,
তখনো আপন মনে ডাকিয়ে সাগর পানে,
বাঁধিয়া মনের মত প্রেম বাঁধনে,
নিভৃতে রেখেছি তারে হৃদি-পুলিনে।

(৩)

ডুবেছে পরাণ যবে, গরলে বিষম ভাবে,
ফেটেছে হৃদয় যবে শেল ঘাতনে,
তখনও নাহি ভুলে জড়ায়ে প্রেমের জালে,
বুকেতে ধরিয়া হায় আকুল প্রাণে,
নিভৃতে রেখেছি তারে হৃদি-পুলিনে।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
কাঁথি।

সন্ধ্যা।

(বালিকার রচনা)

দিবা অস্ত প্রায় রবি অস্ত যায়
সাঁঝের আকাশ 'পরে ;
বিহঙ্গমগণ হরষিত মন
বাস অভিমুখে ফিরে ;
কুসুম-কাননে পূরিদিক, ঘ্রাণে,
ফুটিল বিবিধ ফুল ;
ধীর সমীরণ বহে অনুক্ষণ
হইয়া সৌরভাকুল ;
ক্ষণকাল পরে গগন উপরে
ফুটিল তা'রকা রাশি ;
সুনীল গগনে সোণার বরণে
প্রকাশে চাঁদের হাসি।
তরু'পরে কিবা জোনাকির বিভা
থাকিয়া থাকিয়া জ্বলে ;
হীরক খচিত বিধাতা রচিত
গহনা প্রকৃতি গলে ;
ঝিল্লীরব করি প্রকৃতি সুন্দরী
ধরেছে মধুর তান,
যত জীব সবে মোহিত সে রবে
নীরবে শুনিছে গান ;
দিবা অবসানে পুরবাসিগণে
প্রদীপ জ্বালিল ঘরে,
পুরারে অবনী করি শঙ্খধ্বনি
মঙ্গল-আচার করে ;
এ সুখ যামিনী মধুর চাঁদিনী
এমন সময় তাই,
এস কুতুহলে মোরা সবে মিলে
বিভুগুণ গান গাই।

শ্রীমতী তমাললতা দাসী।

বন্ধুত্ব।

সরল বন্ধুত্ব রত্ন মরি কি সুন্দর!
আহা কিবা মনোরম, অতুলন, অনুপম,
জুড়ায় তাপিত প্রাণ দলিত অন্তর ;
নাজানি কি দিয়া বিধি,এই মনোরম নিধি,
গঠেছে তাই সে এত হয়েছে সুন্দর!

(২)

জগৎ মাঝারে আহা কেহ নাহি যার,
নাহি পিতা,নাহি মাতা,নাহি ভগ্নী,নাহি ভ্রাতা
মরুভূমি মনে করে অসার সংসার ;
অনন্ত শ্মশান প্রায়, সকলেই মনে হয়,
চৌদিকে কেবল দেখে অনন্ত-আঁধার!

(৩)

জীবনের মায়া-ডোর কেটেছে যেজন,
হৃদয় পিঞ্জরে যার, প্রাণপাখী কভু আর,
নাচেনা পুলকভরে, গাহেনা কখন,
সদাই বিষণ্ণ মুখে, রহে বসি, মরে দুঃখে,
দর দর ধারে সেই প্যাখীর নয়ন!

(৪)

আহা পাখী আর কিছু করেনাক আশা,
নাহিক এখন তার, সেই সেই পূর্ব্বকার,
ছাতুলোভে পিঞ্জরেতে থাকিবার তৃষা;
ছিদ্র অন্বেষণে থাকি, উড় উড় করে পাখী,
হারায়েছে বুলি পাখী—হারায়েছে ভাষা।

(৫)

একপ অবস্থা যার, সেও যদি পায়,
বিমল বন্ধুত্ব কারো, হৃদয় আঁধারে তারো,
মধুর মধুর আলো সুবিমল ভায়,
মহা অতৃপ্তির মাঝে, তারো হৃদে তৃপ্তি রাজে,
লভি সে বন্ধুত্ব তার (ও) হৃদয় জুড়ায়।

(৬)

ধন্য ধন্য জগদীশ! তোমার মহিমা,
প্রেমময় বর্ণিবারে তব প্রেম কেবা পারে?
তোমার কৃপার প্রভো নাহি কোন সীমা;
নর-হৃদি জুড়াবারে নর-নারী সুখ তরে
প্রকাশ' প্রকাশ' প্রভো কতই মহিমা!

(৭)

কতই কি মনোরম করিছ সৃজন!
যা'তে আহা ঘোর দুঃখে রহে নর নারী সুখে
পারগো সহিতে ঘোর কষ্ট অযতন,
সরল বন্ধুত্ব তা'রি প্রমাণস্বরূপ হেরি
ধন্য ধন্য কৃপাময় তাপিত রঞ্জন!

শ্রীপ্রমথকৃষ্ণ দেব।

ছবি।

কোন স্বরগের স্বপ্নলোক হতে
আসিল এ ছবি খানি।
কোন্ চিত্রকর-প্রতিভাতুলিকা
গড়িল এমন রাণী!
আননে কোমল ত্রিদিব মাধুরী
কপোলে গোলাপ আভা,
শরীরে চরণে ললিত বিভাসে
উছলয় স্বপ্ন শোভা।
হাসিতে জোছনা—স্বরে বাজে বীণা।
ত্রিদিবের গীত গায়
কম দেহ পরে তরঙ্গ তুলিয়া
যৌবন বহিয়া যায়।
কুঞ্চিত অলক সর্প শিশু সম
পড়িয়াছে চলে মুখে,
কি স্বপনালোক নয়নে তাহার।
প্রাণ খানি ভরা সুখে,
সুরভি নিশ্বাসে মরমের তলে
কি বাসনা জেগে উঠে।
পরতে পরতে হৃদয় মাঝারে
প্রীতির লহর ছুটে।
দরশনে তা'র পরাণে আমার
বেজে উঠে নব সুর!
সংসারের শত মিছা কলরব
রহে পড়ি বহু দূর!

আমিত্ব আমার টানিয়া লয়েছে

আননে ভাসিছে ছবি,

পরশনে তা'র আসে ঘুম ঘোর,

এ কোন্ ত্রিদিব কবি!

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

নব উপহার।

এ নব বরষ প্রাতে

কল্পনে! তোমার হাতে

কি দিব গো নব উপহার?

তরুণ তপন করে

কি প্রেম-অঞ্জলি ধ'রে

দাঁড়াইব সমুখে তোমার?

যা' কিছু আমার হায়

তোমারি মধুবিমায়

হাসি মুখে দিয়াছি সকলি,

সব দুঃখ সুখ মরি

লয়েছ অঞ্চল ভরি'

নত আঁখি কথাটি না বলি'।

আমার সর্ব্বস্ব ধন,

জীবন যৌবন মন,

ও নবাঙ্গ-হৃদয় মাঝারে:

না জানি কি পুণ্যবলে,

পূর্ব্বজন্ম কৃতি ফলে

লভিয়াছে প্রেম পারাবারে।

'আমার' বলিতে সখি!

কিছু আর না নিরখি,

চরাচর তোমারি যে হেরি;

কি দিয়ে তবে গো বালা

গাঁথিব নূতন মালা

দেখ মনে আপনি বিচারি'।

বলগো হৃদয় রাণি!

দুটি সুধাময় বাণী

রচি কিসে নব উপচার?

সখি! এ পাগলে শুন,

তোমারি আমারে পুন

সঁপিনু গো দু'হাতে তোমার।

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

বীণা পূর্ণতান।

দেবি! আজি মম বীণা পূর্ণ তান!

সুনীল অম্বর' পরি

মোহন মুরতি ধরি

অঙ্গুলি সঙ্কেতে মোরে করেছ আহ্বান;

নাহি আর কোন ভ্রান্তি,

পেয়েছি বিমল শান্তি,

মায়া মোহ তিরোহিত, দুরিত অজ্ঞান;

মম পূর্ণ মনস্কাম!

নিখিল বিপুল বিশ্বে,
নানারূপে নানা দৃশ্যে,
হেরিয়াছি কিবা তব মহিমা মহান্,
আজি তাই প্রাণ খুলে
নিষাদেতে স্বর তুলে
গাহিতেছি আমি দেবি ! ইমন কল্যাণ ;
ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্ব্যোম,
গ্রহ তারা রবি সোম,
নিম্নে ধরা, উপরেতে অনন্ত বিমান,
মাতি সবে প্রেমানন্দে
নানা সুরে নানা ছন্দে
চরাচর করিতেছে তব গুণ গান ;
বিশ্ববীণা রবে মম, বিমোহিত প্রাণ,
বীণা পূর্ণতান !

শ্রীকামিনীনাথ রায়।

একবার !

একবার শুধু বসন্ত নিশীথে—
মৃদু হেসে চলে যাও,
আবেশ মাখানো আঁখি দুটী মেলি'
একবার শুধু চাও !
নয়নের কোণে মুকুতার সনে
ফুটুক মোহিনী হাসি ;
অতীতের সনে আসুক ভাসিয়া
দরশ পরশ রাশি।
মেঘের মতন ছড়ায়ে পড়ুক
কাল কেশরাশি তব,
নিথর বিজলী তনুয়া মাঝারে
খেলুক মাধুরী নব !
মেঘের মাঝারে জ্যোৎস্না আলোক
মুখে চকে মেখে বালা,
স্বপনের মত উঠগো ভাসিয়া—
হৃদয় আকাশ আলা।
সারাটী রজনী তোমাকেই ঘিরে
শত তারা জেগে থাক,
চাঁদের জোছনা, ফুলের মাধুরী
তোমাতেই মিশে যাক !
আসুক মলয় সোহাগে বহিয়া
তোমারি সুবাস নিয়ে,
জাগুক বিহগ বসন্ত হৃদ্‌তে
তোমারি বাতাস পেয়ে !
দেখিয়া দেখিয়া আঁখি দুটী মোর
তোমাতেই ডুবে যাক ;
তব, আঁখির আলোকে আকাশ বাতাস
সকলি নিবিয়া যাক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মৃত পুনর্জীবিত। মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভ প্রায় শ্রুতি-গোচর হয় না, কিন্তু সম্প্রতি (২৭ শে মার্চ্চ) ঐরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। একটি মুসলমান স্ত্রীলোক কয়েক দিন হইতে জ্বরে ভুগিতে-ছিল, পরে মৃত্যুর সমস্ত স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া তাহার আত্মীয়েরা সৎকারের জন্য তাহাকে কবর স্থানে লইয়া গেল। কয়েক ঘণ্টা কাল সে মৃতাবস্থায় পড়িয়াছিল, কিন্তু কবরের উদ্যোগ হইতেছে এমন সময়ে স্ত্রীলোকটি বিস্মিত ভাবে ও সকলকে স্তম্ভিত করিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিল। সে বাস্তবিক মরে নাই তবে একপ্রকার চৈতন্য হীন মোহাবস্থায় পড়িয়াছিল মাত্র। যাহাহউক, ঠিক সময়ে চৈতন্যোদয় হইয়াছিল বলিয়া জীবিতাবস্থায় সমাহিত হইতে হয় নাই। তাহাকে কেন ঐ স্থানে আনা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় তাহার আত্মীয়দিগের মধ্যে এক প্রত্যুৎপন্নমতি বন্ধু, পাছে সত্য কথা বলিলে ভয়ে সে সত্য সত্যই মরিয়া যায়, এই আশঙ্কায় উত্তর করিল "আরোগ্য লাভার্থ প্রার্থনার জন্য তাহাকে ঐস্থানে আনা হইয়াছে।" স্ত্রীলোকটি উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে এক ঠিকা গাড়ি করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। ইহা হইতে বোধ হয় মৃত ব্যক্তিকে কয়েক ঘণ্টাকাল কোনও পৃথক স্থলে রাখা কর্ত্তব্য। এরূপও শোনা গিয়াছে দাহকালে কোনও মৃতব্যক্তি হঠাৎ ঐরূপ উঠিয়া বসিলে কুসংস্কার বশতঃ "দানা পাইয়াছে" ভাবিয়া লোকে জোর করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে!

———•———

হস্ত বিহীন চিত্রকর। চার্লস্ ফ্র্যাঙ্কোয়া ফেলু (Charles Francois Felu) একজন সুবিখ্যাত বেলজিয়ান চিত্রকর। ইনি দুইহস্ত বিহীন। সম্প্রতি (৫ই ফেব্রুয়ারী) ৭০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। ২৬শে জুন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে নর্থফ্ল্যান্ডারসের অন্তর্গত ওয়াবমিড্ নগরে ইহার জন্ম হয়। যদিও তিনি আজন্ম হস্তবিহীন তথাপি পুরুষকার বলে দৈবদুর্ঘটনা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে এণ্টোয়ার্প্ সহরে পদদ্বারা চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অঙ্কিতচিত্র পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায়, দেখিতে পাওয়া যায়। স্পেনের রাজ্ঞী ও পোর্টুগালের রাজা তাঁহার অঙ্কিত চিত্র ক্রয় করিয়া তাঁহাকে উপাধি দিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে আগমন করেন; তথাকার ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ও কেনসিংটন মিউজিয়মে তাঁহাকে ছবি আঁকিতে দেখিবার জন্য অনেক লোক আসিত। অতি শৈশবে যখন তিনি বাগানে বসিয়া থাকিতেন ও ফুল লইবার জন্য কাঁদিতেন, তাঁহার মাতা হস্তবিহীন পুত্রকে পদ দ্বারা ফুল কুড়াইয়া লইতে শিখাইতেন। শীঘ্র তিনি এইরূপে ফুল কুড়াইতে শিক্ষা করেন। তিনি অতি সহজে বর্ণ মিশ্রিত করিতে ও ছবি আঁকিতে পারিতেন। আহারের সময় তিনি পদদ্বারা কাঁটা চামচে ব্যবহার করিতেন এবং জলের গ্লাসও কোনও প্রকারে তুলিতে কখনও বিপদ ঘটে নাই। শুধু চিত্র বিদ্যায় নহে, সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। তিনি অনেক কবিতা লিখিয়া ছিলেন এবং কয়েক খানি উৎকৃষ্ট নাটকও লিখিয়া ছিলেন। এণ্টোয়ার্পে তাঁহাকে সকলেই বিশেষরূপে চিনিত, এবং মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে তথাকার মিউজিয়মে বসিয়া ছবি আঁকিতে দেখা যাইত। আশ্চর্য্য প্রতিভা ও পুরুষকার।

কামানের গোলা নিক্ষেপ শক্তি ও মূল্য। এখনকার যুদ্ধক্ষেত্রে যে পক্ষে কামানের গোলা যত বেশী দূরে যায়, সে পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা তত অধিক একথা ইংরাজ-বুয়র সমরে প্রমাণিত হইয়াছে। এবং সেই সূত্রে দূরে গোলা নিক্ষেপকারী বড় কামানের আদরও বাড়িয়াছে। সম্প্রতি পারী সহরে "La Nature" নামক পত্রে এই আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।—

ফরাসীদিগের প্রথম ৬॥ ইঞ্চ রন্ধ্র বিশিষ্ট ১৬ সেণ্টিমিটার ওজনের বড় কামানের (Rifled cannon) গোলা ৬৮০০ গজের অধিক দূরে পৌছিতনা। ১৮৭০ সালে গোলা প্রায় ৫ মাইল (৮৫০০গজ) গিয়াছিল। ১৮৭৫ সালে ইস্পাতের কামান প্রস্তুত করিয়া গোলা প্রায় সাত মাইল (১২০০০ গজ) দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং ঐ কামানের রন্ধ্র পরিবর্দ্ধিত করিয়া গোলা সার্দ্ধ ৮ মাইল (১৫০০০ গজ) পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেই সময় হইতে কামানের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিয়া ফরাসীরা কামানের গোলার দূরক্ষেপণী শক্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিতেছে।

১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে ইংরাজ গোলন্দাজেরা শুবারিনেস্ (Shoeburyness) নামক স্থানে কামানের গোলা ১১ মাইলের অধিক (২০০০০ গজ) দূরে প্রেরণ করিয়াছিল। জার্ম্মানেরা ইংরাজদিগের প্রদর্শিত - পায়ে ইংরাজদের অপেক্ষা ৩৩ গজ দূরে গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ফরাসী আগ্নেয়াস্ত্রও এবিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। ফরাসীদের একটী ১৩॥ ইঞ্চ রন্ধ্র বিশিষ্ট কামান ১৩ মাইল দূরে গোলা নিক্ষেপ করিতে পারে।

কামানের উন্নতির সহিত উহার নির্ম্মাণে খরচ এবং উহার গোলাক্ষেপণের মূল্যও অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মাণ Krupp কারখানার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তি বিশিষ্ট ১১০টন ওজনের কামানের

প্রত্যেক গোলানিক্ষেপে ৮৫০০ ফ্রাঙ্ক (প্রায় ৫০০০৲ টাকা) পড়ে;— গোলার দাম ৩২৫০ ফ্রাঙ্ক ও বারুদের দাম ৯৫০ ফ্রাঙ্ক,—এবং এই গোলা ও বারুদের সহিত কামানের মূল্যের ও কিয়দংশ যোগ করিতে হইবে। কারণ এই কামান ৯৫ বার ছুঁড়িলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এক একটী ১১০ টন কামানের দাম ৪১২,০০০ ফ্রাঙ্ক (প্রায় ২॥ লক্ষ টাকা)। সুতরাং প্রত্যেক গোলা নিক্ষেপে কামানের দাম ৪৩৩৭ ফ্রাঙ্ক (২৬০০ শত টাকা) কমিয়া যায়।

জর্ম্মানির রণতরী বিভাগ সম্প্রতি একটী ৭৭ টন কামান পাইয়াছে যাহার মূল্য ২৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক (প্রায় দেড লক্ষ টাকা)। ঐ কামান ১২৪ বার মাত্র আওয়াজ হইলেই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই কামানের প্রত্যেক গোলাক্ষেপের মূল্য ৪৬০০ ফ্রাঙ্ক (প্রায় ২৭৫০ টাকা)।

৪৫ টন কামান গুলায় অন্ততঃ দেড়শতবার আওয়াজ হয়। এস্‌সেনের (Essen) কারখানায় ঐ কামান প্রস্তুত করিতে ১৮৫০০০ ফ্রাঙ্ক (প্রায় ১ লক্ষ দশ হাজার টাকা) ব্যয় হয়। এই কামানে গোলা নিক্ষেপের মূল্য ২৫০০ ফ্রাঙ্কের (প্রায় দেড হাজার টাকা) অধিক নহে।

অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তি বিশিষ্ট কামানে প্রত্যেক গোলাক্ষেপ করিতে ৪৫০,৪১৭ এবং ৩২৫ ফ্রাঙ্ক (৩ শত হইতে ২ শত টাকা) খরচ হইয়া থাকে।

* * *

প্রশ্ন।—১। ২৪টি দেশালায়ের কাঠি এরূপ কতকগুলি চতু-কোণাকারে সাজাও যে তাহা হইতে ৮টী কাঠি তুলিয়া লইলে দুইটি মাত্র চতুষ্কোণ অবশিষ্ট থাকিবে।

২। একটি জানালার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মাপ সমান। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছু না বাড়াইয়া জানালাটি কিরূপে দ্বিগুণ বড় করা যাইতে পারে ?

৩। নিম্নলিখিত অক্ষর গুলি সাজাইয়া কোন জীবের নাম কর :— (১) ন্ ্কটকবক ্। (২) া শককল ্ (৩) তঙহসলী (৪) SPRSAE-GPORH (৫) ITFSMFA (৬) KOCHNLYEUSE.

* * *

স্বাক্ষরের মূল্য।—সিকাগো সহরের কোন ধনী সেক্ষপীরের একটি স্বাক্ষরের জন্য একলক্ষ ডলার দিতে প্রস্তুত। মহাকবির মোটে ৭টি মাত্র সহি বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে ৩টি একটু কৃত্রিমতার সন্দেহ যুক্ত। বৃটিস মিউজিয়মে কবির যে স্বাক্ষর রক্ষিত আছে তাহা তিন সহস্র পাউণ্ড মূল্যে খরিদ করা হয়। রাজ্ঞী মেরির শিরশ্ছেদের কিছু পূর্ব্বে লিখিত দুইখানি পত্রের ৪০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দাম হইয়াছিল।

* * *

নয়ন মণির হার।—মিসেস্ উইলিয়ম কার্টিস্ সিকাগোর কোন পত্র সম্পাদকের গৃহিণী। তাঁহার একগাছি যথার্থ নরচক্ষু খচিত হার আছে। এই হার গাছি সিকাগো মহামেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। মার্কিনের পেরুপ্রদেশে মৃতব্যক্তিদের বসাইয়া গোর দেওয়া হয় এবং সেখানকার শুষ্ক গরম বাতাসে চক্ষু নষ্ট হয় না। সেখান হইতে এই সকল চক্ষু আনীত এবং স্বর্ণহারের উপর শিল্প নৈপুণ্য সহকারে গ্রথিত। মিসেস কার্টিস্ একবার মাত্র এই হার গলায় পরিয়াছিলেন। লোকে দেখিয়া রত্নখচিত কৃত্রিম চক্ষুভ্রমে বড়ই সুখ্যাতি করিয়াছিল। পরে যখন জানিতে পারিল যেইহা চক্ষুরত্ন খচিত তখন আর তাহাদের ঘৃণার সীমা রহিল না।

কাণমলা। কোন কর্ণরোগ নিপুণ চিকিৎসক বলেন যে বধিরতা অধিকাংশ স্থলেই বাল্য কালে কাণমলিয়া দেওয়া এবং গালে চড় মারার দরুণ জন্মায়।

* * *

ভ্রম বিশ্বাস। জার্ম্মান দেশে পতন অপেক্ষা উত্থানই প্রয়োজন এই বিশ্বাস বশে জন্মমাত্রেই শিশুকে বাড়ীর উপরতলে লইয়া যাওয়া হয়; যাহারা দরিদ্র অথবা যাহাদের উপরে যাইবার রাস্তা নাই তাহারা শিশুকে লইয়া চেয়ার বা টেবিলের উপর উঠিয়াই ক্ষান্ত থাকে।

* * *

বিবিধ সংগ্রহ। ডাক্তার উইল্‌ডার (Burt G. Wilder), বহু বৎসর ধরিয়া বড় বড় লোকের মস্তিষ্ক জড় করিতেছেন। তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিকে বোতল পূর্ণ স্পিরিটে কতশত ব্যক্তির মস্তিষ্ক সাজান রহিয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত তাঁহার ৫০। ৬০ জন বিখ্যাত বন্ধুদিগকে তাঁহাদের মৃত্যুর পর মস্তিষ্ক প্রদান করিতে অঙ্গীকার করাইয়াছেন। বহুবিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কের গঠন ও গুরুত্ব অনুশীলনই ইহার উদ্দেশ্য।

ডাক্তার উইল্‌ডারের মত লেডি রসলিন (Lady Rosslyn) মনুষ্যের মাথার কঙ্কাল জড় করিতেছেন।

ডিউক অপ ইয়র্ক প্রায় বাইশ বৎসর যাবৎ ষ্টাম্প যোগাড় করিতেছেন এবং বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিষয়ে সংবাদপত্রাদিতে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে সেই সমস্ত সহস্র সহস্র পত্র হইতে কাটিয়া নিপুণতার সহিত পুস্তকাকারে রাখিতেছেন।

লর্ড এবার গ্রেভ্‌নির উদ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষ তাঁহার নিমন্ত্রিত এক একটি বড়লোকের সহস্তরোপিত।

আমাদের মহারাণীরও সক কম নহে। তাঁহার একটি পুস্তকা-গারে তাঁহার সাময়িক (Wellington to Roseberry and Louis Philippe to her youngest great grand child) প্রত্যেক বড় লোকের একখানি ফটোগ্রাফ আছে। আর আছে বহুমূল্য ছড়ি (Walking Sticks) একত্রীভূত।

যুবরাজের সংগ্রহের মধ্যে ভারতবর্ষের যতকিছু আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে। আর তাহার নিমন্ত্রিত লোকদিগের ওজন ও স্বাক্ষর তাঁহাদের নিজের হাতে লিখিত তাঁহার একখানি প্রকাণ্ড পুস্তকে আছে।

* * *

ভগ্নীর মত কার্য্য।—"না সুরেন্, বাল্যকালের কথা ভুলিয়া যাও আর এখন তোমায় প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিব না তাহা হইলে আমার স্বামীর নিকট দেবতার নিকট অপরাধিনী হইতে হইবে। তবে এখন হইতে তোমায় ভ্রাতার মত দেখিব ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিব"।

সুরেন। সুশীলা এতদিন পরে যে তোমার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে জানিতাম না, যাহা হউক তুমি আমায় ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিবে ইহাও আমার কম সৌভাগ্যের কথা নহে। আচ্ছা ও বাড়ীর সতীশের ভগ্নী যেরূপ ভ্রাতাকে ভালবাসে ও তাহার সেবা করে সেইরূপ নিজ-ভগ্নীর মত ব্যবহার করিবে ত?

সুশীলা। নিশ্চয়ই।

পর দিন সুশীলা ডাকে একটি পুঁটলি পাইল, খুলিয়া দেখে কি আপদ ২টা ছেঁড়া জামা ও ১ জোড়া মোজা। তাহার সঙ্গে একখানি ছোট কাগজে লেখা আছে পড়িয়া দেখিল—

"প্রিয় ভগ্নি সুশীলা আমি সতীশের কাছে শুনিলাম যে তাহার ভগ্নী তাহার সমস্ত সেলাইয়ের কার্য্য করে। আমার কাপড় চোপড়

[illegible] রাখিবার জন্য অনেক দিন হইতেই ভগ্নীর অভাব বোধ করিতেছি। কাল তুমি ভগ্নী হইতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমার বড় উপকার করিয়াছ। এতৎসহ ছেঁড়া জামা ও মোজা পাঠাইলাম আপাততঃ ভগ্নীর কার্য্য আরম্ভ কর। ডাকে ভার হইবে বলিয়া বোতাম গুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। সেগুলি বুক পকেটে সব আছে” তোমার ভ্রাতা স্বরেন।

সমালোচনা।

মায়া, সামাজিক উপন্যাস শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত মূল্য ।● —✦—লেখক ছাত্র, বাল্যকাল হইতে প্রবন্ধাদি লিখিবার প্রবল ইচ্ছা, তাহারই ফল স্বরূপ এই ক্ষুদ্র উপন্যাস। ইহাতে বিশেষ ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই এরূপ ক্ষুদ্র উপন্যাসে তাহা সম্ভবেও না।

গঙ্গাবক্ষে নৌকামধ্যে নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ, নায়িকা গঙ্গাতীরস্থ কোন ধনী ব্রহ্মচারীর দ্বারা পালিতা, নায়কের নানা অবস্থায় [illegible] দেশে পর্য্যটন ও পরে তাহার কোনও বন্ধুর দ্বারা ঘটনা চক্রে নায়িকার সহিত মিলন। পুস্তিকা খানির প্রারম্ভেই এতবার তাম্বুলের অবতারণা দেখিয়া মনে হইয়া ছিল লেখক বড় তাম্বুল প্রিয়।

৪ পৃষ্ঠা “—মায়া তাম্বুল বিহার দিয়া পান সাজিয়াছিল”

„ “—যুবকটি তাম্বুল লইয়া মায়াকে বলিলেন—”

৫ „ “—মায়া আহারাদি সমাপন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন—”

„ “—স্বামীকে তাম্বুল দিয়া চলিয়া গেলেন—”

৬ „ “—মায়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন”

[illegible] জড়তা কাটে নাই আশাকরি এরূপ দিন[illegible] হাত খুলিয়া যাইবে [illegible]বীন লেখকদের ক্রমোন্নতি বাঞ্ছনীয়।

মথুরা।
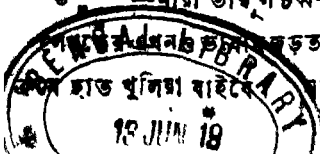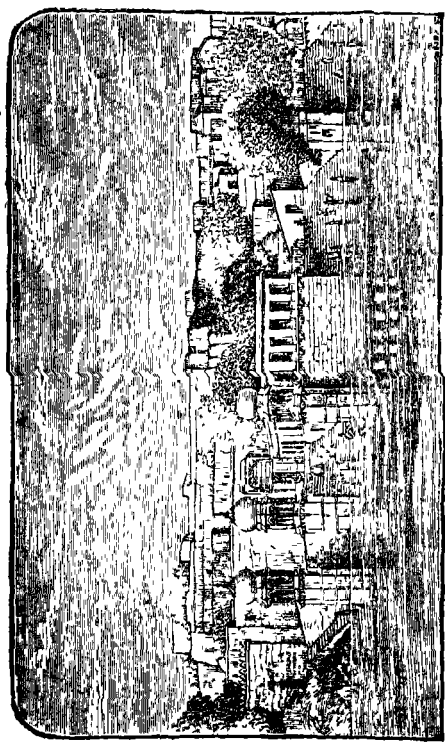
প্রয়াস।

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ। এপ্রেল, ১৯০০ সাল। চতুর্থ সংখ্যা।

শুভ নব বর্ষ।

(১লা বৈশাখ ১৩০৭।)

১

আমার বাড়ীতে প্লেগ হরি, হরি, হরি,
বিড়ালে মাছের লোভে ভেঙ্গে গেল হাঁড়ি!
গাভীটা গাবিন্ হ'য়ে দুধ হ'ল বন্ধ,
থেকে থেকে পাই পচা ইঁদুরের গন্ধ,
রোজ ডিম দিতে ছিল হাঁসটা—তাহায়,
শিয়ালে মারিল; কোট হারালে ধোপায়!
তবু শুভ বরষের প্রভাত যখন
তোমায়, আমায় এস করি আলিঙ্গন।

২

এবার মাহিনা নিতে পেয়েছিনু 'গিনি'
ঘরে এলে কেড়ে নিলে আমার গৃহিণী।
বায়না ধরিল তা'র গড়াবে গহনা,
এদিকে রহিল বাকি মাসিক লহনা।
মুদিতে উঠনা বন্ধ করেছে আমারে,
ঠেকেছি বিষম দায় পেট চলা ভার।
তবু নব বরষের উদয় যখন,
এস ভাই সুখে করি শুভ আলিঙ্গন।

৩

মোহিনী শ্বশুর বাড়ী হ'তে এল কাল,
বিষম দেহের তাপ ফুলিয়াছে গাল;
কবিরাজ দিলা তা'য় "সূচিকাভরণ";
প্লেগ দূত ও বাড়ীর করিছে শোধন।
থাঙ্গিরিল হাম বুঝি খোকাটার গায়,
শীতলার পূজা দিনু গিন্নির জ্বালায়।
তবু নব বরষের উদয় যখন,
এস সবে করি সুখে শুভ সম্ভাষণ।

৪

চারিদিকে মহামারী দুর্ভিক্ষের জ্বালা,
যুদ্ধের সংবাদে কাণ হ'ল ঝালাপালা।
টেক্স আদায়ের তরে এসেছে শমন,
এখনি জলের কল করিবে কর্ত্তন।
গোয়ালা এনেছে বর্দ্ধ করিয়া দ্বিগুণ ;
এখনো এলোনা আজ রাঁধুনি বামুন।
তবু নব বরষের উদয় যখন,
এস সবে করি সুখে শুভ আলিঙ্গন।

৫

তোমার ভাইটি পাশ হয়েছে এবার ;
কাশীতে গিয়েছে হরি, খাব' তুমি যার।
মরেছে মহেন্দ্র—পেলে দেনা হ'তে ত্রাণ,
ওলাউঠা হ'তে বুড়ি লভিয়াছে প্রাণ !
নলিন্ হয়েছে বটে 'ওভারসিয়ার,'
নূতন খিলানে ফাট ধরেছে তাহার।
তবু নব বরষের উদয় যখন,
এস সবে মিলে করি শুভ আলিঙ্গন।

৬

গ্লানি আর রেষারেষি সাপ্তাহিকে ভরা ;
কন্যাদায়ে বাঞ্ছেশ্বর হ'ল ভিটেছাড়া।
সন্ধ্যা বেলা শিলা বৃষ্টি ভয়ানক ঝড়ে
যতনের লতাগৃহ ভেঙ্গে আছে পড়ে।
সাধের যে ম্যাগ্নোলিয়া মাটিতে লুটায় ;
প্লেগ ভয়ে মালী বেটা ছোটে হাবড়ায় !
তবু আসিয়াছে শুভ বরষ যখন,
এস সবে মিলে করি সুখে আলিঙ্গন।

৭

সংকীর্ত্তন কোলাহলে রাত্রে নাই ঘুম,
শ্মশানে বাড়িল চিতা—মরণের ধূম।
ধ্বংস বই কথা নাই নগরে কি রোল,—
'রাম নাম সত্য হয়' আর 'হরিবোল'।
আশে পাশে যায় শব কাঁপাইয়া হিয়া ;
মনে হয় গ্রন্থি বুঝি উঠিল ফুলিয়া !
তবু আসিয়াছে শুভ বরষ যখন,
এস সবে মিলে করি সুখে আলিঙ্গন।

৮

দু'দিন করিয়া কায নূতন যে দাসী
পলাইল,—সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ বিশ্বাসী,
ভৃত্যটা চম্পট দিল—কি জানি কি বুঝে ?
সোণার ঘড়িও চেন পাইনিক খুঁজে !!
তোমার লেখার বড় সুখ্যাতি যে শুনি,
বিদেশী কবিতা হ'তে তোল প্রতিধ্বনি।
তবু আসিয়াছে নব বরষ যখন,
এস ভাই সুখে করি শুভ আলিঙ্গন।

৯

আমার বিরাম গৃহ, সম্মুখ তাহার,
ডাল হাবা ভাঙ্গে ডাল ঘর্ঘর ঝাঁতার
উঠিতেছে দিবা নিশ—আর ধূলা ওড়ে ;
আমিও কবিতা লিখি সুখ শান্তি ছেড়ে।
নূতন খাতার আজ আছে নিমন্ত্রণ—
—যদিও পেটের রোগ সারেনি এখনো—
তবু শুভ বরষের উদয় যখন,
সম্ভাব রাখিতে চ'ল করিগে ভোজন।

ঘটকর্পর ও শ্লিষ্ট কবিতাদি।

ঘটকর্পর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতম রত্ন। শ্লিষ্ট রচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদা তিনি এরূপ প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে কবি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যমক রচনা করিতে পারিবেন, আমি ঘটকর্পরের (খাপ্‌রা) দ্বারা তাঁহার জলবহন করিয়া দিব। বলা বাহুল্য ঘটকর্পরের এইগর্ব্ব স্থায়ী হয় নাই। মহাকবি কালিদাস অচিরেই 'নলোদয়' নামক অতি উৎকৃষ্ট যমক কাব্য প্রণয়ন করেন। বস্তুতঃ নলোদয় কাব্যের যমক রচনা শ্রুতিকটু হওয়া সম্ভব। কালিদাসের যমক স্থানে স্থানে অতিশয় শ্রুতিসুখকর হইয়াছে। ইহার কারণও বিদ্যমান আছে। যাঁহারা কষ্ট কল্পনা পূর্ব্বক রচনা করেন তাঁহাদের রচনা শ্রুতিসুখকর হয় না। তাঁহারা উপযুক্ত ভাব উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। তাঁহাদের যদি ভাষা যুটে তবে ভাব যুটে না। আর যদি ভাব যুটে তবে ভাষা যুটে না। এই জন্যই তাঁহাদের রচনার পারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যিনি কবি, তাঁহার নিকট কবিতার উৎস আপনিই ছুটিতে থাকে। তাঁহার হৃদয়ের ভাব আপনিই উৎকৃষ্ট ভাষায় বাহির হইতে থাকে। কষ্ট কল্পনা তাঁহার আদৌ আবশ্যক করে না। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে 'The Poet is born not made' অর্থাৎ 'কবি আপনা হইতেই হইয়া থাকে, কবি প্রস্তুত করা যায় না'। কবিত্ব ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা, কবিত্ব চেষ্টার ফল নহে। চেষ্টা করিয়া যে 'কবিত্ব' লাভ হয় তাহা

প্রকৃত কবিত্ব নহে। সে কেবল ছন্দোময়ী বাণী প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা মাত্র। তাহাতে ভাব মাধুর্য্য একটুও দৃষ্ট হয় না।

"পোহাইল বিভাবরী কুমার স্মরিয়া হরি
ত্বরা করি কৈলা গাত্রোত্থান।
উদয় হইল রবি বন্ধু সহ যান কবি
সরোবরে করিবারে স্নান।"

এরূপ লিখিলে কবিতা হইল না। আবার একটীও পদ্য না থাকিলেও কাব্য হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্থল—কাদম্বরী।

তাহা হইলেই হইল ছন্দোময়ী বাণী হইলেই পদ্য বা কাব্য হয় না। রসের অবতারণানুসারেই কাব্য। 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং' এইরূপ আলঙ্কারিকদিগের মত। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। যিনি রসের অবতারণা করিলেন তিনিই কবি। অপরের আয়াস সাধ্য পদ্য, কাব্য মধ্যে গণ্য নহে। চেষ্টাদ্বারা যে "কবিত্ব" লাভ হয় তাহা প্রকৃত কবিত্ব অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা যাউক। একদা এক কবি ও একজন পণ্ডিত (ইনি ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন) উভয়ে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। সম্মুখে মহাবন ছিল; সেখানে নানা প্রকার পক্ষী কলধ্বনি করিতেছিল। সম্মুখে একটী শুষ্কবৃক্ষ ছিল। পণ্ডিত ব্যক্তি উহা দর্শনে বলিলেন "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" অর্থাৎ সম্মুখে শুষ্ক কাষ্ঠ (বৃক্ষ) রহিয়াছে। অনন্তর কবি বলিলেন "নীরস তরুবর পুরতো ভাতি" অর্থাৎ নীরস তরুবর সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। ইহা হইতেই স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রকৃত কবির কাব্য ও কৃত্রিম কবির কাব্যে কত প্রভেদ। পণ্ডিতের রচিত পদটী শ্রুতিকটু হইয়াছে, আর কবির রচিত পদটী যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে।

ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এক্ষণে শ্লিষ্ট রচনা কাহাকে বলে দেখা যাউক।

নিম্নলিখিত বিবরণটী হইতে শ্লিষ্ট রচনার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

বৰ্দ্ধমান নগরে প্রতি বৎসর ৺পূজার সময় গীতাভিনয় হইত। যে সময়ের কথা হইতেছে তৎকালে গোবিন্দ অধিকারীর গীতাভিনয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেজন্য গোবিন্দ অধিকারীর গীতাভিনয় বর্দ্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির সমক্ষে হইত। অপর অপর ব্যক্তির গীতাভিনয় রাজবাটী, রাজোদ্যান বা অপর কোনও স্থানে হইত। যে ব্যক্তির গীতাভিনয় পূর্ব্বের কোনও বৎসরে অতিশয় নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত, পর বৎসরে ঐ ব্যক্তির প্রতি টাটী নামক স্থানে অভিনয়াদি করিবার আদেশ হইত। টাটী শব্দে এস্থলে পায়খানা নহে। এই স্থানটি নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের আমোদাহ্লাদের জন্য নির্ণীত ছিল বলিয়া উহার পূর্ব্বোক্তরূপ নামকরণ হইয়াছিল। সে যাহা হউক—একদা গোবিন্দ অধিকারী মহারাজের অসন্তোষ ভাজন হওয়াতে মহারাজ আদেশ করিলেন যে এবার ৺ পূজার সময়ে টাটিতে গোবিন্দ অধিকারীর গীতাভিনয় হইবে। বলা বাহুল্য গোবিন্দ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপতির আজ্ঞা কখনই অন্যথা করা কর্ত্তব্য নহে। সেই জন্য গোবিন্দকে বাধ্য হইয়া টাটীতেই গীতাভিনয় আরম্ভ করিতে হইল। অভিমানে এবার নিজে কিছুই সাজিলেন না। তবে সর্ব্বক্ষণ আসরে উপস্থিত থাকিয়া মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে মহারাজ আসিতেছেন সংবাদ আসিল। গোবিন্দ

মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ আসিয়া উপবেশন করিলেন। পরে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল। যথা—

মহারাজ। গোবিন্দ তুমি এবার সাজ নাই ?

গোবিন্দ। হুজুর! আবার সাজা ?

(অর্থাৎ টাটীতে অভিনয় করিতে দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট সাজা (দণ্ড) আবার আমাকে সাজিতে বলিতেছেন ?)

মহারাজ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "না তোমার দুই একটি গীতাদি শুনিব।"

গোবিন্দ। হুজুরের যেরূপ আজ্ঞা হয়।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে কৃষ্ণলীলার গীতাভিনয় হইতেছিল। কৃষ্ণ, কুব্জা রাণীকে বামে লইয়া মথুরায় রাজা হইয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে বৃন্দা দূতী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। দূতীর কথা কহিবার পালা ছিল। গোবিন্দ অধিকারী রাজাজ্ঞা পাইয়াই দূতীর পালা আরম্ভ করিলেন। দূতীবেশে গোবিন্দ অধিকারী গীত ধরিলেন :—

এই কি বিচার নরপতি, এই কি বিচার নরপতি
হীরামণকে বাহিরে রেখে কাকের গলায় গজমতি॥

পাঠক মহাশয়! এই কথোপকথন এই খানে যে অপরূপ মাধুর্য্য ব্যক্ত করিতেছে ও এই আবার "সাজা" শব্দটী ও পরিবর্ত্তী শ্লোক যে কি সুন্দর নাট্যকলা কৌশল ব্যক্ত করিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। এই স্থানের যথার্থ চাতুরী ও ভাব মাধুর্য্য ভাবিতে গেলে যে মন বাস্তবিক পুলকিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রবাদ এইরূপ যে ঘটকর্পর চমক নামক কাব্য প্রণয়ন করিয়া

নবরত্নগণের এক অধিবেশনে উহা গর্ব্ব সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। উহার পরবর্ত্তী অধিবেশনেই কালিদাস স্বরচিত মেঘদূত কাব্য খানি পাঠ করিয়া ঘটকর্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। উভয় কাব্যের উপাখ্যান ভাগ স্থূলতঃ এক প্রকার এবং উভয় কাব্যেই মেঘকে দৌত্য ভার দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে কেহ কেহ বলেন যে ঘটকর্পর ও কালিদাসের মধ্যে দ্বেষ ভাব প্রবল থাকায়, ঘটকর্পর যাহা রচনা করিতেন, কালিদাস উহাকে পরাস্ত করিবার মানসে ঠিক সেইরূপ রচনা করিতেন। এই মতটী শুনিতে ভাল বটে।

অপর পক্ষে কেহ কেহ বলেন যে চমক কাব্য নবরত্নগণের মধ্যে কাহারও লিখিত নহে। ইহার রচনা দেখিলে ইহাকে প্রাচীন পুস্তক বলিয়া মনে হয় না। আর এক কথা মল্লিনাথ প্রভৃতি ব্যক্তিগণও উক্ত কাব্যের অস্তিত্বের কোনও বিশেষ প্রমাণ দেন নাই। ইহারা আরও বলেন যে ঘটকর্পর নামে কেহ কবি ছিলেন কি না তাহাও সন্দেহ। ভিন্নমতাবলম্বীরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

কেবল রচনা দেখিয়া কোন্ পুস্তক প্রাচীন, কোন্ পুস্তক নূতন উহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কোনও কাব্য মধ্যে যে শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলা হয়, উহা প্রক্ষিপ্ত না হইতেও পারে। কালিদাস প্রণীত মেঘদূতের কয়েকটী শ্লোককে মল্লিনাথ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। কিন্তু সে ভাবের শ্লোকও কুমারসম্ভবের অলকাবর্ণনে দৃষ্ট হয়। তবে শ্লোক কয়েকটীকে প্রক্ষিপ্ত বলা হইল কেন? এইরূপে মহাভারতেরও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের কথা বলা হয়। চমক কাব্য সম্বন্ধে যে উক্তরূপ বলা হইবে ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে।

শ্রীবিপিন বিহারী সেন গুপ্ত।

দাদার অভিশাপ।

(গল্প)

(১)

তখন রাত্রি প্রায় দশটা। হরেন্দ্রনাথ টেবিলে এক খানা নভেলের পাতা উল্টাইতে ছিলেন। পত্নী তারা সুন্দরী, পান চিবাইতে চিবাইতে চেয়ারের এক কোণে বসিয়া বলিলেন "আজ একটা নূতন খবর আছে। তবে অমনি বলচি না—কি দেবে বল ?"

স্বামী হরেন্দ্রনাথের এরূপ অনেক আব্দার অভ্যস্ত ছিল বলিয়া বলিলেন "জানি।"

"কি, বল দিকি নি ?"

"ঐ ত পাশের বাড়ীর কথা।"

"তাই বল যে জান না। সবই উনি আগে জানেন !" বলিয়া তারাসুন্দরী হরেন্দ্রনাথের মুখের নিকট একবার হাত ঘুরাইয়া লইলেন। হরেন্দ্রনাথ হাতটা ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন "ব্যাপারটা কি আজ ?"

"সত্যি একটা সুখবর বল্‌বো। আমায় কিন্তু কিছু দিতে হবে।"

"আচ্ছা, কি আগে শুনি।"

"বড় ঠাকুরের বিয়ে।"

"যাও ! যাও !"

"দিন দশ পরে গরীবের কথা বাসি হো'ক—"

"কে বল্লে ?"

"বড় ঠাকুর নিজে মা'কে বলেছেন।"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

"কেন? আমি বল্লুম বলে?"

"সুখবর হ'ল কি করে?"

"একা থাকেন, সন্ন্যাসীর মতন ঘুরে বেড়ান; বিয়ে হ'লে আবার ঘরে মন বস্‌বে। কে না চায়?"

"ভুল বুঝেছিলে। দাদার কি বিয়ে হয়নি?"

"তা' হ'লে কি হয়; তিন মাসের মধ্যে মরে গেলেন। সেও আজ তিন বৎসর হ'ল।"

"তোমরা বিধবা হ'লে কি বিয়ে কর্‌তে পাও?"

"তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারি নে" বলিয়া তারাসুন্দরী ঘাড় নামাইলেন। একটা রক্তিম আভা তাঁহার মুখে ছড়াইয়া পড়িল। চিত্রিত ভ্রূরেখার নিম্ন-হইতে বক্র দৃষ্টিতে হরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি হ'লে কি কর্‌তে?"

হরেন্দ্র তারাসুন্দরীর মুখটি ধরিয়া নিজের ক্রোড়ে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি বিশ্বাস হয়!"

তারাসুন্দরী অম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "বল্‌বো?"

"বল না।"

"তুমিও বিয়ে কর্‌তে।"

"এত অবিশ্বাস! ছি!"

"মলে' ত আর দেখ্‌তে আসতুম না।" বলিয়া তারা সুন্দরী অধর-দংশিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হরেন্দ্র বলিলেন "তুমি তাই মনে কর বটে। কিন্তু এত বেইমান ভের না।" তারাসুন্দরী হরেন্দ্রের মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন "বক্কো

না।" হরেন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে বহিয়া বলিলেন "দাদাকে বল্লেই বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।"

"যাই কর ভাঙ্‌বেনা। কা'র সঙ্গে হবে জান ?"

"কার সঙ্গে ?"

"তোমার ছেলেবেলা হ'তে যে তোমার কাছে সুন্দরী।"

"কে, তবু শুনি ?"

"তোমাদের শশীবাবুর বোনের সঙ্গে।"

"সত্যি ! এত ঠিক ?"

"হাঁ !"

"যদিই বা হয় জেন এ বিয়ে সুখের হ'বে না।"

"কেন।"

"ভাঙ্গা কাচ কি যোড়া লাগে ?"

"তুমি বড় বদ্। কোথা আহ্লাদ হ'বে না তুমিই—"

"আর শশীই বা কি। এতদিন তা'র সঙ্গে আলাপ জান্‌তুম না যে তা'র মত এরকম কখনও হ'বে। আচ্ছা কাল শশীর সঙ্গে দেখা করচি।"

"তা কর্‌বো। আমার ঘুম পাচ্ছে।" বলিয়া তারাসুন্দরী শয্যায় যাইলেন।

হরেন্দ্রনাথ বই খানি বন্ধ করিয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। রাখিয়া কি একটা ভাবিতে লাগিলেন। পরে দুইখানি চিঠির কাগজ লইয়া একখানিতে লিখিলেন—

"দাদা !

আপনি আমার অপেক্ষা একবৎসর বড় হইলেও চিরকালই আমাকে স্বাধীন ভাবে কথা কহিবার অবসর প্রদান করিয়াছেন,

সেই জন্য আজ যদি কোনও বিষয়ে আমার মত আপনার বিরুদ্ধে প্রকাশ করি, তাহা দুষ্যগণ্য হইবে না বলিয়া বোধ হয়।

শুনিলাম আপনি আবার বিবাহ করিবেন। এরূপ বিবাহ যে অন্যায় তাহা আপনারই নিকট শুনিয়াছি। আপনিই বলিতেন যে আমাদের সমাজে যেমন বিধবা বিবাহ চলে না, মৃতদারেরও সেইরূপ বিবাহ করা উচিত নয়।

আমি ইহার যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা লইয়া আপনার সহিত বিচার করিতে চাহি না এবং সেই জন্য মৌখিক কোনও কথা হইল না। আপনি বিশেষ জানেন যে তর্কক্ষেত্রে নামিলে আমার মেজাজ ঠিক্ থাকে না।

আমার বক্তব্য এই যে এ বিবাহ যদি হয় জানিবেন যে আমার সম্পূর্ণ অমতে হইতেছে। আপনাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

আপনার স্নেহের ভ্রাতা

শ্রীহরেন্দ্র।

আর এক খানিতে লিখিলেন—

শশি,

তোমার সহিত কোনও বিশেষ কথা আছে। তুমি কি অদ্য সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী আসিতে পারিবে? যদি পার ত ভাল হয়।

তোমার

হরেন্।

(২)

পরদিন সন্ধ্যার সময় শশীবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কিহে হরেন্ আমায় অনুগ্রহ করেছ কেন?"

হ। অনুগ্রহ করেছি, তুমি নিগ্রহ করেছ বলে ?

শ। সে কি রকম ?

"বল্‌ছি, বস।" বলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া দিয়া হরেন্দ্র আবার বলিলেন "দেখ একটা বড় অন্যায় কথা শুন্‌চি। দাদা নাকি বিয়ে করবেন ?"

শ। সত্যি এবড় অন্যায় কথা।

হ। আচ্ছা, তুমি কি এসব অন্যায় বল না।

শ। পঁচিশ বার বলি, (শশী বাবু কথা গুলি বরাবরই একটু হাসিয়া বলিতেছিলেন।)

হ। নাও, রঙ্গ রাখ।

শ। রঙ্গ কে কর্‌ছে? তুমিই ন্যাকামি করে' জিগেস্‌ করছো দাদার নাকি বিয়ে? যেন তুমি সবকথা জান না ?

হ। আচ্ছা ভাল করে' কথা কওয়া যাক্‌।

শ। সব কথাই আমি জানি। তুমি এরই মধ্যে সকলকে বলে বেড়িয়েছ। জান তোমার দাদা একে লাজুক, তা'তে কতকরে রাজি করিয়েছি। ছি! তুমি এত ছেলে মানুষ তা জান্‌—

হ। আর আমিও জান্‌তেম না যে তুমি এত Unprincipled.

শ। এখন ত জান্‌লে ?

হ। আমার বিশ্বাস তুমি নিজে এক পক্ষ না হ'লে এ বিবাহে মত দিতে না।

শ। সেটা বলো না। আর যা বলো ও'রকম স্বার্থপর বলো না।

হ। তা নয়ত কি। আগে কি মত ছিল ?

শ। বয়স বাড়ছে না কমছে ?

হ। তা' বলে' ভাল মন্দ বিচার শক্তি কম্‌ছে না।

শ। কমছে না বলেই জিজ্ঞাসা করি বয়স বাড়ছে না কম্‌ছে।

হ। তুমি শেষ কালে ভাল বল্লে। তবে বিধবা বিবাহ চলে না কেন ?

শ। ভাই আমি তর্ক কর্‌তে আসিনে। সবজেনে এসে'ছি কেবল গোটা কতক কথা বল্‌তে—

হ। কি শুনি।

শ। এ বিবাহে মিনতি করি কোনও বাধা দিও না। তুমি তোমার দাদাকে যা' লিখেছ তাহাও পড়িয়াছি—তোমার দাদা বড় দুঃখিত হয়েছেন। সকালেই আমাদের বাড়ী গিয়ে কত কথা বল্লেন সে সব বলে কায নেই। যুক্তির মধ্যে এই টুকু বলি যে তিনি তোমার অপেক্ষা অল্প শিক্ষিত বা অল্প বুদ্ধিমান নন। এভেবে তোমার কি উচিত তোমার দাদার সুখে বাধা দেওয়া ?

"বেশ, দাদা সুখী হ'ন হউন। তবে তুমিও যেমন স্পষ্ট কথা বল্লে আমিও স্পষ্ট কথা বলি না কেন ?"

"বেশ কথা, বল।"

"আমি সত্যের পক্ষে সমাজের মাঝে দাঁড়াইব। আমি এ বিবাহে যোগদান করিব না।"

শশীবাবু একটু বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন "কাল আসিব—আর একবার ভাবিয়া দেখিও।"

"না যা' বলিয়াছি শেষ কথা।"

দুইজনে অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। শশীবাবু উঠিবার সময় বলিলেন "তবে আজ আসি।"

হরেন্দ্র বলিলেন "দেখছি সত্যি রমার বিয়ে হ'ল। তবে তা'র কপালে দোজবেরে বর হ'বে এটা কখনও ভাবিনি।"

শশী বাবু বলিয়া গেলেন "আমিও সত্যের খাতিরে এই কথা বলি যে এ বিবাহ তার পুণ্যফল ও আমাদেরও পুণ্যফল থাকিলেই হইবে। তবে আসি।"

যখন বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন হরেন্দ্র স্থির করিলেন যে বিবাহের কয়দিন বিদেশে যাইবেন। মাতা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও রাগান্বিত হইলেন এবং বিবাহের সময় কোথাও যাইতে বারবার নিষেধ করিলেন।

তারাসুন্দরী, পতির আচরণ ও অভিপ্রায় বুঝিতেন বলিয়া, সময়ে সময়ে অনেক বিদ্রূপ করিতেন। আজ বলিলেন "তুমি যে বড় বাড়ালে। ইচ্ছে করে খালি তোমার মজা দেখ্‌তে একবার মরি। আমার কথা শুন্‌বে ?"

"না।"

"যদি শোন ত বলি যেও না।"

"বলচি ত শুন্‌বো না।"

"তা শুন্‌বে কেন! আমায় ভালবাস যে, আমার কথা কি শোনে ? খালি কথাই জান ভালবাসি আর ভালবাসি।"

জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ যখনই শুনিলেন যে বিবাহের সময় হরেন্দ্র বাড়ী থাকিবেন না তখন তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। হরেন্দ্রকে বলিলেন "বিবাহের পূর্ব্বেই যদি তুমি ভাই বাড়ী ছাড়িবে এমন বিবাহ নাই বা করিলাম।"

"আমি ত শশীকে একথা আগেই বলেছিলাম।"

"শুনিয়াছিলাম দাঁড়াইবে না। তা' আমার দুর্ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম। বাড়ী ছাড়িবে এমন ত কোনও কথা বলো নাই।"

"যদি না বলে থাকি তা' হ'লে যাব না। কিন্তু যা' বলিয়াছি সেটা অন্যথা হ'বে না।"

"তোমার ইচ্ছা আর আমার ভাগ্য। যদি যথার্থই দোষী হই, লেখা পড়া শিখিয়া দোষের প্রশ্রয় দিবে কেন ভাই ?"

হরেন্দ্রের মনে প্রথম একটা প্রতিকূল ভাব আসিল। তিনি ভাবিলেন "আমি হয়ত বাড়াবাড়ি করিতেছি। কিন্তু পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্তের মুখে সে ভাব সে চিন্তা, স্রোতোমুখে তৃণ খণ্ডের ন্যায় অপসারিত হইল।

(৩)

তার পর বিবাহের দিন আসিল। হরেন্দ্র পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। মা বলিলেন, পত্নী তারাসুন্দরী অনুনয় করিলেন, বিদ্রূপ করিলেন, বন্ধুবর্গও দুই একবার চেষ্টা করিলেন, শশীবাবুর সহিত একবার ব্যঙ্গ আরম্ভ হইয়া বিবাদ ও পরে উভয়ের ক্ষমা প্রার্থনা পর্য্যন্ত হইয়া গেল, হরেন্দ্রের প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। শশী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই এত কথা কেন ? একটা কথা আমায় বুঝাইয়া দিতে পার, আমাদের এত লোকের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিতেছ কেন ?"

"এত লোকের চেয়েও বড় একটা আছে।"

"কি ?"

"Conscience" শশীবাবু আর কিছু বলিলেন না।

দেবেন্দ্রের অনুরোধও উপেক্ষিত হইল। জ্যেষ্ঠ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "কিন্তু এই সংকল্প যেন চিরকাল থাকে।" তাহা শুনিয়া হরেন্দ্রের মনে যেন কি একটা অমঙ্গলের ছায়া পড়িল। একবার যেন মনে হইল "দাদার স্নেহের ত অপমান করিতেছি না ?" কিন্তু উদ্ধত

যৌবনের যুক্তি লব্ধ সত্যের নিকট এ সকল চিন্তা দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচায়ক মাত্র।

বিবাহ হইল বটে কিন্তু তাহা বড় শুভক্ষণে হয় নাই। সহোদর ভাই, দাদার বিবাহে যোগদান করিল না, অপরিচিত অতিথির মত এক পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এটা বাঙ্গালী গৃহস্থের নিকট কেমন অমঙ্গলসূচক বিসদৃশ, ভাবী বিচ্ছেদ সংসৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

বিবাহের পর ক্রমে দুই ভাইএ মনোমালিন্য বাড়িতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু লোকে বড় বিদ্রূপ করিত। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের উপর তাহা শোধ তুলিতেন। কয়দিন হরেন্দ্র দাদার সহিত কোনও কথা কহিতেন না। পরে কথা কহিতেন বটে কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কথা চলিত না। পূর্ব্বে দুই ভাইএ বসিয়া সাময়িক সামাজিক আন্দোলন, সাহিত্য বা বিষয়কর্ম্ম লইয়া যেমন সন্ধ্যার বিশ্রামসময় অতিবাহিত করিতেন, সেরূপ আর একদিনও ঘটিল না। পূর্ব্বে যেমন রাম লক্ষ্মণের মত একধ্যান একপ্রাণ ছিলেন, একত্রে বসিয়া কত চরিতকথা কত ঐতিহাসিক আখ্যান-মালা, কতনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন, সে অবস্থা আর ফিরিয়া আসিল না। হরেন্দ্র ইহাতে কোনও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু দেবেন্দ্র অপরাধীর মত বড় অনুশোচনা করিতেন। ভাবিতেন "কি করিলাম বিবাহ করিয়া,ঘরের ভাইকে পর করিলাম।" আবার তাঁহার এই চিন্তায়,এই অনুশোচনায়, এই অভাববোধে, আর একজন কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী। তিনি সবেমাত্র তাঁহার নূতন জীবনে পদার্পণ করিয়াছেন. কোথায় তাঁহার অনন্ত আশা, অসীম আদর ও অপূর্ব্ব নূতনত্ব মায়াময়-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহা না হইয়া কেবল গতসুখের অভাব ও

ভ্রাতৃবিরোধ সূচনা তাঁহার চির আশার গৃহস্থলীকে অমঙ্গল ও নিরানন্দের আবাস করিয়া তুলিতে লাগিল। কোথায় তাঁহার স্বামীর দেবতা হীন হৃদয় মন্দিরে বিভূতিময়ী লক্ষ্মী হইয়া অধিষ্ঠান করিবেন, তাহা না হইয়া, তাঁহার আগমনে বিজয়া দশমীর বিষাদ ও শূন্যতা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র বালিকাহৃদয় সংসারের প্রথম আস্বাদই যদি তিক্ত বোধ করে প্রথমেই যদি সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিতে দেখে তবে তাহা কি সহিতে পারে, তাহাতে কি মুহ্যমান হইয়া পড়ে না?

তবে রমাসুন্দরী সুশীলা ছিলেন। আপনার আশা গতপ্রায় হইয়াছে বলিয়া পরের দোষ দিতেন না, আপনি কল্পনা সৃষ্ট জগৎকে বাস্তব করিতে পারিতেছেন না বলিয়া পরের নিকট তাহা প্রার্থনা করিতেন না। শতবর্ষের পুরাতন বটগাছ যেমন স্বীয় মস্তকে উদীয়মান মেঘমণ্ডলের বর্ষাপাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে, সুশীলা শিক্ষিতা রমা সেইরূপ ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়া গুলি আপনার অদৃষ্টফল বলিয়া সহ্য করিতে অভ্যাস করিতেছিল। রমার কৈশোরে মুকুলিত-সাধ জীবনে শত আকাঙ্খার মধ্যে একটীও কি পুরিয়াছিল?

একরাত্রে রমা স্বামীর নিকট শুনিলেন "তোমায় বিয়ে করে ভাল করিনি।" বিবাহ হইয়া অবধি রমা একদিনও ভাল করিয়া মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পান নাই এ কথার তিনি কি উত্তর দিবেন? বালিসের কোণে মুখ দিয়া শুইয়া ছিলেন, মুখটি আরও লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্র ক্ষণেক চুপ করিয়া আবার বলিলেন "তোমারই বা এসব কথা বলা কেন? আমার কাযের ফল আমিই ভোগ করি।" রমার ক্রন্দন এবার একটু স্পষ্ট হইল। দেবেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

মাথাটী ক্রোড়ে লইয়া দেখিলেন বাষ্পে মুখচোক ভার হইয়া উঠিয়াছে। অঞ্চলে মুখটী মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাঁদছো কেন ?"

রমা আজ প্রথম স্বামীর অঙ্কে শুইতে পাইলেন। আজ প্রথম বহু আশায় যৎকিঞ্চিৎ আদরও লইলেন। চাপত্যক্ত বাষ্পরাশি যেমন ছড়াইয়া পড়ে, নয়ন জল তাঁহার মুখে ও স্বামীর ক্রোড়ে তেমনি বহিতে লাগিল। দেবেন্দ্র নাথ আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েচে—কাঁদচো কেন ?" কিন্তু রমা আরও আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শেষে চুম্বন নিষ্পীড়িত অধর হইতে উচ্চারিত হইল "তুমি ও সব কথা বলো কেন ?"

দেবেন্দ্র নাথ কথাটা বুঝিলেন। ফুলশয্যার রাত্রে তিনিই না হয় মানসিক কষ্টে উদ্বেলিত ছিলেন কিন্তু বালিকার ঈপ্সিত একটা কথাও ত কহেন নাই। আর আজ যে ছয় মাস বিবাহ হইয়াছে তিনিই না হয় আপনার ভ্রম মনে করিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন, সে বালিকা, তাহার কি দোষ যে সে তাহার জীবনের সুখআশা একেবারে বিসর্জ্জন দিবে। দেবেন্দ্র নাথ বলিলেন "না ভাই তোমার সামনে আর কোনও কথা বল্‌বো না। তুমি কেন আমার জন্য কষ্ট পাও ?"

"আমি কি তা' বল্‌চি ?"

"তবে কি বল্‌চো, রমা?"

"বিয়ে হয়ে অবধি তুমি অসুখী কেন ?"

"দেখ্‌ছো ত সব। চিরকালের আদরের নিজের ভাই সে পর হ'ল তাই বড় কষ্ট হয়।"

"আচ্ছা, জান ত আমাদের সঙ্গে কতদিনের আলাপ। আমি একদিন ঠাকুরপো'কে বল্‌বো ?"

"বলনা, তুমি যদি পার ত সবচেয়ে ভাল হয়।"

"আর তবে ও সব কথা বল্‌বে না ?"

"না" বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ রমার কম্পিত অধরে আবার একটী চুম্বন করিলেন। তখন সেই প্রথম তাহাদের বৈবাহিক জীবনে প্রেম-জ্যোতিঃ উভয়ানন স্মিতবিকশিত করিয়া তুলিল।

(৪)

হরেন্দ্র নাথ ফিরিলেন না। সেই যে ভ্রাতার উপর রাগান্বিত হইয়াছিলেন সে রাগ আর কমিল না। রমাসুন্দরী অনেক চেষ্টা করিলেন, তারা অনেকবার অনুযোগ করিলেন কিন্তু সে পূর্ব্বের অবস্থা আর ফিরিয়া আসিল না। তারা কেবল সময়ে সময়ে বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু বিদুষী ও বুদ্ধিমতী রমা যুক্তি দেখাইয়া মিষ্ট কথায় বুঝাইতেন, হরেন্দ্র বুঝিতেন না। জ্যেষ্ঠ ইহাতে বড় মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের চিরশান্তিময় গার্হস্থ্যজীবনে একমাত্র দুঃখের ঘটনা তাঁহার পত্নীবিয়োগ, কিন্তু তাহাও প্রথমজীবনে আকস্মিক বলিয়া একপ্রকার সহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যহ এইরূপ চিরপ্রিয় সহোদরের মৌন গঞ্জনায় তাঁহার অন্তরাত্মা যেন কশাঘাত ভোগ করিতে লাগিল।

ফল হইল এই যে তিনি শীঘ্রই একটী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। রোগ ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল। চিকিৎসকগণ হতাশ হইলেন।

তখন হরেন্দ্রের মনে একটা আঘাত লাগিল। তখন বোধ হইল যে তাঁহার দাদার বক্ষঃপঞ্জর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আবাল্য পরিপুষ্ট সখ্যভাব তিনি ইচ্ছা করিয়া দূরে ফেলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শান্ত নিরীহ কোমল প্রাণ জ্যেষ্ঠের শরীর মনের সকল

গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে। কিন্তু জীবনের আশা ভরসা সকলই তখন বিসর্জ্জিত।

তাই বলিয়া কি দুঃখ যায়? মানুষ যখন বোঝে যে তাহার গতজীবনের এই উপেক্ষায়, এই নির্ব্বন্ধে আজ এই কুফল ফলিল সে কুফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কি সে উপেক্ষার জন্য সে নির্ব্বন্ধের জন্য অনুশোচনা করে না? না সে কুফল যত অবশ্যম্ভাবী হয় যত বিয়োগাত্মক হয় ততই না সেই পশ্চাত্তাপের হলাহল জ্বালা ভোগ করিতে হয়?

আবার সময়ে সময়ে হরেন্দ্র ইহাও ভাবিতেন যে তিনি অন্যায় কি করিয়াছেন? স্ত্রী পুরুষ সমাজের দুই দিক; এক দিকে এক নিয়ম অপর দিকে কি অন্য নিয়ম চলিবে? স্ত্রীলোক অর্থশূন্য ভাবশূন্য পরোচ্চারিত শব্দমালার দ্বারা আপন জীবনকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিতে পারে, আর পুরুষ অর্থ বুঝিয়া ভাব গ্রহণ করিয়া মন্ত্রের সার্থকতা রাখিবে না, হৃদয়কে স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়ের দাস করিবে! ইহারই বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। ব্যক্তির স্বার্থ, সমাজের হিতে ত্যাগ করিতেই হয়। তাঁহার দাদা, তা তিনি কি করিবেন।

কিন্তু এসব ভাবনা আসিলেও অধিকক্ষণ চিত্ত নিবিষ্ট রাখিতে পারিত না। গৃহে যখন মৃত্যুর ছায়া পড়ে তখন যুক্তিলভ্য সত্য মনুষ্য হৃদয় অধিকার করিতে পারে না, তখন আদিমনিবন্ধর মানবসন্তানের সহজ সরল ভ্রাতৃবন্ধন রজ্জু কি যেন কোন অক্ষুণ্ণ মহান্ সত্যের বলে অসীম ও অতুল প্রেমে সকল হৃদয় বাঁধিয়া একটী ভাবনায় আকুল করিয়া তোলে। সে ভাবনা বিশ্বসংসারে আর কিছুই নহে ঐ দেখ কে কোথায় চলিয়া যায়! মৃত্যুর ঘন ছায়ায় হরেন্দ্রের হৃদয় অন্ধকার ও অধীর হইয়া উঠিল; দিবারাত্র ভাবিতেন আমার দোষে কি দাদা চলিলেন।

তথাপি একদিনও দাদাকে মুখ ফুটিয়া কোনও কথা বলিতে পারিলেন না! এই সকল ভাবনায় দাদার সমক্ষে যাইতে বড় লজ্জিত হইতেন। এইরূপ করিয়া কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িল। একদিন এইরূপ ভাবনায় যখন তাঁহার মস্তিষ্ক ক্ষুব্ধ ও জর্জ্জরিত হইতেছিল তখন তাঁহার হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীগুলি ছিঁড়িয়া লইয়াই যেন কর্ণে সেই বিয়োগ ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল। দৌড়িয়া গিয়া দেখিলেন যে দাদার বুকের উপর রমা ও মা পড়িয়া আছেন। তখন চক্ষে আর কিছু দেখিতে পাইলেন না কর্ণে আর কিছু শুনিতে পাইলেন না, বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন "দাদা আমায় ক্ষমা—"

(৫)

কিছু দিন পরে হরেন্দ্রের মাতা পুত্রশোকে দেহত্যাগ করিলেন। তাহার পর তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিলেন। শোক সকলেরই এক প্রকার সহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা থাকিয়া সংসারকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাদের জন্য যে নাই তাহাকে ভুলিয়াই থাকে। অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমানের ভাবনা অধিক, মৃত অপেক্ষা প্রাণের মান্য অধিক!

হরেন্দ্র দাদাকে ভুলিলেন না বটে কিন্তু এটা বুঝিয়া লইলেন যে দাদার মৃত্যুর জন্য তিনি বিশেষ দায়ী নহেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা সৎকল্পেই করিয়াছিলেন। ধর্ম্মান্ধতার ফল Gnymisition এর সকল অত্যাচার ও অবিচার ঘটিতে পারে আর তাঁহার সামাজিক মতে দাদা কষ্ট পাইলেন তজ্জন্য কি তিনি দোষী। হইতে পারে তিনি ভ্রমান্ধ, কিন্তু তিনি না বুঝিতে পারিলে তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। হউক ভ্রম, ভ্রম আছে বলিয়াই ত মানুষের শিক্ষা হয়।

তবে দাদা যাঁহাকে রাখিয়া গেলেন তিনিও কি চিরজীবন তাঁহার

স্বামীর দোষের জন্য কষ্ট পাইবেন। হরেন্দ্রের নীতি অতি কঠোর ছিল না, তিনি বুঝিতেন যে ভ্রম দোষ সকলেরই আছে, কিন্তু তজ্জন্য দুর্ব্বল নির্দ্দোষ কেন ফল ভোগ করিবে। অধিক আবার তিনি বিশ্বাস করিতেন যে চিরকালই সবল পুরুষ অবলা নারীকে নির্যাতন করিয়া আসিয়াছে, সংসারের লক্ষ্মীদিগের উপর অত্যাচার না করিলে মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না। এই জন্য তিনি রমাকে শ্রদ্ধা করিতেন যত্নে রাখিতেন তাঁহার কথানুসারে তারাসুন্দরীও যাহাকে বড় ভালবাসিতেন।

রমাও সে স্নেহ যত্ন পরিশোধ করিতেন। তিনি বুঝিলেন যে ভগবান তাঁহার অদৃষ্টে স্বামীসুখ লিখেন নাই, কিন্তু এমন লক্ষ্মণের ন্যায় দেবরই বা কে পায়, শ্বশুরকুলে তারার ন্যায় ভগ্নীই বা কে পায়। ইহা বুঝিয়া তিনি এই দম্পতীর সুখে সুখী হইয়া, ইহাদের প্রেমে আনন্দ লাভ করিয়া শান্ত নির্লিপ্ত জীবন অতিবাহিত করিতেন।

হরেন্দ্র সন্ধ্যার সময় বাটীতে বসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় গল্প করিতেন নানা কথাপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন। তবে ইহাতে ভাবের আদানপ্রদান হইত না, যুক্তিতর্কের উত্তেজনা ছিল না কারণ ইহাতে যোগদান করিতেন কেবল তারা ও রমা। রমা কথোপকথনে অনেক শিখিতেন ; তাঁহার বুদ্ধি ও মেধা যথেষ্ট ছিল ; তাঁহার জীবনে এইরূপ চর্চ্চা বড় প্রীতিকর লাগিত। রমণীহৃদয়ানন্দকর আর একটী রত্ন রমা পাইয়াছিল ; গৃহে একটী নূতন অতিথি আসিয়াছিল ; হরেন্দ্রের একটী পুত্র হইয়াছে। সে শিশু জন্মিয়াই রমার স্নেহবারি সিঞ্চনে অভিষিক্ত হইয়াছে, আর এক বৎসর তাঁহারই যত্ন তাহার দেহসৌন্দর্য্য পরিপুষ্ট করিয়াছে।

এইরূপে সে গৃহে আনন্দ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু মানুষের ভাগ্য কোন শক্তির সহিত জড়িত তাহা বলা যায় না। এ আনন্দে

কাহার ক্ষতি হইতেছিল? এ মঙ্গলে কে কষ্ট পাইতেছিল? না ফাল্গুনচৈত্রের বাসন্তী সুষমার পর প্রকৃতিকে কালবৈশাখীর ঝড় সহ্য করিতেই হয়?

(৬)

হঠাৎ তারা সুন্দরী মরিয়া গেলেন। হরেন্দ্র মৃত্যুর পর তিন চারিদিন কাহারও সহিত কোনও কথা কহিতেন না, প্রায় কিছুই আহার করিতেন না, কাহারও সহিত দেখা করিতেন না; জানালার ধারে যে বৃহৎ পুরাতন অশ্বত্থ ছিল সেই অশ্বত্থের দিকে চাহিয়া দিবা-রাত্র বসিয়া থাকিতেন। বোধ হয় মনে করিতেন যে অশ্বত্থ তাঁহাদের দুইজনের মান অভিমানের ইতিহাসের সাক্ষী, যে তাঁহাদের প্রেম বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে দেখিয়াছে, লজ্জাবিভ্রম বিন্যাসে যে তাঁহাদের সুগন্ধবায়ে সেবা করিয়াছে সে হয়ত আজ বিয়োগানুকম্পায় তাহার প্রিয়াকে আনিয়া দিবে! মানুষের নিকট প্রকৃতি কি জড়?

রমাসুন্দরী দেখিলেন যে বিপদের উপর বিপদ ঘনাইয়া আসে হরেন্দ্র হয়ত পাগল হইয়া উঠিবেন। চতুর্থ দিনে খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, বলিলেন খোকা কাঁদে, একবার কোলে কর। হরেন্দ্র খোকাকে কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাঁদছিলে কেন?" বলিয়া চক্ষু মুছিয়া দিলেন।

খোকা বাষ্পরুদ্ধস্বরে "মা" বলিয়া উঠিল।

হরেন্দ্র বলিলেন "মাকে ডাক" বলিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্বর আসিল, তিনি শয্যাশায়ী হইলেন।

সংসারে লোক যে ছিল না তাহা নহে তবে নিকট আত্মীয় রমা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। সুতরাং সেবার ভার সমস্তই রমার উপর পড়িয়াছিল। কিন্তু সেকি তজ্জন্য কাতর? যতদিন তাহার

শক্তি আছে যতদিন সে জীবিত আছে ততদিন তাহার স্বামীকুলের কাহারও কোনও কার্য্য অকৃত থাকিবে না, তাহাদের শোকজ্বালা দূর করিতে তাহার হৃদয়বল ম্রিয়মান হইয়া পড়িবে না। সেইজন্য জ্বর-ভোগের সময় হরেন্দ্র যখনই কোনও কিছু কষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন তখনই দেখিয়াছেন যে সংসারের সঞ্চিত মায়ারাশি রমাসুন্দরীর মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, স্পৃহাশূন্য কর্ত্তব্যপালন তৃপ্তির উজ্জ্বলজ্যোতিতে সে তখন আনন্দময়ীরূপে বিভাসিত।

প্রায় নয়মাস ভোগের পর হরেন্দ্র আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়া কিছুদিন বাড়ীর বাহির হইতে পারিতেন না। তাঁহার কয় ভাগিনেয় ও খোকার খেলাধূলা লইয়া সমস্ত দিন অতি-বাহিত করিতেন। কিন্তু খোকার সহিত কি সমস্ত দিন ভাল লাগে? ভাগিনেয়রাও অল্পবয়স্ক। কথা কহিবার লোক রমা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। হরেন্দ্রের বাটীতে থাকিয়া থাকিয়া শেষে এরূপ অভ্যাস হইয়া গেল যে আর বাহিরে যাইতে ভাল লাগিত না। বাহিরের লোকের সমবেদনা মৌখিক, তাহা কেমন নির্ম্মম কঠোর বলিয়া বোধ হইত। তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই বাহিরের ও ভিতরের এই পার্থক্য স্পষ্টতর হইতে লাগিল। ইহা বড় অশান্তির কারণ। রমা তাহা বুঝিলেন দুঃখ ভোগ করিয়া করিয়া তিনি এসকল বেশ বুঝিতে পারিতেন সেই জন্য গৃহে হরেন্দ্রকে আপনার সহানুভূতিতে ডুবাইয়া রাখিতেন।

পত্নীর শোক অনেক কমিয়াছিল। বিদ্বান বুদ্ধিমান মন বাঁধিলেন, কিন্তু কমিয়াছিল প্রধান এক কারণে—রমার সমবেদনাযুক্ত ব্যবহারে, নম্রতায়, মিষ্টতায়, স্নিগ্ধদৃষ্টিতে, দাসীর ন্যায় আজ্ঞাবহতায় হরেন্দ্রনাথ পরিপ্লুত হইয়াছিলেন।

এরূপ অবস্থায় মানুষের মনে কি হয়? অপরের কি হয় কে জানে হরেন্দ্রের মনে হইত কায নাই বাহিরের আড়ম্বর কোলাহল কায নাই যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, গৃহে যে মহিমাময়ী দেবী আমার শোকে শান্তি, রোগে আশা ও দুঃখে আনন্দ দিতেছে তাঁহার মার্যাদা ও মহত্বরক্ষণে একটী লোকের জীবন ধন্য হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি গৃহিনীহীন হইয়াও পুনরায় গৃহে মন বাঁধিলেন গৃহিনী না থাকিলেও গৃহের অধিশ্বরী ত ছিল।

ইহার পর খোকা ও রমা যাহাতে সুখে থাকে ইহা দেখাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। খোকার কি রমার একটু অসুখ হইলে অস্থির হইতেন। প্রায়ই রমাকে অধিক শ্রম করিতে নিষেধ করিতেন কিন্তু রমা সে সকল কথা প্রায়ই হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। একদিন হরেন্দ্র বলিলেন "আমি কিছু চাইলেই তুমি দৌড়ে আস কেন?"

রমাও বিস্মিত বদনে উত্তর করিলেন "কেন আস্‌তে কি নেই?"

"না আর কাকেও পাঠালেই হয়। তুমি কত কায কর। তোমায় সারাদিন ব্যস্ত কর্‌তে লজ্জা হয়।"

রমাসুন্দরী আর কোনও উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইলেন।

খোকার চিত্তবিনোদন কিসে হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন সমবেদনা পাইয়া সমবেদনা বোধ করিতে পারিতেন তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেন; কিন্তু কি প্রকার তাহা প্রকাশ করিবেন তাহা বুঝিতেন না। প্রায় তাঁহার জন্য মনোনীত পুস্তক আনিতেন। সেই গুলির সমালোচনায় রমা সুখী হইবেন ভাবিয়া কোনও কোনও দিন বা তাহা লইয়া কত কথা ফেলিতেন, বিদেশীয় নীতি ধর্ম্ম বিজ্ঞানের কত তথ্য উল্লেখ করিতে যাইতেন কিন্তু সে সমস্ত শ্রবণগোচর হইত মাত্র, কথার আদান প্রদান হইত না। সুতরাং হঠাৎ

সমস্ত কথা থামিয়া যাইত। হরেন্দ্র ভাবিতেন রমার সহিত ভাববিনিময় চলে না কেন।

কোনও দিন বা দেশীয় আচার ব্যবহার প্রথার কথা হইত। হরেন্দ্র সে সকলের ভালমন্দ কত কি বলিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহাও ঐরূপ হটাৎ স্থগিত হইত। হরেন্দ্র ভাবিতেন রমা কি ইচ্ছা করিয়া কথা কহে না?

একদিন হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে হটাৎ অমন কথা বন্ধ কর কেন?"

"আমরা তোমাদের মতন কি অত কথা জানি?"

"আমাদের বাড়ীতে আপনার লোকে কেউ নেই যে তুটো গল্প করি। তাই সময়ে সময়ে আমিই গল্প করি।"

"তা বেশ কর" বলিয়া রমা সেথান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

অপর একদিন প্রাতে হরেন্দ্র টব হইতে তুটী গোলাপ তুলিয়া রমার ঘরে গেলেন। আলমারির উপর নিজের ও তাহার পার্শ্বে রমাসুন্দরীর ফটোগ্রাফ ছিল। হরেন্দ্র ফুল তুটী সেই তুই থানির সম্মুখে রাখিলে। রমা ধীরে তথায় গি া নিজের চিত্রের সম্মুখস্থ ফুলটী সরাইয়া দিলেন হরেন্দ্র পুনরায় তাহা সেই চিত্রের সম্মুখে দিতে এবার ফুলটী লইয়া জানালা দিয়া যেমন ফেলিতে যাইবেন, হরেন্দ্র হাত ধরিয়া বলিলেন "না ফেল না, আচ্ছা আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

রমা "ছি। ছি। হাত ধর কেন?" বলিয়া সেস্থান হইতে হইতে গম্ভীর মুখে চলিয়া গেলেন। হরেন্দ্র নাথ একটু অপ্রতিভ হইলেন।

যে প্রাতে এই ঘটনা ঘটে সেই রাত্রে হরেন্দ্রনাথ আহার চাহিলে রমাসুন্দরী একটীও কথা কহিলেন না খাবার দিয়া চলিয়া গেলেন।

হরেন্দ্রনাথ উঠিয়া খোকাকে কোলে করিয়া রমাসুন্দরীর নিকট যাইলেন তিনি বসিয়া একখানা কাশীদাস পড়িতেছিলেন।

ঘরের বাহিরে পূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় অম্বরে গৃহছাদে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লঘুমেঘে চঞ্চল তরঙ্গে কম্পিত হইতেছিল, অতি মন্দ পবনে নিকটস্থ প্রস্ফুটযুথিকা রাশি আন্দোলিত হইয়া গন্ধে সেই দিকটা প্লাবিত করিতেছিল, আর পার্শ্বের বাড়িতে তানলয়ে গায়ক যাছিয়াই যেন হৃদয়মধ্যে অতৃপ্তি বাসনা কম্প ও হর্ষের বিদ্যুৎ ছুটাইয়া নিত্যনব-মাধুরীময় তান ধরিয়াছিল—

"কুন্তলফুল গন্ধ আসে উন্মাদ সমীরে"

হরেন্দ্রনাথ খোকাকে বলিলেন "জেঠাই মা, যাও।" বলিয়া রমার ক্রোড়ে দিলেন। রমা তথাপি একটাও কথা কহিলেন না। হরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। খোকা চঞ্চল; তাহার ইহা ভাল লাগিল না। রমার মুখ আচাড়াইয়া চুল ধরিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। তখন রমা খোকাকে ধরিয়া হাঁসিয়া শতচুম্বনে সেই অধর-পুষ্পপুট নিষ্পিষিত করিয়া ফেলিলেন। সে দৃশ্যে হরেন্দ্র বহুদিনপরে এক গতস্মৃতি জড়িত আনন্দ উপভোগ করিলেন।

রমা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "তুমি এরকম আমায় অপমান কর কেন ?" বলিতে বলিতে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল।

হরেন্দ্র চমকিয়া নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রমার ঘূর্ণিত চক্ষু ও কম্পিত মুখ দেখিয়া কেমন একটা ভয় হইল। নিজে কাঁপিতে কাঁপিতে রমার পদতলে পড়িয়া গেলেন। পা দুইটী জড়াইয়া বলিলেন "আমি দোষী। আমার কি ক্ষমা আছে ?"

রমা শীঘ্র পা ছাড়াইতে পারিলেন না। বলিলেন "পা ছাড়। তুমি দোষী নও—নও, পা ছাড়।"

"আমি দোষী—শতবার দোষী, শুধু তোমার নিকট নয়—দাদার নিকট দোষী—আমার তারার নিকট দোষী।" বলিয়া হরেন্দ্র ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

খোকা কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। রমা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বিছানায় শুইয়া আকুলি বিকুলি কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রভু, প্রিয়তম আমায় এত পরীক্ষা কেন?"

"কোমল পদপল্লবতল চুম্বিত ধরণীরে।"

পরদিন প্রাতে রমা দেখিলেন ঘরের মেজে এক টুকরা কাগজে লেখা রহিয়াছে;—

"এত দিনে একটী ভুল বুঝিয়াছি—সে সব কথায় কায নাই; আমি নিরুদ্দেশ হইলাম। অনুসন্ধান বৃথা। খোকার জন্য ভাবি না, সে বোধ হয় মাতৃহারা বলিয়া বোধ করে না।"

শ্রীনরেন্দ্র নাথ শেঠ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

(১)

যৌবনে প্রফুল্ল রাখিয়া তোমায়
বিগত বসন্তে কুসুম ভরা,
ভাসাইনু তরি লইয়া বিদায়
হরষ উজল ভাবি' এ ধরা।
ভালবাসি ফুটে বলিনি তোমায়,
তথাপি তোমার মুরতি স্বপে,
হেরিতাম জাগি' গম্ভীর নিশায়
অথবা ভীষণ তরঙ্গ-বুকে।
কত যে সুখের স্বপন বিভায়
হেরিতাম তব সে মৃদু হাসি,
ফুটেছিল যাহা বকুল তলায়
যবে পদ্মাকূলে ছাড়িয়া আসি।

(২)

জগতের সার তুমি প্রিয়তমে
এসেছি আবার তোমারি তরে,
তোমারি প্রতিমা আঁকা যে মরমে,
এসেছি বলিতে সোহাগ ভরে।

এসেছি তোমাকে সঁপিতে হৃদয়,
আশা, সরলতা, হরষ লয়ে,
যৌবনের চারু প্রেমের প্রভায়
উজলি কিশোর বাসনা চয়ে।
গদ গদ ভাবে ডাকিনু তোমায়
অসাড় শীতল হইল কায়,
শুনিনু যে সেই বকুল তলায়
চির নিদ্রাগত হয়েছ হায়!

(৩)

বলিত সকলে সাহসী আমায়
হেরি মগ্নপ্রায় তরণী' পারে।
কিন্তু আজি মোর জীবন শুকায়
তব চিতাভস্ম এখানে হেরে।
কাঁপেনি হৃদয় বিপদ সঙ্কুল
নিরখি ভীষণ তরঙ্গ রাশি,
তৃণের হিল্লোল হেরিয়া আকুল
হতেছি আজি এ পুলিনে আসি।

হেরিতে আসিনু তব চন্দ্রানন
বিকশিতে তায় সে মৃদু হাসি,
হেরিলাম তব অন্তিম শয়ন
ঢেকেছে বিধুত কুসুম রাশি।

(৪)

হয়ত এ শোক পাবে উপশম
বরষের পর বরষ যায়।
শুনেছি এমনি কালের নিয়ম
একে একে সব বিলয় পায়।
হয়ত বাড়িব থাকি এ সংসারে
নব নব আশা জাগিবে মনে,
হয়ত বা সুখ কতই প্রকারে
বাঁধিবে ধরার শিকলি সনে।
তবু চিরদিন জাগিবে স্মরণে
বকুল তলার সে মৃদু হাসি,
যে হাসি হেরিতে আসিয়া এখানে
হেরিনু তোমার বিভূতি রাশি।

—৪*৪—

রচনা রহস্য।

গতবারের "প্রয়াস" পাঠ করিয়া আমার কবিতা লিখিবার সকটা সহসা জাগিয়া উঠিল। যেমন সংকল্প অমনি কাজ।

সেই শুভদিনেই সন্ধ্যার পর একখানা পুরাতন খাতা বাহির করিয়া প্রদীপে একটু বেশী পরিমাণ তৈল সংযোগ করিয়া লিখিবার যোগাড় করিতে লাগিলাম।

আমার গৃহিনী বোধ হয় ছেলেবেলা (?) একটু ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছিলেন। এখনও তাই আছেন তবে বয়সের গুরুত্বের সঙ্গে

একটু খিট্‌খিটে হইয়াছেন বলাই প্রশস্ত। অবশ্য অর্দ্ধাঙ্গভাগিনীর মুখের উপর আমি এরূপ সমালোচনা করিনা এবং কোন নিরপেক্ষ বীর সমালোচকও করেন না। তবে লোক চক্ষের অন্তরালে কতলোকে রাজ মহিষীকে কি না বলিয়া থাকে।

গৃহিনীর এই মেজাজ অবগত থাকিবাই আমি অনেক সময় পরিত্রাণ পাইয়াছি এবং এই সন্ধ্যার সময়ও পরিত্রাণ পাইলাম। অর্থাৎ যাই তিনি উপরের সিঁড়িতে উঠিতেছেন শব্দ পাইলাম অমনি আমি খাতাখানি বালিসের নিচে রাখিলাম প্রদীপের তৈল পিল্‌সুজের গর্ভজাত করিলাম এবং শান্ত প্রকৃতির ন্যায় শয্যালাভ হইলাম।

শয়ন যখন করিলাম তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রার ভান করাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইল, কারণ চাহিয়া থাকিলে এখনি কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে হইবে, আর স্থিরচিত্তে লেখা হইবে না। অতএব গৃহিনীর পক্ষে আমি এখন নিদ্রিত।

ক্রমে আমার পক্ষে গৃহিনী নিদ্রিতা হইলে আমি গাঝাড়া দিয়া শয্যাত্যাগ করিলাম, মনে মনে বলিলাম আলস্যই বাঙ্গালীর অধঃপতনের মূল। তারপর সাজসরঞ্জাম বাহির করিয়া কাগজে শ্রীদুর্গা ফাঁদিয়া বসিলাম।

খপরদার সব চুপ আমার মাথা খুলিল, হাত চলিল। মাসিকপত্র সম্পাদকগণ কম্পমান হও, বড় যে সেদিন আমার লিখিত নোভা জেম্বলার ইতিহাস কেহ প্রকাশ করিতে চাহ নাই। কেন আমার লেখায় কি ওজস্বীতা নাই, না বীর্য্যবত্তার অভাব? একদেশিক সমালোচকগণ একবাক্যে বলেন বার্ক বা মেকলে বাঙ্গালায় লিখিলে

এই রূপই হইত। যাক্ আমার গদ্যে একরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে তাহা আমার এক চল্লিশটি কারণ শুনিলেই বা শুনিবার অগ্রেই সকলে স্বীকার করিবেন।

সম্প্রতি পদ্য। একটা হ্যাতমক্‌স করিবার কাগজ পাওয়া গেছে, এখন কি খাইয়া কবিত্বশক্তি জন্মায় অথবা বর্দ্ধিত হয় (ভিতরে ভিতরে আছে কিনা) তাহা নির্দ্ধারিত করিলেই হইল। শুনিয়াছি পাশ্চাত্য কবিগণের কবিতার খুব জোর, আর মহাজনো যেন গত স পন্থাঃ। এই দুটি একত্র করিলেই কবিতারচনা করা যায়। অর্থাৎ একখানি ইংরাজী কবির রচনা আদর্শ করিয়া সেই মহাজনের পথই অবলম্বন করি, কিনা তাঁহার কবিতার তর্জ্জমা করি। ইহাতে দোষ কি? বাঙ্গালায় যাহা দাঁড়াইল তাহাত খাঁটি আমার মাথা ঘামাইয়া বাহির করিয়াছি। অধিকাংশ কবিতাই তর্জ্জমা—কোনটা ভাষার কোনটা ভাবের। বাঙ্গালায় মৌলিক কবিতা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেক পাশ্চাত্য লেখকও এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নাম কিনিয়াছেন। যদি বাল্যকালে রুশিয়ান বা জর্ম্মন ভাষা শিক্ষা করিতাম তবে তাহাদের কবিতার তর্জ্জমায় আর যে সে লোক বৈদেশিক ভাবের গন্ধ পাইত না, আদি ও অকৃত্রিম মস্তিষ্ক প্রসূত বলিয়া ছাড়িয়া দিতাম। ভবিষ্যৎ কবির জন্মদাতাগণ আমার সঙ্কেত অনুযায়ী কার্য্য করিলে এইবার স্বস্ব সন্তানদিগকে অনায়াসেই কবি করিয়া তুলিবেন। সকলেই জন্ম লাভ করা কবি হইবেন।

এখন তর্জ্জমাটা কিরূপভাবে করা যায় দেখা যাক্। সাধারণ চলিত পুস্তক যথা সেক্ষপীর বায়রণ ইত্যাদি যাহা আজকালকার কচি ছেলেদের পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ সে সকল ছোঁয়া হবে না, ধাঁ করে ধরা

পড়তে হবে। চেনা পথে না চলাই ভাল। এই Stanzaটা নিয়েই চেষ্টা করা যাক্ :—

"My stomach is not ruled by other men's
And grumbling for a reason quaintly begs;
Wherefore should master rise before the hens
Have laid their eggs."

তর্জ্জমা করিলে :—

আমার পাকস্থলী অন্যলোকের নিয়মে শাসিত হয় না,
এবং খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কারণের জন্য অদ্ভুত রূপে ভিক্ষা করে;
কি কারণে প্রভু উঠিবেন
মুরগী ডিম পাড়্বার আগে।

বাঃ কি চমৎকার কবিতা হইল। কেহ বুঝিলে কি? এই যে চারিটি ছত্রের তর্জ্জমায় চারিটি ছত্র দাঁড়াইয়াছে উহাই কবিতার লক্ষণ বুঝিতে হইবে। এখন একটু মাজিয়া ঘসিয়া লইলেই হইল। মুরগীর ডিম বাঙ্গালা কবিতায় থাকাটা কবির খৃষ্টানত্বর পরিচায়ক বিশেষ যখন অত নিকটে পাকস্থলী রহিয়াছে। ওটাকে হাঁসের ডিম করে দিলে অনেকের হয়ত আপত্তি থাকিবে না। অতএব—

আমার উদর বলে দেখায়ে কারণ।
প্রভু তব উঠিবার কিবা প্রয়োজন॥
এখনও পাড়েনি ডিম হাঁসেরা যখন॥

বেশ অক্ষর সমান করিলাম, ডিম বদ্‌লাইয়া দিলাম অথচ মিল হইল, কিন্তু একটা লাইন কমিল যে। শুনিয়াছি কবিরা লাইসেন্স প্রাপ্ত পাগল। তাহাদের যা তা লিখিবার অধিকার আছে, তত্রাচ আমি কিনা কবি হইতে বসিয়া এক লাইন বাদ দিব? তা হইবে না লাইন ত ঠিক চাই, তা ছাড়া কাঁচা হাঁসের ডিমের গন্ধ পাঠিকার সহ্য না হইতে পারে। ইহাতে কবির আইন অনুসারে দণ্ড আছে। তবে দেখা যাক্—

আমার উদর বলে দেখায়ে কারণ—
না আসে হাঁসের ডিম সিদ্ধ যতক্ষণ,
তার আগে উঠিবার কিবা প্রয়োজন ?
ছেড়োনা ছেড়োনা প্রভু সুখের শয়ন।

বেশ চলন সহ কবিতায় দাঁড়াইয়াছে। নাম অবশ্যই দে[illegible] নহিলে লোকে চিনবে কেন ? এখন নামসহ হাঁসের ডিম সিদ্ধ [illegible] করাও যা' আর বামালশুদ্ধ লাল হস্তে ধরা পড়াও তাই। এতদিন ঘুরাইয়া সেন্‌জার ওখানে খাইলাম্ কি শেষ ছাপায় আমার উদর সহ হঁাসের ডিম সিদ্ধ দেখিবার জন্য—ধিক্ আমার কবিত্বে, দেখি অন্য-যুক্তি আসে কি না :—

আমার জঠর বলে যুক্তিপূর্ণ বাণী—
আগে দিয়ে যাক্ দুধ এসে গোয়ালানী,
এখন ছেড়োনা প্রভু কোমল শয়ন,
আমার অভাব কিছু না করি পূরণ।

রাজধানী ! রাজধানী !! (Capital) ছন্দোবন্ধে ভাব সমাবেশে ও যুক্তিতে ইহাপেক্ষা কোন কবি ভাল লিখেন ? কে বলে আমি ইংরাজি হইতে তর্জ্জমা করিলাম ? (আঃ যদি একটু চৈনিক ভাষা শিখিতাম।)

এখন আমার হাত দোরস্ত, মাথা সাফ্, যশের পথ নিষ্কণ্টক। সমালোচকগণ সাবধান, আমার কবিতা সমালোচনা করাও যা' আর বড় বড় প্রথিত নামা কবিকাব্যকারের সমালোচনাও তাই। কবিতা লেখার রহস্য যখন আয়ত্ত করিয়াছি, তখন কেন রাতারাতি একটা লিখিয়াই জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিই না ? এখন যাহা ধরিব তাহা হইতেই কবিতারস ইক্ষুনিষ্পীড়নবৎ বাহির হইবে। এই কবিতাটাই দেখি:—

WHAT CAN AN OLD MAN DO BUT DIE ?

What can an old man do but die ?
Spring it is cheery winter is dreary,
Green leaves hang but the brown must fly,
When he is forsaken withered and shaken,
What can an old man do but die ?
But love will not clip him maids will not lip him
Maud and Marian pass him by
Youth it is sunny and age has no honey
What can an old man do but die ?
June it is jolly, O for its folly
A dancing leg and a laughing eye
Youth may be silly wisdom is chilly
What can an old man do but die ?

১। খাঁটি তর্জ্জমাঃ—একটা বুড়া না মরে কি করে ?

বুড়া না মরে কি করে ?
বসন্ত প্রফুল্ল শীত কোকড়ান,
সবুজ পাতা ঝোলে পাকাপাতা ওড়ে,
যবে সে পরিত্যক্ত হয় শুকায় ও কাঁপায়
একটি বুড়ো তখন না মরে কি করবে ?
প্রণয় আলিঙ্গন করে না, স্ত্রীলোক চুমিবে না
কামিনী না দেখে চলে যায়,,
যৌবন উজ্জ্বল, বৃদ্ধ মধুহীন
বুড়ো তখন না মরে কি করে ?
আষাঢ় আনন্দের হায় মূর্খতার জন্য
এক নাচোলা ঠ্যাং এবং হাসিত চক্ষু
যুবা বদমাইস, জ্ঞান কনকনে
বুড়া তখন না মরে কি করে ?

২। বুড়ার মরণ মঙ্গল।

বসন্ত সরস, শিশির বিরস
কিশলয় হাসে জীর্ণ পাতা খসে,
শীর্ণ ও কম্পিত দেহ যখন চাহেনা কেহ
বুড়ার তখন মরণ মঙ্গল।

জাগেনা প্রণয় বুকে রমণী চুমেনা মুখ,
ভ্রুক্ষেপ না করি যায় চলে ;
যৌবন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ জরা জীর্ণ শীর্ণ অতি,
বুড়ার তখন মরণ মঙ্গল।
বসন্ত বিলাস ভরা শূন্য তার আগাগোড়া,
আছে শুধু নাচ গান হসিত নয়ন ;
তরুণ চপল বটে বুড়া বিচক্ষণ,
বুড়ার তখন মরণ মঙ্গল।

৩। জরা হ'তে ভাল বুড়ার মরণ ;—
শিশির বিরস আর বসন্ত সরস ;
জীর্ণপাতা যায় খসে, কিশলয় দুলে হাসে,
বিলোল কম্পিত তনু কেবা করে আকিঞ্চন,
জরা ভোগ হ'তে ভাল বুড়ার মরণ।
প্রণয় করে না কভু বৃদ্ধে আলিঙ্গন,
ভ্রুক্ষেপ না করি হায় তরুণী চলিয়া যায়,
অপাঙ্গে দেখেনা চেয়ে ফিরায়ে বদন,
জরা ভোগ হতে ভাল বুড়ার মরণ।
জরা মধুহীন আর যৌবন উজ্জ্বল,
বসন্ত বিলাস ভরা, শুধু হর্ষে মাতোয়ারা,
হলে হ'তে পারে যৌবন চঞ্চল
তবু জরা হতে মরা বুড়ার মঙ্গল।

মনে পড়ে ছেলেবেলায় গল্প শুনিয়াছিলাম যে চার জন বন্ধু এক বনে রাত্রিযাপন করিতে গিয়া প্রত্যেকে রাত্রির এক এক প্রহরে কতকগুলি নরকঙ্কালে অস্থি যোজনা, মাংস সংযোগ, রক্ত সঞ্চার ও শেষে প্রানদান করেন। আমি একাকী রাত্রির তিন প্রহর জাগিয়া সংসার কাননে বিজাতীয় গোর হইতে উদ্ধৃত কবিতা কঙ্কাল

গুলির রক্ত সঞ্চার পর্য্যন্ত করিয়াছি এখন শেষ প্রহরের প্রাণদান কার্য্য বাকী। প্রাণ পাইয়া ইহা যে কি অদ্ভুত জীব হইবে তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর। বিশেষ গৃহিণীর বাহিরে যাওয়ার আবশ্যক হইলে বা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাঁহার বিভীষিকা উৎপাদন করিতে পারে। অতএব প্রাণদান করিয়াই থামের ভিতর শীল করিয়া বরাবর "প্রয়াস" কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিই। এই বিলাতি ভূত সেখানকার অপরাপর ভূতের দলে মিশিয়া যাইতে পারে।

মান্যবর প্রয়াস সম্পাদক

সমীপেষু—

মহাশয়, এই কবিতাটি ফুলের সাজিতে স্থান পাইলে বাধিত হইব। ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত রচনা এবং ইহাতে বুড়দিগের মানহানিকর কিছু নাই আপনি নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে পারেন। পাছে নাম দিলে লোকে প্রবীণ লেখক বলিয়া চিনিয়া ফেলে, তাই উহা অজ্ঞাত রাখিলাম। আপনি নাম প্রকাশের জন্য আর বৃথা অনুরোধ করিবেন না।

আমার ৫৭৩ পাতা পূর্ণ একখানি গল্পের খাতা শীঘ্রই পাঠাইব। তাহা হইতে এক একটী প্রতি মাসে প্রকাশিত হইলে আরও বাধিত হইব। খাতাখানি শেষ হইলে পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবেন, আমি একখণ্ড সমালোচনার্থ সমিতিতে প্রদান করিতে স্বীকৃত রহিলাম।

ইতি ২৮ মার্চ্চ ১৯০০।

শ্রীচক্ষুদান চম্পট্।

মোকাম—ঠিক হইলেই খপর দিব।

বিহারিলাল।

স্বভাবে।

বিহারিলাল উন্মুক্তহৃদয় এবং স্পষ্টভাষী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার কবিতায় অকপট আত্মপ্রকাশ এতই প্রচুর যে, সে গুলি বিহারিলালের একটী স্বরচিত প্রাঞ্জল জীবনী বিশেষ। কবি তাঁহার অকাল মৃত্যুর কল্পনা করিয়া, স্বীয় বন্ধুগণের মুখে "প্রেমপ্রবাহিণীতে" নিজ স্বভাবের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নির্ম্মল দর্পণে প্রতিফলিত ছায়ার ন্যায় অবিকল। ভাষা, স্থানে স্থানে শীলতার সীমা অতিক্রম করিলেও, তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"—তার ছিল বটে সরল হৃদয়,
আমাদের সঙ্গে ছিল সরল প্রণয়।
রাখিতে জানিত বটে মিত্রতার মান,
পিতাকে বাসিত ভাল প্রাণের সমান।
বড়ই বাসিত ভাল সরস আমোদ,
প্রাণান্তে করেনি কভু কারো বরামোদ।
জন্মভূমি প্রতিছিল আন্তরিক প্রীতি,

° °

সদানন্দ মনছিল মগ্নছিল ভাবে,
বুদ্ধি সত্ত্বে অন্ধছিল সাংসারিক লাভে।
কিন্তু ছিল অতিশয় উদ্ধতের প্রায়,
ভুঁড়োদের গ্রাহ্য নাহি করিত কাহায়।
ব'সে ব'সে আপনি হইত জ্বালাতন,
খামকা ত্যজিতে যেত আপন জীবন।

নিজের লেখায় ছিল বিষম বড়াই,
জানিত এদেশে তার সমজদার নাই।
তুমি কি তখন, অয়ি প্রেম প্রবাহিণী!
মিত্রদের মত কবে আমার কাহিনী?
এই পোড়া বর্ত্তমানে নাই গো ভরসা,
তাই আরো দমে যাই ভেবে ভাবি দশা।

এই ছত্র কয়টী রচনার সময় বিহারিলালের বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে। ইহাতে যৌবন সুলভ চাপল্য আছে, কিন্তু ইহা আত্মগরিমা সম্ভূত নহে। ইহাতে কবির প্রকৃতির দোষ গুণ উভয়ই সমভাবে প্রকটিত হইয়াছে; ইহা সাদা প্রাণের খোলা কথা। বিহারিলাল যথার্থই বুদ্ধিমত্তে ধনোপার্জ্জন বিষয়ে আস্থাহীন ছিলেন। এসময়ে তাঁহার অর্থাগমের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সচেষ্ট হইবার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁহার কর্ম্মক্ষম পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু পরে যখন তাঁহাকে সংসার পরিচালনের ভার বহন করিতে হইয়াছিল, তখনও তিনি যাহাকে প্রবল ধনলালসা বলে, তাহা অনুভব করেন নাই। তিনি যৌবনে গাহিয়া ছিলেন—

ধূলীর পুতলী গণে ফেটে পড়ে যেই ধনে
সে ধনে সুখের আশা করিনি কখন।

এবং কার্য্যেও তাহাই দেখাইয়া গিয়াছিলেন; বীণাপাণির সেবাকে তিনি আজীবন ঐহিক সুখ এবং পারত্রিক মঙ্গল অপেক্ষা উচ্চতর সাধনার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন।

ধনোপার্জ্জনের ব্যাঘাতও বিহারিলালের কিছু ছিল। তিনি স্বাধীন চেতা ছিলেন। স্বার্থ-চিন্তা থাকিলেই লোককে ধনগৌরবের নিকট অবনতমস্তক হইতে হয়; সময়ে সময়ে অন্যায়ের প্রশ্রয় দান করিতে হয়, শুষ্ক হাসি হাসিতে হয়, মন বলিতেছে একরূপ, মুখে অন্য

রূপ বলিতেছেন। কিন্তু এরূপ বিচারী বা বিভাবী হওয়া বিহারিলালের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। তিনি আত্মাভিমানী ছিলেন, তিনি বলিতেন —

সকলি সহিতে পারি নারি তেজের অপমান,
রাখিতে তেজের মান অকাতরে ত্যজি প্রাণ ;
করিয়ে সুপথ ধার্য্য নির্ভয়ে করিব কার্য্য ;
যা' আছে অদৃষ্টে হ'বে নাহি তাহে দুঃখজ্ঞান।

দুর্ব্বলের পীড়ন, প্রবলের অত্যাচার, বিহারিলালের পক্ষে অসহ্য ছিল, তিনি সাধ্যমত প্রতীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। নিজ প্রকৃতির এই অঙ্গটী স্মরণ করিয়াই বিহারিলাল পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতায় আপনাকে 'উদ্ধত' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এই ঔদ্ধত্যে অন্যায় দর্শন জনিত রোষ, বাক্যে বা কার্য্যে অপ্রকাশ রাখিবার উপযোগী সংযম শিক্ষার অভাব ব্যতীত আর কোন দোষ পরিলক্ষিত হয় না। দয়া দাক্ষিণ্য ও আদর্শ নীতিজ্ঞানে বিহারিলালের হৃদয় পরিপূর্ণ থাকাতে এই ঔদ্ধত্য তাঁহার চরিত্রে সৎসাহস বা পুরুষোচিত তেজ বলিয়া প্রসংশনীয়। সময়ে সময়ে এই তেজ তাঁহাকে বিপদে পাতিত করিত, এই তেজের মান রাখিবার উপযোগী অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাকাতে, তিনি আসন্ন বিপদ জাল হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। উদাহরণ স্বরূপ দুইটী ঘটনা নিম্নে বিবৃত হইল।

যৌবন কালে একদিন বিহারিলাল একটী মহা সমারোহের বরযাত্রা দর্শন অভিলাষে রাজপথে দণ্ডায়মান। সেই বিপুল জনতা স্রোতে শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগের বহুসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ দিগের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা অবশ্য অশ্বপরিচালনার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত বিবেচনা করিয়া, সেই জনতা শৃঙ্খলাচ্ছে

যতদূর সাধ্য বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিতেছেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে যে কেহ তাঁহাদের সম্মুখে পড়িতেছে তাহারাই নির্দ্দয় আঘাতে বিপর্য্যস্ত হইতেছে। এই অকারণ অত্যাচার দর্শনে, আঘাতপ্রাপ্ত মেষভাবাপন্ন ভ্রাতাদিগের অঙ্গবেদনা অপেক্ষা বিহারিলাল গুরুতর মনোবেদনা অনুভব করিলেন, তাঁহার শোণিত উত্তপ্ত হইল; তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক একটী কনেষ্টবল পুঙ্গবের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। অবশ্য এই ধৃষ্টতার জন্য কনেষ্টবল মহাশয় নেটিব নিগারকে দণ্ডবিধান করিতে কালক্ষেপ করিলেন না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজগ্রীবাদেশে নেটিভের লৌহ-অঙ্গুলির পীড়ন অনুভব করিলেন ও পলক মধ্যে কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় বহুহস্ত দূরে-বিক্ষিপ্ত হইয়া ধূলি-ধূসরিত দেহে ধরণী চুম্বন করিলেন। বিহারিলালও পরক্ষণেই বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সেস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

একদিন বিহারিলাল, বড়বাজারের আর্ম্মানি গির্জ্জার পার্শ্ববর্ত্তী একটী বাটীর দ্বিতলে কার্য্যোপলক্ষে উপবিষ্ট। একটী কাবুলবাসী তাঁহার নিকট বেদানা বিক্রয় করিতে আসিল। নিম্নে অসংখ্য কাবুল দেশীয়দিগের সমাগম ও বিপণি। বিহারিলাল বেদানার উৎকৃষ্টত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বিক্রেতাকে বলিলেন "তোড়ো মাৎ"। আফগান-বাসী তাঁহার নিষেধ বাক্য উপেক্ষা করিয়া ফলটী ভাঙ্গিল, এবং বিহারি-লালের অনুমানই সত্য হইল, উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই দেখিলেন, ফলটী বেদানা নহে, অপকৃষ্ট জাতীয়। বিহারিলালও তাঁহার নিষেধ বিরুদ্ধে বিখণ্ডিত অপকৃষ্ট ফল ক্রয় করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু মহাকায় আফগান্ বাঙ্গালিকে অবজ্ঞার কণ্ঠে বলিল "তোম্‌কো লেনে হোগা"। কিন্তু এই বাক্য কয়টী উচ্চারিত হইবামাত্র, বিহারিলালের একটীমাত্র মুষ্টাঘাতে বিরাটবপু আফগানের বদন বিকৃত ও রক্তাক্ত

হইয়া গেল। এবং এই এক মুষ্টাঘাতেই তাহার বাঙ্গালিদের বল ও সাহস সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা ছিল, তাহারও বোধ হয় ব্যতিক্রম ঘটিল। কারণ কয়েক দণ্ড পরেই যখন বিহারিলাল নিজকার্য্য সমাধা করিয়া রাজমার্গে সেই কাবুলি ও তাহার সঙ্গীদিগের সম্মুখ দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন কেহ তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে সাহস পায় নাই। এটী বিহারিলালের প্রৌঢ় বয়সের ঘটনা।

বিহারিলাল যেমন তেজস্বী ছিলেন, তেমনি আবার তাঁহার স্বভাবের সেই কঠোর ভাব কোমলতম করিবার উপযোগী পরদুঃখ-কাতরতা বা দয়া ছিল। তিনি বাটী হইতে কখন ভিক্ষুককে রিক্তহস্তে ফিরাইতেন না। যদি কখন তাঁহার অজ্ঞাতে কোন অতিথি তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইত, তাহা শুনিলে তিনি নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু তিনি প্রাণান্তেও কোন প্রকার প্রতারণা বা ভাণের প্রশ্রয় দান করিতেন না। একদিন বিহারিলাল বাটীতে বসিয়া আছেন এমন সময়ে গাত্র সম্মার্জ্জনীমাত্র পরিহিত একজন প্রাচীন বয়স্ক ব্যক্তি আসিয়া কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে জানাইল যে, সে তাহার পরিধেয় বস্ত্র ও অর্থাদি তীরে রাখিয়া জাহ্নবীজলে অবগাহন করিতে নামিয়াছিল ইত্যবসরে তাঁহার সমস্ত বস্তুই অপহৃত হইয়াছে। সে পল্লীগ্রাম হইতে নূতন আগন্তুক সুতরাং নিরতিশয় বিপদগ্রস্থ। ঐ ব্যক্তির নিবেদন সমাপ্ত হইতে না হইতে বিহারিলাল তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। কবির স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বিহারিলালের স্বভাববিরুদ্ধ আচরণে বিস্মিত হওয়াতে কবি তাঁহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বলিলেন যে ঐ ব্যক্তি ঠিক্ ঐ অবস্থায় একই উপকথা মুখে করিয়া মাস কয়েক পূর্ব্বে তাঁহার

এক বন্ধুর বাটিতে উপস্থিত হয় এবং বিহারিলাল ও তাঁহার বন্ধু দয়াপরবশ হইয়া উহাকে দুইটী রৌপ্য মুদ্রা দান করেন ও তাহাকে বস্ত্র ও আহার দানে পরিতৃপ্ত করেন। এইরূপ প্রতারণার উপর বিহারিলালের বিষদৃষ্টি ছিল, তজ্জন্য সাহায্যপ্রার্থীর ক্লেশ 'ভাণ' কি প্রকৃত তাহা নির্ণয় করিতে সন্দিগ্ধ হইলে, করুণ হৃদয় বিহারিলাল কখন কখন কষ্টকর সমস্যায় পতিত হইতেন।

একদিন বিহারিলালের নিকট পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট একজন দীর্ঘাকৃতি সবল দেহ পশ্চিম দেশবাসী খাদ্য যাচ্ঞা করে। বিহারিলাল তাহাকে অলস বা প্রতারক ভাবিয়া তাহার কাতর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বাটী চলিয়া আসেন। কিন্তু সেই ভিক্ষুকের সজল দৃষ্টি তিনি ভুলিতে পারিলেন না, এবং বাটীতে আসিয়াই তাঁহার মনে হইল বুঝিবা সে ব্যক্তি যথার্থই ক্ষুধার্ত্ত ও চলৎশক্তি রহিত। বিহারিলাল তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে যাহা কিছু মিষ্টান্নাদি আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা লইয়া পুনরায় সেই ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন লোকটীর যথার্থই ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন দেহ ও বাকশক্তি জড়িত হইয়া আসিয়াছে—সে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। তিনি নিজহস্তে ধীরে ধীরে তাহাকে আহার ও জল পান করাইলেন। সে ব্যক্তি সুস্থ হইলে অবগত হইলেন, যে সে দূরদেশ হইতে কার্য্য অনুসন্ধানে নবাগত এবং নিঃসম্বল ; পুষ্টকায় ও পরিচ্ছদ পরিহিত দেখিয়া, তাহাকে কেহই ভিক্ষা দেয় নাই, সে চারিদিন অনাহারে এবং আর কয়েক দণ্ড এরূপ অবস্থায় থাকিলেই হয়ত তাহার ভবযন্ত্রণার অবসান হইত। বিহারিলাল এই লোকটীর জীবন রক্ষার উপায়স্বরূপ হইয়াছিলেন বলিয়া যে অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন তিনি বলিতেন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলেও বোধ হয় তিনি ঐরূপ আনন্দিত হইতেন না।

বিহারিলালের শেষজীবনের দয়া ও পরোপকারিতা সম্বন্ধে একটী ঘটনার কথা আমরা তাঁহার সমবয়স্ক ও পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শুনিয়া ছিলাম। একদিন উভয়ে আহীরী-টোলার ঘাটে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় দেখিলেন পথিপার্শ্বে একজন বৃদ্ধা একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। বিহারিলাল বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিয়া অবগত হইলেন যে কনিষ্ঠা স্ত্রীলোক তাহার কন্যা, উভয়ে পল্লীগ্রাম হইতে গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতায় আসিয়াছে এবং পথিমধ্যে হঠাৎ কন্যাটী বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া গতিশক্তি রহিত হইয়াছে; নগরীমধ্যে তাহাদের আপনার লোক বা আশ্রয় স্থান নাই। বিহারিলাল কানাই বাবুকে বলিলেন যে সন্নিকটবর্ত্তী হনিংবার্জ (Honingberg) সাহেবের চিকিৎসালয়ে পীড়িতাকে লইয়া যাইতে পারিলে সে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে। এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোক দুইটীকে নিজব্যয়ে একখানি শকটযানে করিয়া উক্ত চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইলেন, পীড়িতার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাদের তত্ত্ব লইতে লাগিলেন। দুইদিন পরে স্ত্রীলোকটী আরোগ্য লাভ করিয়া মাতার সহিত তাহাদের গ্রাম্য গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

বিহারিলালের ধনাকাঙ্ক্ষা ছিল না, সমাজের মান বা পদগৌরব লাভে স্পৃহাও তাঁহার ছিল না। বিহারিলালের আবাস বাটীর সম্মুখস্থ গলির নাম পরিবর্ত্তন কালে, তাঁহার প্রতি ভক্তিমান কোন কোন ভদ্র লোক বলেন যে গলিটীর নামকরণ বিহারিলালের নামেই হওয়া উচিত এবং চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। ইহাতে বিহারিলাল উত্তর দেন, যে এইরূপ উপায়ে নাম রাখিয়া যাইবার তাঁহার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, তাহার নাম স্মরণীয় করিবার অন্য উপায় আছে।

শেষোক্তিটী বিহারিলাল তাঁহার কবিনামের কথা স্মরণ করিয়াই বলেন; কিন্তু শেষ জীবনে তিনি জনসাধারণের নিকট কবিখ্যাতি লাভ বিষয়েও বীতস্পৃহ হইয়া ছিলেন আত্মপ্রসাদ লাভেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এ বিষয় স্থানান্তরে উত্থাপিত হইবে।

বিহারিলাল তাঁহার পরমগুরুর বা প্রিয়তম বন্ধুর ও অসদাচার দেখিলে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এজন্য এক সময়ে তাঁহার কোন প্রিয়তম ব্যক্তির সহিত চির বিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল এবং এই কারণে তিনি অপর কাহারো কাহারো বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু বিহারিলালের এ বিষয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞান পার্থিব অনুরাগ বিরাগের অতীত ছিল। তিনি নত হইবার পাত্র ছিলেন না এবং আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, যে তিনি তাঁহার এই কর্ত্তব্য বিশ্বাস সমর্থনের জন্য একদিন পাশ্চাত্য প্রথানুসারে 'দ্বন্দযুদ্ধে' (Duel) প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে উদ্ধৃত কবিতায় বিহারিলাল যে 'থামকা প্রাণ ত্যজিতে' যাইবার কথা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। বিহারিলাল যুবা বয়স অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার গুরু বা শিক্ষক রামকমল বাবু উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। রামকমল বাবুকে বিহারিলাল দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং তাঁহার এই উদাহরণ দেখিয়া বিহারিলালের মনে ধারণা হয়, যে আত্মহত্যা বুঝি একটা পৌরুষকর কার্য্য এবং পাপতাপময় ধরা হইতে অপসৃত হইবার একটী সহজ পথ। বিহারিলালের যৌবন রচনায় ও "বঙ্গসুন্দরী"তে তাঁহার এইরূপ ধারণার আভাস পাওয়া যায় এবং সারদামঙ্গল রচনার সময়ও তিনি এই আতঙ্কপ্রদ ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি

বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও প্রকাশ্য ভাবে বলিতেন যে আত্মহত্যার ন্যায় কাপুরুষতা ও হীনতম কার্য্য জগতে আর কিছু নাই।

অতি অল্প লোকের সহিত বিহারিলালের পত্র বিনিময় হইয়াছিল কিন্তু পত্র প্রাপ্ত মাত্র তাহার উত্তর দান করিতে তিনি সতত সযত্ন থাকিতেন এবং পুত্রগণকে এই বিষয়ে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন।

বিহারিলালের আকৃতি তাঁহার স্বভাবের অনুরূপ ছিল। তিনি যখন পথে চলিতেন তখন বোধ হইত যেন এ লোক জগতের কাহাকেও ভ্রুক্ষেপ করে না। তাঁহার বেশভূষার কোনরূপ বিশেষ পারিপাট্য ছিল না। বেলির থান, মোটা চাদর, হাতকাটা সে কালের পিরিহান, চটীজুতা ও হাতে একগাছি মোটা লাঠি তাঁহার সাধারণ বেশ ছিল। তবে সময় বিশেষে তিনি দেশী ধুতি উড়ানি এবং জামা ও জুতা ব্যবহার করিতেন।

লিখিবার উপকরণ, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি রক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার টেবিল বা বাক্সের প্রয়োজন হইত না; দেশীয় প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী তাঁহার একটী দপ্তর ছিল; সেই দপ্তরের মধ্যেই কবির রচনা গুলি রক্ষিত হইত।

পশুপ্রীতি বিহারিলালের স্বভাবের আর একটী উল্লেখ যোগ্য অঙ্গ। তিনি বড় বিড়াল ভাল বাসিতেন, এবং একটীর পর আর একটি করিয়া চিরজীবনই তাঁহার পালিত ও আদরের মার্জ্জার ছিল। তিনি পারাবত ভাল বাসিতেন এবং ফুলের গাছের উপর তাঁহার বিশেষ যত্ন ও আদর ছিল।

কোনরূপ ক্রীড়া বা ঐরূপ আমোদের প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল না। কিন্তু যুবা বয়সে তিনি কখন কখন দাবা খেলিতেন এবং ঐ ক্রীড়া কালে তাঁহার বন্ধুবান্ধব, যাহাকে পাইতেন নিকটে বসাইয়া

থাকিতেন, নির্জ্জনে নিবিষ্ট চিত্তে ঐ খেলায় তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

তিনি ব্যায়াম ভাল বাসিতেন এবং প্রৌঢ় বয়সেও আহিরিটোলায় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রের ব্যায়াম শালায় সর্ব্বদাই যাইতেন ও যুবকদিগকে জিম্‌নাষ্টিক্ ক্রীড়ায় উৎসাহ দান করিতেন।

বিহারিলালের সততা ও বন্ধু প্রীতির কথা আমরা অন্যত্র উত্থাপন করিব। কবির আর একটী মহৎ গুণের উল্লেখ করিয়াই আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব। তিনি কায়মনে পবিত্র ও শুদ্ধাচারী ছিলেন।

পত্নীপ্রেমে।

বিহারিলাল একটী বিষয়ে বড়ই ভাগ্যবান ছিলেন, এইটী তাঁহার মনোমত পত্নীলাভ। এবং যদি বহির্জ্জগতের কোন পদার্থ দ্বারা কবির কবিত্ব শক্তির স্ফূর্ত্তি বিষয়ে সহায়তা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিহারিলাল সেই সহায়তা প্রধান ভাবে তাঁহার প্রণয়িণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিহারিলালের সহধর্ম্মিণী কবি ব্রাউনিং পত্নীর ন্যায় কবিত্বপ্রতিভাবতী বা কবিতারচনায় পতির সহযোগিনী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি টেনিসনের অঙ্কলক্ষ্মীর ন্যায় স্বামীর রচনায় সহানুভূতি ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া পরোক্ষভাবে তাঁহাকে কবিত্বে উৎসাহিত করিতেন।

বিহারিলালের পত্নী অধুনাতন কালের কলেজ-শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণের ন্যায় বিদুষী ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁহাকে সুশিক্ষিতা বলিতে পারা যায় এরূপ শিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি মাতৃভাষায় বিশেষরূপে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি পতির কবিত্বের পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং তাঁহার ভাষার অতি সুকুমার শিল্প এবং ভাবের কোমলতম বিকাশর

সমস্তই সূক্ষ্মানুভূতির সহিত উপভোগ করিবার ক্ষমতা তিনি অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। কবি তাঁহার নবরচনাগুলি প্রিয় পত্নীর নিকটে পাঠ করিতেন এবং তাঁহার প্রেমনয়নে প্রীতিকিরণ নিরীক্ষণ করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন, যত উৎসাহ পাইতেন, জগতের শত সহস্র প্রশংসাবাদে কবিকে তত উৎসাহিত বা আনন্দিত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

নিজ পত্নীর আকারগত মাধুরী অহরহ প্রত্যক্ষ করিয়াই কবি অসীম সৌন্দর্য্যের কল্পনায় উদ্দীপিত হইয়াছিলেন; তাঁহার মানসিক সুষমায় অনুপ্রাণিত হইয়াই বিহারিলাল রমণীজাতিকে পূজা করিতে শিখিয়া ছিলেন, তাঁহার মধুরপ্রেম নিশিদিন অন্তরে অনুভব করিয়াই বিহারিলাল অনন্তপ্রেমের প্রতিমূর্ত্তি সারদাকে হৃদয় মন্দিরে পাইয়া ছিলেন। এই প্রেমকরুণাময়ী সুবুদ্ধিমতী রমণী রত্নই সংসারের বন্ধুর পথ বিহারিলালের পক্ষে সুগম করিয়াছিলেন।

বিহারিলালের পত্নীপ্রেম তাঁহার যৌবন রচনা হইতে শেষ রচনা পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থেই উজ্জ্বল ভাবে প্রতিবিম্বিত। তিনি যৌবনে "সঙ্গীত শতক"এ গাহিয়াছিলেন—

প্রাণ প্রেয়সি আমার,
হৃদয় ভূষণ, কত যতনের হার,
হেরিলে তব বদন, যেন পাই ত্রিভুবন,
অন্তরে উথলে ওঠে আনন্দ অপার।

বয়সের সহিত রূপলালসার প্রথম উচ্ছ্বাস শান্ত ভাব ধারণ করিলে, কবি যখন তাঁহার পত্নীকে সন্তান-জননী গৃহকর্ম্মনিরতা ঘরণী রূপে অবলোকন করিলেন তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে Words-

worth নিজ পত্নীকে যে perfect woman বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার দেহ মনের উত্তরার্দ্ধভাগিনীও সেই শ্রেণীর রমণীকুলের অন্যতম।—সংসারের নিত্য সহচর ক্ষুদ্র বৃহৎ সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ আশা নিরাশা অতিক্রম করিবার উপযুক্তা সঙ্গিনী।

নিসর্গসন্দর্শন কাব্যের "ঝটিকা রজনী" সর্গে এবং বঙ্গসুন্দরীর "প্রিয়তমা" সর্গের ছত্রে ছত্রে এই অনুরাগ অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবি যখন বলিয়া ছিলেন—

প্রিয়ে তুমি মম অমূল্য রতন, যুগযুগান্তের তপের ফল,
তবপ্রেম স্নেহ অমিয় সেবন, দিয়েছে জীবনে অমর বল।

তখন তিনি তাঁহার প্রাণের প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সারদা মঙ্গলের শেষ গীতটীতে কবি তাঁহার পুত্র কন্যাদি পরিবেষ্টিত দাম্পত্যপ্রণয় উথলিত পবিত্র সংসারের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিরাগীর হৃদয়েও সংসারে পুনঃ প্রবেশের আকাঙ্খা উদিত হয়।

সেই গীতটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর মূরতি তোমার!
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার!
সদা যেন ঘরে ঘরে কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেববীণা বাজে সারদার!
খাইয়ে হরষ-ভরে কল কোলাহল করে,
হাসে খেলে চারিদিকে কুমারী কুমার!
হবে কত জ্বালাতন করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উড়ে যায় হৃদয়ের ভার!
মরুময় ধরাতল তুমি শুভ্র শতদল,

করিতেছ চল চল সমুখে আমার!
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি, ভোর হ'য়ে ব'সে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার!—
তোমায় দেখি অনিবার!
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসি তার!

বিহারিলালের পত্নীপ্রেমের এই আবেগ কালের গতি প্রশমিত করিতে পারে নাই, তাহা চিরদিনই সমভাবে বেগবান ছিল। তিনি "নিশীথ সঙ্গীতে" একবার চাঁদের দিকে আর বার নিজ জীবন-সঙ্গিনীর ঘুমন্ত প্রেমানন পানে চাহিয়া গাহিয়া ছিলেন—

উথলি অমৃত রাশি মুখেতে ধরে না হাসি
বিশ্বের প্রেমিক ওহে প্রিয় সুধাকর,
প্রেয়সীরো থর থর হাসিমাখা বিম্বাধর
সাধের স্বপনময়ী মূর্ত্তি মনোহর।
আর কিছু নাই সুখ ওই চাঁদ, এই মুখ
যেন আমি জন্মান্তরে ফিরে দুই পাই।

তিনি নিশান্ত সঙ্গীতে সোহাগ মধুর স্বরে প্রিয়ার নিদ্রাভঙ্গ কালে তাঁহার সঙ্গীত শতক ও সারদামঙ্গলের দুই একটী গীতের যে মূর্চ্ছনাময় মৃত্তান লহরী তুলিয়াছেন তাহাপেক্ষা মধুরতর প্রভাতী সম্ভাষণ সতী স্ত্রীর কর্ণের নিকটে বোধ হয় আর কিছু হইতে পারে না—

উঠ প্রেয়সী আমার।
* * *
মধুর মূরতি তব ভরিয়ে রয়েছে ভব
সমুখে ও মুখশশী জাগে অনিবার।—

কি জানি কি ঘুম ঘোরে কি চোখে দেখেছি তোরে
এ জনমে ভুলিতে যে পারিবনা আর
নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
উঠ প্রেয়সী আমার উঠ প্রেয়সী আমার
জীবন জুড়ান ধন হৃদি ফুলহার!
উঠ প্রেয়সী আমার।
০ ০ ০

ক্রমশঃ।

মথুরা।

ভারতবর্ষের অন্যান্য পুরাতন সহর মধ্যে মথুরা একটী অতি প্রাচীন সহর। ইতিহাস লেখক টোলেমি ইহাকে "মডুরা" ও বিখ্যাত চীন পর্য্যাটক ফাহিয়ান্ ইহাকে বুদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মথুরা যমুনা নদীর দক্ষিণ উপকূলে বিরাজিত। যমুনা বক্ষ হইতে মথুরার দৃশ্য অতীব মনোহর। বিশেষতঃ বর্ষাকালে যমুনাতীরস্থ প্রাসাদ সমূহের নিম্নভাগ ও সোপানাবলী কতক পরিমাণে জলমগ্ন থাকায় মথুরা প্রবেশের রেল-সেতু হইতে বোধ হয় যেন মথুরার সমস্ত বাটীগুলি যমুনা জলে ভাসিতেছে। একপ সুন্দর দৃশ্য অতি বিরল। মথুরা শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি; তজ্জন্য ভারতের সকল স্থানেরই লোকে তীর্থ দর্শন উদ্দেশ্যে মথুরায় আগমন করিয়া থাকে। সুলতান সিকান্দার লোদি ও অরাঙ্গজেব পাতসা কর্ত্তৃক মথুরা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলেও এখনো পুরাতন কংস বাদ্ধবাটীর ভগ্নাবশেষ বিখ্যাত দাওজি ও শেঠের মন্দির প্রভৃতির দৃশ্য অতিশয় চিত্তআকর্ষক। মথুরার যমুনাতীর প্রায় এক মাইল প্রস্তর নির্ম্মিত

সোপানাবলীর দ্বারা শোভিত। মথুরায় দুইটী রেলষ্টেসান আছে। একটীতে কোম্পানি বাহাদুরের স্কুল কালেজ,অফিস্ কাছারি ও সৈন্যাবাস এবং অপরটী দুই মাইল দূরে; এই স্থানে ব্রজমণ্ডলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থান, কংস রাজার বাটীর ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি চিহ্ন সকল প্রতীয়মান আছে এবং বিখ্যাত দাওজি নাথজি, মথুরার শেঠের মন্দির সকল পাহাড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে।

মথুরা হইতে ৬ মাইল দূরে গোকুল নগর; এবং ১৪ মাইল দূরে সুবিখ্যাত গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কোমর ভাঙ্গিয়া গোধাকারে পড়িয়া আছেন। সাত মাইল দূরে মহাবন নামক পুরাতন সহর বিরাজমান আছে,—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পালিত হইয়াছিলেন ও এখনো তাঁহার বাল্যকালের দোলা বর্ত্তমান আছে।

মথুরা হইতে ৫ মাইল দূরে শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন যমুনাতীরে স্থিত। ইহার দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর। দেবালয় সমূহের মধ্যে ৫টী প্রধান দেবালয় আছে। তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দ দেবের পুরাতন মন্দির যাহা জীব গোস্বামী ১৫৯০ সালে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহার গঠন প্রণালী ও কারুকার্য্য দর্শন জন্য এখন কত বড় বড় ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারগণ আসিয়া দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়া যান। উক্ত মন্দির সপ্ত তোলা ছিল। কিম্বদন্তী যে ঐ মন্দিরের তুঙ্গ চূড়াস্থিত দীপছটা দিল্লীর প্রাসাদ হইতে দৃষ্ট হইত; আরঙ্গজেব কাফেরের মন্দিরস্থ উক্ত আলোক গৌরব সহ্য করিতে না পারিয়া উহার চারি তোলা ভগ্ন করিয়া দেন, এক্ষণে তিন তোলা মাত্র বর্ত্তমান আছে।

১৮৫১ সালে মথুরায় শেঠদিগের মন্দির প্রস্তুত হয়। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী একটী প্রধান কেল্লা'র ন্যায়। ইহাতে ছয়টী প্রায় ছয়তোলা উচ্চ তোরণ আছে। প্রত্যেক তোরণ পার হইলেই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ

চতুর্দ্দিকে মনোহর অট্টালিকাশ্রেণী ও নানা জাতীয় ফল পুষ্প বৃক্ষাদির দ্বারা পরিশোভিত। সকল তোরণ অতিক্রম করিয়া দেবালয়ের মধ্যস্থানে প্রবেশ করিতে হয়। অভ্যন্তরের প্রাঙ্গণে প্রায় শত ফুট উচ্চ ও চারি ফুট প্রস্থের সুবর্ণ নির্ম্মিত একটী তালবৃক্ষ 'শেঠের কড়ি'র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেবালয়ের নাট্য মন্দির ও আভ্যন্তরীণ মন্দিরাদির সজ্জা ও দৃশ্য সুন্দর। ভিতরে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গধামে আসিয়াছি। ইহা ব্যতীত পাইক পাড়ার লালাবাবুর দেবমন্দির, সাহাজির শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীবঙ্কুবিহারী ও শ্রীরাধাবল্লভ জীর প্রকাণ্ড ও সুন্দর মন্দির গুলির শোভা অতি চমৎকার।

প্রায় ১০ বৎসর হইতে জয়পুরের মহারাজ একটী মন্দির প্রস্তুত করাইতেছেন তাহাতে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এখনো উহা শেষ হয় নাই। উক্ত মন্দিরে ভারতের কারিগর দ্বারা প্রস্তরের কায কিরূপ হইতে পারে এবং বিনা ক্রেণ সাহায্যে কত শত মণ ওজনের ও কত দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা খিলান ও উপরের গাঁথুনি সকল প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। জয়পুরের দেশীয় কারিগরে শুদ্ধ কাষ্ঠ ও দড়ি দড়ার সাহায্যে অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে। অনেক ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার উহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিনা ক্রেণ ও এনজিন্ সাহায্যে কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা এখনো তাঁহাদের বুদ্ধিতে আইসে নাই। কিছুদিন পরে উক্ত মন্দির বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিবেনা কে বলিল?

কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উক্ত মন্দির সকলের দর্শন করা উচিত।

শ্রীনিতাই কৃষ্ণ মিত্র।

চন্দননগর।

শ্রীভাগবত ধর্ম্ম।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

চিত্তশুদ্ধিই জীবের নৈষ্কর্ম্ম্য লাভের একমাত্র কারণ। এই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইলে তিনি সমস্ত বিধি নিষেধের অতীত হয়েন। সুতরাং বর্ণাশ্রম বিহিত কোন অনুষ্ঠানই তাঁহার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না কেন না তিনি সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম-বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল আত্ম-নিষ্ঠা যোগই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম। রজঃ ও তম গুণের উপদ্রব শূন্য নির্ম্মল চিত্তে কেবল আত্মচৈতন্যের পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া অথবা আভাস দর্শন করিয়া ক্রমশঃ আপনাকে আপনি জানিতে পারেন, ইহারই নামান্তর আত্মার উদ্ধার অথবা আত্মজ্ঞান লাভ। পূর্ব্বে অবিদ্যাশক্তি কর্ত্তৃক তাহার স্মৃতি বিপর্য্যয় হওয়া প্রযুক্তই তিনি আত্মহারা হইয়াছিলেন সুতরাং তৎকালে চিত্তমধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া অবোধ শিশুর ন্যায় ঐ চিত্তকেই "অহং" অর্থাৎ এই দেহই "আমি" এইরূপ ভাবিয়া অনবরতঃ সুখ দুঃখ স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় ভোগ করিতেছিলেন। এক্ষণে রজস্তমরূপা অবিদ্যাশক্তির উপদ্রব শূন্য বিশুদ্ধ চিত্ত কেবল সত্ত্বগুণান্বিত প্রযুক্তই তিনি আপনাকে জানিতে পারিলেন। কেন না "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" (গীতা)। সত্ত্বগুণ হইতে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম সাত্ত্বিকী বিদ্যা। ভগবন্মায়ার দুইটী শক্তি যথা আবরণ শক্তি এবং বিক্ষেপ শক্তি। এই আবরণ শক্তির দ্বারা জীবের জ্ঞানাবরণ রূপ দেহোপাধি হইয়া থাকে। ইহার নাম অবিদ্যা শক্তি। এবং বিক্ষেপ শক্তিই পারমেশ্বরী মায়া বা বিদ্যা।

এক্ষণে চিত্ত মধ্যে "আভাস" দর্শন করিয়া যেরূপ আপনাকে

আপনি জানিতে পারিলেন, সেইরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে যথা।

যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন যথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবিস্থিতঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত। ৩স্ক।২৭ অ।

ভগবান বলিতেছেন, অহঙ্কার বিশিষ্ট আত্মাদ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ দেহাভিমানি জীব এই দেহেতেই পরমাত্মাকে জানিতে পারে যথা—শ্লোকস্থ টীকা:—

প্রথমং জীবাত্মৈব কেন প্রকারেণ জ্ঞাতব্যস্ততস্তেন পরমাত্মা চৈতাত্র সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি—জলেস্থিত আভাসঃ প্রতিবিম্বাকারো নিষ্কম্পঃ সূর্য্য প্রকাশোযদা গৃহান্তর্বর্ত্তি স্বচ্ছ ভিত্ত্যাদৌ স্থলে স্ফুরতি তদা গৃহকোনস্থিতৈঃ পুরুষৈঃ প্রথমং স্থলস্থ আভাসো দৃশ্যতে ততশ্চ কুতোঽয়ং প্রকাশ ইতি পরামৃষদ্ভিস্তৈস্তেন স্থলস্থিতেন স্বাভাসেন শোভন সূর্য্য প্রকাশেন জলস্থো নিষ্কম্প আভাসোঽবদৃশ্যতে লক্ষতে। পুনশ্চায়মপ্যাভাসঃ কুত্র ইতি তথা তেনৈব প্রকারেণ তেনজলস্থেন স্বাভাসেন শোভন প্রকাশেন দিবিস্থিতঃ সূর্য্যোঽবদৃশ্যতে।

অস্যার্থ:—প্রথমে কোন প্রকারে অর্থাৎ যোগাদি সাধন বা ঈশ্বরে ভক্তি যোগদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পরে ঐ আত্মজ্ঞান দ্বারা যেরূপে পরমাত্মজ্ঞান লাভ হয় তাহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন যথা গগনস্থ সূর্য্যমণ্ডল স্বচ্ছজলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইলে ঐ জলের চাকচিক্যময় সুন্দর দৃশ্য যদি নিকটস্থ কোন ভিত্তি সংলগ্ন স্ফটিক স্তম্ভে প্রতিচ্ছায়ীকৃত হয়। এবং স্বচ্ছ জলের কম্পন বা তরঙ্গ হেতু ঐ স্ফটিকস্তম্ভে নানাবর্ণ নানাআকারে প্রতীতি হয়, ইহাই অহঙ্কারোপহিত মানব চিত্তের দৃষ্টান্ত জানিবে। এক্ষণে ঐ ভিত্তির নিকটস্থ কোন ব্যক্তি স্ফটিকের স্তম্ভে ঐ চাকচিক্যময় সুন্দর দৃশ্য দর্শনে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে ঐ দৃশ্য কোথা হইতে আসিল! পরে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে জলস্থ চাকচিক্য-

ময় দৃশ্যটি শুভ্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই জলস্থ দৃশ্যটিই আত্মার দৃষ্টান্ত জানিবে। পরে সেই ব্যক্তি জলস্থ সুন্দর দৃশ্যটির কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে যেমন গগনস্থ সূর্য্যমণ্ডল লক্ষিত হয়, সেই রূপ আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই পরমাত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

ফুলের সাজি।

প্রভাত।

নিশা অবসানে　বিহঙ্গম সবে
　ধরিল মধুর তান,
বিস্তারি কিরণ　পূরব গগনে
　উদিল জগৎপ্রাণ।
পাপিয়া কোকিল,　বুলবুল বসি'
　মনসুখে তরুশাখে
পিউ পিউ পিউ　কুহু কুহু রবে
　মনের আনন্দে ডাকে।
মাঠে ঘাটে গাছে　গৃহ সৌধ চূড়ে,
　পড়িল রবির ভায়,
বিভোর হইয়া　বিহঙ্গম গণ
　বিভুর করুণা গায়।
গোলাপ টগর　আরো থরে থর
　ফুটিয়াছে কতফুল;
যুই নাগেশ্বর　গন্ধরাজ বেলা
　সৌরভে করে আকুল।
উঠে তাড়াতাড়ি　রাখাল বালক
　মাঠে যেতে হবে বলে,
হাত মুখ ধুয়ে　পান্তা ভাত খেয়ে
　ধেনুদলয়ে সবে চলে।
বধূবা সকলে　উঠে শশব্যস্তে
　করে সাংসারিক কায;
এখনো ঘুমায়　কেহ জানে যদি
　পাবে তবে বড় লাজ।
সকলের গায়　সোণার বরণ
　ফুটেছে রবির ভায়;
বিশ্বচরাচর　হাসিতেছে যেন
　উদ্ভাসিত হেমকায়।
যেজন এমন　মানস মোহন
　প্রভাত রচিল ভাল;
আমার হৃদয়　সেই পদে যেন
　মজে রয়ে চিরকাল।

শ্রীমৃণালিনী বসু।

মনে পড়ে তায়।

সেই মধুর উষায়,—
　বসিয়া বকুল তলে,
　দেখি সরসীর জলে
আকুল কুমুদকুল ডোবো ডোবো প্রায়।

নলিনী মধুর হাসে,

হেলে দুলে আশে পাশে,

নিরখি' বিষাদ আর হরষ তথায়।

হায়! মনে পড়ে তা'য়।

সেই ঘনবরষায়,—

মুখর বাদর দিনে,

বসিয়া ঘরের কোণে,

মুদিয়া আঁখির পাতা ভাসি ভাবনায়।

কেন সে চিন্তার স্রোতে,

কি জানি গো কোথা হ'তে,

আসিয়া কতকি সাধ পুনঃ ভেসে যায়।

হায়। মনে পড়ে তায়।

সেই বসন্ত সন্ধ্যায়,—

পড়ে এক গৃহ কোণে,

হেরি দূরে শূন্য পানে,

শশীরে সাধিল কত চকোরী আশায়।

দূরে হতে কুহুস্বর,

অপরূপ মনোহর,

বাজিল সহসা দূরে বীণা সে সময়।

শুনি সেই মৃদু তান,

চমকি উঠিল প্রাণ,

বাজে সেই তান গিয়া শিরায় শিরায়।

আর, মনে পড়ে তায়।

এই দূর নিরালায়—

বাঁধিয়া কুটির হেথা,

পাশরি বিরহ-ব্যথা,

যাপি' কাল অসুখধ প্রবাসীর প্রায়।

নিরজন ভাল বলে

লোকালয় পাছে ফেলে,

আসিয়াছি এতদূর ফেরা নাহি যায়।

একটু হাসিব আশে,

কত কাল আছি বসে,

দেখা ত দিলে না আসি সে হাসি আমায়।

তবু, মনে পড়ে তা'য়।

শ্রীরাখাল দাস রায়।

সুখ দুঃখ।

(১)

সুখ দুঃখ এই ভবে,

মানবে সহিতে হ'বে,

সদা সুখ ভোগ কারো ঘটেনা কখন,

সতত দুঃখেতে কারো কাটে না জীবন।

(২)

যারে তুমি ভাব মনে

বড় সুখী এ ভুবনে,

কত দুঃখ আছে তা'র জান কি কখন?

কত নিশা যাপে সেই করিয়া রোদন।

(৩)

দিবস রজনী মত,

সুখ দুঃখ অবিরত,

চক্রবৎ ঘোরে সদা মানব জীবনে,

চিরসুখী, চিরদুঃখী নাহিক ভুবনে।

(৪)

নিরমল সুখ ভবে,
চির দিন নাহি রবে,
মনে করি, সুখ দিনে হবে সাবধান ;
সুখে মত্ত হ'য়ে যেন হারায়োনা জ্ঞান।

(৫)

বিপদে পড়িবে যবে,
হতাশ নাহিক হ'বে,
পোহাবে দুঃখের নিশা, সুখের উদয়
ঈশ্বর ইচ্ছায় হ'বে জানিবে নিশ্চয়।

শ্রীধীরাজকৃষ্ণ সোম।
হরিণাকুণ্ডা।

দূরে।

কত দূরে নব ঘন—কোথায় শিখিনী,
বারিদ-দরশে শুধু হয় যে সুখিনী,
দূরে চাঁদ সুবিমল,
দূরে সে কুমুদ দল,
দূরে যে কমল—দূরে সহস্র কিরণ।
দূরে দূরে তাই হেন আনন্দে মগন।
কখন আসেনা কাছে,
দূরে দেখে সুখে আছে,
নিতুই নূতন তারা—নূতন সদাই,
নূতনত্ব রাখিবারে দূরে দূরে তাই।
তটিনী সে পাগলিনী,
পতি-পাশে একাকিনী
বুকভরা আশা নিয়ে ছুটে গো যখন,
সাগর-সঙ্গম চেয়ে সুখিনী তখন।
ভাল সে সুখের চেয়ে, সুখ আশা বড়
আশায় হৃদয় বাঁধি সুখী গো নিয়ত
আছি ভাল তার আশে,
ভাবি সেও ভাল বাসে,
কবিত রহিলে পাশে হয় "দূর ছাই"!
লইয়ে সুখের আশা, "দূরে দূরে তাই।"

শ্রীহরিসাধন বন্দোপাধ্যায়।

বসন্ত।

আমি এসেছি এসেছি।
তোমাদের কাতর রোদন,
বহুদূর থেকে, আমি শুনেছি শুনেছি।
তোল মুখ চাহ মোর পানে,
নাহি আর শীতল বাতাস,
খুলে দাও হৃদয়ের দ্বার,
দূর কর সব হা হুতাশ
আমি এসেছি এসেছি;
তোমরা যা' চাও, সব এনেছি এনেছি।
গাছে গাছে নব কিশলয়,
লতায় লতায় কত ফুল,
নববধূ শ্রবণ যুগলে,
পরায়েছি দেখ কত দুল।

গাছে গাছে ডাকিছে কোকিল,
ডালে ডালে পাপিয়া বুল্‌বুল্‌,
সুধাসার যেতেছে ভাসিয়া,
স্বরে প্রাণ হতেছে আকুল ;
জাগিয়াছে লুকান প্রণয়,
উঠিয়াছে ভূত স্মৃতি রাশি ;
তোমাদের দেখিতে এসেছি,
তোমাদের বড় ভাল বাসি।
আমি এসেছি এসেছি,
হাসি মুখে কথা কও,
তোমরা যা'চাও, সব এনেছি এনেছি।
সরোবরে হাসিছে নলিনী,
রূপে আলো করি' দিকদশ ;
হৃদয়ের মধু বিলাইয়া,
অলিকুলে করিতেছে বশ।
গুণ গুণ করিছে ভ্রমরা,
মিশিতেছে সে স্বর লহরী—
কোকিলের মধুর কূজনে,
সুধারাশি বহিতেছে ধীরি।
আমি এসেছি এসেছি,
ফুল ফল কিশলয়, এনেছি এনেছি।
মলয় পবন ধীরি ধীরি,
বহিতেছে আদেশে আমার,
লবঙ্গ মাধবী যূথি কত,
চুমি বহে সৌরভের ভার।
আনিয়াছি প্রেম আলিঙ্গন,
গুরু গুরু কাঁপে যাহে বুক ;
আনিয়াছি প্রণয় মিলন,
ধরা মাঝে স্বরগের সুখ।
মুখোমুখি বসি' চুপি চুপি,
কত কথা গোপনে গোপনে,
অস্ফুট সুধার কত ধারা
আঁখি ঠারে পশে যা' পরাণে।
মধুমাখা কতই চুম্বন,
কাঁপি কাঁপি মিলায় অধরে,
ওষ্ঠপুট বাবেক পরশে,
আরক্তিম গণ্ড যাহা করে।
কবি হও, ভাবক, প্রেমিক,
বিলাসী, বিজ্ঞান বিৎ হও।
আমার এ নব উপহার,
লও আসি হাসি চলি যাও।

শ্রীশ্রীপতি কবিরত্ন।

মধুনিশি।

নীল নভ—নীলিমায়,
ধীরি ধীরি ভাসি' যায়
পুলকে অলস কায়,
ফুল্ল বসন্তের চাঁদ নিথর নিশায়।
মৃদুমন্দ সমীরণ,
কাঁপাইয়া উপবন
শিহরিয়া তনু মন
মলয় অচল হ'তে অনন্তে মিশায়।

লভি' সুখ মধু মাস
বিকশিত ফুল রাশ,
বিলায়ে মধুর বাস
আমোদিছে বিশ্বভূমি, মানব পরাণ।
প্রকৃতি কি মধুময়ী,
নিখিল অন্তর জয়ী;
সরসী কল্লোল ময়ী,
গাহিতেছে কলস্বরে বিভুযশোগান।
ব্যোমাঙ্কিত দশ দিশি
—ধ্যানে মগ্ন যেন ঋষি,—
এমন মধুর নিশি,
মরু-ভাগে মিলিবে কি অস্ফুট কাকলি?
বিশ্বের অন্তরযামী—
ত্রিলোক সৃজন-স্বামী;
এস, সখি, তুমি আমি
তাঁহারি চরণ পূজি—ভক্তি-কৃতাঞ্জলি।

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

ব্যর্থ-প্রেম।

সেতগো ক'হনি কথা, চাহে নাই ফিরে;
আপন গরব ভরে চলে গেছে ধীরে।
সেতগো প্রাণের ব্যথা বুঝে নাই মোর,
সেতগো গণেনি কভু নয়নের লোর।
সেতগো দীরঘশ্বাসে হয়নি কাতর;
সেতগো দেখেনি চেয়ে আমার অন্তর।
বুঝে নাই হৃদয়ের আকুলি ব্যাকুলি;
অনায়াসে চলে গেছে চরণেতে ঠেলি। ১।

সেতগো কান্নায় মোর দেয় নাই কান
শুনে নাই বারেক এ হৃদয়ের গান।
দেখে নাই একবার কাতর চাহনি;
শুনে নাই রুদ্ধশ্বাসে ভরা কণ্ঠধ্বনি।
বুঝে নাই মরমের কাতর উচ্ছ্বাস;
মানে নাই নয়নের বাক হীন ভাষ।
ভাবে নাই অন্তরের নিভৃত কামনা;
বুঝে নাই হৃদয়ের অদম্য বাসনা। ২।

সেতগো বুঝেনি কভু নলিনীর প্রাণ—
রবি পানে চেয়ে থাকে সারা দিনমান!
চপবের দীর্ঘশ্বাস, তপ্ত সমীরের,
শুনেনি, বুঝেনি তা'র বেদনা প্রাণের
সেতগো শুনেনি কভু পাপিয়া'র স্বর—
নিশীথে, প্রান্তর ক্রোড়ে উদ্ভ্রান্ত কাতর।
সেতগো প্রাবৃটে গাঢ় জলদের গায়,
বুঝেনি—কি দীর্ঘ ব্যথা ব্যর্থ কল্পনায়। ৩।

সেতগো গানের মত ভাসিতে ভাসিতে,
হৃদয়ের মাঝে আসি শিখেনি মিশিতে।
সেত চাতকের মত আকাশের পানে,
শিখেনি চাহিতে কভু এক মহাধ্যানে।
সেত নির্ঝরিণী মত ঘুরিতে ঘুরিতে,
পারাবার হৃদয়েতে শিখেনি ডুবিতে।
সারাদিন তা'র তরে তবু পথ চেয়ে,
পড়ে আছি শূন্য প্রাণে দীর্ঘ স্মৃতি লয়ে! ৪।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী,
খিদিরপুর।

স্বপনে।

কেগো নিরাশা কাননে, ফুটালে কুসুম,
ছুটা'লে মলয়-বায় ?
কেগো অনন্ত আঁধারে, সুখের আলোকে
বারেক দেখালে তায় ?
আমি নীরব নিদ্রার, সুকোমল কোলে,
ছিলাম সুখেতে ঘুমি',
কেন জাগালে আমারে, হেন অসময়ে,
হেথায় আসিয়া তুমি ?
আমি তাহারি বিরহে, মরম যাতনা
পেতেছি জীবন ভোর,
আজ মুছেনি আমার, কলঙ্ক কালিমা,
ঘুচেনি নয়ন লোর ;
সেযে জীবনের মাঝে, ছিল একদিন,
শান্তির অমিয় রাশি,
সেযে বাসন্তী উষার, কুসুম কলিকা,
আঁধারে তারকা-হাসি।
কত কেঁদেছি জীবনে, তাহারি বিরহে,
আরো বা কাঁদিব কত,
তবু পাইনি তাহার, সহবাস সুখ,
শুধু, ক্ষণেকের মত।
আমি কাঁদিতে এসেছি, কাঁদিয়া যাইব
তাহারি বিরহ নিয়ে,
কেন বাড়াইয়া দিলে হেন শোক রাশি
আমাকে জাগায়ে দিয়ে ?
আছে সে মাধুরী তার, আজিও হৃদয়ে
ভুলিতে পারিনি হায়,
শুধু ক্ষণেকের তরে, নীরবে ছিলাম,
নিদ্রায় ডুবা'য়ে কায়।
আমি ভুলিনি তাহারে, ভুলিতে নারিব
থাকিতে জীবন দেহে ;
কেন অসময়ে এসে, জাগায়ে আমায়,
জ্বালালে অনল গেহে।

শ্রীঅটলবিহারী দাস,
বারুইপাড়া।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মাতা —হাঁরে মেধো, তোকে না বল্লুম খোকার সঙ্গে একটু খেলা কর্, তা না করে খালি ওকে কাঁদাচ্চিস্ কেন ?

মেধো।—না, মা আমি কাঁদাইনি, ও আপনি কাঁদ্চে, ওকে ভোলাবার জন্য এত করে' ওকে মাথায় হাঁট্তে শেখাচ্চি তা কিছুতেই শিখ্বে না, এমন নতুন খেলায় ওর মন উঠে না, তা আমি কি কর্‌বো ?

খোকা।—মা, আমার যদি শীগ্‌গির খুব দাড়ি হয় ত বেশ হয়।

মা।—কেন?

খোকা—তা হলে সমস্ত মুখটা আর ধু'তে হয় না!

* * *

তৃতীয় সংখ্যার প্রশ্নোত্তর।

১।
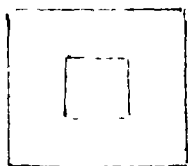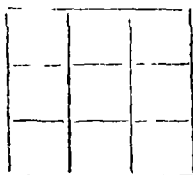
২। জানালাটি প্রথমে এইরূপ আকারের ছিল—

পরে এইরূপ করা হইল:—

৩। (১) বন্যকুক্কুট, (২) কৃকলাশ, (৩) জলহস্তী (৪) *Grasshopper* (৫) *Mastiff* (৬) *Honeysuckle*.

* * *

অল্পভাষী। রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক বড় অল্পভাষী ছিলেন। একদিন তিনি শুনিলেন হাঙ্গেরির কোনও জমীদার নিকটস্থ স্থানে আগমন করিয়াছেন। তিনিও অত্যন্ত অল্পভাষী। উভয়ের সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হইলে পর তাঁহাদের পরস্পর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। রাজাই প্রথম আরম্ভ করিলেন:—

রা। স্নান হচ্ছে?

জ। পান।

রা। সৈনিক?

জ। জমীদার।

রা। উত্তম।

জ। পুলিস কর্ম্মচারী?

রা। রাজা।

জ। অভিবাদন।

এঁরা দুজনে বোপদেবের কেহ হতেন কি?

* * *

এক কথায় উত্তরদান। স্যর চার্লস ব্রাড্‌ল একদা কোনও ব্যক্তির সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এক কথায় "হাঁ কি না" এই উত্তর প্রদানের জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, সকল প্রশ্নেরই ঐরূপ এক কথায় উত্তর দেওয়া যায়। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ধীরভাবে বলিলেন "মিষ্টার ব্রাড্‌ল আমার একটী প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিবেন?" "অবশ্য দিব।" তখন সেই ব্যক্তি বলিল "আপনি কি আপনার স্ত্রীকে প্রহার করা অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছেন?" ব্রাড্‌ল মহা বিপদে পড়িলেন, যদি বলেন "হাঁ" তাহা হইলে স্বীকার করা হইল যে তাঁহার ঐ অভ্যাস পূর্ব্বে ছিল এখন ত্যাগ করিয়াছেন। যদি বলেন "না" তাহা হইলে স্বীকার করা হইল তাঁহার এখনও ঐ অভ্যাস আছে।

* * *

কতিপয় বড়লোকের বয়স। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাঁহাদের দ্বারা চালিত হইতেছে তাঁহাদের নাম ও বয়স:—

লর্ড সল্‌স্‌বেরি	৭০	ডিউক অব্ ডিভন্‌সায়ার	৬৭
মিঃ গোসেন	৬৯	মিঃ চেম্বার্লেন	৬৪
লর্ড উল্‌স্‌লি	৬৭	স্যর মাইকেল হিক্‌স্‌বিচ্	৬৩

লর্ড ডব্লিউ কার্ ৬৯
লর্ড ল্যান্সডাউন ৫৫
মি: ব্যাল্ফোর ৫২

দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধে যে সকল কর্ম্মচারী গিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও বয়স।—

লর্ড ববার্টস্	৬৮
জেনাবেল হোয়াইট্	৬৫
জেনারেল্ বুলার	৬১
„ ওয়ারেন	৬০
„ কেলি কেনি	৬০
„ গ্যাটেকার	৫৭
লর্ড মেথুয়েন্	৫৫
„ কিচেনার	৫০
জেনারেল ফ্রেঞ্চ	৪৮
প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বয়স	৭৬

* * *

গুরুমহাশয়—(ছাত্রের প্রতি) তুই বাড়ি থেকে তেরিজ কসে আন্‌লেই কি যোগফল গুলো বাড়িয়ে আন্‌বি ?

ছাত্র—মশায়, আমি কসিনি, বাবা আমাব আঁক কসে দেন।

গুরু—বটে, তোর বাবাব ত খুব বিদ্যে—সে কি কায করে বল্‌ত ?

ছাত্র—আজ্ঞে, তিনি তেজারতি কবেন—সুদে টাকা খাটান।

গুরু—ও! তাই বটে, এতক্ষণে বুঝতে পারলুম।

* * *

মনিব—হ্যাবে বেমো, তুই ব্যাটা কাল বাত্তিব একটার সময় বাড়িতে এসেছিস? আমি টেব পেয়েছি।

ভৃত্য—বাবুমশাই, আমিও ক'দিন ধবে ঐ কথা আপনাকে বল্‌ব বল্‌ব করে বলতে পারিনি। আপনি শিগ্‌গিব কব্‌রেজ ডেকে ঘুমেব একটা কিছু ভাল ওষুধ বিসুব খান। আমি আস্‌বার সময় নীচে জুতো খুলে, পা টিপে টিপে, টু শব্দটী না করে এলুম, তাতেও যখন আপনার ঘুম ভেঙে গেছ্‌ল, তখন ব্যারাম ভারি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গালিচা ক্রয় সম্বন্ধে বড়লাটের উপদেশ।—সম্প্রতি অমৃতসহর মিউনিসিপ্যালিটির অভিনন্দন পত্রের উত্তর দান কালে বড়লাট বলিয়াছেন—"কোনরূপ প্রাচ্য দেশ জাত শিল্প, পাশ্চাত্য কল কৌশল সাহায্যে প্রস্তুত করিতে হইলে, কখন ইউরোপীয় প্যাটার্ণ্ নকল করিবেন না। ঐ সকল প্যাটার্ণ্ সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর, শিল্প-সৌন্দর্য্যবিহীন ও জঘন্য। আজ প্রাতে আপনাদের সর্ব্বপ্রধান কারখানা পরিদর্শনের সময় সেখানে এখনো গালিচা হস্তদ্বারা বয়ন করা হয় দেখিয়া আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমার বোধ হইয়াছিল যেন কোন কোন প্যাটার্ণে বিদেশীয় রুচি বিমিশ্রিত হইয়াছে। আমি অনুরোধ করি যেন এরূপ ভ্রমে আপনারা আর পতিত না হয়েন; আপনাদের ভারতীয় এবং পারস্য দেশীয় আদর্শেই আপনারা নিবদ্ধ থাকুন, সে আদর্শ এক আজন্মশিল্পি জাতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল এবং সে আদর্শের কোনরূপ উন্নতি বর্ত্তমান কালে সম্ভবপর নহে। আর আমি এদেশীয় রাজা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করি, আপনারা যখন নিজ নিজ প্রাসাদ বা অট্টালিকা সজ্জার জন্য গালিচা ক্রয় করিবেন, তখন যেন ইউরোপীয় গালিচা খরিদ করিয়া, কিডার্-মিনষ্টার বা ব্রসেল্সেএর বীভৎস ডিজাইন্এর উৎসাহ দান না করেন। স্বদেশে গালিচা ক্রয় করিবেন এবং এটী একটী নিয়ম করিবেন যেন সেই গালিচায় ভারতীয় বর্ণসমাবেশ এবং প্যাটার্ণে প্রস্তুত হয়। এদেশীয় ধনিদিগের মধ্যে অনেকেই ইউরোপীয় অনুকরণ নূতন হইলেই তাহা রুচিকর (fashionable) এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ফ্যাশন্ ও সৌন্দর্য্যে কোন রূপ বাঁধাধরা সংস্রব নাই—নূতন প্যাটার্ণ্ অনেক সময়ে নিকৃষ্ট শিল্প।"

৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

প্রবাস, ২বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

ELM PRESS, CALCUTTA

প্রয়াস।

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ। মে, ১৯০০ সাল। পঞ্চম সংখ্যা।

নিদাঘ নিশায়।

(১)

একটুকু বহেছে বাতাস,
জুড়ায়েছে হৃদয় বেদনা;
নাজানি এ কিসের লহরী,
নাজানি এ কাহার করুণা।

(২)

সন্ধ্যা যায় ধীরে ধীরে, আকাশেতে মেঘ ঘিরে
অন্ধকার আসে ঘনাইয়া;
বিষাদিত তরুলতা, নাচেনা গাছের পাতা
পাখী আর উঠেনা গাহিয়া।
বায়ু কোথা কেবা জানে, আসি কুসুমের কাণে
নাহি কয় প্রণয়-বারতা;

হৃদিভরা পরিমল, ফুলতনু সুকোমল,
ম্রিয়মাণ পেয়ে মনোব্যথা।
থামিয়াছে কলতান, আর নাহি গাহে গান
আর নাহি বহে স্রোতস্বিনী,
নাহি কোন কলরব, নীরব মানব-রব
নীরব এ নিখিল মেদিনী।

(৩)

কি যেন অশান্তি আসি, রহিয়াছে বিশ্বগ্রাসি'
বিষাদ চাপিয়া আছে বুকে ;
সুখহীন শান্তি হীন, প্রকৃতি শকতি হীন
কথা আর নাহি সরে মুখে।
ছাইয়া তরুর মূল, ঝরেনা বকুল ফুল,
নাহি ফেলে সুরভি নিশ্বাস,
নাজানি কোথায় আজি, স্বভাবের শোভারাজি
স্বভাবের বিমল বিকাশ।
গগণে যতেক তারা, হইয়ে নিমেষ হারা
চেয়ে রয় সদা ম্লান চোকে ;
প্রভাহীন, জ্যোতিঃহীন, হীনবল দেহক্ষীণ
প্রিয়জন বিরহের শোকে।
যতই বাড়িছে রাতি, মলিন চাঁদের ভাতি
ম্লানমুখে মেঘগুলি চায়,
বহেনা বহেনা শ্বাস, ফুরায় জীবন-আশ,
ধরা যেন মুমূর্ষু শয্যায়।

(৪)

সতত চঞ্চল চিত, নাহি হয় প্রশমিত,
কিছুতে না সুখ পাই মনে ;
শ্রান্ত দেহ রাখি ভূঁয়ে, বাহু'পরে মাথা থুয়ে
শুয়ে তাই বিষাদ শয়নে।
সহসা যে কোথা হ'তে, বহে বায়ু আচম্বিতে
ধরণীর প্রাণ স্নিগ্ধ করি ;
দূরে যায় চিন্তা রাশি শিরায় শিরায় পশি'
হৃদে বহে আনন্দ লহরী।
হরিগুণ গান করি, হৃদে বহে এ লহরী
এ লহরী স্বর্গ সুখ ধারা,
তিরপিত প্রাণমন, সুধাবারি বরিষণ
সদামুক্ত শান্তির ফোয়ারা।
নিখিল জগতস্বামী, ধন্য প্রভু, ধন্য তুমি,
ধন্য তব অপার করুণা ;
ম্রিয়মাণ জগতেরে, কেবা প্রভু দিতে পারে,
তুমি বিনা অসীম সান্ত্বনা।
নাচে তরু ফোটে ফুল, বহে নদী কুল কুল,
শশী দেয় বিমল কিরণ ;
অভিনব সুখে ভুলে, যত জীবে কোলে তুলে
ধরা হয় নিদ্রায় মগন।
ধন্য তব এ মহিমা, নাহি অন্ত নাহি সীমা
তব শক্তি জগতে প্রকাশ ;
প্রকৃতি পুলকে ভরে, পাখী গায়, ফুল ঝরে,
একটুকু বহিলে বাতাস।

(৫)

বহিয়াছে শান্তির বাতাস
জুড়ায়েছে হৃদয়-বেদনা;
হৃদে বহে আনন্দ লহরী
ঈশ্বরের অশেষ করুণা।

শ্রীরসময় লাহা।

বিহারিলাল।

বন্ধুত্বে।

বন্ধু-বৎসলতা বিহারিলালের চরিত্রের একটী বিশেষত্ব। তিনি বাল্যকাল হইতেই বন্ধুপ্রিয় ছিলেন, এবং তাঁহার এমন একটু নৈসর্গিক আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহাতে তাঁহার বন্ধুরা ও তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি দুই কথায় অপরিচিত লোকের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতেন এবং যাহার সহিত তাঁহার মনের মিল হইত, তাঁহাকে তিনি চিরজীবনের জন্য প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিতেন, হয়ত তাঁহার সহিত একটা সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিতেন। তিনি তাঁহার অধিকাংশ বন্ধুগণকে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতেন,—ভাসা ভাসা ভালবাসা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। এবং এই ভালবাসার আর একটু বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রত্যেকেরই ধারণা ছিল, যে তিনিই বিহারিলালের অপরাপর বন্ধুগণ অপেক্ষা প্রিয়তম। বলা বাহুল্য যে বিহারিলালের বন্ধুত্ব কেবলমাত্র মৌখিক সাদর সম্ভাষণে পরিসমাপ্ত হইত না।

বিহারিলাল যাঁহাদের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া জানিতেন, তিনি তাঁহাদের পার্শ্বে, বিপদে সম্পদে, দুঃখে সুখে সমভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। তাঁহার এই দুর্লভ প্রণয়ের তুল্য মূল্যে প্রতিদান দিতে পারিতেন এরূপ কয়েকটী বন্ধুও বিহারিলালের শুভাদৃষ্টবশতঃ মিলিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই বিহারিলালের বন্ধুর অভাব ছিল না। কিন্তু পুরী হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার স্বভাব ও কার্য্যপ্রণালীর বৈলক্ষণ্য অবলোকন করিয়া সেই অপরিণত বয়স্ক সহচর গুলির মধ্যে অনেকেই বায়ুতাড়িত তুষরাশির মত তাঁহার সহবাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, যে কয়টী খাঁটী বীজ সেই কয়টীই অবশিষ্ট রহিল। এই নির্ব্বাচিত বন্ধু কয়টীর মধ্যে চারিজন যৌবনেই ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহাদের নাম ছিল পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় ও রামচন্দ্র। এই শৈশব সহচর, বাল্যসখা ও যৌবনবন্ধু কয়টীর সহিত বিহারিলালের সুকুমার বয়সের মধুর স্মৃতিগুলি বিজড়িত ছিল। ইঁহাদের অকাল মরণে বিহারিলাল কিরূপ মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার "বন্ধুবিয়োগ" কাব্যের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পায়। এই বাল্যবন্ধু কয়জনের মধ্যে রামচন্দ্রের স্বভাবের সহিত বিহারিলালের নিজ প্রকৃতির কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা রামচন্দ্রের উদ্দেশে কবির লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টী পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন,—

ছেলেবেলা হয় নাই বিদ্যা আলোচন,
উদ্ধত ব্যাভার ছিল তোমার তখন।
কিন্তু কভু মজ নাই অসৎ আচারে,
পরমন্দ পরদ্বেষ নেশা ব্যভিচারে।
অকপটই মনে ছিল মহত্বের মূল,
নহিলে সময়ে কভু ফোটে কি সে ফুল?

রামচন্দ্রের মাতৃভাষা সাধনার কথা বিহারিলাল যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহার সহিত বিহারিলালের স্বকীয় বাল্য শিক্ষার ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়,—

জননী জনমভূমি সম মাতৃভাষা,
যত কিছু মঙ্গলেব তাঁ'র প্রতি আশা।
তাঁহার মঙ্গলে হবে দেশের মঙ্গল,
তাঁ'র অমঙ্গলে হ'বে দেশে অমঙ্গল।
যত তাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধা হইবে সঞ্চার,
যত তাঁ'র আলোচনা হইবে প্রচাব,
ততই প্রবোধ সূর্য্য হইবে উদয,
ততই জনমভূমি হ'বে আলোময়।
এই তত্ত্ব সার তুমি বুঝেছিলে রাম,
মাতৃভাষা সাধনা কবিতে অবিশ্রাম।
কৃত্তি, কাশী, ভাবত, মুকুন্দ মহাকবি
এঁকেছেন যে সকল মনোহব ছবি,
সেগুলি তোমার ছিল নয়নে নয়নে,
বাণী যেন বিহরেণ কমল কাননে।

উপরোক্ত কয়জন ব্যতীত বিহারিলালের আব কয়েকটী বাল্য-বন্ধুর কথা উল্লেখ যোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা উকিল ৺ ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজন ছিলেন কুমারটুলীর খ্যাতনামা কবিরাজ ৺ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন। ব্রজেন্দ্র বাবু রামায়ণ পাঠ কবিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং কবির বাটীতে আসিয়া কবিরাজ মহাশয় প্রায়ই বাল্মীকির আলোচনা করিতেন। উভয়বন্ধুই ইহাতে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন। ব্রজেন্দ্র বাবুর সহিত কবির অকপট প্রণয় ছিল এবং কৃষ্ণকমল বাবু

ব্যতীত বোধ হয়, কবি, বন্ধুগণের মধ্যে ব্রজেন্দ্র বাবুর ন্যায় অন্ত কাহাকেও ভালবাসিতেন না। ভৈরব বাবু ও ব্রজেন্দ্র বাবু উভয়েই কবির জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। বিহারিলালের আর দুইজন বাল্য-সুহৃদ এখনও জীবিত এবং উভয়েই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ;—একজন কাশ্মীররাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান ভাইস্ চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, অপর জন এই রাজধানীর প্রথিত নামা ও বিচক্ষণ ভিষক্ শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী। নীলাম্বর বাবুর পিতার নিকট বিহারিলাল সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন এই সূত্রে উভয় বন্ধুর জীবনের প্রথম সংযোগ। এবং এই বাল্যকালের হৃদ্যতা সময়ের গতি বা অবস্থার পরিবর্ত্তনে কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে নাই। বিহারিলাল জীবনে একবার মাত্র কিছুদিনের জন্য বাগ্দেবীর অবিচ্ছিন্ন সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন—চাকুরী গ্রহণ করেন। কবির জীবনের এই ঘটনাটী কিরূপ ভাবে নীলাম্বর বাবুর নামের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

সূর্য্যকুমার বাবুর সহিতও বিহারিলালের বাল্যকাল হইতে বিশেষ প্রণয় ছিল। সূর্য্যকুমার বাবু বিহারিলালের কয়েকবৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, কবি তাঁহাকে মান্য করিতেন। সূর্য্যকুমার বাবু সংস্কৃতকাব্য পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন এবং বিহারিলালের সহিত একত্রে তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। কবি তাঁহার "বন্ধুবিয়োগ" কাব্য সুহৃদবর সূর্য্যকুমার বাবুর স্নেহ করে সমর্পণ করেন। শেষ ব্যাধির সময় বিহারিলাল সূর্য্যকুমার বাবুরই চিকিৎসাধীন ছিলেন।

কিন্তু সুকুমার বয়সের বন্ধুগণের মধ্যে, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত বিহারিলালের প্রীতিবন্ধন যত দৃঢ়তর সূত্রে আবদ্ধ ছিল, তত বোধ হয় আর কাহারও সহিত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিহারিলালের ইংরাজি কাব্যালোচনার সময় কৃষ্ণকমল বাবু তাঁহাকে সহায়তা করেন। এ সহায়তা অধ্যাপক ভাবে নহে, জ্ঞানার্জ্জনে সহযোগী বন্ধুর ন্যায় সাধিত হইয়াছিল। বিহারিলাল কৃষ্ণকমল বাবুর নিকটে, ইংরাজ কবিগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন, দুর্ব্বোধ অংশ গুলির মর্ম্ম কৃষ্ণকমল বাবুর বিশদ ব্যাখ্যায় অন্তস্তল পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিত, এবং উভয় বন্ধুই এই কাব্যালোচনায় পরমানন্দ অনুভব করিতেন। যৌবন কালের দেশীয় সাহিত্য সেবার সময়ও কৃষ্ণকমল বাবু, বিহারিলালের একজন প্রধান সহযোগী ছিলেন। বিহারিলালের যত্নে পরিচালিত "অবোধবন্ধু" নামক মাসিক পত্রের অধিকাংশ গদ্য প্রবন্ধ গুলিই কৃষ্ণকমল বাবুর লেখনীপ্রসূত। কৃষ্ণকমল বাবু কলিকাতা বাস ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণপুরে অধিবাস আরম্ভ করিলে, তাঁহার বাটীতে কোন কোন রবিবারে এক প্রকার বন্ধুসম্মিলন হইত। এইখানে বিহারিলালের সহিত বঙ্গসমাজের কয়েকটী, তৎকালে সমুদিতপ্রায়, প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পরিচয় হয়। ইঁহাদের মধ্যে একজন হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রতিভাবান জজ স্বর্গগত বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র, আর একজন কবিকুলভূষণ বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমবাবু এবং বিহারিলাল উভয়েরই তখন কবিত্ব শক্তি বিকাশের প্রভাত কাল। উভয়েরই কয়েকটী সাময়িক রচিত কবিতা সেই বন্ধুসম্মিলনীর মধ্যে পঠিত এবং সমালোচিত হয়। কৃষ্ণকমল বাবুর বাটীতে এই রবিবারে, বন্ধুসম্মিলনীর কথা বিহারিলালের এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধুর, জীবনের অতি সুখকর স্মৃতির সহিত বিজড়িত ছিল।

কৃষ্ণকমল বাবু এবং বিহারিলাল সংসারযাত্রার দুইটী বিভিন্ন

পথাবলম্বন করিয়াছিলেন। একজন জ্ঞান অর্জ্জন ও বিতরণ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন ও এখনও আছেন,—আর একজন বীণাপাণির ললিতকলা আলোচনা করিয়া জীবিত কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উভয়ের মতামত, আচার ব্যবহার প্রভৃতি অনেক বিষয়ে প্রভেদ সত্ত্বেও উভয় বন্ধুই সুখে দুঃখে পরস্পরের প্রতি চিরজীবন সোদরাধিক সমবেদনা অনুভব করিতেন। এই পরম বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিক অনুরাগ বিহারিলালের কবিতায় প্রেমভরে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। সেই সাদর সম্ভাষণ হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

প্রিয়তম সখা সহৃদয়। প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে, তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

* * *

যখন তোমার কাছে যাই, যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই;
অতুল আনন্দ ভরে, মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।

* * *

ফিরে আসে সেই ছেলে বেলা, হেসে খুসে করি খেলাদেলা,
আহ্লাদের সীমা নাই, কাড়াকাড়ি করে' খাই
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।

* * *

তুমি ধাও আপনার ঝোঁকে সুদূর "দর্শন" সূর্য্যালোকে;
যার দীপ্ত প্রতিভায় তিমির মিলায়ে যায়,
ফোটে চিত্র বিচিত্র আলোকে।

* * *

আমি ভ্রমি কমল কাননে, যথা বসি কমল আসনে
স্বরস্বতী বীণা করে স্বর্গীয় অমিয় স্বরে
গান গান সহাস আননে।

* * *

পরস্পর উল্টতর কাজে, পরস্পরে বাধা নাহি বাজে
চোকে যত দূরে আছি মনে তত কাছা কাছি
ঈর্ষার আড়াল নাই মাঝে।

চোরবাগানের বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ, আর একজন ব্যক্তি যাঁহার সহিত বিহারিলাল তরুণ বয়স হইতে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত ছিলেন। যোগেন্দ্র বাবু বিহারিলালের কয়েক বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ, বিহারিলাল তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন এবং সাংসারিক সুখ দুঃখ আশা আশঙ্কা সকল কথাই বলিতেন। যোগেন্দ্র বাবুও কবিকে "দাদা" সম্ভাষণ করিতেন ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। এখনও যোগেন্দ্র বাবুর নিকট স্বর্গীয় কবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তিনি কবির নানারূপ সদ্‌গুণের বর্ণনা শেষ করিয়া উঠিতে পারেন না। যোগেন্দ্র বাবুর সহিত বিহারিলালের সাহিত্য সেবার আরম্ভ কাল বিশেষরূপে সংযুক্ত। যোগেন্দ্র বাবু "অবোধবন্ধু" নামক মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তক, ইঁহার হস্ত হইতেই বিহারিলাল এই পত্রের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। কৃষ্ণকমল বাবুর বাটীতে যে বন্ধুসম্মিলনীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, যোগেন্দ্র বাবু সেই বন্ধুগণের মধ্যে একজন।

কবির শৈশব কালের সহচর গণের মধ্যে আর একজন ব্যক্তি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—ইঁহার নাম ৺অভয়চন্দ্র চন্দ্র; ইনি রাধাবাজার চন্দ্র ব্রাদার্শ দিগের সত্বাধিকারীগণের অন্যতম ছিলেন। ইঁহাদের বাটী কবির বাটীর সন্নিকটেই এবং কবির সহিত বাল্যকাল হইতেই ইঁহার একসঙ্গে অবস্থিতি। সুবর্ণবণিক্ দিগের ভক্তির পাত্র হইলেও অভয় বাবুর সহিত বিহারিলালের অন্তরঙ্গ ভাবে সখ্যতা ছিল।

কবি তাঁহার "নিসর্গসন্দর্শন" কাব্য খানি অভয় বাবুর নামে উৎসর্গ করেন।

১২৮৯ সালে ৭ই বৈশাখ অভয় বাবুর মৃত্যু হয়। কবির বয়স তখন ৪৫ বৎসর। এই ঘটনায় শোককাতর হইয়া কবি নিম্নোক্ত গানটী ঐ দিবস রচনা করেন।

কাঁদে কাঁদেরে প্রাণ অভয় বিহনে ;
ক্ষণে ক্ষণে সেই মুখ পড়িতেছে মনে।
কোথাহে শৈশব সখা, দাও ভাই দাও দেখা
কোথা যাব কোথা পাব হারানো রতনে,
আমারি হারানো রতনে।

যুবাবয়সের ও পরবর্ত্তী কালের বন্ধুগণের মধ্যে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্তের নাম সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখ যোগ্য। কৃষ্ণগোপাল বাবু, যৌবনকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কবির একজন প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। বিহারিলাল তাঁহার প্রায় সমস্ত রচনাই কৃষ্ণগোপাল বাবুকে শ্রবণ করাইয়া পরে প্রকাশিত করিতেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী মুদ্রাঙ্কন, প্রকাশ ও রচনা বিষয়েও কৃষ্ণগোপাল বাবুর নিকট কবি আন্তরিক আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেন। কবির জীবিতকালে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত পুস্তকই কৃষ্ণগোপাল বাবুর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয় এবং কবি তাঁহার "প্রেম প্রবাহিণী" কাব্য খানি কৃষ্ণগোপাল বাবুর নামে উৎসর্গ করেন। কৃষ্ণগোপাল বাবুর কবিত্ব ও কাব্যরসের দোষ গুণ বিচার শক্তির উপর বিহারিলালের যথেষ্ট আস্থা ছিল। বিহারিলাল ব্যতীত "মহিলা" প্রণেতা ৺ সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, ৺ রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি অপরাপর কবিগণ এই প্রবীণ কাব্যানুরাগীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন ও তাঁহার নিকট ন্যূনাধিক

পরিমাণে ঋণী ছিলেন। সার্ ওয়াল্টর স্কটের জীবনে উইলিয়াম আরস্কিন (William Erskine) যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, বিহারিলালের জীবনেতিহাসে কৃষ্ণগোপাল বাবুরও সেই স্থান। কৃষ্ণগোপাল বাবু এখনও জীবিত এবং তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কবির জীবনের কয়েকটী বিষয় লেখক ও পাঠক উভয়েরই অপরিজ্ঞাত থাকিত।

কবির শেষ জীবনে আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার সখ্যতা সংস্থাপিত হইয়াছিল। সুকবি ও বঙ্গের খ্যাতনামা দার্শনিক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই বন্ধুগণের মধ্যে একজন। ইঁহার নিকট কবি বিহারিলালের আদরের ও সম্মানের সীমা ছিল না এবং বিহারিলালও দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণকে স্নেহ করিতেন। "সারদামঙ্গল" রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে, "সঙ্গীত শতক" পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুর মনে, বিহারিলালের সহিত আলাপ করিবার বাসনা উদিত হয়। ঘটনাক্রমে সাময়িক "হিন্দু মেলা" স্থলে উভয়ের সাক্ষাৎকার হয় এবং প্রথম দর্শনেই সখ্যতার সূত্রপাত হয়। বিহারিলালের "সারদামঙ্গল" এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুর "স্বপ্নপ্রয়াণ" রচনা কালে উভয় কবি নিজ নিজ রচনা পরস্পরকে শুনাইতেন ও একত্রে কাব্যালোচনা করিয়া অনেক সময় আনন্দে অতিবাহিত করিতেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন যে দেশীয় সাহিত্য বা অন্যান্য বিষয়ে উভয়ে যে কথোপকথন হইত তাহাতে বিহারিলালের মতামতের সহিত অধিকাংশ স্থলে তাঁহার মত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যাইত।

রামবাগানের সুপ্রসিদ্ধ দত্ত বংশীয় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও কয়েকজন

ব্যক্তির সহিত বিহারিলালের সৌহার্দ ছিল। ক্ষেত্র বাবু বিহারিলালের "বঙ্গসুন্দরী" পাঠ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়েন এবং উভয়ে পরিচয় হইবার পর হইতে ক্ষেত্র বাবু বিহারিলালের কবিতার গুণগ্রাহিদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিলেন।

সমাজের সমস্তরে অবস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা শেষ করা যায় না। কারণ যিনি একবার বিহারিলালের সহিত আলাপ করিতেন, তিনিই কবির সদ্ব্যবহার গুণে তাহার বন্ধু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বড়াল, ৺ রাজকৃষ্ণ রায়, ৺ অধরলাল সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি অনেক বয়ঃ কনিষ্ঠ সাহিত্যসেবিগণ বিহারিলালের ক্ষুদ্র ভবনে যাতায়াত করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন এবং কবির নিকট হইতে উৎসাহ, প্রীতি ও সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতেন।

অক্ষয় বাবু বলেন কবি তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন অথচ বন্ধুর ন্যায় সরল খোলা প্রাণে কথা কহিতেন। বিহারিলাল তাঁহাকে প্রীত করিবার জন্য হয় ত গান করিতে বসিলেন, বাদ্যযন্ত্র অভাবে বালকের ন্যায় তক্তপোষ বাজাইতে লাগিলেন, কটীর বসন শিথিল হইয়া গিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। বিহারিলালের সরল ব্যবহার তাঁহার স্নেহ সম্ভাষণ অক্ষয় বাবু কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

বিহারিলালের একজন বাল্য সহচর, আত্মীয় ও প্রতিবাসী এখনও জীবিত আছেন যদিও তিনি জরাগ্রস্ত ও অসুস্থ। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভট্টাচার্য্য। বিহারিলালের বাটীতে তাঁহার অধিকাংশ

অবসরকাল অতিবাহিত হইত এবং বিহারিলাল তাঁহাকে ভালবাসিতেন। পরস্পরের এই সম্প্রীতির একটী বিশেষ কারণ ছিল। কানাইবাবুর নিজের কবিতা চর্চ্চা ছিল; তিনি বিহারিলালের কবিত্ব ও তাঁহার গরীয়সী কবিতার মাধুর্য্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া বিহারিলালের প্রতি আন্তরিক ও অচলা ভক্তিবন্ধনে গ্রথিত হইয়া ছিলেন। কানাইবাবু, চলিতকথায়, শিক্ষিত ব্যক্তি নহেন। তিনি অনেকগুলি সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে কয়েকটী মাত্র তাঁহার কোন স্নেহভাজন ব্যক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ গুলিই তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিতেছে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার জীবনের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হইবে। ঐ গানগুলিতে পুরাতন কবিগণের অবিমিশ্র জাতীয় সুরের একটী মধুর রেশ ধ্বনিত হইতে শুনা যায়। * কানাইবাবু স্বরচিত গীতগুলি বিহারিলালকে গান করিয়া শুনাইতেন, এবং বিহারিলালের প্রশংসা পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। কানাইবাবু বলেন—"বিহারিবাবুর স্বভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে উত্তমের পক্ষে সমস্তই—অধমের পক্ষে কিছুই বলা যায় না।" কানাইবাবুর এই উক্তি

---

* কানাইবাবুর দুইটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১। গাছে ফুল শোভা কেমন, হয় কি তেমন গাঁথলে মালা?
গলায় দিলে ক্ষণেক মজা, শেষকালেতে হেলা ফেলা।
কোথায় সে সৌরভ সুখে, কোথায় সে প্রফুল্ল
সে আদরে রসভরে ভ্রমরে করেনা খেলা।

২। পুঁথির পণ্ডিত হলে বল কি হ'বে!
পুঁথিতে শুধুই ভুঁত কুয়া কোথায় পাবে।
পুঁথির পণ্ডিত হ'লে বল কি হবে।
মুকুর পিছনে থাকি, কি খুঁজিছ মেলে আঁখি
সমুখে দাঁড়াও এসে অভাব না রবে।

বিহারিলালের সহিত অর্দ্ধশতাব্দীকাল একত্র ও ঘনিষ্ঠ সহবাসের ধারণা প্রসূত।

বিহারিলালের শেষ জীবনে আর একটী বন্ধু মিলিয়াছিল, ইহার নাম শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু রায়, নিবাস কাঁকিনীয়া, রঙ্গপুর। অনাথ বাবুর সহিত বিহারিলালের প্রণয় সংস্থাপন কিছু বিচিত্র রকমে হইয়াছিল, এবং এই বন্ধুত্বে কিছু কবিসুলভ বিশেষত্ব আছে। দুই বন্ধুতে জীবনে কখন সাক্ষাৎ হয় নাই, "সারদা মঙ্গল" এর অনন্য সাধারণ কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, অনাথবাবু বিহারিলালকে একখানি প্রশংসাপত্র লিখেন, এই সূত্রে উভয়ে আলাপ, এবং পত্র বিনিময়েই সেই পরিচয় এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগে পরিণত হয়, যে অনাথবাবুর পত্র আসিতে বিলম্ব হইলে বিহারিলাল বিরহ-কাতর প্রেমিকের ন্যায় সেণ্টিমেণ্টাল হইয়া উঠিতেন। পাঠকের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য কবির একখানি লিপি উদ্ধৃত করিলাম—

কলিকাতা।
৬ই মাঘ, ১২৮৮।

"ভাই অনাথ

তুমি কোথায়, তুমি কোথায় এখন ! তোমাকে এখন আর দেখিতে পাইতেছি না কেন? আমি কি করিয়াছি? আমি যখন তোমার প্রথম পত্র পাই, তখন আমার শোবার ঘরের সমুখের ছাদের আলসের উপর টবে, দাড়িম গাছে, একটী দাড়িম ধরিয়াছিল। তোমার দ্বিতীয় পত্র পাইবার সময়, সেটী পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে, তৃতীয় পত্র পাওয়ার পর অবধি সে রক্তবর্ণ, ক্রমে আপেলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল। আমি প্রতিদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিবামাত্র দাড়িমটী আমার চোখে পড়িত, অমনি তুমি আমার সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে; আমোদে আহ্লাদে, পীড়ায়, চিন্তায়, রচনায়, সর্ব্বদাই তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে—সর্ব্বদাই

তোমার হাসি খুসি মুখশশী চেহারায় খুসি ফুটিয়া থাকিত। তোমার মত খোলা প্রাণের মানুষকে পাইয়া আমি অহোরাত্র স্বর্গসুখে ছিলাম। দুই চারিদিন হইল টুকটুকে চুকচুকে দাড়িমটী ঝরিয়া পড়িয়াছে। ছাতটা যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তোমাকেও আর তেমন সর্ব্বদা দেখিতে পাইনা। প্রাণ কাতর মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। পত্রপাঠ পত্র লিখিয়া সুস্থ কর। আমি শরীর গতিক ভাল আছি, তুমি সারিয়াছ কিনা?

তোমার বেহারী।

আর এক পত্র বিহারিলাল অনাথবাবুকে লিখিয়াছিলেন—

"নিশ্চয়ই তোমার আমার জন্মান্তরে সহোদর সম্বন্ধ ছিল, তাহা না হইলে এখন আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কুলশীল আকৃতি থাকিয়াও কি করে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া গেল।"

বিহারিলালের অপরাপর সকল বন্ধুই কলিকাতায় থাকিতেন, সেই জন্য তাঁহাদিগকে মনের কথা পত্রে লিখিয়া জানাইবার বড় প্রয়োজন হয় নাই ; এবং বিহারিলাল পত্রও অতি অল্পই লিখিতেন। কিন্তু অনাথবাবুকে তিনি জীবনের রচনার ও প্রাণের সকল কথাই সাক্ষাৎদর্শন অভাবে লিপি দ্বারায় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই পত্রগুলি হস্তগত হইলে বিহারিলালের জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে অনেক রহস্যই উদ্ঘাটিত হইতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্নিদেব অনাথবাবুর বসতবাটীর সহিত সেগুলিকে উদরসাৎ করিয়াছেন। কয়েক খানি কবির স্বহস্তে লিখিত প্রতিলিপি মাত্র আমরা দেখিতে পাইয়াছি। অনাথবাবু জীবিত আছেন। তিনি কবির উপর কিরূপ অনুরক্ত তাহা এই নগণ্য লেখকের উদ্দেশ্যে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন—

কাকিনীয়া, ২৮ পৌষ ১৩০৩।

"মহাশয়

তাঁহার (বিহারিলালের) মত বন্ধুকে অকালে হারাইয়া, মর্ম্মাহত হইয়া আছি। অমন আদরের সম্ভাষণ এ জীবনে কেহ কখন করে নাই, করিবে না। আমার দুর্ভাগ্য, আর দুর্ভাগ্য বঙ্গভাষার। বিহারিলালের ন্যায় সুকবিকে হারাইয়া বঙ্গমাতা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত। অমন সুললিত তানে সরল কথায় কে আর কাব্য কাননে মৃদুমন্দ পদক্ষেপে বেড়াইবে। বিহারি বাবুর "সারদা মঙ্গল" 'বঙ্গসুন্দরী" কাব্য জগতে অতুলনীয়। * * *

জীবন চরিত মুদ্রাঙ্কিত হইলেই আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। বুকের ধন বুকে করিয়া রাখিব।

শ্রীঅনাথবন্ধু রায়।"

এই স্থলে একজন ভদ্রমহিলার কথা উল্লেখ না করিলে বোধ হয় কবির বন্ধুপ্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিবে। জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কাব্যানুরাগিণী সুশিক্ষিতা সীমন্তিনী কবিকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার নিকট বঙ্গের অনেকানেক নবীন লেখক সাহিত্য সেবা কার্য্যে উৎসাহিত হইতেন। এই রমণীর পবিত্র অধর নিঃসৃত মধুর প্রশংসা বাক্য এবং প্রীতি উপহার বিহারিলালকে কবিত্বরসে বিশেষরূপে উদ্দীপিত করিত। ইনিই কবিকে একখানি স্বহস্তে রচিত কারুকার্য্যময় পশমের আসন উপহার দান কালে "যোগেন্দ্র" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করেন। ইঁহার উৎসাহেই বিহারিলাল তাঁহার "সারদা-মঙ্গল" কাব্য আর্য্যদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন, এবং ইঁহারই অনুরোধে বিহারিলালের "সাধের আসন" কাব্যের সূচনা। এই মহিলার প্রতি কবির প্রীতি ও ভক্তির অবধি ছিল না। নিয়তির কঠোর নিয়মে এই রমণীরত্ন কবির জীবিত কালে

এবং "সাধের আসন" কাব্য পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই, অপূর্ণ বয়সে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ইহার অকাল মরণে বিহারিলাল হৃদয়ে কিরূপ দারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কবির "আসনদাত্রী দেবী" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ঐ কবিতা হইতে কয়েকটী পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

তোমার আসন খানি আদরে আদরে আনি
রেখেছি যতন করে, চিরদিন রাখিব,
এ জীবনে আমি আর তোমার সে সদাচার
সেই স্নেহ মাখা মুখ পাসরিতে নারিব।
সাক্ষাৎ আমার প্রাণ "সারদা মঙ্গল" গান
অসম্পূর্ণ পড়েছিল যেন মরে গিয়েছে ;
বেসুরা বীণার মত জানিনা কি দশা হ'ত
তোমারি আদরে দেবি ! ফিরে প্রাণ পেয়েছে।

* * *

সেই মুখ খানি মনে কেন পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
করুণ নয়ন দুটী সদাই প্রাণেতে ভায়,
হা দেবি। তোমায় আর দেখিব না এ ধরায় !

ক্রমশঃ।

জাতীয় নববর্ষ।

ধীরে ধীরে পুরাতন বৎসর, অতীতের অন্ধকারময় রাজ্যে প্রবেশ করিল ; তাহার স্থান নববেশে নববর্ষ মধুরহাসি শুভ্রমুখমণ্ডলে মাখিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া অধিকার করিল। ভারতে জাতীয় নববর্ষের আগমন, ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কত সুখের। নববর্ষ কত নব

আশা, কত তরুণ উৎসাহ, কত মধুর কল্পনা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের কতপূর্ব্বগৌরব কাহিনী, কত পূর্ব্ব মহিমার গীতি ইহার স্তরে স্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। সেই উৎসাহময়ী প্রতিভাময়ী সঙ্গীতের পবিত্র মহিমা কোন্ ভারত বাসীর হৃদয়ে নবউৎসাহে নবশক্তিতে জাগাইয়া না তোলে? কিন্তু হায়, নববর্ষের কলকণ্ঠ নিঃসৃত সুধাসঙ্গীতে বাঙ্গালী হৃদয় বড় প্রফুল্ল হয় না! এ কথা বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—শরীর অবসন্ন হয়। বাঙ্গালী কি জাতীয় নববর্ষের সম্বর্দ্ধনা করিতে জানে? বাঙ্গালীকে কখনও কেহ কি নববর্ষকে হৃদয়ের সবটুকু উৎসাহ, সবটুকু উদ্যম লইয়া আহ্বান করিতে দেখিয়াছে? বোধ হয় না। বাঙ্গালীকে নীচচেতা ঘৃণিত দাসের ন্যায় ইংরেজী নববর্ষের উৎসবে যোগ দিতে দেখা গিয়াছে; সেই উৎসবে বাঙ্গালীকে পাশ্চাত্য শিক্ষা উপার্জ্জিত উপায় অবলম্বন করিয়া মাতিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু আমাদের জাতীয় নববর্ষ কিরূপে আসিল আবার কি ভাবে কাল-পয়োধি বক্ষে লীন হইয়া গেল তাহা বাঙ্গালীর চিন্তার বিষয় নহে! একবার তোমার বিবেককে প্রশ্ন কর এবং নির্ব্বিকার চিত্তে উহার উত্তর প্রতীক্ষা কর, শুনিতে পাইবে বিবেক গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—"তোমার জাতীয় জীবন মৃতপ্রায় তাই আর জাতীয় অবনতিতে তোমার হৃদয় ঘৃণা লজ্জা অভিমানে দগ্ধ হয় না, তুমি জাতীয় রীতি নীতি জাতীয় প্রথা, জাতীয় আচার ব্যবহার সব পাশ্চাত্য শিক্ষার নিবিড় জলরাশি মধ্যে কাপুরুষের ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়াছ, তাই আর জাতীয় উৎসবে তোমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠেনা—শুধু তাই তুমি চক্ষু থাকিতে অন্ধ কর্ণ থাকিতে বধির—।" বাঙ্গালি! বিবেকের এই তিরস্কার তোমার নির্লজ্জ হৃদয় বিদীর্ণ করিবে কি? একবার নীরবে নির্জ্জনে এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িবে কি? বোধ হয় পড়িবে, কারণ তোমার

হৃদয়, গত হইলেও উন্নত—পবিত্র আর্য্যজাতির পবিত্র রক্ত এখনও তোমার ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে।

তোমার বর্ত্তমান বড়ই দুঃখময়, বড়ই অন্ধকার, তাই তুমি ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিন আনন্দ উৎসবে মত্ত হও—কতস্থানে কত প্রীতি উপহার প্রেরণ কর, কিন্তু একবার ভাবনা, একবার ভাবিয়া দুঃখ করনা যে তোমার জাতীয় নববর্ষ প্রতিবৎসর ভারতে অতিথি হয় কিন্তু তাহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা একবারও হয় না। হায়, হায়, যে নববর্ষ আমাদের জন্য শান্তি, আশা, প্রীতি উৎসাহ উদ্যম লইয়া আসে—যে নববর্ষের অঙ্কে অঙ্কে ভারতের কীর্ত্তি, ভারতের যশঃ ভারতের গৌরব-কাহিনী দৃঢ়রূপে অঙ্কিত থাকে, যে নববর্ষ নিজ সুধাকণ্ঠ নিঃসৃত জাতীয় সঙ্গীত পূত কলেবরা পবিত্র সলিলা জাহ্নবীর কুলকুল নিনাদ মিশ্রিত প্রাচীন মুনি ঋষিগণের স্বর্গীয় বেদ কথার সহিত মিলিত করিয়া ভারত জীবনে নব আশার সঞ্চার করিয়া দেয় সেই মধুর নববর্ষ, সেই উৎসাহময়ী দিব্যশক্তিশালিনী নববর্ষ কিনা ভারত সন্তান কর্ত্তৃক উপেক্ষিত !

আমরা কি আমাদের বাঙ্গালা নববর্ষের সম্বর্দ্ধনার জন্য নববর্ষের প্রথম দিনে উৎসব করিতে পারি না? আমরা কি ঘরে ঘরে জাতীয় প্রথার প্রীতি উপহার পাঠাইতে পারি না? আমরা কি সেই দিন সকল বাঙ্গালী একত্রে মিলিয়া আত্মপর ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সকলে এক কণ্ঠে পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিয়া জগৎকে একতার জলন্ত দৃষ্ট দেখাইতে পারি না? জগতের চারিদিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে সকল জাতিই জাতীয় নববর্ষের উৎসবে রত; আরও দেখিবে তাহারা জাতীয় নববর্ষের পূজা মাতৃভূমির পূজার ন্যায় জ্ঞান করে; সেই জন্যই এই জাতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব

তাহাদের এত প্রীতিপ্রদ। সকল জাতিই যখন মাতৃসেবায় রত তখন বাঙ্গালী তুমি শুধু মায়ের কুসন্তান হইয়া জগতে ঘৃণিত জীবন ধারণ কর কেন? সকল জাতিরই নববর্ষের প্রথম দিনে সেই উৎসবে একতার বিচিত্র চিত্র ফুটিয়া উঠে, শুধু তোমার নববর্ষের প্রারম্ভ শূন্য নিরানন্দময় কেন? আমাদেব জাতীয় নববর্ষের প্রথম দিন গেজেটের ছুটির তালিকা ভুক্ত নয় বলিয়াই কি এই দিবসের উৎসব আমাদের প্রীতিপ্রদ নয়? তাহা কি আমরা সেই আনন্দময় দিনের পবিত্র শোভা উপেক্ষা করি--শুধু তাই কি সেই নব আশা রঞ্জিত নবউৎসাহেব দিনে নিবিড় অন্ধকাররাশি দুর্ব্বল বাঙ্গালী হৃদয় ঢাকিয়া রাখে।

সামান্য ছুটির প্রয়োজন কি? যদি সেই দিন মহৎ উদ্যোগ প্রণোদিত হইয়া অকৃত্রিম ভক্তি রসে সিক্ত হইয়া অকপট হৃদয়ে আমরা "স্বর্গাদপি গরিয়সী" মাতৃভূমির পূজায় রত হই— তাহা হইলেই আমবা যে অনন্ত পুবস্কারের অধিকারী হইব তাহা অতুলনীয়, অবর্ণনীয়—তবে আইস আমরা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বার্থ ভুলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই এবং সেই স্বর্গীয় অমূল্য ধনরাশির অধিকারী হইবার জন্য যত্নশীল হই। আজ হইতে প্রতি বৎসর জাতীয় নববর্ষের সম্বর্দ্ধনা করিব, আইস ঘরে ঘরে সকলে মিলিয়া এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা করি। ইংরেজের নববর্ষে যোগ দিতে হয় দিব কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃত হইব না— অনুকরণাধিক্যে জাতীয় জীবনের প্রতিভাতৈলহীন ম্রিয়মাণ প্রদীপ শিখার ন্যায় মলিন করিবে না। বিজাতীয় নববর্ষের উৎসবে যোগ-দিতে গিয়া জাতীয় নববর্ষকে হীনমনা কাপুরুষের ন্যায় বিস্মৃতির অতলস্পর্শ গর্ভে চিরদিনের তরে নিক্ষেপ করিব না। ইংরেজের

উৎসাহ, ইংরেজের উদ্যম অনুকরণীয়! অহো, যদি প্রতিবৎসর বঙ্গে গৃহে গৃহে নববর্ষের প্রথম দিনে জাতীয় উৎসব হয় এবং সেই উৎসবে একতার স্বর্গীয় সৌরভময়ী কুসুম ফুটিয়া উঠে তাহা হইলে সে পবিত্র দৃশ্য কত সুখপ্রদ হয়—তাহার সহিত কত মধুর কল্পনা কত জীবন-দায়িনী আশা জাগিয়া উঠে! সেই মধুর জীবনে সকলে যদি হিংসা ঘৃণা বিবাদ বিসম্বাদ হৃদয় হইতে দূর করিয়া পূর্ণচন্দ্র পরিশোভিত মেঘমুক্ত নীলাম্বরের ন্যায় আমাদের অন্তর্জগৎ নির্ম্মল এবং প্রশান্ত করিতে পারি তাহা হইলে সে দিন কত সুখের হয়। হৃদয়ের অন্ধকার, মনের মালিন্য দূর করিতে শিক্ষা করিবার পক্ষে নববর্ষের প্রথম দিন বড়ই সুপ্রশস্ত, সে দিনকার স্বর্গীয় মহিমা দুর্ব্বল হৃদয়ে নব শক্তিদান করে—সুপ্ত হৃদয়ও সে দিন আনন্দভরে উৎসাহ ভরে জাগিয়া উঠে। ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া লাগাইবার পক্ষে কুটিলতাকে সরলতায় পরিণত করিয়া শত্রুকে মিত্ররূপে আলিঙ্গন করিবার পক্ষে নববর্ষের প্রথমদিন বড়ই প্রশস্ত। এ জগতে থাকিতে হইলে—সুখে থাকিতে হইলে—মানুষের মত থাকিতে হইলে ক্ষমাগুণ উপার্জ্জন করা বড়ই প্রয়োজন। নিভৃতে নির্জ্জনে, প্রকাশ্য লোকালয়ে সর্ব্বতোভাবে আমরা অপরাধীকে ক্ষমা করিতে শিখিব। নববর্ষের প্রথম দিন প্রকাশ্যে সকলে মিলিত হইয়া হস্তে হস্ত ধারণ করিয়া পবিত্র হৃদয়ে আমরা এই স্বর্গীয় গুণের অর্চ্চনা করিব। আইস আমরা সেই সুখের দিন সেই পবিত্র দিন ঈশ্বরের প্রীতিপ্রদ এই মহৎকার্য্যে বিনিযুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হই। মন উন্নত হইবে—হৃদয় প্রশান্ত হইবে—পূত বারিধারা সংসারের পঙ্কিল কর্দ্দমে মলিনীকৃত জীবন বিধৌত করিয়া শুভ্র পরিচ্ছদে পরিশোভিত করিবে। তবে আইস ভ্রাতৃগণ, আমারা হৃদয়ের সবটুকু ভক্তি লইয়া জোড় করে ঊর্দ্ধনেত্রে মঙ্গলময় জগদীশ্বরের নিকট,

আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত শক্তি দান করিতে প্রার্থনা করি। যেন প্রতি বৎসর আমরা জাতীয় নববর্ষের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে সক্ষম হই এবং নববর্ষের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ে যে সকল আশা, এবং সুবাসনা মুকুলিত হইয়াছে তাহা যেন তাঁহার করুণায় বিকশিত হইয়া জীবন-সমরে আমাদিগকে পবিত্র আর্য্যজাতির উপযুক্ত সন্তান বলিয়া পরিচিত করে।

শ্রীমন্মথনাথ রায়চৌধুরী।

অকলঙ্ক সৌহার্দ্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার নিখিল রাজপথ গ্যাসালোকে আলোকিত। গৃহে গৃহে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে। কলেজ্ ষ্ট্রীটের উপর একখানি ছোট অট্টালিকার ভিতর একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিভৃত প্রকোষ্ঠে দু'টি কিশোর ছাত্র কথোপকথনে নিযুক্ত।

তারাপ্রসন্ন। আজ্ বাঁচ্লুম ভাই, মাথা থেকে যেন বিশ মোণ বোঝা নেমে গেল।

যোগেশ। একবার ক'রে বল্‌তে! এ কটা দিন যেন মরে ছিলুম। ধন্য Calcutta University! এক একটা examination এর ভাবনায় দশ বছর করে আয়ু কমে যায়।

তারাপ্রসন্ন। যা' হোক্, আমাদের এখনত গেরোটা ভালয় ভালয় কাটলো—এখন ক'মাস বিশ্রাম নিয়ে বাঁচি।

যোগেশ। কাল সকালেই বাড়ী যাবে ত ?

তারাপ্রসন্ন। কাল সকালেই ? সব গুচিয়ে নিতে পারবে ত ?

যোগেশ। তা' পার্‌বো না কেন ? কি এমন জিনিষ পত্র আছে ? বই ক'খানা আর বিছানা মাদুর বইত নয়—আমি সব বেঁধে ফেলি; অনেক দিন বাড়ী যাই নি—বাড়ীতে কত না ভাব্‌চে।

তারাপ্রসন্ন। সব গুচিয়ে নিতে পার আমার কোন আপত্তি নাই। আচ্ছা, এর পরে কি কর্‌বে ভেবেচ ? F. A. পড়্‌বে ত ?

যোগেশ। আগে পাশই হই ; তার পর বিবেচনা করা যা'বে।

তারাপ্রসন্ন। আমার বিশ্বাস আমরা কেহই ফেল হ'ব না ; তোমার কি নিজের কোন branch এ সন্দেহ আছে ?

যোগেশ। আমি এখন কিছুই বল্‌তে পারি না, আর ভাই, এখন ও সব কথা ছেড়ে দাও। পাশ হই আর ফেল হই সে পরের কথা, এখন দিন কতক নির্ভাবনায় সময় কাটা'তে দাও।

যোগেশের কথা শেষ হইলেই পাচক আসিয়া সান্ধ্য ভোজনের জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করিল। তারাপ্রসন্ন উত্তর দিবার অবসর পাইল না। তাহারা দু'জনে আহার করিতে চলিল।

তারাপ্রসন্ন ও যোগেশচন্দ্র কলিকাতায় হিন্দু স্কুলে বাল্যকাল হইতে একত্রে পাঠাভ্যাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বিমল বন্ধুস্নেহ। একই বাসায় আশৈশব সর্ব্বদা বসবাসের দরুণ, এবং একই পাঠাগারে বিদ্যার্জ্জনহেতু তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই সুকোমল স্নেহবন্ধন সৃজিত হইয়াছিল ; এতদ্ব্যতিরেকে তাহাদের উভয়ের জন্মভূমি একই গ্রামে এবং তাহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ।

এই সকল কারণে তাহারা দু'জনে সহোদর-মিথুনের ন্যায় সুখের কিশোর কাল যাপন করিয়াছে।

অদ্য তাহাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা সমাপ্ত হইল—দু'জনে বাসায় আসিয়া উপরোক্ত কথাবার্ত্তায় রত ছিল।

তাহারা ভাবিয়াছিল বহুদিনেব পর আজ সুখে শান্তিময় নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইবে, কিন্তু examination এর দারুণ চিন্তাসঙ্কুল দিন কয়টি শেষ হইয়াছে, এই হর্ষেই সে রাত্রে তাহাদের শীঘ্র তন্দ্রাবেশ আসিল না। পিঞ্জরবিমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় দুশ্চিন্তামুক্ত তাহাদের মন সে রাত্রির অধিকাংশ সময়ই কখন বা পল্লীগৃহের স্নেহমধুর পরিজনের প্রীতিক্রোড়ে, কখন বা বন্ধুজনের অনাবিল উদার হৃদয়ে, কখন বা ভবিষ্যৎ সুখের মনোরম আশার স্নিগ্ধ শান্ত ছায়াতলে, উদ্ভ্রান্ত গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। সুখোৎফুল্ল নয়ন কখন্ নিমীলিত হইয়াছিল, তাহা তাহারা জানিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুটি বন্ধু সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া নবোদ্যমে কলেজে পড়িতে মনস্থ করিল। কিন্তু এবার বুঝি তাহাদের বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। তাহাদের চিরবর্দ্ধিত প্রণয়স্রোতে বিচ্ছেদের চর পড়িল।

যোগেশের পিতা পুত্রকে Engineering শিখাইতে স্থির করিলেন, এবং ধনীপুত্র তারাপ্রসন্নকে First Arts পাশ করিবার জন্যই প্রস্তুত হইতে হইল।

তারাপ্রসন্ন বন্ধুবিরহের আশঙ্কায় পিতার নিকট engineering শিক্ষা করিবার বাসনা জানাইয়াছিল, পিতাও অনেকটা সম্মতির ভাব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গগৃহের সনাতন নিয়মানুসারে তাহার মাতাঠাকুরাণী কোন মতেই পুত্রকে দারুণ শারীর শ্রমসাধ্য শিক্ষার্জ্জনে পাঠাইতে অনুমতি দিলেন না। পুত্রের সকল যুক্তিতর্ক মিনতি অনুরোধ বিফল হইয়া গেল। মাতার ইহাতে বড় বেশী অপরাধও ছিল না। তারাপ্রসন্ন তাঁহার একমাত্র পুত্র, স্বামীও অতুল বিষয়ের অধিপতি; পুত্র লেখা পড়া না করিলে যে ভবিষ্যতে তাহাকে কষ্টে পড়িতে হইবে এমন আশঙ্কা নাই, এবং আত্মজ যাহা শিখিয়াছে মাতৃদেবী তাহাই যথেষ্ট ভাবিলেন। মাতার অভিলাষ—চিরপ্রবাসী পুত্রকে বিদ্যার্জ্জন হেতু পুনর্ব্বার বিদেশে না পাঠাইয়া, বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে। কিন্তু বাল্যোদ্বাহবিরোধী তারাপ্রসন্নের পিতা পত্নীর এ আব্দার গ্রাহ্য করিলেন না, পুত্রকে Presidency College এ পড়াইতেই স্থির করিলেন।

সহৃদয় তারাপ্রসন্ন দেখিল বাল্যবন্ধু যোগেশের সহিত নিতান্তই বিচ্ছিন্ন হইতে হইতেছে। পিতা মাতাও তাহার অনুরোধ রাখিলেন না। তখন তাহার মনে হইল একবার যোগেশের পিতাকে অনুরোধ করিয়া দেখি যদি তিনি পুত্রকে Engineering Collegeএ না দিয়া First Arts পড়াইতে স্বীকৃত হন। অনেক আশা করিয়া তারাপ্রসন্ন যোগেশের পিতার সহিত দেখা করিয়া আপনার অভিলাষ সবিনয়ে জ্ঞাপন করিল।

যোগেশের পিতা তেমন অবস্থাপন্ন নহেন যে, পুত্রকে Presidency College এ দিতে পারেন; অধিকন্তু, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যেরূপ সময় কাল, তাহাতে "হাতে কলমে" কোন একটি অর্থকরী বিদ্যা না

শিখাইলে ভবিষ্যতে দরিদ্র পুত্রকে সামান্য কেরাণী গিরির উমে-দারীতেই হয়ত দুর্লভ মানব জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। অনেকের পুত্রবত্নই ত কলিকাতা হইতে B. A., M. A., রূপ লাঙ্গুল লইয়া গৃহে ফিরিতেছে, আর, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া সাথে আনিতেছে অম্বল রোগ ও বার্দ্ধক্যশোভি দুর্ব্বলতা! এই সকল বিবেচনা করিয়া এবং নিজের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া, তিনি তারাপ্রসন্নের অনুরোধ রাখিতে পারিলেন না।

যোগেশও বন্ধুব সহিত আসন্ন বিচ্ছেদ চিন্তা করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। সে জানিত পিতার প্রতিজ্ঞা অটল; এবং স্বয়ং সাধরণ শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে পিতার সহিত সমমতাবলম্বী ছিল। সে ভাবিল, বন্ধুকে সহপাঠী করিতে পারিলে বড়ই ভাল হইত—তাহা যখন হইল না, উপায়ান্তব নাই। তাহার মানসিক বল যথেষ্ট ছিল।

ক্রমে ছুটী ফুরাইয়া আসিল। সুহৃদদ্বয়কে বিভিন্ন পাঠাগারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। কলিকাতায় আসিয়া যোগেশ শিবপুরের কলেজ, এরং তারাপ্রসন্ন সেই পরিচিত বাসায় থাকিয়া Presidency College এ পড়িতে আরম্ভ করিল। যোগেশ যাইবার সময় নিয়মিতরূপে বন্ধুকে পত্র লিখিতে প্রতিশ্রুত হইল, এবং তারা-প্রসন্নও মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অঙ্গীকার করিল। দু'জনে বিচ্ছিন্ন হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহার পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তারাপ্রসন্ন B. A. পড়িতেছে। যোগেশের সহিত তাহার বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রায়ই তারাপ্রসন্ন শিবপুরের বাগানে বেড়াইতে যায়—উদ্দেশ্য

যোগেশের সহিত দেখা করা। তাহাদের এমন অনাবিল বন্ধুস্নেহ সকলেরই স্পৃহণীয়।

কিন্তু বিধাতার নিয়মে মর্ত্ত্যভূমিতে সম্পূর্ণ সুখ অসম্ভব। আজন্ম যাহারা একত্র বর্দ্ধিত, শিক্ষিত, পালিত, যাহাদের সরল হৃদয়ে অন্যোান্যের প্রতি কেবলই প্রীতি, স্নেহ, শুভ বাসনা, যাহাদের অকলঙ্ক চরিত্রে সকলেই সন্তুষ্ট, যে মিত্র-মিথুন পরস্পরের স্নেহের উপর কথনও ভ্রমক্রমেও অবিশ্বাস করে নাই, যাহাদের দুর্লভ প্রণয়ে ছলনা বা আন্তরিকতার অভাব কখনও দেখি নাই, তাহাদেরই প্রীতিশুভ্র পবিত্র অন্তঃকরণে অবিশ্বাসের ছায়া—সন্দেহের কালিমা দেখিতেছি! এ তিন বৎসর মধ্যে তাহাদের পরস্পেরের অসংখ্য পত্র-বিনিময় হইয়া গিয়াছে, কতবার সাক্ষাৎকার হইয়াছে, পূজার অবকাশে দু'জনে একত্রে স্নেহপুর্ণ গৃহে ফিরিয়াছে; তথাপি সেই অপার্থিব স্নেহ-বন্ধন এখন যেন শিথিল!

চির দিন একত্রে থাকিয়া তাহারা যে আনন্দ না উপভোগ করিয়াছিল, বিচ্ছেদের পর পরস্পর প্রথম পত্র পাইয়া, বুঝি তাহারও অধিক আনন্দ অনুভব করিয়াছিল; এবং প্রথম সন্দর্শনে তাহাদের উভয়ের যেরূপ সুখোপলব্ধি হইয়াছিল, নর-ভাগ্যে সেরূপ সুখ কদাচ ঘটে; সে দিন তাহাদের নয়নে কতনা আনন্দের বিকাশ! তাহাদের কথোপকথনের কি অন্ত ছিল না? সেবার তারাপ্রসন্নদের "কাদম্বরীর" কিয়দংশ পাঠ্য ছিল। তারাপ্রসন্ন বন্ধুকে বাণভট্টের অনুপম ভাষার, অসাধারণ শব্দচয়ন নিপুণতার, এবং অপূর্ব্ব আখ্যায়িকার বিবরণ শুনাইতে কতই না ব্যগ্র! কেমিষ্ট্রির পরীক্ষা গুলির বর্ণনা যোগেশের কি কম ভাল লাগিয়াছিল? যোগেশচন্দ্রও আপনাদের কলেজের নবপরিচিত বন্ধুবর্গের, পাঠ্য পুস্তকের, মানসিক পরিশ্রমের লাঘবতার বিষয় বলিয়া এমন সুচারু মনোরঞ্জন কথায় বন্ধুকে

আপ্যায়িত করিয়াছিল যে, তারাপ্রসন্নের ইচ্ছা হইতেছিল পিতামাতার অপ্রিয়ভাজন হইয়াও যোগেশের সহিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই পড়ি।

হায়! তাহাদের মনোমালিন্যের কারণ একদিনকার সামান্য ঘটনা—যোগোশের বুঝিবার ভুল!

যোগেশের পিতার তেমন অর্থ সঙ্গতি ছিল না—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবং তাহার Engineering Collegeএ ভর্ত্তি হইবার বৎসরেক পরেই ঘটনা বশতঃ পিতাব আয় অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। এই অপ্রিয় সংবাদ পাইবার কয়েক দিবস পরে যোগেশের সহিত তারা-প্রসন্নর সাক্ষাৎ হয়। যোগেশ তাহাকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে "পৃথিবীতে দেখ্‌চি একজন টাকার ওপর বসে খাচ্চে, নানা রকমে অন্যায় বিলাসে টাকার অপব্যয় কচ্চে, আর কত জন দুটি অন্নের জন্য কাঁদ্‌চে—এ অনিয়ম কেন?"

তারাপ্রসন্ন হঠাৎ বন্ধুব মুখে এই তত্ত্বমূলক প্রশ্ন শুনিয়া পরিহাসেব লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। হাসিয়া বলিল, "তুমি যে দেখ্‌চি মহা দার্শনিক পণ্ডিত হ'তে চল্লে, এ সব বড় বড় কথার উত্তর আমাদেব তত্ত্বনিধি মশায় বেশ জানেন, তাঁকে এখানে আস্‌তে লিখ্‌বো না কি?"

যোগেশের মন তখন ভাল ছিলনা, বন্ধুর সহাস্য উত্তরে প্রীত হইত পারিল না। ভাবিল, তাবাপ্রসন্ন ধনীপুত্র বলিয়াই তাহার মত দরিদ্র পুত্রকে পরিহাস করিল। সে সাভিমানে বলিল, "তোমরা বড় লোক, তোমাদের তত্ত্বনিধি মশায় আছেন, আমার কথার উত্তর দেবার জন্য আরও কত লোক আছে; আমি গরীব বলে তোমার কাছে কি আজ কাল উত্তর পা'বার যোগ্য নই?"

রঙ্গপ্রিয় তারাপ্রসন্ন তখনও যোগেশের পিতার আর্থিক অবনতির

বিষয় কিছুই শুনে নাই ; সুতরাং সে ইহার উত্তর স্বরূপ যথা পূর্ব্ব সপরিহাসে বলিল, "এ সাহেবী মেজাজ্ কোথা থেকে পেলে যোগেশ ? আমি বুঝি তোমায় গরীব বলে ঠাট্টা করলুম ? নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মিশে তোমার নতুন বুদ্ধি হয়েছে দেখ্‌চি।"

যোগেশ এ সকল কথাই বৈরীভাবে গ্রহণ করিল। রোষে দুঃখে আর দ্বিতীয় বাক্য না বলিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তারাপ্রসন্ন ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ধরিয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিল। যোগেশের নয়ন অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া সে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল— তথাপি যোগেশ নীরব। এত সহজে বন্ধুর ভাবান্তরের কারণ সে কিছুতে বুঝিতে পারিল না ; সন্ধ্যা হইলে বিষণ্ণ মনে তাহার নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতার বাসায় ফিরিল।

তারাপ্রসন্ন যখন কিছুদিন পরে যোগেশদের অবস্থার অবনতির কথা জানিতে পারিল, তখন তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না ; যোগেশের সে দিনকার ব্যবহারের রহস্য বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। অনন্যমনে চিন্তার পর সে স্থির করিল এসময়ে যোগেশকে অপরের অজ্ঞাতে যদি অর্থ সাহায্য করি, তাহা হইলে তাহার অনেক সুবিধা হইবে ; এবং তাহার সেদিনের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ যে এ সকল তথ্যের অজ্ঞতা বশতঃ হইয়াছিল তাহাও যোগেশকে বলিবে।

যোগেশ তারাপ্রসন্নের নিকট এই অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব শুনিয়া আরও ক্ষুব্ধ হইল। তাহার মনে হইল, সে তাহাকে পদে পদে অপমান করিবার জন্যই অধুনা কৃতসঙ্কল্প। তাহার নিকট কোনরূপ সাহায্য লইতে একেবারে অস্বীকৃত হইল। তারাপ্রসন্ন বন্ধুর চিত্ত কিছুতেই প্রসন্ন করিতে পারিল না।

এ ঘটনার পর উভয়ের বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু

পূর্ব্বেকার মত দর্শনের আগ্রহ আর নাই—সে অসঙ্কোচ আলাপ কোথায়? তাঁহারা এখন যেন দুজন নব পরিচিত বন্ধু—সকল কথাতেই একটু খাতির—সকল কার্য্যেই অস্বাভাবিক আড়ম্বর! তারাপ্রসন্ন যদি এতদিন যোগেশের অসাধু ব্যবহারের প্রতিদান করিত, তাহা হইলে তাহাদের বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হইত।

সাধারণে এবং আত্মীয় বন্ধুগণ তাহাদের এই অন্তরের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে কাহারও হৃদয়ে যে কোনরূপ অসন্তোষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বাহিরের তৃতীয় ব্যক্তির ধরা একেবারে অসম্ভব না হইলেও সাতিশয় দুষ্কর। একদিনের অকিঞ্চিৎকর ঘটনায় বন্ধুহৃদয়ে যে সামান্যতম আঘাত লাগিতে পারে, কিম্বা নগন্য কারণে অন্যোন্যের স্নেহে ভাবান্তর ঘটিতে পারে—তাহা সাধারণে শুনিলেও সহজে বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের প্রণয় এমন বিমল শুভ্র ছিল যে, ক্ষণিকের সেই সামান্য মাত্র মনো-মালিন্য, যাহা অপরে গ্রাহ্যের বহির্ভূত ভাবে, অন্যতর হৃদয়ে সাদর আসন পাইল। শরতের স্বচ্ছ নীল নভস্তলে অগোচরে এক কোণে একটি ক্ষুদ্রকায় অভ্রাংশ সহসা দেখা দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রাবণের শেষ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে ধরণীতল জলময়। দিগন্ত-প্রসারী অভ্রমালা ভুবনকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। এমন মেঘমেদুর দিন, অবিরাম বারিধারা, এবং ক্ষণপ্রভার চকিত কটাক্ষ কবিজনের ভাবোদ্রেক করিতে পারে, কলাপী মিথুনের হর্ষোৎপাদন করিতে পারে, এবং বিরহীচিত্তে চকিতে প্রিয়মুখ স্মরণ করাইতে পারে; কিন্তু

যে দুর্ভাগ্য পথিককে এরূপ দুর্য্যোগে পল্লীপথে পদব্রজে চলিতে হইতেছে, তাহার পক্ষে অদৃষ্টের বা দৈবনিন্দার লোভ সম্বরণ করা নিতান্ত সহজ নয়। পথে কোথাও কেহ নাই, কচিৎ ধান্যক্ষেত্রে দু'একটি কৃষক, ঘনপত্রতরুশাখায় বায়সবধূর সকরুণ শব্দ, আর বিশ্ব জুড়িয়া জলময়ী নীরব নীর্জনতা।

এমনই দুর্দ্দিনে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সঙ্গীবিহীন Engineer যোগেশচন্দ্র কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিতেছে। Station হইতে তাহাদের গৃহ দুই ক্রোশের অধিক। সে একবার মনে করিল নিকটস্থ কোন বন্ধুর বাড়ীতে সে রাত্রি যাপন করে। তাহার সুবিধাও যথেষ্ট ছিল! অর্দ্ধক্রোশ মাত্র অতিক্রম করিলেই বন্ধু তারা-প্রসন্নের বাটী—ইচ্ছা করিলে তথায় স্বচ্ছন্দে থাকিয়া যাইতে পারে। আজ যোগেশ তাহা করিল না। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে হইলে তাহাদের গৃহে থাকিতে সে আপনাকে সম্মানিত ও ভাগ্যবান মনে করিত। সে দ্রুত পদক্ষেপে দৈববাধা অগ্রাহ্য করিয়া স্বগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

ক্রোশাধিক পথ অতিক্রান্ত হয় নাই, এমন সময়ে বৃষ্টিবেগ এরূপ প্রবলতর হইল, যে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে শিলা-পতনও আরম্ভ হইল। কাহারও গৃহে আশ্রয় না লইলে আর চলে না। যোগেশ আর্দ্র পরিচ্ছদে এক গৃহস্থের দ্বারে উঠিল। গৃহস্বামী তখন পুত্র কন্যা লইয়া দ্বারপার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপে রত।

সহসা একজন বর্ষাস্নাত ভদ্র পথিককে দেখিয়া গৃহস্বামী তাহাকে সাদরে গৃহাভ্যন্তরে আহ্বান করিয়া শুষ্ক পরিচ্ছদ আনাইয়া দিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি আগন্তুকের পরিচয়াদি জানিতে চাহিলেন।

যোগেশ ভাবিল, ইহাদের নিকট যদি এখন নিজ পরিচয় যথাযথ প্রদান করি এবং ভবিষ্যতে যদি তারাপ্রসন্ন এ সংবাদ পায়, তাহা হইলে তাহার গৃহে আশ্রয় লই নাই বলিয়া, সে নিশ্চয়ই মনক্ষুণ্ণ হইবে।

তাহার সহিত গৃহস্বামীর এইরূপ কথোপকথন হইল ;—

গৃহস্বামী। মহাশয়ের নিবাস এখান হ'তে কত দূর?

যোগেশ। এই গ্রামেই ; এখান থেকে ক্রোশ খানেক।

গৃহস্বামী। আপনারা?

যোগেশ। ব্রাহ্মণ।

গৃহস্বামী। মহাশয়ের নাম জান্‌তে পারি?

যোগেশ এইবার মিথ্যা কথা বলিতে আরম্ভ করিল, এবং অম্লান বদনে বলিল, "শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায।"

গৃহস্বামী। আপনাদের নিবাসের নিকট কি মহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে একজন গৃহস্থ আছেন?

যোগেশ চমকিয়া উঠিল। গৃহস্বামী তাহারই পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন! একটি মিথ্যা কথা বজায় রাখিতে তাহাকে আরও অনেক মিথ্যা কথা বলিতে হইল। অধুনা তাহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। কিন্তু, কোথায় পাত্রী-গৃহ প্রবাসী যোগেশের তাহা জানিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এক্ষণে গৃহস্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া এবং তাঁহার বিবাহযোগ্যা কন্যাকে দেখিয়া তাহার মনে হইল এই খানেই হয়ত তাহার সম্বন্ধ হইতেছে।

যোগেশ বলিল, "ওঁ'কে বেশ জানি, তিনি আমাদের প্রতিবেশী, আর তাঁ'র পুত্রের সঙ্গে আমি একত্রে পড়েছি।"

গৃহস্বামীর চতুরা দুহিতা এই সময়ে ধীরে ধীরে পলাইল। যোগেশের সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হইল।

গৃহস্বামী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁ'র পুত্রটি কেমন ?"

যোগেশ। দেখিতে অনেকটা আমারই মত, বয়সেও আমার চেয়ে বেশী হ'বে না। খুব অমায়িক যুবক, এখন Engineer হইয়া বেশ উপার্জ্জন কচ্চে।

গৃহস্বামী সন্তুষ্টচিত্তে অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন, যোগেশের নিকট বিবাহ-প্রস্তাব কিছু ভাঙ্গিলেন না। তখন রাত্রি নয়টা হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির বেগ সমান।

গৃহস্বামী বলিলেন, "আজ এ দুর্যোগে আপনি কি করে বাড়ী যাবেন? অনুগ্রহ করে যদি আজ আমাদের এখানে আহার করে, এই খানেই রাতটা থাকেন, বড় বাধিত হই। কাল সকালে বাড়ী যাবেন।"

যোগেশের তেমন আপত্তিও ছিল না; প্রথমে একটু অস্বীকারের ভাণ দেখান সনাতন নিয়ম। কিঞ্চিৎ পরে আহার করিয়া শয়ন করিল।

যোগেশ একাকী অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। এতগুলি মিথ্যা কথা না বলিলেই ভাল হইত, তারাপ্রসন্নের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেই ভাল হইত ইত্যাদি। মিথ্যা পরিচয় দিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা রহিল।

প্রত্যুষে উঠিয়া যোগেশ গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইল—তখন তাহার হৃদয় নানা চিন্তায় বিড়োলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চিরপরিবর্ত্তনশীল জগতে ইতিমধ্যে তারাপ্রসন্নের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। B. A. পাশ করিবার পরই তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার পিতা বহুসাধ করিয়া নববধূকে গৃহে আনিয়া বেশী দিন সুখ-

ভোগ করিতে পারেন নাই। যোগেশ যখন Engineer হইয়া গৃহে ফিরিল, পুত্রের বিবাহের একবৎসর পরেই, তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন। যুবক তারাপ্রসন্নের উপর সংসারের এবং বিস্তৃত জমীদারীর গুরুভার প'ড়িল।

তারাপ্রসন্ন নানা কার্য্যে বিব্রত বশতঃ যোগেশের সহিত স্বাভিলাষ মত দেখা ও আলাপ করিবার অবকাশ পাইত না; কিন্তু যখনই অবসর পাইয়াছে, তাহার প্রতি পূর্ব্ব স্নেহ দেখাইতে ভুলে নাই। বিপুল বিষয়ের অধিপতি হইয়া তাহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। স্থিরপ্রতিজ্ঞ যোগেশ কিন্তু এ বিষয়ে নির্দ্দোষ। তারাপ্রসন্ন তাহার নিকট হইতে ঠিক পূর্ব্বেকার মত সরল অকৃত্রিম ব্যবহার যেন আর পাইত না—যেন তাহার স্নেহে কিসের অভাব অনুভব করিত।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে যোগেশকে তাহার ভাবী শ্বশুর দেখিতে আসিলেন। যখন যোগেশ আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিল, পাত্রীর পিতা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—এ যে সে দিনকারই পরিচিত অতিথি! যোগেশও লজ্জায় সংভ্রমে নত মুখে নীরব রহিল। এ রহস্য আর কেহ জানিত না—দু'জনেই অন্যোন্যের অন্তর বুঝিল।

যথাসময়ে যোগেশ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কন্যাকর্ত্তা সহাস্যে সে দিনের বিবরণ এবং যোগেশের সাহসিকতার কথা ভাবী বৈবাহিককে শুনাইলেন। মহেশ বাবু শুনিয়া সানন্দে বলিলেন, "তবে ত ভালই হয়েছে, আপনার জামাই স্বচক্ষে আমার বধূমাতাকে দেখে নিয়েচে; পরে, বউ মন্দ হ'ল বলে বুড়ো বাপ্‌কে নিন্দা কত্তে পার্‌বে না।"

নিমন্ত্রিত তারাপ্রসন্ন সেই স্থানেই ছিল ; যোগেশ যে বিবাহের পূর্ব্বেই আপনার ভাবী পত্নীকে দেখিয়া লইয়াছে তাহাতে আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু তাহারই বাড়ীর নিকট দিয়া যাইয়াও প্রিয়তম বন্ধু যে অপরের আশ্রয় লইয়াছিল ইহাতে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তারাপ্রসন্ন বেশ বুঝিল যে যোগেশের এরূপ আচরণের কারণ নিশ্চয়ই তাহার প্রতি মৌন উপেক্ষা।

যোগেশের বিবাহ একপ্রকার স্থির হইয়া গেল। বরবধূ উভয়েই সকলের মনোমত। কিন্তু কন্যাকর্ত্তার একমাত্র অসন্তোষ—ভাবী বৈবাহিকের তেমন ভাল অট্টালিকা নাই—যাহা আছে নিতান্ত পুরাতন, ভগ্নপ্রায়। কন্যার পিতা মহেশ বাবুকে একখানি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে পরামর্শ দিলেন ; কিন্তু পরামর্শ যত শস্তা, একটা ব্যয়সাধ্য কার্য্য করা তেমন নয়। সামান্য সময়ের মধ্যে যোগেশ এমন উপার্জ্জন করিতে পারে নাই যাহাতে একখানা বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করা যাইতে পারে।

তারাপ্রসন্ন অপর একদিন যোগেশদের বাড়ীতে আসিয়া, তাহার উদ্বাহের বিষয় সমস্ত শুনিল। ভাল বাড়ী নাই বলিয়া কন্যাকর্ত্তার এ বিবাহে সামান্যমাত্র অসন্তোষ আছে তাহাও তাহার অজ্ঞাত রহিল না। অধিকন্তু ইহাও জানিল যে, যোগেশের পিতার অভিলাষ তাঁহার গৃহসংলগ্ন বিস্তৃতপরিসর ভূমির অর্দ্ধাংশ—যদি তেমন সুবিধা দর পান—বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে ইমারৎ তুলেন। গৃহে ফিরিবার সময় তারাপ্রসন্নের মনে এক নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হইল।

শীঘ্রই মহেশ বাবু দেখিলেন, তাঁহার ভূমিখণ্ডের আশাতীত মূল্য পাইবার সম্ভাবনা। কোন অপরিচিতনামা সবার অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত। মহেশ বাবু তাহাকেই ভূমি বিক্রয় করিলেন।

এদিকে যোগেশ ক্রেতার নাম দেখিয়াই চিনিতে পারিল সে তারাপ্রসন্নের মাতুল—ভগিনীর গৃহে পালিত। প্রকৃত ক্রেতা যে কে তাহা আর তাহার বুঝিতে কষ্ট হইল না। তাহার বন্ধু তারাপ্রসন্ন তাহাকে অপমানিত করিবার জন্য এবং তাহার মনে কষ্ট দিবার জন্যই যে তাহাদের ভূমিখণ্ড ক্রয় করিল—ইহাই যোগেশের স্থির বিশ্বাস হইল। ক্ষোভে ঘৃণায় তাহার চক্ষে জল আসিল।

যোগেশ তারাপ্রসন্নকে এসম্বন্ধে কোন কথা বলিল না, তারাপ্রসন্নও কোন কথা উত্থাপন করে নাই।

সম্মুখে অকাল পড়িতেছে দেখিয়া, মহেশচন্দ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বেই পুত্রের বিবাহ দিন একমাস পবে স্থিরীকৃত করিলেন।

এ দিকে সেই বিক্রীত ভূখণ্ডের উপর গৃহনির্ম্মাণোপযোগী রাশি রাশি ইষ্টকাদি উপকরণ আসিয়া পড়িল। বহু শিল্পীর সাহায্যে ক্রেতা অচিরে তথায় সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত করাইলেন যোগেশ মর্ম্মাহত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজ যোগেশের আয়ুর্ব্বৃদ্ধান্ন। তারাপ্রসন্ন তাহার মাতুলের সহিত আসিয়া মহেশবাবুকে মাতুলের নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় যোগেশের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিয়াছে—তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা হয় নাই।

যোগেশের পিতা বৃদ্ধ, তাহার সোদরগণও অল্পবয়স্ক, আর তেমন আত্মীয় নাই যে আপনার ভাবিয়া সযত্নে বিবাহের সমস্ত আয়োজন

করিয়া দিবে ইত্যাদি নানা কারণ দেখাইয়া, তারাপ্রসন্ন ক্রয় নিমন্ত্রণাদির সমস্ত কার্য্যভার আপনার স্কন্ধে লইল। যোগেশের পিতা প্রফুল্লচিত্তে সামান্য দ্রব্য হইতে ভাণ্ডার পর্য্যন্ত তাহার হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

তারাপ্রসন্ন কিন্তু পঁচিশ ঘর নিমন্ত্রণের স্থানে নিজমতে শত ঘর করিয়া আসিল, এবং চতুর্গুণ দ্রব্যক্রয় করিল। যোগেশ কিম্বা মহেশবাবু ইহার কিছুই জানিলেন না।

সন্ধ্যার সময় মহেশবাবু দেখিলেন, যাহাদের নিমন্ত্রণ করিবার কথা ছিল না, অথচ অনিমন্ত্রিত হইয়া আসিবার নয় তাহারা গৃহ পূর্ণ করিতেছে। তিনি ভাবিলেন তারাপ্রসন্ন সব ভুল নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে—কেমন করিয়া এতগুলি লোককে তাঁহার সামান্য আয়োজনে পরিবেশন করাইবেন! চিন্তায় আকুল হইয়া, বিস্ময়বিমূঢ় মহেশচন্দ্র তারাপ্রসন্নকে হতাশ স্বরে বলিলেন, "বাবা! একি করিয়াছ? এত লোকের আয়োজন আমিত কিছুই করি নাই। কি করে আজ মান সম্ভ্রম বজায় রাখি?"

তারাপ্রসন্ন হাসিয়া বলিল, "আপনার কোন আশঙ্কা নাই, আমি যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করে রেখেছি, আপনি দেখ্‌বেন আসুন।" মহেশচন্দ্র ভাণ্ডার দেখিয়া বুঝিলেন তাঁহার সামান্য অর্থে এত প্রচুর দ্রব্য হওয়া অসম্ভব, সস্নেহে বলিলেন "বাবা, তুমি নিজের অর্থ ব্যয় করে ভাল কায করনি।" তারাপ্রসন্ন উত্তর দিল, "আমার ভায়ের বিবাহে যদি না আমার ইচ্ছামত আমোদ ও খরচ করি, তা' হ'লে কখন কর্‌ব? আপনি এতে অসন্তুষ্ট হবেন না, বাইরে সকলকে সম্ভাষণ করুন।" মহেশ বাবু ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

যোগেশ এ ব্যাপার জানিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইল না—তারাপ্রসন্নর

এ কার্য্যও যে তাহাদিগকে অপমানিত করিবার জন্য ইহাই ভাবিল। বন্ধুর উদারতায় অবিশ্বাস করিয়া পদে পদে তাহাকে ভুল বুঝিল।

*　　　*　　　*

গত কল্য নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অদ্য অল্পক্ষণ মাত্র বরবধূকে বরণ করিয়া গৃহে আনা হইল। যেমন চির দিন হইয়া আসিতেছে, সুন্দরীগণ নব দম্পতীকে পরিবেষ্টন করিয়া কন্যার রূপের আলোচনা করিতেছেন। সেই সুসজ্জিত কক্ষে অসংখ্য দীপের উজ্জ্বল আলোক এবং বিবিধ বর্ণ-দুকুলা রূপসী তরুণীদের অপাঙ্গের নয়নালোক—ইহাদের মধ্যে কোন্ আলোক অধিকতর মনোজ্ঞ এবং অন্তরগ্রাহ্য তাহার বিচার করিতে আমি এক্ষণে প্রস্তুত নহি—সে বর্ণনা এখন অতি পুরাতন,—অথবা চির নূতন।

প্রবীণা ও নবীনাগণ নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গল যৌতুকাদি প্রদান করিয়া, সে কক্ষে পুরুষগণের প্রবেশাধিকারের অবসর দিলেন। সকলের আশীর্ব্বাদ ও যৌতুকের পর, সর্ব্বশেষে, তারাপ্রসন্ন যৌতুক প্রদান করিল। তাহার উপহার দ্রব্য দেখিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। একটী কনকনির্ম্মিত মনোরম ক্ষুদ্র বাক্স—তাহার চতুষ্কোণ মুক্তাকলাপে সজ্জিত—মধ্যদেশে হীরকে খচিত যোগেশের নাম—তাহাতে হিরণ্ময়ী চাবী সংলগ্ন। যোগেশ খুলিয়া দেখে তাহার ভিতর একটী সুরম্য মখমলে পল্লব-হরিৎবর্ণ রেশম সূত্রে লিখিত নিম্ন প্রদত্ত কয়েক ছত্র ;—

ভাই যোগেশ,

জানিনা তুমি আমাদের আজন্মের বন্ধুস্নেহ কেন অবহেলার চক্ষে দেখিতেছ। আমার হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে তোমার হৃদয় এত সযত্নে রাখিয়াছি, তাহাতে দেখিতেছি অবিশ্বাসের কালিমা! অজ্ঞাতে যদি তোমার কাছে কোন

অপরাধ করিয়া থাকি, আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে তাহা ভুলিয়া যাও—আমাকে ক্ষমা কর।

বন্ধুভাবে—ভ্রাতৃভাবে আজ আমি তোমাকে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে যে সামান্য উপহার দিতেছি, তাহা সানন্দে গ্রহণ করিলে, আমার সুখের অবধি থাকিবে না।

যে অট্টালিকায় তুমি এক্ষণে বসিয়া আছ, তাহা আমি তোমাদেরই জন্য নির্ম্মিত করিয়াছি, ইহাতে তোমারই সম্পূর্ণ অধিকার।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তোমাদের এই শুভমিলন পুণ্যময় হউক।

ইতি তোমার

স্নেহের সোদর

শ্রীতারাপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা।

পাঠান্তর, সেই পুণ্যক্ষণে, সেই মহা সন্ধিযোগে, যোগেশের নয়ন হইতে তপ্ত দুটী অশ্রু মুকুতা বন্ধুকৃত্যের পুরস্কার স্বরূপ তারাপ্রসন্নর উপহারের উপর পড়িল। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে যোগেশের শারদ নির্ম্মল মনোনভে যে ক্ষণস্থায়ী অবিশ্বাসের রেখাকলঙ্ক সহসা উদিত হইয়াছিল, তাহা আজি তারাপ্রসন্নর অকলঙ্ক স্নেহচন্দ্রমার স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুভ্র জ্যোৎস্নায় চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত ও অন্তর্হিত হইল।

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

মৃত্যু।

খৃষ্টীয়ান মহর্ষি বলিয়াছেন—To be carefully minded is death—পাপ বৃত্তিই মৃত্যু—বাস্তবিক মৃত্যু কি? মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার নিমিত্ত কতই কৌশল করা যাইতেছে কতই উপায় উদ্ভাবন

করা যাইতেছে—কিন্তু সকলই বিফল—আমার প্রিয় বন্ধু দুই ঘণ্টা কাল পূর্ব্বে আমার সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছেন কতই আনন্দ করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহার দেহ অচল নিষ্পন্দ জড়। কেহ কি একবার মুহূর্ত্তেকের তরে পূর্ব্ব চেতনা জাগাইতে পারে না? এ মৃত্যু কি? সে চেতনা কাহার কোথা হইতে আসিয়াছিল—নিমেষের মধ্যে অপসৃত হইল—এ তত্ত্ব কে নির্দ্ধারিত করিতে পারে?—মনুষ্যজাতির জন্মাবধি এই দুঃখই প্রভু—কবির কল্পনায় ইহার তত্ত্ব স্থির করিতে পারে না। ধর্ম্মে শান্তি দিতে পারে না—কবির কল্পনা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া ইহাকে আবাহন করে কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই শঙ্কিত চিত্তে ইহাকে বিদায় দান করিয়া পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা পায়। কোন পথেই মৃত্যুর তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না কোন উপায়েই ইহার মর্ম্মভেদ করা যায় না। কেবল একটী কথা জানা যায় মৃত্যু নিশ্চিত। এই নিশ্চিত মৃত্যু শঙ্কা মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। এই শঙ্কার উৎপত্তি কোথায়? বিচ্ছেদজনক বলিয়াই কি আমরা সদা সশঙ্কিত?—না, তাহা নহে। কারণ, আমরা ইচ্ছা করিয়াই ত অনেক সময় বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকি। কিন্তু সে বিচ্ছেদে দুঃখিত হই না আপনার জনকে পর করিয়া, সংসার ছারখার করিয়া মায়ামমতা জলাঞ্জলি দিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকি—সে জন্য আমরা দুঃখিত বোধ করি না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত হই সুতরাং বিচ্ছেদের জন্য আমরা দুঃখিত নহি। মৃত্যুর পর অজ্ঞাতবাস—সেই অজ্ঞাতবাস কি আমাদের ভীতি উৎপাদন করে? না তাহাও নহে। কারণ মানবজাতির সুখাশা, ভরসা সকলই ভবিষ্যতে নিক্ষিপ্ত। ভবিষ্য-সুখাশাই মানবজাতির জীবনের মূল মন্ত্র কিন্তু ভবিষ্যৎও মানবজাতির চির অজ্ঞাত। বাস্তবিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই

ও অজ্ঞাতের প্রতি ধাবমান্ হইতেছে। বর্ত্তমান অতি কঠিন, নীরস, নির্দ্দয়, মমতা শূন্য। আমরা ভবিষ্যকাল কত প্রকারে সাজাইয়া, কল্পনা প্রভাবে অলস্ত করিয়া এ জীবনে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করি। সুতরাং অজ্ঞাতাবস্থা বলিয়া আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না। মৃত্যুর একটী গুণ আছে —মৃত্যু নিশ্চিত—লিখিতে হাত কাঁপে, বলিতে বুক ফাটে, মনে করিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে—মৃত্যু নিশ্চিত—। নিশ্চিত বলিয়াই এ শঙ্কা। এই শঙ্কা মন হইতে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত সদাই শশব্যস্ত। কিন্তু মস্তক লুকাইয়া পরিত্রাণ নাই, ব্যাধ নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, দেখিয়াই হনন করিবে। সদাই মন বলিতেছে ঐ মৃত্যু, ঐ মৃত্যু, পলাও পলাও। কতই আমোদ প্রমোদ সৃষ্টি করিয়া, সংসারের অসারকে সার করিয়া মৃত্যু-শঙ্কা চাপিতে চেষ্টা পাই কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই সকল প্রকারে বিফলমনোরথ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় মৃত্যুকে আহ্বান করি ও তাহার করাল গ্রাসে পতিত হই। বস্তুতঃ, মানব জীবনের সারতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে কেবল এই মাত্র প্রকাশ পায় যে মৃত্যু শঙ্কাই সকল প্রকার সামাজিক ব্যাপারের মূল কারণ। ঐ ভয় হইতে যতটুকু দূরে থাকি, সেই আমাদের চেষ্টা। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে সামাজিক রীতিনীতি আমোদ প্রমোদে মনুষ্যত্বের পরিতৃপ্তি হয় না। কিন্তু তথাপি লোকে অর্থোপার্জ্জন, রীতি নীতি ক্রিয়া কলাপ আমোদ প্রমোদে দিনাতিপাত করে—ইহার কারণ কি?

মৃত্যু কাহাকে বলে? মৃত্যু কি পদার্থ? কি প্রকার ঘটনা ঘটিলে, তাহাকে মৃত্যু কহা যায়? এ সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান অতি দুরূহ ব্যাপার। মুনি, যোগী, ঋষিগণ আদিম কালাবধি এই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছেন কিন্তু তাঁহারা অনুসন্ধানে কি ফল পাইলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তাঁহারা কেবল মাত্র বলিয়া থাকেন মৃত্যু মিথ্যা!—

আশ্বাস বাক্য!—চক্ষে দেখিতেছি মৃত্যু নিশ্চত! কর্ণে শুনিতেছি, মৃত্যু মিথ্যা! এচক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটাইবে কে? হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন বাহ্যাভ্যন্তরিক জগতের সৌসাদৃশ্য নষ্ট ঘটিলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। জীবমাত্রেই বহির্জগতের সহিত নানাসূত্রে বদ্ধ। সূর্য্যরশ্মিও বায়ুসেবন ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করা যায় না। চতুঃপার্শ্বস্থ বৃক্ষ লতা গুল্ম তারা নক্ষত্রাদি সকলেরই সহিত প্রত্যেক জীবের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ পুষ্ট থাকিলেই জীবন স্রোত চলিতে থাকে ও নষ্ট হইলে মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবনমাত্র সজীব থাকে ও ঐ ঘটনার পর নির্জীব হয়। সজীব নির্জীবে প্রভেদ কি? সজীব পদার্থের চারিটী গুণ আছে সে গুলি নির্জীব পদার্থে নাই। সজীব পদার্থ মাত্রে আদান (Assimilation) প্রদান (Discrimination) ত্যাগ (Waste) ও বৃদ্ধি (Growth) এই চারিটী গুণ বিশিষ্ট। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের আদান প্রদান ত্যাগ ও বৃদ্ধির সৌসাদৃশ্য থাকিলেই জীবন সম্ভব হয়। এই নিয়ম কেবল শারীরিক নহে, কিন্তু মানসিক জীবনেও এই নিয়ম প্রতিফলিত দেখা যায়। বাহ্যাভ্যন্তরিক সম্মিলনের ব্যতিক্রম আংশিক বা সম্পূর্ণ হইতে পারে। দুর্ভিক্ষ ঘটিলে বহির্জগতের পরিবর্ত্তন হয়। খাদ্যাদি আহারীয় সামগ্রী অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু জীব মাত্রের উদর পিণ্ডের পূর্ব্বাবস্থাই বর্ত্তমান আছে। বহির্জগতের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত জঠরানলের ক্ষমতা হ্রাস পায় নাই আহার পরিমাণ পূর্ব্বানুযায়ী আছে সুতরাং এস্থলে বহিঃ ও অন্তর্জগতের সাদৃশ্য আংশিক নষ্ট হইয়াছে। অন্ধ বধির রুগ্ন সকলেরই এই প্রকার আংশিক মৃত্যু ঘটিয়াছে।

জীবদেহমাত্রেই বহির্জগতের সহিত সম্মিলিত কিন্তু কতকগুলি

সম্পূর্ণরূপে ও কতকগুলি অসম্পূর্ণরূপে। একটী বৃক্ষ বহির্জগতের সহিত অনেকপ্রকারে সংশ্লিষ্ট ; যথা—মূলদেশস্থ ভূমি সূর্য্যকিরণ ও উত্তাপ এবং বায়ু। বৃক্ষ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে না সুতরাং এই কয়টী ব্যতিরেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাহারও সহিত ইহার কুটুম্বিতা হয় না। কিন্তু একটী পক্ষীবিশেষের কুটুম্ব সংখ্যা এতদপেক্ষা অধিক। পক্ষী বৃক্ষকে জানে, কিন্তু বৃক্ষ পক্ষীকে জানে না; ইহার ক্ষুধা আছে, যে স্থানে খাদ্যাদি প্রাপ্তব্য সেই স্থানের সহিত নদ নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ ইত্যাদি অনেকের সহিত ইহার কুটুম্বিতা আছে। ইহার সমাজ আছে, সন্তান সন্ততি আছে, ভালবাসা আছে বৃক্ষের এ সকল কিছুই নাই। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বৃক্ষ অপেক্ষা পক্ষীর গৌরব অধিক। পক্ষী না থাকিলে বৃক্ষ জীবন ধারণ করিতে পারে কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে পক্ষীর জীবন ধারণ অসম্ভব। এই প্রণালীতে তর্ক করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে মনুষ্যই সৃষ্টির প্রধান ও সর্ব্বোচ্চ পদ। সে পদ মানবজাতি একটী কারণে পাইয়াছে। সে কারণটী, ধর্ম্মবিশ্বাস। মানবজাতির মৃত্যু দুই প্রকারে ঘটিতে পারে—দৈহিক ও পারমার্থিক। যে জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস নাই, সে জাতি মৃত। যে মনুষ্যের ভগবদ্ভক্তি নাই, সে মনুষ্য মৃত, কারণ পারমার্থিক জগতে সে মনুষ্যের সম্ভাব্য সম্মিলন সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু এ ঘটনা প্রকৃত নহে। ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাস জাতিগুণ, সুতরাং সকল মনুষ্যের হৃদয়েই বর্ত্তমান। এই ভক্তিজীবন হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অপসৃত হওয়া পাপজনক, সুতরাং পাপই মৃত্যু। (The wages of sin is death) এই প্রকার মৃত্যু ভিন্ন অন্য মৃত্যু মানবজাতির নাই, এই পাপ ভিন্ন অন্য পাপ নাই।

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব্বস্মৃতি।

(বেহারীবাবু ও তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ক্ষান্তমণি।)

বে। অঃ বৌ, বৌ, একটা কথা জিজ্ঞাসা কব্‌ব, বল্‌বে ?

ক্ষা। কি কথা ?

বে। তুমি কি আমায় ভালবাস ?

ক্ষা। তোমার কি মনে হয় ?

বে। আমার ত মনে হয় তুমি আমায় ভালবাস না।

ক্ষা। কিসে জান্‌লে ?

বে। তুমি আমার সঙ্গে ভাল কবে কথা কও না, কথায় কথায় চোটে উঠ, সকল কাযেই কেমন একবকম হতশ্রদ্ধা ভাব দেখ্‌তে পাই।

ক্ষা। আহা, কথা আব কি ছাই ভস্ম কইব ?

বে। তুমি কি ছাইভস্ম কথা কইবে খুঁজে পাও না আর আমাব প্রথম স্ত্রী শান্তমণি কথা ক'য়ে ফুরিয়ে উঠ্‌তে পাবত না, কোথা দিয়ে রাত পুইয়ে যেত ! আহা শান্ত আমায় বড ভালবাসত।

ক্ষা। তবে বে মুখপোডা, আমার সাম্‌নে আমার সতীনের সুখ্যাতি, ফের যদি আমার কাছে তা'র নাম কর্‌বি ত আমি বাপের বাডি চলে' যা'ব।

বে। আচ্ছা আমি আর তা'র নাম কব্‌ব না, কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে একটু ভাল করে কথা কও—

ক্ষ। আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে এখন, বুডো মিন্‌সের ঢং দেখ না, উনি যেন আমাব যুগ্যি তাই ও'র সঙ্গে ভাল করে কথা কইতে হবে।

বে। অমন কথা ব'ল না, বড় কষ্ট হয়, আমি তোমার যুগ্যি নয় কিসে? বয়সই না হয় একটু বেশী হয়েছে, তাই বা এমন কি বেশী ৫২ বৎসর বইত নয়, তবু তোমার স্বামী ত বটে, আহা শান্ত আমায় কত যত্ন, কত আদর করত। আমার দ্বিতীয় স্ত্রী রাইকিশোরীও মন্দ ছিল না তবে রাইয়ের একটু অভিমান বেশী ছিল, কিন্তু সে আমাকে কটু কথা কখনও বল্‌ত না।

ক্ষা। তবে রে মুখপোড়া, ফের সতীনদের সুখ্যেত! একটা সতীন নয় আবার দুটো। তা'রা যদি এত ভাল ছেল তবে আবার বে করে আমার হাড় জ্বলাতে গেলি কেন? তাদের সঙ্গে সহমরণে যেতে পারিস্‌ নি। আমার যেমন পোড়া কপাল। আঃ কতদিনে আমার মরণ হবে হাড় জুড়োবে!

বে। ক্ষান্তমণি ওকথা মুখে এনোনা আমার বড় কষ্ট হয়। আহা রাইকিশোরী আমার অভিমান হইলেই ঠিক্‌ ঐ রকম কথা বল্‌ত। সব মেয়ে মানুষের স্বভাব একই রকম।

ক্ষা। ফের রাইকিশোরী!

বে। থুড়ি ভুলে গেছি আর বল্‌ব না। আচ্ছা শান্ত, দূর হোক ছাই কেমন অভ্যাসের দোষ ক্ষান্ত বল্‌তে শান্ত বলে ফেলেছি মাপ কর—

ক্ষা। তবে রে মুখপোড়া এই তুমি আমায় ভালবাস, আমার নাম বল্‌তে আমার সতীনের নাম ধর? (বেহারীবাবুর কর্ণমর্দ্দন)।

বে। উঃ উঃ ছাড় ছাড়, লাগে, মাইরি। আচ্ছা রাইকিশোরির কাছে যখন শান্তর নাম কর্‌তুম কই সেত কান টান মলে দিত না।

ক্ষা। ফের, মুখপোড়া, ফের তাদের নাম। (পুনরায় কর্ণমর্দ্দন)

বে। উঃ গেলুম, অঃ ক্ষান্ত শান্ত হও।

ক্ষা। কেন রে মুখপোড়া সতীন হ'তে যাব কেন ?

বে। বলি, না না, সে শান্ত না, একটু ঠাণ্ডা হও। আমার প্রাণান্ত হ'ল যে। আমি রাই কিশোরীর জন্য যে চন্দ্রহার গড়িয়ে ছিলুম আজই তা' ভেঙ্গে তোমার জন্য নতুন একছড়া গড়াতে দেবো।

ক্ষা। (কাণ ছাড়িয়া দিয়া সোহাগ ভরে) ছি বেরসিক, আমি ঠাট্টা করে তোমার কাণ মল্‌ছিলুম তাও বুঝলে না ? জান না কি তোমায় লাগ্‌লে আমারও প্রাণে লাগে। এটাও বুঝলে না, তোমায় ভাল বাসি বলেই তোমার মুখে আমার সতীনদের নাম শুন্‌লে গা জ্বলে যায়। তা যাক্‌, চন্দ্রহার ছড়াটা ভেঙ্গে আবার গড়াতে দেবে বল্‌ছেলে কেন ?

বে। বলে কি আবার কাণমলা খাব ?

ক্ষা। না না আর খেতে হ'বে না, যা খেয়েছ অনেক দিন মনে থাক্‌বে।

বে। রাইকিশোরীর নাম শুন্‌লে তোমার গা জ্বলে যায় তবে তার চন্দ্রহার তুমি ত নেবেই না, তাই নতুন করে গড়াতে দেবো।

ক্ষা। সে আবার কতদিন লাগবে, তা থাক আর ভাঙ্গতে হবে না, সেই ছড়াই নেবো। সোণাতে দোষ নেই। আমার চন্দ্রহার নিজের সখের জন্য নয়, তুমি দেখে সুখী হ'বে বলে পরা, নইলে আমার গয়না টয়না পরবার সাধ যায় না।

বে। আহা, রাই আমার ঠিক ওই কথাই বলত !

ক্ষা। আবার কেন ?

বে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভুল হ'য়েছে, অভ্যাসের দোষ, শুধ্‌রে যাবে, তুমি একটু যত্ন শ্রদ্ধা করলেই তাদের ভুলে যাব।

ক্ষা। হ্যাঁ গা ওকি কথা, আমি কি তোমায় যত্ন শ্রদ্ধা করিনি। অমন কথা বোলো না।

বে। কই ভাই আর কর, কাল বেড় মাথা ধরেছিল বলে মাথাটা একটু টিপে দিতে বল্লুম, তুমি বল্লে আমি কি তোমার মাইনে করা দাসী!

ক্ষা। কাল ভাই আমার শরীরটা খারাপ ছিল বলে ও কথা বলে ছিলুম তা নইলে স্বামীকে কি কখনও অমন কথা বলে।

বে। তা ত বলে না। শান্ত কিন্তু ভাই তা'র নিজের অসুখ হলেও প্রাণপণে আমার সেবা কর্‌ত।

ক্ষা। মরণ আর কি, ফের শান্ত, শান্ত, যত বারণ করছি, ততই সাবেক প্রেম উথলে উঠছে। আমি যদি তোমার সামনে একশবার আমার প্রণয়ীর সুখ্যাতি করি, বল দেখি তোমার মনে কি হয়?

বে। অঁ্যা বল কি? একশবার বলতে হবে না একবারেই আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ। সত্যি সত্যি, তোমার প্রণয়ী কেউ আছে না কি?

ক্ষা। মুখে আগুণ, কথার কথা বল্লুম সত্যি ঠাওরালে। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ, আর একটু হলেই সব বেরিয়ে যেত।

বে। সত্যিই যদি না হবে তবে তুমি আমার মরণ কামনা কর্‌বে কেন? কই শান্ত কিম্বা রাইকিশোরীত কখনও আমার মরণ কামনা করত না। আমার মুখে আগুন দিত না। হঁ্যা গা বলনা গা ও কথা কি সত্যি। ও আমার রাইকিশোরী তোমায় আমি মিছা মিছি সন্দেহ করতুম তাইকি আমার এই শাস্তি।

ক্ষা। ফের সতীনের নাম, বেহায়া মুখপোড়া মিন্‌সে রোস ঝঁ্যাটা না আন্‌লে হবে না। (প্রস্থান)

বে। ও শান্ত, ও রাই কিশোরী, তোমরা কোথা গো, দেখে যাও আমার কি দুর্দ্দশা।

হিন্দু কাব্য ও কবির কৌশল।

আদর্শ সৃষ্টিই কবির লক্ষ্য ও কার্য্য। যাহা অনুকরণ করিলে পাশব মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্যত্বে উপনীত হইবে, মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হইবে, তাহাই কাব্য সৃষ্টির লক্ষ্য হওয়া উচিত। হিন্দুশাস্ত্র এরূপ ভাবে গঠিত যে একজন হিন্দু ভূমিষ্ঠ হইয়াই যাহাতে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর ও উচ্চতর হইতে উচ্চতম অবস্থায় আসিতে পারে তাহারই শিক্ষা ও বিধি প্রদান করিয়াছে মাত্র।

কাব্য সৃষ্টিও সেইরূপ হিন্দুজীবনের লক্ষ্যানুরূপ হওয়া উচিত। যাহা এই লক্ষ্যানুরূপ তাহাই পাঠ্য—যাহা তদ্বিপরীত তাহা অপাঠ্য। যাহা পাশব ভাবাপন্ন মনুষ্যকে দেবোপম মনুষ্যের বিষয় অহঃরহ ভাবাইতে ভাবাইতে দেবভাবাপন্ন মনুষ্য করিয়া না তুলিতে পারে সে কাব্য সৃষ্টিতে লাভ কি? সে কাব্য সৃষ্টির কি প্রয়োজন? কাব্য কবির লীলাক্ষেত্র এবং স্বহস্তনির্ম্মিত রাজ্য। কাব্য কবির রুচি প্রবৃত্তি ও শিক্ষার পরিচয় স্থল। কবির ইচ্ছায় যখন কবির কাব্য সৃষ্টি, তখন সেই ইচ্ছা সেই মূল যাহাতে পবিত্র, সংযত ও নির্ম্মল হয় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। যে সেক্সপীয়ার ইচ্ছায় অদ্বিতীয় ম্যাক্‌বেথ্, আয়াগো ওথেলোর জন্ম দিয়াছেন, শিক্ষা, রুচি ও প্রবৃত্তি অন্যরূপ হইলে সেই সেক্সপীয়ার আর এক জনক রাজার আর এক যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা হইতে পারিতেন। সমস্তই যখন রুচি, শিক্ষা ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিতেছে, তখন যাহাতে সেই রুচি প্রবৃত্তি শিক্ষা গোড়া হইতে ভাল হয়, তাহার উপরে হিন্দু জীবন-লক্ষ্যের অনুরূপ কাব্য

তাহার সন্দেহ নাই। রাশি রাশি খাঁটি হ্যাট কোট ধারী ইংরাজী নভেল ও বাঙ্গালা ধুতি উড়ানি পরিচ্ছদাবৃত ইংরাজি নভেল পড়িয়া আমাদের রুচি ও প্রবৃত্তি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি। সেই বিকৃত রুচি ও প্রবৃত্তিতে এখন যে কোন হিন্দু পুস্তক পড়িব ও যে কোন কার্য্য করিব সবই বিকৃত করিয়া ফেলিব। তাই ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে হ্যাট কোট ছাড়া কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। প্রভূত জ্ঞানাপন্ন ও উজ্জ্বল প্রতিভা বিশিষ্ট হইয়াও সেই প্রতিভার গতি রুচি ও শিক্ষার গুণে কোন্ দিকে যাইল? কুন্দনন্দিনী তৈয়ার করিলাম—বিলাতি ভাবে বিধবা বিবাহ দিলাম ও শেষে বিলাতি অনুকরণে বিষপান করাইয়া সমস্ত বিকৃতরুচি হিন্দুর ঘরে বিষ ঢালিয়া দিয়া গেলাম। এইরূপ কত শত বিলাতী ভাব বিশিষ্ট চরিত্র বাঙ্গালী ছাঁচে ঢালাই হইতেছে। আকার ও পরিচ্ছদে বাঙ্গালী কিন্তু কাযে সাহেব। রাশি রাশি যে বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক প্রেস হইতে বাহির হইতেছে তাহার প্রায় সবই প্রেমিক প্রেমিকার কথা, কোর্টসিপ্ এবং শেষে কোন অভাবনায় ট্র্যাজিডির অবতারণা করিয়া পুস্তকের পরিসমাপ্তি। বঙ্কিম বাবু ইচ্ছা করিলে কুন্দনন্দিনীর পরিণাম কি অন্যরূপ করিতে পারিতেন না? যদি করাই স্বাভাবিক বোধ হয় তাহা হইলে তাঁহার কল্পনার দোষ ছিল। তিনি কল্পনা অন্যরূপ করিলেন না কেন যাহাতে সে কল্পনার ফল অন্যরূপ দাঁড়ায়? সেক্সপীয়ার যদি হিন্দু শাস্ত্রে শিক্ষিত হইতেন, যদি হিন্দু রুচিবিশিষ্ট হইতেন তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষা রুচি ও প্রবৃত্তি কৃষ্ণবর্ণ ম্যাক্‌বেথের সৃষ্টিতে পরিতৃপ্তি লাভ করিত না—ম্যাকবেথের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে অন্য কোন শ্বেতবর্ণ চরিত্রাঙ্কন করিয়া জগতে অক্ষয় আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারিতেন। যাহা বিশ্ব সৃষ্টিতে নাই তাহাই ত কাব্যে স্থান পাইবে। যাহার প্রতিরূপ বিশ্বে আছে

তাহার সৃষ্টির প্রয়োজন কি? বিশ্বকর্ম্মা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর বর্ণে আর কে দেখাইতে সক্ষম? স্বর্ণ পর্ব্বত নাই—কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা সৃজিত স্বর্ণও আছে পর্ব্বতও আছে। এই স্বর্ণ ও পর্ব্বত উভয়কে একত্রিত করিয়া মনুষ্যের গায়ে চড়াইতে হইবে। এবং সেই সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যের উপকারে আনিতে হইবে। কবির কার্য্য এই যাহাতে কোন উপকার নাই সে সৃষ্টির প্রয়োজনই বা কি?

সেলির Sky-Laik একটী অতি সুন্দর কবিতা। কিন্তু এই লার্ক যদি পৃথিবীর কোন কার্য্যেই না আসিল তাহা হইলে এ সৃষ্টির প্রয়োজন কি? কেবল কতকগুলি সুন্দর বাক্যের ও ভাবের সমষ্টি মাত্র। যখন পাঠ করা যায় তখন মনে হয় যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতেছি। যেন লার্কের সঙ্গে সঙ্গে মেঘের অন্তরালে মিশিয়া গিয়াছি তথায় লার্কের পশ্চাৎ পশ্চাৎ Like unbodyed joy উড়িয়া যাইতেছি। যেন আর কখন মর্ত্তে ফিরিয়া আসিব না এইরূপেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব। যে কবি এই সুখ কল্পনার জনক, সে কি ভাল নহে? আমি বলি যে কল্পনার অনুকরণ কার্য্যে সম্ভব তাহাই মূল্যবান্। কবি নানারূপ সুন্দর কল্পনা করিতে পারেন কিন্তু সে কল্পনায় লাভ কি? মনুষ্যের জীবন কিসের জন্য? সেই জীবনের লক্ষ্যকে যদি কবিকল্পিত সুন্দর বস্তু ভুলাইয়া মানব মনকে অন্য দিকে লইয়া গেল তবে ত সেই কবিকল্পিত বস্তু আমার পরম শত্রু।

এই লক্ষ্যানুরূপ কাব্য সৃষ্টিতে কবির কৌশল কার্য্যকরী হওয়া উচিত। শুদ্ধ কোন একটী সুন্দর বস্তুর সৃষ্টিতে কবির কৌশল প্রয়োগ যথেষ্ট বিবেচনা করিলে সে কৌশল প্রকৃত কাব্য সৃষ্টিতে প্রযুক্ত হইল না। যাহাতে কবিকল্পনা মনুষ্যের শিক্ষাপ্রদ ও অনুকরণীয় হয় সেই

জন্য কবির কৌশল প্রয়োগ করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে যে কবি কৌশল করিয়া এক চরিত্রের মধ্যে আর এক চরিত্রের অবতারণা করেন সে কেবল কবির ইচ্ছা প্রকাশের কৌশল মাত্র। এক চরিত্রের মধ্যে অন্য চরিত্রের অবতারণা করাতে এই ফল হয় যে অন্য চরিত্রের অনুপ্রবেশে পূর্ব্ব চরিত্রের গতির পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। সেই গতির পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বচরিত্র হয়ত সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ ধারণ করে, না হয় তাহার সামান্য আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য হয়।

নৈতিক সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি কাব্যসৃষ্টির এক অঙ্গ। এই কাব্যসৃষ্টির ও কাব্যসৃষ্টি পরিপুষ্টির জন্য কবির কৌশল।

শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের কণ্যমুণির আশ্রমে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইয়া গেল। দুষ্মন্ত স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন, শকুন্তলাও আপন পর্ণকুটীরে বসিয়া দুষ্মন্তের চিন্তায় বিভোর। দুর্ব্বাসারও এই সময়ে কণ্যমুণির আশ্রমে ভিক্ষা করিবার সময় পড়িল। ঋষি বটে কিন্তু রাগের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। আবহমান কাল হইতে যেখানে কবিদিগের কোন কার্য্যে রাগের ভাব প্রকাশ করিতে হয় সেইখানেই দেখি দুর্ব্বাসা ঋষি আসিতেছেন। তা কি সত্য যুগে, কি দ্বাপরে, কি কলিতে, দুর্ব্বাসা যেন চারিযুগ অখণ্ড পরমায়ু লইয়া কেবল রাগসর্ব্বস্ব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্ব্বাসায় ঋষিচরিত্রের এমন কোন কার্য্যের বিবরণ আমরা পাই না যাহাতে তিনি ঋষি। যেথানে দুর্ব্বাসাকে কবি আনয়ন করিয়াছেন জ্বলন্ত রাগের প্রতিমূর্ত্তিতেই সেইখানে উপস্থিত। পৃথিবীতে তাঁ'র যেন রাগ করা ছাড়া আর কোন কায নাই। রাগ হইল, শাপ দিলেন আর প্রস্থান করিলেন। কবিরও দুর্ব্বাসাকে আনয়ন করিবার প্রয়োজন ফুরাইল। কিন্তু কাব্যসৃষ্টির ঘটনা বিভিন্ন দিকে ফিরিল। গান্ধর্ব্ব বিবাহ যে মন্দ অন্ততঃ দুষ্মন্তের

সময়ের পক্ষে সমাজ বিগর্হিত এই কথাই যেন দুর্ব্বাসা চরিত্রের অবতারণার কারণ। দুর্ব্বাসা (moral indignation) সেই জন্য শাপ দিয়া যাইলেন। তারপর কবি দেখাইলেন যে দুর্ব্বাসার শাপ কার্য্যকরী হইয়াছিল। পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের বাক্য অকাট্য ছিল একবার মুখ হইতে বাহির হইলে সে ফলিবেই ফলিবে। রাজা পরিক্ষীত ব্রহ্মশাপের হস্ত হইতে অনেক সাবধান হইলেও রক্ষা পান নাই। তক্ষক ফুলের মধ্য হইতে কুসুম কীট রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়া শেষে সর্পরূপে দংশন করিল। সেই শাপকে কার্য্যকরী করিবার জন্য কবি দুর্ব্বাসাকে ঋষি আখ্যা দিয়াছেন। কাজেই শাপ অকাট্য হইবে। আর কার্য্যত moral রাগের মধ্যেও ঋষি চরিত্রের অংশ যেন বিদ্যমান। এই কবির কৌশল কি সুন্দর। এক কৌশলে ঘটনা স্রোত ফিরিয়া গেল। দুষ্মন্ত আর বিনা প্রমাণে বিনা নিদর্শনে শকুন্তলাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। দুষ্মন্তই বা কিরূপে স্বীকার করেন? কারণ তিনি স্বীকার করিলে তাঁহার দেখা দেখি তাঁহার রাজ্যে তাঁহার প্রজাকুলে এইরূপ প্রথাই বাহাল হইবে। কেহ কোন বিবাহ সংক্রান্ত মকর্দ্দমা আদালতে উপস্থিত করিলে এক পক্ষ বলিতে পারেন—"মহাজনো গতসা পন্থা।" বিচারক দুষ্মন্ত তখন বাক্‌শূন্য হইতে পারেন—রাজ্যেও পুত্রকন্যা লইয়া মহাগোলোযোগ পড়িয়া যাইবে। একজন অপরের বিষয় তাহারই প্রাপ্য বলিয়া আদালতে হুলুস্থুল বাধাইবে। সম্ভবতঃ এই সব কারণে কবিও কৌশল করিয়া যাহাতে তাহা না ঘটিতে পারে তাহার একটা উপায় করিয়া রাখিলেন। কবি যদি রামচন্দ্রকে সীতার বনবাসের ব্যবস্থা না দিয়া আর কোন ব্যবস্থা দিতেন তাহা হইলে মহর্ষি ঠাকুরকেও এইরূপ কোন কৌশলের অবতারণা করিতে হইত। যখন সীতার

বনবাসের ব্যবস্থা হইল তখন কাযেই কবিকে আর মাথা ঘামাইতে হইল না।

এইরূপে কবির কৌশল (Poetic macl i ıery) কাব্যজগতে অসাধ্য সাধন করে। কাব্যজগতের কবিই ঈশ্বর তিনি মনে করিলে এক সৃষ্টিতে প্রলয় ঘটাইয়া অপররূপ সৃষ্টি করিতে পারেন। কাব্য জগৎ ইচ্ছাময় জগৎ। যে কবি আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য কৌশল প্রয়োগে তত নিপুণ নহেন তাঁহার সৃষ্টি সে কারণ অসুন্দর। এই জগতে সৃষ্ট বস্তুর তত দোষ পড়ে না দোষ কবির দোষ কবি কল্পনার। কবি যদি দোষযুক্ত সৃষ্টি কল্পনায় না আনিতেন তাহা হইলেত আর সৃষ্টি হইত না। সৃষ্টির নিন্দা বৃথা নিন্দা, সমস্ত দোষই কবি কল্পনার।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ফুলের সাজি।

ভুলে।

(১)

মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে।
সেযে—মৃণালে কমল ফুল অগাধ জলে;
তাতে যে মোহিনী রেখা,
কি জানি কি ভাব মাখা,
কেমন আকুল ভাবে হৃদি উথলে।
মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে।

(২)

মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে।
সেযে—আড়ালে বিমল চাঁদ আকাশকোলে;
পরাণ শিহরি উঠে,
কি জানি কি ভাব ছুটে,
পাছে সে কলঙ্ক রেখা দেখে সকলে;
মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে!

(৩)

মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে !
সে যে—কোকিল কূজন বসি গাছের ডালে ;
সে তানে কি মধু মাখা,
অমৃতে গরল ঢাকা,
বিষম হইয়া তাহা হৃদয়ে ঢালে।
মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে !

(৪)

মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে !
সে যে—তটিনী মুকুতা ভরা নিজ সলিলে,
পাছে সে সাগর তবে,
আপনা ভুলিয়া মরে,
জোয়ারে বহিয়া যায় কূলে অকূলে,
মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে !

শ্রীরঙ্গলাল রায়,
কাঁথি।

তুমি।

তুমি, চির বরষার নীরদ আমার,
চির আঁধারের আলো,
তুমি চির নিদাঘের ছায়া গো আমার,
সকল সময়ে ভাল।
তুমি চির যমুনার ধীর কলতান,
চির মথুরার বাঁশী,
তুমি, গরবে আমার হৃদয়ের রাণী,
সেবায় আমার দাসী।
তুমি চির আলোকের কিরণ আমার,
চির গগণের তারা,
তুমি চির সাগরের মাণিক আমার,
চির মুকুতার ধারা।
তুমি চির বিকশিত নলিনী আমার,
চির নিরাশার আশা,
তুমি চির প্রণয়ের স্বপন আমার,
আকুল প্রেমের তৃষা।
তুমি চির আলয়ের কমলা আমার,
চির অমরার শোভা,
তুমি জগতে আমার দেবীর মতন,
লোচন পরাণ লোভা।
তুমি, চির জনমের হরষ আমার,
চির সুষমার খনি,
তুমি, চির জীবনের সাথী গো আমার,
আঁখির আমার মণি।
তুমি, বাসনা আমার, কামনা আমার,
প্রাণের আমার সার,
তুমি চির স্বরগের চির আলোময়,
অশেষ বিভার হার।

—গিরিজাকুমার—

জরা হ'তে মরা ভাল।

(১)

বসন্ত সরস আর শিশির বিকল
কিশলয় দুলে হাসে, জীর্ণ পাতা যায় খসে

কাঁপিয়া ঝরিয়া যায় ছাড়িয়া সকল,
জরা হ'তে মরা তাই বুড়ার মঙ্গল।

(২)

প্রণয় না করে কভু বৃদ্ধে আলিঙ্গন,
ভ্রুক্ষেপ না করি হায়, তরুণী চলিয়া যায়,
অপাঙ্গে দেখেনা চেয়ে ফিরায়ে বদন,
জরা হ'তে ভাল তাই বুড়ার মরণ।

(৩)

জরা মধুহীন আর যৌবন উজ্জ্বল,
বসন্ত বিলাস ভরা, শুধু হর্ষে মাতোয়ারা,
যৌবন তেমতি বটে উন্মত্ত চপল;
কিন্তু প্রাচীনের জ্ঞান অসাড় শীতল।

তোরা।

তোরা কেন এসেছিলি কোথা বা যাইলি
স্নেহের পুতলি স্মৃতির দাগা?
তোরা হেসে কোলে এলি বেঁদে ফিরেগেলি,
পরিয়া ছিঁড়িলি মায়ার তাগা।
তোরা বারে বারে এসে আধ যাদু ভাষে
ভোরের আলোতে ললিত গানে,
তোরা কি মোহন বেশে কত ছাঁদে হেসে
ভুলিবনা—তবু মর্ম্মান্ প্রাণে।
তোরা ছিলি বুকে সুখে, দুঃস্বপন দেখে
শিহরি জাগিলি, কাঁদিয়া সারা,
হ'লি যাতনা আকুল থাকিতে ব্যাকুল
মা'র হিয়া গলি বহালি ধারা।
তোরা নিজে জ্বলে গেলি পরাণে দহিলি
ছাইগুলি আছে মরম জুড়াঁ,
ফেলিবনা তাহা কত স্নেহ আহা!
মাখা আছে তা'তে স্মরণ ঝরা।
তোরা কাহার আদেশে কি নিয়ম বশে
খেলিস্ যে এই বিষম খেলা,
তোরা জানিস্ তাঁহারে বুঝারে আমারে,
পাপ যে সে সেজনে নিঠুর বলা।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

তীর্থ দর্শন।

(১)

এই কি সে স্থান?
যথায় অমর বঙ্গকবি শিরোমণি,
মধুর আকর কবি শ্রীমধুসূদন
ভারত সৌভাগ্য রবি অমূল্য রতন,
জনমি' করিলা গুণে উজল অবনী।

(২)

এই কি সে স্থান?
যথায় শৈশবে মধু, মাধুর্য্য বিকাশি,
নির্ম্মল শৈশব-লীলা করিলা সাধন,
কৌমার, কৈশোর (ও) বটে করিলা যাপন,
গুঁয়াইলা জীবনের সুপ্রভাত হাসি?

(৩)

এই কি সে স্থান?
পাদদেশ ঘিরি যার বীচি বিক্ষেপিয়া

কল্লোলিনী কপোতাক্ষী নির্ম্মল সলিলা,
চিযাইয়া চিতে, তব শৈশবের লীলা,
ধাইছে সাগবে বুঝি সে গীত গাইযা?

(৪)

এই কি সে স্থান ?
যাহাব উবসে উচ্চ অপূর্ব্ব সুন্দর
শৈশব বিহাব সৌধ বিবাজে তোমাব,
(মধুব বিহনে হীন মাধুরী তাহার।)
প্রাবৃট অমার বেতে যেন মহীধর ?

(৫)

এই সেই স্থান।
এই সে সাগবদাঁড়ী, এই সেই দত্ত বাড়ী
এই সেই কপোতাক্ষী ধাইছে সাগবে
এখনো উদিছে রবি, এখনো শশীব ছবি
তেমনি বিকাশ পায প্রফুল্ল অংবে,
তেমনি আকাশময উদিছে তাবকাচয়,
তেমনি বহিছে বায়ু আন্দোলিযা তরু,
মধুর অভাবে তবু বোধ হয় মরু !

(৬)

এই সেই স্থান !
এ খানে কিছুই নাই, শুধু তব জন্মঠাঁই,
জগত ব্যাপিয়া কীর্ত্তি উজলে তোমাব !
অভাগী ভারত চিত, সে আলোকে উদ্ভাসিত
কি করিবে কবি, তব বিরহ আঁধার
কীর্ত্তিদেহ কতকাল রহিবে প্রচার ?

(৭)

এই সেই স্থান।—
দেখিতে এসেছি আমি, আগ্রহে হে কবিস্বামী
তীর্থসম আজ তব জনম ভবন !
হইল পবিত্র চিত, হৃদানল নির্ব্বাপিত,
পুলকে পূর্ণিত দেহ কাঁপিল সঘন,—
হেরি কবিবর তব জনম ভবন।

(৮)

মহাতীর্থোপম—
হেবি এই কবি, তব জনম ভবন,
পুলকে পূর্ণিত দেহ—সফল জীবন !
ধন্য যশোহব, তুমি,—মধুব জনম-ভূমি
বিবাজে সাগবদাঁড়ী, হৃদয়ে তোমার,
জগতে ব্যাপিয়া কীর্ত্তি উজলে যাহাব !

শ্রীতারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়,
বারুই পাড়া।

পথিক।

(১)

অরুণ উদয়ে, একাকী পথিক,
চলিছে ছুটিয়া জীবন পথে,
শৈশব বিভাগ,—সরলতা মাখা—
উতরিছে যেন মানস-রথে।

(২)

সুমধুর তান, আনন্দ লহরী,
বিবিধসুষমা পথের ধারে ;
প্রফুল্ল অন্তরে, ভাবনা কণিকা
ক্ষণেকের তরে পশিতে নারে।

(৩)

কৈশোর-শবরি——শিরীষ কোমল—
মনের উল্লাসে ভ্রমণ করে ;
হৃদয় কাননে করিয়া যতন
আশা লতা কত রোপণ করে।

(৪)

কিছু ঊর্দ্ধদিকে হয়ে অগ্রসর
উন্নতির সীমা হেরিতে চায়,
সহসা বন্ধুর,* কুটীলতাময়
যৌবনের বাঁধ ঠেকিল পায়।

(৫)

পথিক অমনি, চাহিয়া সুমুখে
দুস্তর সাগর দেখিতে পায় :
নক্র হাঙ্গরাদি——ভীম বিপুবল—
হেরিয়া সতত কাঁপিছে কায়।

(৬)

উচ্চবীচিমালা গরজে গভীর
সহায় কেবল তনুর তরী,
সৈকত পুলিনে সহচরী এক
আসিল তাহার ভরসা করি।

(৭)

কিছুক্ষণ তথা রহিয়া দু'জন
বিষয়-বাসনা সাধন করে,
সময় কাণ্ডারী——বিনয়-বধির—
ডাকিতে সঘনে ঘটিকা ধরে।

(৮)

তরঙ্গ আঘাত সহিয়া সহিয়া
উঠিবে যখন সাগর পার ;
জরা উপনীত হৃদয় বিকল
চলিতে শকতি নাহিক আর।

(৯)

অসীম আঁধার, কালের মন্দিরে
নয়ন মুদিয়া পশিল যবে ;
জনম যথায়, পৌঁছিল তথায়
পশ্চাতে পড়িয়া রহিল সবে।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস,
কীর্ণহার।

বঙ্গ-বিধবা।

কে তুমি মা ! ফিরিতেছ উদাসিনী বেশে ?
পর দুঃখে সদা কাঁদ দেশে কি বিদেশে,
কে তুমি মা ! বিষাদিনী রমণীর রাণী ?
শীত গ্রীষ্ম সনে বাদ নাহিক জননি !
আত্মহারা ফের সদা মাঝে ধরণীর,
তুচ্ছ ধূলি সম ভাব আপন শরীর,
যথা ইচ্ছা ভ্রমিছ মা ! দুঃখীর কল্যাণে,
নাহি মান অপমান নাহি হিংসা প্রাণে,

নাহিক মায়ার ডোরে বাঁধা তব প্রাণ,
সদা হৃদি বীণা-তন্ত্রে বাজে বিভুগান।
কে সাজালে বল মা তোরে এহেন যোগিনী
নাহি স্নেহ দয়া তা'র, সে কি মা! পাষাণী
কে ঢাকিল কালিমায় সুবর্ণ শরীর,
কে নিল কাড়িয়া ওগো মণি ফণিনীর?
কেড়ে নিয়ে চিরতরে সুখ যত হায়,
কে সাজালে উন্মাদিনী তোমারে ধরায়?

এক কালে ছিলে তুমি গৃহ কুলবধূ
নারী স্নেহ হৃদি ভ'রে থাকিত মা শুধু;
কা'লের কুটিল চক্রে হয়েছ নূতন
নিজ সুখ চির তরে দেছ বিসর্জ্জন,
চিতা ভস্মে অঙ্গ তুমি ঢেকেছ হেলায়
ছিন্নবাসে আচ্ছাদিয়া রেখেছ হৃদয়।
শ্মশান হয়েছে তব সুরম্য ভবন,
সুবর্ণ মৃত্তিকা সম করিয়াছে জ্ঞান,

সকলি অসার তুমি জেনেছ ধরায়,
জীবন দিয়েছ তুমি বিশ্বের সেবায়।
যে রতন হারাইয়া হয়েছ যোগিনী
এ জগতে মিলিবে না সে ধন জননি!
এক বিন্দু দুঃখী অশ্রু মুছায় যে জন
হয় তা'র এমহীতে যোগ সমাপন,
ধন্য গো জগতে তুমি অমূল্য রমণী
পর অশ্রু মুছাইতে থেক মা ধরণী।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী,
ভবানীপুর।

পরিচয়।

(১)

কৌমুদী খচিত কুসুম কাননে,
ছড়ায়ে কুন্তল সান্ধ্য সমীরণে,
অৰ্দ্ধস্ফুট পুষ্প করিয়া চয়ন,
যখন করিবে মালিকা রচন,
অলক্ষিত তা'র নিকটে যাইয়া,
সরমকুঞ্চিত চিবুকে ধরিয়া,
কহিব, "যার লাগি গাথিছ মালা,
অচেনা পথিক আমি সে বালা।"

(২)

নিশীথ প্রদীপ স্তিমিত আলোকে
বিরলে বসিয়ে তন্দ্রানত চোকে
বাতায়ন পথে চাহিয়ে যখন,
নীরবে করিবে প্রহর গণন
মু'খানি চুমিয়ে মৃদুমৃদুস্বরে
কহিব তাহার শ্রবণ বিবরে
যা'র তরে তব আঁখি দুটী নত
আমি সে পথিক অপরিচিত।"

(৩)

প্রভাতে তরুণ অরুণ কিরণে
জাগিয়া উঠিয়া বিহগ কূজনে
কোমল করেতে লয়েবীণা খানি
গাহিবে যখন ভৈরবী রাগিণী
অশ্রুসিক্ত দুটী আঁখি মুছাইয়ে
ধীরে ধীরে কর পাশে দাঁড়াইয়ে
এ করুণ সুর যাহার উদ্দেশে
অচেনা পথিক আমি সে পাশে।

শ্রীকামিনীনাথ রায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

এক কৃষকের কতকগুলি হাঁস চুরি যায়, এবং সে চোর ধরিয়া বিচারালয়ে হাজির করে। চোরপক্ষের উকিলের কড়া জেরায় কৃষক উত্তর করিল "তা হুজুর আমার হাঁস দেখ্‌লেই আমি চিনিতে পারি" এই বলিয়া হাঁসের বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। উকিলবাবু সময়ের অপব্যবহার দেখিয়া বলিলেন "তোমার হাঁসের কোনও বিশেষত্ব দেখিলাম না, ও রকম হাঁসত আমার বাড়িতে দু দশটা আছে।"

কৃষক। "তার আশ্চর্য্য কি? শুধুত এই গুলিই আমার চুরি যাইনি।"

* * *

দুই ঠিক্। একজন কর্ম্মচারী পাগ্‌লাগারদ পরিদর্শনে গিয়া এক পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে এখন আছ কেমন, তোমার নামটা কি ভাল?" পাগল গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল "আমার নাম? আমি রাজা জন্মেজয়।" কর্ম্মচারী পূর্ব্বে একবার এই লোকটির সহিত কথা কহিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া বলিলেন—"সেকি সেবারে আমাকে বলিয়াছিলে তুমি শুকদেব?"

পাগল। "ওহো! বটেই ত সে প্রথম স্ত্রীর গর্ভে।"

* * *

ভিক্ষুকের সংবাদ পত্র। ফ্রান্সে (Mendicant's journal নামে) এক খানি ভিক্ষুকদের সংবাদপত্র আছে। ইহাতে রাজনীতি বা ধর্ম্মনীতির চর্চ্চা হয় না, লোকের গ্লানি বা কুৎসা প্রকাশিত হয় না আর যা' তা' কতকগুল বিজ্ঞাপনও নাই। ইহাতে ভিক্ষুকশ্রেণীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করা হয় এবং তাহাদের আবশ্যকীয় নিম্নলিখিত রকমের বিজ্ঞাপন থাকে, যথা—আজ সন্ধ্যা

নয়টার সময় অমুক বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে কাঙ্গালী বিদায় হইবে, সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।" "শনিবার প্রাতে পর্ব্বোপলক্ষে শীননদীর ধারে যাত্রী সমাগম হইবে।" "একজন অন্ধ বাদ্যকরের বিশেষ প্রয়োজন শীঘ্র আবেদন কর।" "মেলার জন্য ২৪ জন অন্ধ খঞ্জ বা বিকালাঙ্গের প্রয়োজন, রোজ একটাকা হিসাবে দেওয়া যাইবে।" ইত্যাদি—

* * *

গুরুর অনুমতি। গুরু গোয়ালাবাটী আসিয়াছেন। গুরুদেব তেল তামাক চাহিলেন। গোয়ালা বলিল আমি জাত গোয়ালা আমার বাটী তেল তামাক হবে না, এখানে ঘি তামাক করিতে হবে। সমস্ত মিটিলে গুরুদেব সম্মুখে ফুল সহিত একটী চামেলি ফুলের গাছ দেখিয়া শিষ্যকে অনুমতি করিলেন, বাবা দিব্য চামেলি ফুল ফুটিয়াছে কিছু সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস শ্রীভগবানের পূজা করি। গোয়ালা বলিল আমি পারিব না, ও গাছে ভিমরুলের চাক্ আছে। গুরুদেব বলিলেন আমি অনুমতি করিতেছি যাও ভয় নাই, ভীমরুলে কামড়াইলেও জ্বালা করিবে না, এই বলিয়া জিদ করিতে লাগিলেন। শিষ্য জানে ভীমরুল জাগ্রত দেবতা, কামড়াইলে রক্ষা নাই; বলিল প্রভু আপনার কথায় যদি এমন হয়, তবে আপনি নিজেই একবার গা তুলিয়া পুষ্পচয়ন করিয়া আসুন না কেন? এবার গুরুদেব বিপদগ্রস্থ হইলেন, কি করেন অগত্যা গেলেন। গাছে হাত দিবার মাত্র গুরুকে ভিমরুলে ঘিরিয়া দংশন করিতে লাগিল। প্রভু তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উহু জ্বলে না জ্বালা করে না উহু জ্বলে না জ্বালা করে না বলিয়া চিৎকার ও ছটফট করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গোহত্যা হয় দেখিয়া প্রতিবাসীরা আসিয়া নানা ঔষধ

প্রয়োগ দ্বারা গুরুকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। কিন্তু গুরুদেব আসিয়াছিলেন কৃশ বাটী ফিরিলেন স্থূলকায়। মা গোস্বামী চিনিতে না পারায় এক রাত্রি বাহিরে বাস করিতে হইয়াছিল।

* * *

উভয়ে অপ্রতিভ। প্রায় ১৬ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড রসেল (Lord Russel) জর্ম্মনির মৃত মন্ত্রী Prince Bismarckএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া, অপব কথাবার্ত্তার পর বিষমার্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আপনাব সহিত ত অনেক লোক দেখা করিতে আসে, কিন্তু যাহারা আপনাকে বিরক্ত করে তাহাদের নিকট কিরূপে নিস্তার পান। মন্ত্রী বলিল—"এই রকম লোক তাড়াইবার আমার একটী সহজ উপায় আছে। আমার স্ত্রী এই প্রকৃতিব লোক আমার নিকট আসিয়াছে জানিলেই সে আসিযা কোন অছিলায় আমাকে গৃহ হইতে ডাকিয়া লইয়া যায়" এই টুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন অমনি বিষমার্কের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন "অটো ঔষধ খাবে এস আরো দশ মিনিট পূর্ব্বে খাওয়া উচিত ছিল সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

জর্ম্মন দেশে এইরূপ নিয়ম আছে যে সাম্রাজ্ঞী বা রাজকুমারীরা কেহ এক পোষাক পরিয়া দুইবার সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। সকলেরই অসংখ্য নূতন ধরণের পোষাক আছে। এত পোষাক সত্ত্বেও সাম্রাজ্ঞী এ বিষয়ে মুক্তহস্ত। তাঁহার একটি পোষাকের মূল্য ১৫০০০ হইতে ৬০০০০ টাকা পর্য্যন্ত এবং কোন কোনটী এত ভারি যে কএকজন ভৃত্য তাঁহার পোষাকের পুচ্ছ (train) বহন না করিলে তিনি এক পা চলিতে পারেন না। এযাবৎ যত লাট মহিষী ভারতবর্ষে আসিয়াছেন তন্মধ্যে আমাদের

বর্ত্তমান লাট কর্জ্জন বাহাদুরের মহিষীর ন্যায় কাহারও এত মূল্যবান পোষাক ছিল কি না সন্দেহ। আমাদের বড়লাটের পত্নী মার্কিণ রাজ্যের কোন লক্ষপতির কন্যা।

সমালোচনা।

মুকুল—শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, এম্, এ, প্রণীত।

ইহা এক খানি কবিতা পুস্তক কিন্তু তাই বলিয়া আজ কাল যে বিরহ ও হতাশ প্রেমের উচ্ছ্বাস বা উদ্গার পূর্ণ রাশি রাশি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। ইহার বিষয় গুলি শিক্ষাপ্রদ, ভাব ও ভাষা সুন্দর। এই পুস্তক খানি বিদ্যালয় সমূহের পাঠোপযোগী। "সিদ্ধার্থের পুরত্যাগ," "নির্ব্বাসিতা সীতার উক্তি", "পিতৃ সত্য পালনে রামচন্দ্রের সাধুতা," "আত্মোৎসর্গ" "সেবা," "পরমার্থ," "বিশ্বপ্রেম," "স্বদেশ," "অন্ধকার নিশীথে," "চন্দ্রালোকে," "নদী," "সূর্য্য," "মেঘ" প্রভৃতি অধিকাংশ কবিতা গুলিই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। দুই এক স্থল হইতে দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

এই কথা ? এরি তরে এত কোলাহল ?
যৌবরাজ্যে অধিবাস,
তা'না হ'য়ে বনবাস,
দুয়ে কি প্রভেদ এত,—সুধা, হলাহল ?
চাহি না এ রাজবেশ,
শাসিতে কোশল দেশ,
চাহি ধর্ম্ম,—চাহি সত্য, জীবনের সার,
ভোগ সুখ তরে তৃষা নাহিকো আমার।

(পিতৃ সত্য পালনে রামচন্দ্রের সাধুতা)

বুঝেছি, বৃথায় নষ্ট না করি সময়,
চলেছ উদ্দেশ্য পথে আপনার মনে,
জগতের হিত তব উদ্দেশ্য নিশ্চয়,
দেহ পাত করি হিত সাধ' সযতনে।
বড় সাধ হয়, মেঘ, তোমারই মত,
পর উপকার ব্রতে সদাবই রত। (মেঘ)

স্থানাভাবে অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

পুস্তক খানির কলেবর ১০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি আনা মাত্র,
বি, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং এর নিকট প্রাপ্তব্য।

শোভা—মাসিক পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। অবতরনিকায় লিখিত আছে "শোভা—চুনা, পুটী হইলেও কই কাতলার আস্বাদ দিতে বিরত থাকিবে না।' পারিলেই ভাল। ২৪ পৃষ্ঠা পত্রিকায় উপন্যাস, গল্প, জীবন চরিত, চিকিৎসা প্রভৃতি ১২টী বিষয় সন্নিবেশিত করা আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত নহে। আমরা এই নূতন পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। "শোভা" বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

স্বাস্থ্য—চতুর্থ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। আমরা এই সংখ্যা পাঠে প্রীত হইয়াছি। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মূল্য সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। ৩২ পৃষ্ঠা পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ২ টাকা আমাদের নিকট কিছু অধিক বলিয়া বোধ হইল। প্রদীপ ও সাহিত্যের মূল্য ২৲ টাকা, আমাদের সামান্য "প্রয়াস" ডবল ক্রাউন ৬৪ পৃষ্ঠা হইলেও মূল্য ১০ মাত্র। এই হিসাবে "স্বাস্থ্যের" মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া বোধ হয় না কি?
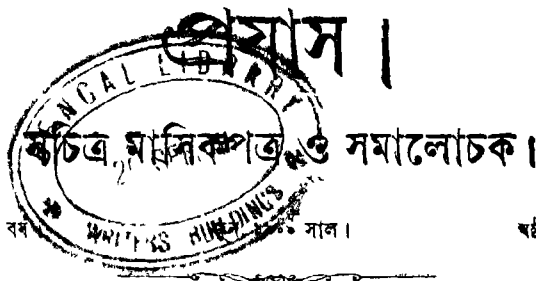
লক্ষ্ণৌ।

প্রয়াস।

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ ... সাল। ষষ্ঠ সংখ্যা।

বিদায়।

ছল ছল দু'নয়নে নীরবে চাহিয়া
আর কেন? কল্পনা গো! বিদায় এখন,
ছাড়িয়া তোমার সঙ্গ, জন্মভূমি, প্রিয়া!
কর্ত্তব্যের পরদেশে বিরহ-যাপন
করিতে হইবে মোরে সুদীর্ঘ সময়,
এই বিদায়ের ক্ষণে আঁখিজল ফেলি'
কেন কর ভাগ্যবতি! অমঙ্গলময়?
কাল্ সারা নিশি অশ্রু-মুকুতার ডালি
উপহার দিয়ে কিগো মেটেনি বাসনা?—
যতক্ষণ নাহি আসে আসন্ন বিপদ
মহতে করয়ে চিন্তা শঙ্কায় যাপনা
ততক্ষণই, এলে পরে বিপদই সম্পদ।
অশুচি অশুভ ঢাক ধৈর্য্যের সৌরভে
আসিব ফিরিয়া পুনঃ বিজয় গৌরবে।

৬ই জুলাই, ১৮৯৯।

পুনর্মিলন।

মুক্ত দেখি! মুক্ত দ্বার বিরহ-সদন,
এস এস, কবি পান দোঁহে পুনর্ব্বার
বিরহ-মন্থিত সুধা—বাঞ্ছিত মিলন।
কল্পনে! প্রাণময়ি! জীবন আমার!
মিলন-মঙ্গল গাও হিরণ অধরে,
লহ লহ হিয়া মোর লুণ্ঠিয়া সবলে—
তোমার অতল স্নিগ্ধ স্নেহের সাগরে
মগ্ন কর চিত্ত মোর দগ্ধ চিন্তানলে।
আবার এসেছি আমি হে মোর কল্পনা!
মুক্ত তব পুরদ্বারে মুগ্ধ সুখাবেশে,
দিকে দিকে প্রচারিয়া বিজয়-ঘোষণা
আবার তোমার কবি ফিরেছে স্বদেশে।
বিজয়-কিরীট শিরে হের গো প্রেয়সি!
কণ্ঠে বাহু বন্ধ দাও—মালিকা শ্রেয়সী।

১৯শে মে, ১৯০০।

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

সন্তান শিক্ষা।

———**———

আমার স্বামী যখন শিলচরে বদলী হইয়া আসিলেন তখন আমার তিনটি সন্তান,—দুইটী পুত্র ও একটি কন্যা। বড় পুত্রটির বয়স তখন দশ বৎসর, ছোটটীর দুই বৎসর। কন্যাটি তখন সাত বৎসরের। আমরা জাতিতে কায়স্থ। আমার স্বামী গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিসে সিগ্‌নেলারের কায করিতেন। মাহিনা যাহা পাইতেন তাহাতে সংসার-যাত্রা এক রকমে নির্ব্বাহ হইয়া যাইত।

আমাদের শিলচরে আসিবার প্রায় এক মাস পরে সিদ্ধেশ্বর ঘোষ নামে একজন সিগ্‌নেলার পরিবার লইয়া তথায় বদলী হইয়া আসিলেন। আমরা বাঙ্গালী পাড়ায় বাসা করিয়া ছিলাম। আমাদের বাসার অতি নিকটে একটি বাসা খালি ছিল; সিদ্ধেশ্বর বাবু তথায় আশ্রয় লইলেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে দেখিলাম দশ বৎসরের একটি পুত্র পাঁচ বৎসরের একটি কন্যা, তাঁহার স্ত্রী ও তিনি নিজে।

সিদ্ধেশ্বর বাবু বড়ই সামাজিক লোক আমার স্বামীও তদ্রূপ। এ ছাড়া চাকুরি এক। দুই পরিবারের শীঘ্রই ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। তাঁহারা প্রায় আমাদের বাসায় আসিতেন আমরাও তাঁহাদের বাসায় যাইতাম। বিদেশে যে কয়জন স্বদেশী থাকেন, তাহাদের মধ্যে মেশামিশি খুব বেশী। সহানুভূতি বড়ই প্রবল। প্রবাস, বন্ধুত্বের আবাসভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রবাসে বন্ধুত্বের বন্ধন বড়ই দৃঢ় হয়। তথায় পর আপন হইয়া যান। পরোপকারের দৃষ্টান্ত তথায় বিরল নহে।

অল্পদিন পরেই আমরা দেখিতে পাইলাম যে সিদ্ধেশ্বর বাবুদের চাল চলন অন্যরূপ—আচার ব্যবহার ভিন্ন প্রকারের। দেখিলাম তাঁহারা না খৃষ্টান না ব্রাহ্ম না মুসলমান না হিন্দু। ছেলেরা সব ইংরাজিতে কথা কয়। স্বামীর অনুপস্থিতি কালে তাঁহার কোনও বন্ধু বা অপর কোনও লোক আসিলে লজ্জার মাথা খাইয়া সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী তাঁহাদের সহিত কথা কয়, আসিবার প্রয়োজনাদি জিজ্ঞাসা করে এবং পুরুষের ন্যায় তাঁহাদিগকে আহ্বান করে। প্রাতঃকালে উঠিয়া হারমনিয়ম বাজাইয়া সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা সূচক গান করে। কাপড়ে শুষ্ক ভাত পড়িলে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়; কাপড় ছাড়িয়া ফেলে না, হাতও ধোয় না। তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া আমরা একেবারে অবাক্ হইলাম। অপরাপর সকলে তাঁহাদের কথা লইয়া কাণাকাণি ফুস্‌ফুসানি আরম্ভ করিল। এমন কি ঠাট্টা তামাসা করিতেও ত্রুটি করিল না। তাহাদের ব্যাপার দেখিবার ও শুনিবার জন্য আমাদের বাসায় আমোদপ্রিয় স্ত্রী পুরুষের সমাগম হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সিদ্ধেশ্বর বাবুদের এই সব কাণা কাণিতে একটুও চৈতন্যের উদয় হইল না। এই সব খ্রীষ্টানি-গিরি পরিত্যাগ করিলেনও না। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের আচরণ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। অতএব তাহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইল যে ঈশ্বর বোধ হয় সিদ্ধেশ্বর বাবুদের "পিত্তি" টুকু একেবারে দেন নাই। আমি কিন্তু কিছু অনিচ্ছা সত্বেও আমাদের এই অতিথিবর্গের পক্ষ সমর্থন করিলাম এবং লোক নিন্দার ভয়ে সিদ্ধেশ্বর বাবুদের বাসায় গতায়াত কিছু দিনের জন্য বন্ধ করিবার মনস্থ করিলাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার মনস্থ কার্য্যে পরিণত করিতে

পারিলাম না। দু'দিন সিদ্ধেশ্বর বাবুদের বাসায় না যাওয়ায় তাঁহার স্ত্রী আমাদের বাসায় আসিলেন এবং আমি কেন তাঁহাদের বাসায় যাই নাই তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আসল কথা গোপন করিয়া সাংসারিক কার্য্যের ব্যস্ততা নিবন্ধন যাইতে পারি নাই বলিলাম। তাহার পর তিনি পরদিন তাঁহাদের বাসায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া গেলেন। আমিও যাইতে সম্মত হইলাম—অবশ্য দায়ে পড়িয়া।

পরদিন সকাল সকাল আহারাদি করিয়াই আমি সিদ্ধেশ্বর বাবুদের বাসায় গমন করিলাম। সিদ্ধেশ্বর বাবু তখন ডিউটিতে বাহির হইয়াছেন। গিয়া দেখিলাম যে সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী নিজ পুত্রকন্যাকে লইয়া লেখা পড়া শিখাইতেছেন; দেখিলাম তাঁহার হাতে একখানি ইংরাজি পুস্তক ও পুত্রকন্যারা হাতের লেখা লিখিতেছে। আমাকে দেখিয়া তিনি সম্ভ্রমে উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া সাদরে তাঁহার নিকট বসাইলেন এবং অন্যান্য সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কি পাকাদি ও আহার হইল তাহার বিষয় কথা বার্ত্তা না হইয়া অন্যান্য বিষয়ের কথা আরম্ভ হইল। আমিও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের ঐরূপ ধর্ম্ম ও সমাজ বিরুদ্ধ কথার উত্থাপন করিলাম এবং তাঁহাদের উপর আমার প্রতিবেশিনীগণের মতামতের বিষয় বলিলাম। এবং তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "বোন্, তোমার ছেলেরা স্কুলে যায় না কেন? এই দেখ দেখি আমার ছেলেরা সব কেমন স্কুলে যায়। না গেলে উনি কত মারেন বকেন; কায়েতের ছেলে স্কুলে না গেলে চল্‌বে কেন? আর ভালও দেখায় না। স্কুলে না গেলে কি লেখাপড়া হয়? তোমার স্বামীও ত কিছু বলেন না!" আমার সমস্ত কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিয়া তিনি বলিতে লাগি-

লেন "দিদি, তুমি যাহা বলিলে তাহা শুনিলাম কিন্তু আমরা ত কিছুই অন্যায় কায করি না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সকলকারই কর্ত্তব্য। কাপড়ে শুষ্ক ভাত পড়িলে কাচিয়া দিলেই পরিষ্কার থাকা হয় না। আহার পরিচ্ছদ শয্যা প্রভৃতি বিষয়ে পরিষ্কার একান্ত আবশ্যক—আমরা করিয়াও থাকি। আর তুমি যে লজ্জার কথা বলিলে আমার বিবেচনায় ঐরূপ ব্যবহার করিলে নির্লজ্জতা প্রকাশ পায় না। স্বামী যদি গৃহে না থাকেন তবে কি অভ্যাগত ব্যক্তির আহ্বান হইবে না? মিথ্যা কথা বলিতে লোকের লজ্জা হওয়া উচিত। লোকের নিন্দা করা হিংসা করা মন্দ করা প্রভৃতি কার্য্যগুলিই লজ্জাজনক। গান করা ইংরাজি পড়াশুনা করাকে আমি লজ্জাজনক বলিয়া বিবেচনা করিনা। যে কার্য্যে অনিষ্ট নাই বরং ইষ্টই অনেক সেই কায করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

"আর ছেলেদের লেখা পড়ার সম্বন্ধে যে কথা উত্থাপন করিলে তাহা অতিশয় গুরুতর। সন্তান শিক্ষার উপর ব্যক্তিগত জীবন এমন কি জাতীয় জীবনের ভাবী সুখ দুঃখ উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে। এই সন্তানেরাই উভয়ে সমাজের উপর কিয়ৎ পরিমাণে কর্ত্তৃত্ব চালাইবে। অতএব ইহাদের উপরেই আমাদের দেশের ভাবী উন্নতি স্থাপিত রহিয়াছে। ইহা আজ কাল প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরিয়াছে। সেই জন্যই আজকাল সমাজের শীর্ষস্থানীয় ভক্তিভাজন মহাপুরুষগণ সন্তানদের রীতিমত শিক্ষার জন্য মনোনিবেশ করিয়াছেন। সে কথা এখন যাউক আমরা কেন ছেলেদের স্কুলে পাঠাই না তাহা শুন। তুমি বোধ হয় জান যে একটি প্রবাদ আছে "সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট"; একথার সত্যতা সম্বন্ধে দুইটি মত নাই। সকল দেশের সকল লোকেই ইহার

সত্যতা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অল্প বয়সে স্কুলে পড়ার দোষ অনেক। স্কুলে অনেক ছেলের সমাবেশ। তাহাদের সকলের স্বভাব চরিত্র সমান নহে; ক্লাশে ভাল ছেলের সংখ্যাই কম মন্দ ছেলের সংখ্যাই অনেক। সুকুমারমতি বালকদিগের বিবেচনা শক্তি তত পরিস্ফুট নহে তাহাদের মন শীঘ্রই এবং স্বতঃই মন্দের দিকে আকৃষ্ট হয় অতএব স্কুলে তাহাদের কুশিক্ষা হইবার সম্ভাবনা বড়ই অধিক। স্কুলে না পাঠানর ইহাই প্রধান কারণ। এছাডা স্কুলে উপস্থিত নিয়মানুসারে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা দুষণীয়। তাহাতে ছেলেদের জ্ঞান বডই সীমাবদ্ধ হয়। তাহারা পৃথিবীর অপরাপর বিষয় জানিবার তত সুবিধা পায় না; তাহাদের বিদ্যা প্রায় "পুঁথিগত" হইয়া থাকে। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার স্বামী বাড়ীতেই ছেলেদের শিক্ষা দিবার মনস্থ করিয়াছেন। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া আমরা সকলেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গান করি। তাহার পর ছেলেদের কিছু জলযোগ হইয়া গেলে উহারা উঁহার সহিত বেড়াইতে বাহির হয়; আমি তখন সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হই। বেডাইবার সময় উনি উহাদিগকে এটা ওটা দেখাইয়া তাহাদের নাম ধাম উপকারিতা প্রভৃতি বোধগম্য বিষয় শিখাইয়া দেন। বেডাইবার পর বাসায় আসিয়া উনি ঘণ্টা দুই পড়ান এবং পড়া লয়েন। পড়া শুনা হইলে উনি স্নানাহার করিয়া আফিসে চলিয়া যান। ছেলেদের খাওয়া হইলে তাহাদের একটু ঘুম পাডাইয়া আমি আহারাদি করি এবং তৎপরে একটু বিশ্রাম করি। তাহার পর উহাদিগকে জাগাইয়া পড়াইতে বসি। যাহাতে আমি দুপুর বেলা তাঁহার আফিস অবস্থান কালে তাহাদিগকে পড়াইতে পারি এই ভাবিয়া তিনি আমাকে বাঙ্গালা ইংরাজি শিক্ষা

দেন। আমি এখনও তাঁহার নিকট হইতে ইংরাজি শিখিতেছি এবং তিনি আমাকে এরূপ শিখাইবার মনস্থ করিয়াছেন যাহাতে আমি অনায়াসে উহাদিগকে এণ্ট্রান্স স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়াইতে পারি। পড়াশুনা হইয়া গেলে উহারা জলখাবার খাইয়া নিজেদের ইচ্ছামত খেলা করে। রাত্রে তাহারা পড়া শুনা করে না। সন্ধ্যার সময় ঈশ্বর উপাসনার গান হইয়া গেলে এদিক ওদিক খেলা করে এবং রাত্রে আহার হইয়া গেলে নিদ্রা যায়। আমার স্বামী তখন নিজে পড়েন এবং আমায় পড়ান। আর ছেলেদের শিক্ষোপযোগী কিছু দেখিলে তাহা চিহ্ন করিয়া রাখিয়া দেন—ভবিষ্যতে শিখাইবার জন্য।"

আমার নিকট তাঁহার কথা গুলি প্রকৃত বলিয়া বোধ হইল এবং তাহাতে যে কিছু নূতনত্ব আছে তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। আমি অতিশয় আগ্রহ সহকারে শুনিতে ছিলাম এবং একটু একটু করিয়া তাঁহাদের উপর আমার যে একটা ঘৃণা ছিল তাহা অপসারিত হইতেছিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন "ইহা গেল সন্তানদের লেখা পড়া শিক্ষার কথা। আমি তোমাকে আরও অধিকতর আবশ্যকীয় শিক্ষার বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি অনুগ্রহ করিয়া শুন। সন্তানদিগকে সচ্চরিত্র সুশীল করিতে হইলে দুইটি বিষয় একান্ত প্রয়োজনীয়। একটি সৎ শিক্ষা অপরটি পিতামাতার নিজে সৎ হওয়া। দ্বিতীয়টীর গুরুত্ব প্রথমটি অপেক্ষা কোনও ক্রমেই ন্যূন নহে বরং অধিক বলিয়াই প্রতীত হয়। আমি নিজে ভাল হইব না অথচ প্রত্যাশা করিব যে আমার ছেলেরা ভাল হইবে, আমি নিজে মিথ্যা কথা কহিব অথচ নিজে আশা করিব আমার ছেলেরা সত্য কথা বলিবে ; আমি নিজে অসৎ পথে যাইব আর আমার ছেলেরা

সৎ হইবে উহার ন্যায় বিড়ম্বনাও আর নাই। আমার স্বামী বড়ই সৎ। আমার স্বামী বলিয়া এ কথা বলিতেছি না প্রকৃত পক্ষে তিনি পরের কখনও নিন্দা করেন না, পরের কথা লইয়া কখনও থাকেন না। ভুলিয়াও কখন মিথ্যা কথা বলেন না। পরোপকার করিতে পারিলে তিনি বড়ই উৎসাহিত হন।

"ছেলেকে সৎ করিতে হইলে শাসন আবশ্যক। কোনও অন্যায় কার্য্য করিলে প্রহার না করিয়া উপদেশ সূচক বাক্যে তিরস্কার করা উচিত। তিরস্কার করিবার সময় অপর পক্ষ হইতে ছেলের সহায় হইয়া আদর করা একেবারে অন্যায়। ইহাতে বড়ই কুফল উৎপাদন করে। আমি দেখিয়াছি যে কোনও অনিষ্টের বা কুকার্য্যের জন্য পুত্র, পিতা কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে মাতা চুপ করিয়া না থাকিয়া অন্যায় রূপে অপরাধী পুত্রের সহায় হইয়া স্বামীকে অযথা গালি বর্ষণ করেন। এইরূপ ব্যবহারে ছেলেদের মাথাটি খাওয়া হয়। বাঙ্গালীর ঘরে এইরূপ কাণ্ড বিরল নহে। ছেলেদের মাটি হওয়ার এই একটি প্রধান কারণ। পিতা মাতা সৎ না হইলে পুত্রেরা চুরি বিদ্যা শিক্ষা করে। আমি দেখিয়াছি পুত্র অপর ব্যক্তির গাছ হইতে আম লিচু প্রভৃতি চুরি করিয়া আনিলে তজ্জন্য তিরস্কার করা দূরের কথা বরং মাতা মিষ্ট বাক্যে তাহাদিগকে গ্রহণ করেন; এমন কি ঐ কার্য্যে কখন কখন উৎসাহও প্রদান করিয়া থাকেন। কোন কোন জননী, দুই একটী পথের ধারে ফেলিয়া আসায়, তিরস্কার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। আমার স্বামী এসব বিষয়ে বড়ই সতর্ক। আমার ছেলেরা কাহারও বাড়ী গমন করিলে যদি তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া উহাদিগকে পুঁতুল বা খেলনা দেয় তাহা হইলে ঐগুলি কি প্রকারে

পাওয়া গেল এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই শুদ্ধ ক্ষান্ত হয়েন না। যাঁহারা ঐ গুলি দিয়াছেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। বাড়ীতে খাবারাদি থাকিলে তাহারা কখনও চুরি করিয়া খায় না। আমার বলা আছে ক্ষুধা পাইলেই তাহারা খাইতে পারিবে।"

আমি তাঁহার কথা গুলি অতিশয় আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতে লাগিলাম। আমার অন্তর হইতে ঘৃণা তিরোহিত হইয়া গিয়া তাঁহার উপর আমার একটু ভক্তির উদয় হইল। তাহার পর আমি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম "বোন্ ছেলে পিলেদের সত্যি কথা কহিতে কি করে শেখাতে হয়?"

আমার কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী বলিতে লাগিলেন, "দিদি, আমি ঐ কথাই বলিতে যাইতেছিলাম। ছেলেরা মিথ্যা কথা কহে কেন? অবশ্যই কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করায় তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য। আমি অন্যায় কায করিয়াছি পিতামাতা আমায় নিশ্চয়ই বকিবেন শাস্তি দিবেন এই ভয়েই তাহারা মিথ্যা কথা বলে। অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে এই ভয় নিবারণ করিতে পারিলেই উহাদের নিকট হইতে সত্যকথা পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারা যায়। তাহাদের ভয় নিবারণ করিতে হইলে দৈহিক শাস্তি এমন কি মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও বন্ধ করা একেবারে উচিত। অনেক মনে করিবেন ইহাতে বরং অন্যায়কে অনেকাংশে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না। কেবল উপদেশ সূচক তিরস্কার করিলে সুফল প্রায় ফলিয়া থাকে। দৈহিক শাস্তিতে অনুপকারই প্রায় দেখা যায়। মনে কর আমার ছেলে অসাবধানতা বশতঃ একটি কাচের বা অন্য কোনও মূল্যবান দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আমি যখন জানিতে পারিলাম তখন একে একে সকল পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম কে উহা ভাঙ্গিয়া

ফেলিয়াছে? যে ভাঙ্গিযাছে সে যদি জানে যে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে খুব মারিব ও বকিব তাহা হইলে সে উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিবে এবং চাকর বাকরের উপর বা আর কাহারও উপর দোষারোপ করিবে। আর যদি সে জানে যে আমি উহার কিছুই করিব না তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সত্য কথা বলিবে। আর যদি সে ভাঙ্গিয়া থাকে অথচ মিথ্যা কথা কয় তাহা হইলে তাহাকে মিথ্যা কথা বলার জন্য তিরস্কার করা বা শাস্তি দেওয়া উচিত—ভাঙ্গিবার জন্য নহে। এইরূপ করিলে সে বুঝিতে পারিবে যে তার মিথ্যা কথার জন্যই সে দণ্ডিত বা তিরস্কৃত হইতেছে অতএব সে ভবিষ্যতে সাবধান হইবে। আর যদি সে নিজ দোষ স্বীকার করে তাহা হইলে তাহাকে তাহার কার্য্যটি যে অন্যায় হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহার সত্য কথা বলার জন্য তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া উচিত। ইহাতে সে এই মনে করিবে যে সত্য কথা বলার জন্যই সে ঐ পুরস্কার পাইয়াছে অতএব সত্যের উপর তাহার অনুরাগ জন্মাইবে।"

আমি তাঁহার এই সুন্দর কথা গুলি শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। দুই একটি অন্য কথা বার্ত্তার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা মেয়েদের কি এই রকমে শিক্ষা দেওয়া উচিত না তাহাদের আর কিছু বেশী আবশ্যক?"

তিনি বলিতে লাগিলেন "এ সব ত তাহারা শিখিবেই তা'ছাড়া তাহাদের শিখিবার আরও অনেক আছে। তাহাদের শিক্ষা পুত্রদের শিক্ষা অপেক্ষা গুরুতর; কেননা তাহাদের উপর সংসারের ভার ও পুত্র কন্যাদিগের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইবে। মেয়েদের দ্বারাই পুত্র কন্যাদের চরিত্র অনেকাংশে গঠিত হয়। কারণ শৈশব কালে যখন

তাহাদের চরিত্র গঠিত হইতে থাকে তখন তাহারা মাতার নিকটেই বাস করে। সেই সময় তাহারা যে শিক্ষা পায় সেই শিক্ষা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর অনেক পরিমাণ প্রভুত্ব করে। অতএব তাহাদিগকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে তাহারা শ্বশুর শাশুড়ী দেবর প্রভৃতি লইয়া সুচারুরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়, আর নিজ পুত্র কন্যাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে। মেয়েদের শিক্ষার উপর বেশী মনোযোগ আবশ্যক। আমার বিবেচনায় তাহাদের লেখাপড়া শেখা যত না আবশ্যক নির্ব্বিবাদে সংসার চালান শিক্ষা তাহা অপেক্ষা শতগুণ আবশ্যক। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে অনেকে এ বিষয়ে বড়ই ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। মেয়েদের লেখা পড়া শিক্ষার জন্য তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত কিন্তু তাহা অপেক্ষা শতগুণ এমন কি সহস্রগুণ আবশ্যকীয় এই বিষয়টী উপেক্ষা করেন। সে লেখা পড়া শেখার উপকারিতা কি? যদি শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সেবা করিতে জানিলাম না—যদি সুখের সংসারে হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতার দ্বারা অশান্তির অনলশিখা জ্বালাইয়া দিলাম। যাহা হউক দিদি এই আপনাকে প্রধান প্রধান বিষয় কয়টী বলিলাম। আরও অনেক বিষয় আছে সে সব বলিতে গেলে দু'এক দিনে হয় না। একটু বিবেচনার সহিত কার্য্য করিলেই সব হইতে পারে। তবে আমি অত্যাবশ্যকীয় একটী শিক্ষার কথা বলিয়া অদ্যকার কথা শেষ করিব। সেটি স্ত্রী শিক্ষার প্রধানতম অঙ্গ। নিস্বার্থপরতার উপর আমাদের সংসারের সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তি নির্ভর করিতেছে। আজ কাল আমাদের বাঙ্গালী সংসারে অশান্তি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে ইহার প্রধান কারণ স্বার্থপরতা। এমন অনিষ্ট নাই যাহা স্বার্থপরতার দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। সতীশ বাবুর "বায় পরিবার" ও তারক বাবুর "স্বর্ণলতা"

তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই স্বার্থপরতার জনাই ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ এই স্বার্থপবতাব জনাই সংসারে প্রত্যহ কলহ উপস্থিত হইতেছে। অতএব নিস্বার্থপরতা শিক্ষা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। কিন্তু কি উপায়ে ঐ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে আমাব স্বামী যে রূপে শিক্ষা দেন তাহা বলিতেছি শুন। তিনি বলেন ছেলে মেযেকে নিস্বার্থপবতা শিক্ষা দিতে হইলে পিতামাতাব নিস্বার্থপব হওয়া একান্ত আবশ্যক। ছেলে মেয়েদের সাক্ষাতে কেবল নিস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে পরিবেশনকারিণী মাতা পরিবেশন কালে নিজ পুত্রকেই বেশী দিযা থাকেন বা দিবাব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এছাডা অন্যান্য অনেক স্থলে পুত্রকন্যাদেব সাক্ষাতেও ঐরূপ অনিষ্টকব পার্থক্য দেখাইযা থাকেন। ইহাতে তাহাবা মনে করে যে পবেব সহিত এইরূপেই ব্যবহাব করিতে হয়। আপনাব গণ্ডা বুঝিয়া লইতে হয়। আপনার জিনিষ আবশ্যক হইলে পরকে কদাচ দিতে নাই। নিস্বার্থপবতা শিক্ষা দিতে হইলে পুত্রকন্যাদেব সর্ব্বদা একত্র থাকিতে দিতে হয় একত্র খাইতে দিতে হয়। আপনাব জিনিষ পরকে দিতে শিখাইতে হয় ইহাতে স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা করে। আমার স্বামী মধ্যে মধ্যে ছেলেদেব ঐরূপ শিক্ষা হইল কিনা তাহা পরীক্ষা লযেন; আমার বড় ছেলেটিকে খাবাব দিয়া বলেন "যা, তোতে আর খুকিতে খাইগে যা "এই কথা বলিয়া তিনি আডাল হইতে দেখেন কে নিজে বেশী খাইতেছে কি দুজনে সমান খাইতেছে; নিজে অধিক খাইলে বডই বকেন। কখনও অপব ব্যক্তির ছেলেকে আনাইয়া ভুপেনকে একটি ভাল জিনিষ দিয়া বলেন "ভুপেন ও তোমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে ওকে ঐটা দাও। যদি

দেয় তাহা হইলে উনি তাহাকে কত আদর যত্ন করেন তাহা অপেক্ষা ভাল জিনিষ তখনই কিনিয়া আনিয়া দেন। আর যদি না দেয় তাহা হইলে তিনি যৎপরোনাস্তি বকেন এবং ঐ জিনিষটাও কাড়িয়া লয়েন।

"একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে নিস্বার্থপরতা শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা অনেক। তথায় পিতা মাতা ভাল হইলেই হয়। তথায় ছেলে পিলের সংখ্যা অধিক। অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে কোনও খাদ্য দ্রব্য আসিলে জননী নিজ পুত্রদের জন্য অর্দ্ধেক আত্মসাৎ করিয়া থাকেন; ইহাতে যে ছেলেরা স্বার্থপরতা শিক্ষা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহা ছাড়া অনেক উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর স্ত্রী সংসারে বিষ বৃক্ষের বীজ বপন করিবার জন্য বলিয়া থাকেন "আমার স্বামী রোজগার করিতেছে আমি আমার ছেলেকে বেশী দিব আমার ইচ্ছা। (দেবরকে লক্ষ্য করিয়া) উনি খালি ভায়ের অন্ন ধ্বংস করিবেন নিজে বেশী উপায় করিতে পারিবে না তবু আবার কথা বল্‌বে" এইরূপ মাতার নিকট হইতে কি শিক্ষা করা যাইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।"

তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি তাঁহাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। এবং তথায় কিছুক্ষণ থাকিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই দেখিতে পাইলাম আমার মনের ও মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে ঐ সব কথা বলিবার জন্য উৎসুক চিত্তে তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দুঃখের বিষয় তিনি সে দিন অনেক দেরি করিয়া বাসায় ফিরিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়াতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার আজ আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? সিদ্ধেশ্বর বাবুত অনেকক্ষণ আসিয়া-

ছেন জল টল খাইয়া ছেলেদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন তোমার আর আসা হয় না।" "কেন দেরি হ'ল বলিব" বলে তিনি মুখ হাত ধুইয়া জল খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন "তোমারা যা'হোক খুব মেয়ে মানুষ বটে। তোমরা সব কর্‌তে পার" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন হয়েছে কি ?"

আমায় উত্তর করিলেন "আর হযেছে কি। সিদ্ধেশ্বর বাবুদের আজ যাহা দেখে শুনে এলুম তা'তে তোমাদের বিবেচনা শক্তি টুকু ঈশ্বর দিয়াছেন কিনা সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্চে।"

বলা বাহুল্য আমি সিদ্ধেশ্বর বাবুদের বিষয় তাঁহাকে বলিবার জন্য এতক্ষণ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলাম। তাঁহার মুখে ঐ সিদ্ধেশ্বর বাবুদের কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। আমি তাঁহাকে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম "বলি ব্যাপারটা কি খুলে বল না।"

আমার স্বামী বলিতে লাগিলেন "যা শুনে এলাম তা'তে আমার বোধ হয় যে সিদ্ধেশ্বর বাবুরা দেবতা। আচ্ছা সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রীকে কখনও কি গহনা পরিতে দেখিয়াছ ? তাহার গহনা টহনা আছে কি বলিতে পার ?"

আমি। না। তাহার হাতে দুই গাছা বালা ছিল বটে কিন্তু আজ কয় দিন হল আর দেখিতে পাচ্ছিনে—বলি এসব কথা কেন ?"

স্বামী। "শুন তবে বলি। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী বিবাহের সময অনেক গুলি গহনা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাড়ীতে কএকজন ভাই আছে তাহাদের পড়াশুনার খরচের জন্য প্রায় সমস্ত গুলিই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী এমন লক্ষ্মী যে স্বইচ্ছায় সে গহনা গুলি খুলিয়া দিয়াছেন ; হাতে কেবল দুই গাছি বালা ছিল তাহা সেদিন তাহার এক দেবরের বি, এ পরীক্ষার টাকা জমা

দিবার জন্য বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেখ দেখি কেমন মেয়ে মানুষ! তোমাদের এত গহনা রহিয়াছে তবু আর একখানির জন্য বিরক্ত করিয়া মারে। এতক্ষণ ওদেরই কথাবার্ত্তা হইতে ছিল। অদ্য অন্নদা বাবুর বাসায় আমার একটু দরকার ছিল; সেখানে গিয়া দেখি সিদ্ধেশ্বর বাবু ও তাহার ছেলে মেয়ে রহিয়াছে। অন্নদা বাবু তাহা-দিগকে একটি গান করিতে বলিলেন। তাহারা পিতার অনুমতি লইয়া ঈশ্বর সম্বন্ধীয় একটী সুন্দর গান করিল। শুনিয়া সকলেই মোহিত হইল। তাহার পর সিদ্ধেশ্বর বাবু ভুপেনকে জয়দেবের দশ অবতারের স্তব, মোহমুদ্গর প্রভৃতি সংস্কৃত পদ্য মুখস্থ বলিতে বলিলেন। ভুপেন এমনি সুন্দর ভাবে তাহা বলিল যে আমি একে-বারে আশ্চয্যান্বিত হইয়া গেলাম। তাহার পর আশালতাও কতগুলি বাঙ্গালা পদ্য মুখস্থ বলিল। ঐ টুকু মেয়ের মুখে অমন পদ্য শুনিয়া সকলেই তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। আমিও তাহাদিগকে দুই একটী প্রশ্ন করিলাম। ঠকাইতে পারিলাম না। আহা দেখ দেখি তাহারা কেমন সোণার চাঁদ ছেলে! আমাদের ওদের দেখলেই গা জ্বালা করে। এক একটি যেন ভুত" তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে আমার বক্তব্য সমস্ত তাহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া দেখিলাম তাহাদের প্রতি আমার স্বামীর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল। তাহার পর দিন হইতে তিনি আমাকে পড়াইতে শুনাইতে লাগিলেন এবং ছেলেদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং নিজ বাড়ীতে তাহা-দিগকে পড়াইতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাহার উপকারিতা দেখিতে পাইলাম। আমাদের দেখাদেখি অপরাপর লোকে যাহারা দুইদিন পূর্ব্বে তাহাদের নিন্দা করিতেছিল আমাদের অনুসরণ করিল।

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ও জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের ছেলেরা আর চক্ষুশূল বা ভুক্ত নাই। এখন তাহাদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমার বড় ছেলেটীর বাড়ীতে পড়া শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই তাহাকে এণ্ট্রেন্স স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে এখন সকলেই তাহাকে ভাল বাসে ও স্নেহ করে। আমার কন্যা সরলার সুখ্যাতি তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর মুখে আর ধরে না। আমাদের সংসার এখন স্বর্গের ন্যায় হইয়াছে। মাঝে মাঝে সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রীর পত্র পাই। তিনি আমাদের যে উপকার করিয়াছেন তাহা আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না। ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন।

শ্রীমতি প্রবোধিনী ঘোষ।
চন্দননগর।

ভূমিকম্প।

(১)

করিতেছে গোল ছেলে মেয়ে গুলো,
বানরের মত লাফাইছে ভুলো,
গিন্নি, বৌমাকে থামাইতে বলো,
কোলের খুকিকে তার,
মাঠে যাও হরি লইয়া লাটাই
উড়াওগে ঘুড়ি সেখানে কানাই
বাইকেতে চড়ি' যাওগো বলাই,
যাদব নিমাই আর।

(২)

তোমার কুকুর ইঁদুর শিকারী,
তা'রে লয়ে যাও ওহে গিরিধারি,
ভুলোনা ভোলায় নিতে সঙ্গে করি'
শিকার শিক্ষা তরে;
উমা, উষা, লীলা, রতি, মতি, বেলা,
বাগানেতে গিয়ে কর সবে খেলা,
জামরুল গুলো ছিঁড়ে এই বেলা,
আনগে আঁচল ভোরে।

(৩)

ঘরে বসে' বসে' লিখিছে গোকুল,
যদু, মধু, বিধু গিয়েছে স্কুল,
থেমেছে, এবার যত হুলস্থুল,
বাঁচা গেল এতক্ষণ!
পাঠে মন তবে দিই এইবার,
"ম্যাল্‌থসে"র লেখা কিবা চমৎকার।
"ম্যাল্‌থস্‌" তুমি যে জগতের সার,
পণ্ডিত বিচক্ষণ।

(৪)

উদার মতের সহিত তোমার—
সুগভীর মিল রয়েছে আমার,
সংসারের হিতে—বুঝিয়াছি সার—
মানুষ কমান চাই,
লোকে লোকারণ্য হ'তেছে সংসার,
এত মহামারী, যুদ্ধ, অনাহার,
এত পীহাফাটে, বুটেতে গোরার,
তথাপি কমেনা ছাই!

(৫)

হায়, ধর্ম্মরাজ, তুমিও হারিলে,
ধরণীর ভার হরিতে নারিলে,
কলিকালে কৃষ্ণ কোথায় রহিলে,
স্ববংশনিধনকারী?
চাকরি করিছে লোক রাশি, রাশি,
অসংখ্য উকিল গাছতলাবাসী,
ডাক্তার, বণিক্‌, কত চাপরাশী,
উমেদার, কর্ম্মচারী।

(৬)

খাবারেরো দেখ বিস্তর দোকান,
কত লোকে বেচে বার্ডসাই পান,
বলিতে কিন্তু বিদরে পরাণ,
শববাহী মেলাদায়!
বালক, বালিকা, দাস, দাসী আর
সধবা, বিধবা, যুবতী, যুবার,
কে করে গণনা—বুড়ী ও বুড়ার
বিনাশের কি উপায়?

(৭)

পণ্ডিত বলি' যাঁদের বাখানে
সেই সব যত মূর্খ, অজ্ঞানে,
বলে বিনাশকারী উঠায়ে সেখানে
কর চির নির্ব্বাসন,
আরো বলে—দাও আর্ত্তের স্থান
রোগীর সেবায় ঢাল কায়, প্রাণ;
বাঁচাও অভুক্তে করি' অন্নদান,
আহাম্মক যত জন।

(৮)

তাঁদেরি হৃদয় করুণ, উদার,
শ্মশান প্রাঙ্গণ করিয়া বিস্তার,
যাঁ'রা মানবের মহদুপকার
করেছেন সুসাধন;
তাঁহারাই বটে বিজ্ঞ, সুধীর,
বহায় যাঁহারা মানব রুধির,
লোক হিত তরে ভার ধরণীর
হরিতে বাঁধায়ে রণ।

(৯)

আমার উপরে হ'ত যদি ভার,
যত নরাকার পিশাচ হত্যার
সাধিতাম কত হিত অনিবার,
কি আপন সাধারণ ;
মরুক এখনি কসাই কৃপণ ;
অসমর্থ ঋণী বাঁচে কি কারণ?
একান্ত বাসনা লভুক মরণ
যিনি মোর মহাজন।

(১০)

সাধারণ সুখ বর্দ্ধন ছলে,
মারিতে হইবে কামিনীর ছেলে ;
প্রমদা এবার কথা না রাখিলে,
পাঠাইব যমালয় ;
চলিতে হইবে আইন ধরিয়ে
ভবিষ্য সুখের উপায় রাখিয়ে,
কি সূত্রে নাশিব পাইনা খুঁজিয়ে,
তীর্থ মন্দির চয়।

(১১)

হ'লে বঙ্গালয় পরিপূর্ণ লোকে
সৌন্দর্য্যে,গীতে,আমোদে,আলোকে,
ডিনেমাইট্ দিয়ে অমনি পলকে
উড়াইয়া দিলে সব—
কত যে লাঘব হয় দুঃখ, শোক,
ঘুচে যায় মিছে আমোদের ঝোঁক,
নিবে যায় কত জীবন-আলোক,
থেমে যায় কলরব।

(১২)

লোক হিত হায়, বোঝে কয় জন?
পরম দয়াল বর্জ্জি যখন,
গ্রামের স্বাস্থ্য করিতে শোধন,
আগুন লাগালে দেশে—
ঋষিরাও হোম করিত আগুনে—
বোকা'শিরোমণি' সে কথা কি শোনে
ঘর পুড়াইল বলি' যত জনে,
ডাকিয়া নিবা'লে শেষে।

(১৩)

আহারে, বিহারে, আমোদে উৎসবে
বিষ ব্যবহার করে যদি সবে,
অন্ন জলাভাব হইতে যে ভবে
কত লোক পায় মুক্তি।
কেন জন্মায় হেথা মেয়ে গুলো,
গলা টিপে টিপে শুধু মেরে ফেলো,
কন্যাদায় হ'তে মরণ যে ভাল
ঘুচুক্ পণের চুক্তি।

(১৪)

আসিয়াছে প্লেগ এদেশে যখন,
রাখ তা'রে করি' পরম যতন
মিছে কোয়ারেন্টাইন,আইসোলেশন
থাকিতে মৃত্যুর কোল,
এস বিসূচিকা, এস বসন্ত
এস ম্যালেরিয়া ব্যাধি দুরন্ত
নানা বেশে এসে লহ কৃতান্ত,
হরি বোল। হরি বোল।"

বিহারিলাল।

মাসিকপত্রে ও গদ্যসাহিত্যে।

বঙ্গীয় ১২৬৫ সালে "পূর্ণিমা" নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা এই মহানগরীতে প্রচারিত হয়। ঐ বর্ষের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উক্ত পত্রিকার জন্মলাভ হয় এবং পর বৎসরের শারদীয়া পৌর্ণমাসী সংখ্যা অবধি উহার স্বল্পায়ুর স্থিতি কাল। "রত্নসার" নামক পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ ঘোষ, উহার পরিচালক ছিলেন। এই পত্রিকায় বিহারিলাল পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনাই লিখিতেন। "পূর্ণিমা"র 'সূচনা'টি বিহারিলালের লেখনী-প্রসূত। ইহা পাঠ করিলে বিহারিলাল মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে কতদূর অনুরাগী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই পত্রিকায় বিহারিলাল 'প্রেম বৈচিত্র্য" নামক একটী কবিতা লিখেন, উহা উল্লেখযোগ্য। উহা, পরে কবির "প্রেম প্রবাহিণী" কাব্যে স্থান পাইয়াছিল।

"পূর্ণিমা'র বিলয় প্রাপ্ত হইবার অল্পদিন পরেই "অবোধ বন্ধু"* নামক আর একখানি মাসিক পত্র, কলিকাতার অন্তর্গত চোরবাগান

---

* "In my younger days I used to edit the well known vernacular paper by name 'Abodha-Bandhu. It was then a first class Literary Magazine of Calcutta and had a staff of eminent contributors, such as Babu Hem Chandra Bannerjee the poet, Babu Behary Lal Chakravarty, whose poetic effussions are much admired, Principal Krishna Kamal Bhattacharjee and many others who were then young men, passing their literary novitiate"

Reminiscences of an old Homeopath of Calcutta, (Bu J. N Ghose)
Indian Mirror—6th April, 1895

হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্র খানি কয়েকমাস দেখা দিয়াই অদর্শন প্রাপ্ত হয়, এবং ১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাস হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে সংবাদ-পত্রেরই প্রচলন ছিল; কিন্তু কেবল মাত্র সাহিত্য বিষয়ক মাসিক-পত্র বাঙ্গালায় অবোধবন্ধুই বোধ হয় প্রথম। এই পত্রের গ্রাহক সংখ্যা প্রচুর ছিল এবং বিহারিলাল প্রথমে ইহার একজন প্রধান লেখক ছিলেন—পরে সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। কবিবর হেমচন্দ্রবন্দ্যো-পাধ্যায়, পণ্ডিত প্রবর কৃষ্ণমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার অন্যতর লেখক ছিলেন। যোগেন্দ্রবাবুর সম্পাদকত্বের সময় পত্রখানির আকার ক্ষুদ্র ছিল এবং সেই সময়ে বিহারিলালের "নিসর্গ সন্দর্শন" ও "বঙ্গসুন্দরী" কাব্যের কয়েকটী কবিতা এই পত্রে প্রকাশিত হয় এবং অপরাপর লেখকদিগের কবিতাতেও বিহারিলালের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন কার্য্যের আভাস পাওয়া যায়।

১২৭৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা (৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা) হইতে বিহারিলাল এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হয়েন এবং সেই সময় হইতে অবোধবন্ধুর আয়তন অপেক্ষাকৃত পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহাতে রচনার বিশেষত্ব ও উন্নতি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণকমল বাবুর গদ্য এবং বিহারিলালের পদ্য রচনা ও প্রবন্ধ নির্ব্বাচন নৈপুণ্যই এই উন্নতির মূল কারণ। "অবোধবন্ধু" উদার, উন্নত ও পবিত্র সার্ব্বভৌমিক মতের পক্ষপাতী ছিল এবং সেই মত সহজ সরল স্পষ্ট ভাষায় মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিত। বিহারিলালের সম্পাদনের সময়ই এই পত্রে 'পৌলভর্জ্জীনী' 'বেকন সন্দর্ভ', 'নেপোলিয়নের জীবনবৃত্তান্ত' অনূদিত ও ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। এবং কবিবর হেমচন্দ্রের 'ইন্দ্রের সুধাপান' এবং বিহারিলালের 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী' ও

অসম্পূর্ণ কাব্য 'সুরবালা' অবোধবন্ধু পত্রের শোভা সম্বর্দ্ধন করে। এই সময়ের অবোধবন্ধুকে উল্লেখ করিয়াই রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা "অবোধ বন্ধু"কে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য্য বলা যায়, তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।"*

এই পত্রও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে নাই, ১২৭৭ সালে ইহার আয়ুশেষ হয়। এইপত্র মুদ্রাঙ্কণের জন্য বিহারিলাল কয়েক মাস নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রের পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু অর্থাগমের সুবিধা করিতে না পারায়, বা "অবোধ বন্ধু" সাধারণের নিকট আশানুরূপ আনুকূল্য প্রাপ্ত না হওয়াতে, বিহারিলাল এই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

"অবোধবন্ধু" বিলুপ্ত হইবার অল্পদিন পরেই বিহারিলাল এবং বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত তাঁহার কয়েকটী স্নেহাস্পদ বন্ধু—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, সমবেত চেষ্টায় একখানি সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়া ছিলেন। ঐ পত্রের জন্য প্রবন্ধ ও কবিতাদি রচিত এবং সংগৃহীত হইয়াছিল কিন্তু ঘটনা ক্রমে ঐ মাসিকপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

বিহারিলালের সহিত, বঙ্গীয় মাসিক সাহিত্যের মুখ্য সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত, কিন্তু গৌণ সম্বন্ধ শেষ জীবন অবধি কিছু কিছু ছিল। তাঁহার

* 'সাধনা,' আষাঢ়, ১৩০১ সাল।

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রায় সমস্ত কাব্যেই সম্পূর্ণ আকারেই হউক বা অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই কোন না কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—'প্রেম প্রবাহিণী' পূর্ণিমাতে, 'নিসর্গসন্দর্শন,' 'সুরবালা' ও 'বঙ্গসুন্দরী' অবোধবন্ধুতে; 'সারদামঙ্গল' আর্য্যদর্শনে, 'মায়াদেবী,' 'শরৎকাল' (প্রভাত সঙ্গীত প্রভৃতি) ভারতীতে, 'সাধের আসন' মালঞ্চে এবং "বাউলবিংশতি" কল্পনায়। অবোধবন্ধুর পর যে সকল কবিতা অপরাপর মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়, সেগুলি কবির ভক্ত বন্ধুগণের অনুরোধে ও চেষ্টায় প্রকাশিত হয়—স্বেচ্ছায় নহে।

"স্বপ্নদর্শন"।—বিহারিলালের গদ্য রচনার পরিচয় পূর্ণিমা ও অবোধবন্ধু ব্যতীত "স্বপ্নদর্শন" নামক এক খানি স্বতন্ত্র পুস্তিকাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তকখানি ক্ষুদ্রায়তন এবং সম্বৎ ১৯১৫ বা সন ১২৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। "স্বপ্নদর্শন" এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং উহাতে এরূপ কোন বিশেষত্ব নাই যাহাতে সাহিত্য ক্ষেত্রে উহার পুনর্দর্শনের আশা করা যাইতে পারে। অথচ বিহারিলালের উহাই এক মাত্র গদ্য পুস্তক এবং প্রথম গদ্য রচনা। সুতরাং তাঁহার জীবনীতে উহা উল্লেখ যোগ্য। আমরা এই স্থলে পুস্তক খানির সংক্ষেপে পরিচয় দিব। "স্বপ্নদর্শন" পুস্তিকা খানি, ৺অক্ষয়কুমার দত্তের স্বপ্নদর্শন প্রবন্ধগুলির ন্যায় ইংরাজি allegory ধরণে লিখিত একখানি গদ্য রূপককাব্য।

আসন্নপ্রায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আতঙ্কে বিলাপকাতরা বঙ্গভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত, কবির স্বপ্নাবেশ সাক্ষাৎ, বঙ্গমাতার সহিত দেশের শোচনীয় ও ভীতিপ্রদ অবস্থা সম্বন্ধে কথোপকথন এবং অন্নাভাব ও মহামারী কবলিত বঙ্গদেশের সম্ভাবিত হৃদয় বিদারক চিত্র প্রদর্শন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানির বর্ণনীয় বিষয়।

এই পুস্তকে কবির যৌবন সুলভ আবেগ, উচ্ছ্বাস আছে, দেশ ভক্তি ও দেশের দুরবস্থার জন্য মর্ম্মবেদনার অভিব্যক্তি আছে, কর্ত্তব্য পরায়ণতা সংসাহস অর্থনিস্পৃহা, ও ভণ্ডধার্ম্মিকতা স্বার্থপরতার প্রতি বিদ্বেষ, প্রভৃতি অনেক মতামতের পরিচয় আছে, বাণিজ্য সম্বন্ধে Political Economyর দুই একটী কুটিল প্রশ্নেরও অবতারণা আছে, স্বাধীন বাণিজ্যের উপকারিতা জ্ঞানের পরিচয় আছে। পুস্তক খানির ভাষা প্রশংসনীয়। ইহার ভাষা পণ্ডিতি ধরণেরও নহে অথচ "আলালী ভাষা"ও নহে। ইহার স্থানে স্থানে পাঠ করিতে করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষার কথা মনে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। স্বপ্নাবেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামৃত্যু পীড়িত দেশের বিভীষিকাময় চিত্র দর্শনে লেখক পরিতাপ করিতেছেন—

হা! এখন আর কিছুই নাই, আর প্রভুদের প্রলয় মূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হইতেছে না, আর মানবেরা কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে না, আর পশুরা কোলাহল করিতেছে না, আর বিহঙ্গরা কলরব করিতেছে না, সকলি থামিয়া গিয়াছে। সকল দিকই নিস্তব্ধ। আহা! যে সকল প্রান্তরে কৃষাণেরা গান গাইতে গাইতে হলচালনা করিত, সে সকল প্রান্তর অগ্নিপুঞ্জে কবলীকৃত হইয়া অতি খেদময় দর্শন ধারণ করিয়াছে। ভবন সকল হাঁ হাঁ করিতেছে। কি ভ্রূভঙ্গ সদৃশ তরঙ্গবাহিনী তরঙ্গিণী, কি নানা বর্ণ বিভূষিণী নীরদশ্রেণী, কি নির্ম্মল জলপূর্ণ জলাশয়, কি সুন্দর প্রাসাদ সমূহ, কি শ্যামল পত্র মণ্ডিত পাদপ চয়, কি শিখর শোভিত পর্ব্বত মালা, সকলই বিরূপ ভাবাপন্ন, সকলই যেন বিষাদে বিষন্ন রহিয়াছে। প্রকৃতি দেবী যেন শোক বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া অশ্রু জলে ভাসিয়া যাইতেছেন। দিবাকর সহস্রকর, বর্ষণ করিয়া প্রকৃষ্ট আলোক প্রদান করিলেও চতুর্দ্দিক যেন তমঃসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হা! দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া খেদ করে এমন একটীও প্রাণী বিদ্যমান নাই, কেবল নিরানন্দ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

হা আমার প্রিয় জন্মভূমি ! তোমার একি দশা হইয়াছে ! হা আমার স্বদেশীয় ভ্রাতা সকল ! তোমরা কোথায় গমন করিয়াছ ! যে আমি তোমাদের সহিত লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত কত আমোদ প্রমোদ করিয়াছি ; হা ! সেই আমাকে তোমাদের কঙ্কালমাত্র পতিত দেখিতে হইতেছে। হা কঠিন হৃদয় ! কেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছ না ? হা মাতঃ। হা ভ্রাতঃ ! হা অধিদেবতঃ ! তোমরা কোথায় ? হে সূর্য্য ! দেখ দেখ ! তুমি যে দেশের প্রান্তরে কিরণ দান করিতে, যে দেশের ক্ষেত্রের মুখ উজ্জ্বল করিতে, যে দেশের শস্য সতেজ রাখিতে, যে দেশের কমলিনী প্রফুল্ল হইয়া তোমার প্রতি কতই আনন্দ প্রকাশ করিত, সে দেশের কি বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে ! হে পবন ! হে অনল। হে সলিল ! হে মাত ধরণি ! তোমরা বল বল ! আর কি আমার সৌভাগ্য দশা ফিরিয়া আসিবে, আর কি আমার ভাই সকল শ্মশানময় প্রান্তর হইতে উঠিয়া আসিয়া মহা মহোৎসবে নগর আনন্দময় করিবে, আর কি মনোহর পক্ষীগুলিন প্রভাতে ললিত তানে গান করিতে থাকিবে ?"

সংসারে।

অনুমান পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিহারিলাল অর্থ চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই, তিনি একান্ত মনে বাগ্দেবীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষম পিতা এতদিন সংসারের সমস্ত ভারই বহন করিতেছিলেন। দীননাথ ঠাকুর একজন কার্য্যকুশল উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী লোক ছিলেন, তাঁহার শরীরে ও মনে প্রভূত বল ছিল। বিহারিলাল তাঁহারই শক্তি ও তেজস্বীতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। দীননাথ ঠাকুর এই জীবন সংগ্রামময় কর্ম্মক্ষেত্রে লেখনী হস্তে ধ্যান-নিমগ্ন থাকিবার উপযোগীতা দেখিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে বিহারিলাল কবিতা লিখিয়া এই অমূল্য মানব জীবনটা বৃথাই নষ্ট করিলেন ; তাঁহার অকর্ম্মণ্য পুত্র যে কখন যজমান রক্ষা করিয়া

বা অন্য উপায়ে সংসার পরিচালন করিতে সক্ষম হইবেন এ আশা তাঁহার আদৌ ছিল না। যাহা হউক তিনি পুত্রকে বড়ই ভাল-বাসিতেন, এজন্য তাঁহার প্রবৃত্তিতে বাধাদিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত করেন নাই, এবং ব্যস্ত করিবার তাদৃশ প্রয়োজনও হয় নাই। বিহারিলালও পিতাকে "প্রাণের সহিত" ভালবাসিতেন একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তিনি পিতার স্নেহচ্ছায়াবলম্বনের কথা "সঙ্গীত শতক"এ উল্লেখ করিয়াছেন এবং বঙ্গসুন্দরীতেও বাৎসল্য স্নেহের সহিত বিহারিলালের পিতৃস্নেহ স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছে—তিনি বলিয়াছিলেন যে পিতার জন্য তিনি সকলই ত্যাগ করিতে পারেন। তিনি জানিতেন যে পিতা না থাকিলে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সেবা ঘটিয়া উঠিত না,—এ ঋণের কথা কৃতজ্ঞ বিহারিলালের মনে অহর্নিশি জাগরূক ছিল। বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে বিহারিলালের যে কয়টী রচনা পরিচিত সে সকল গুলিই প্রায় তাঁহার পিতার জীবদ্দশাতেই লিখিত ; বঙ্গসুন্দরী এবং সারদামঙ্গল (আর্য্য দর্শনে প্রকাশিত) এই কালেরই রচনা।

কিন্তু মানবের স্বাস্থ্য চিরদিন থাকে না। বিহারিলালের পিতার শরীর ক্রমশঃ অসুস্থতায় ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল সুতরাং বিহারিলালের অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইল। পৈত্রিক পৌরহিত্য কার্য্য পিতার অসুস্থতা সত্বেও এককপে চলিয়া যাইতে ছিল—বিহারিলাল অর্থাগমের অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে একটী উপায় অচিরেই উপস্থিত হইল।

বিহারিলাল, এই সময়ে তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে একটি কর্ম্মভার প্রাপ্ত হইলেন। নীলাম্বর বাবু সে সময়ে কাশ্মীরের মহারাজার রাজস্ব সচিব পদাভিষিক্ত ছিলেন।

তিনি কাশ্মীর রাজ্যমধ্যে উৎপন্ন রেশম প্রচলিত ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রপ্তানী করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন; ও কলিকাতায় ঐ উদ্দেশ্যে একটী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া বিহারিলালকে উহার তত্ত্বাবধারণ ও পরিচালনের সমস্ত ভার সমর্পণ করিলেন। বিহারিলাল এই কার্য্য এরূপ উদ্যম ও দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে অল্পদিনের মধ্যেই ঐ ব্যবসায়ে অচিন্ত্যপূর্ব্ব লাভের সম্ভাবনা হইল। যে কাশ্মীরি রেশমের বিপণিতে পরিচয় মাত্র ছিল না, সেই রেশমের এত বিস্তারিত ভাবে প্রচলন হইল যে উহার মূল্য প্রতি সের বার তের টাকা হইতে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইল। এই কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিলেন যে বিহারিলালের চেষ্টা ও কর্ম্ম পটুতা গুণে কাশ্মীর রাজস্বের একটী নূতন আয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে এবং বিহারিলালের বন্ধুগণও আশা করিলেন যে তাঁহারও সৌভাগ্য তপন বুঝিবা প্রখর জ্যোতিতে সমুদিত প্রায়। বিহারিলালও ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এই ব্যবসায় অধিকতর বিস্তৃত আয়তনে নির্ব্বাহ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! বিহারিলালের ভাবী স্বর্ণপ্রসূ আশাতরু অঙ্কুরেই বিলয় প্রাপ্ত হইল।

বিহারিলাল ঘটনা ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে এই কার্য্যের সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও, কাশ্মীর রাজের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তদীয় অস্তিত্ব পরিচিত করিবার কোনও সম্ভবনা নাই, এবং অপরাপর কারণে তিনি এই কার্য্যে থাকিলে আত্মসম্মান লাঘব হইবার আশঙ্কা করিলেন। বিহারিলাল আত্মসম্মানকে স্বার্থ চিন্তা অপেক্ষা বড় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি এক কথায় আপনার ভাবী ঐশ্বর্য্য আলেখ্য হৃদয় ফলক হইতে মুছিয়া ফেলিলেন এবং স্বেচ্ছায় ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি কত সততার সহিত

এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা নীলাম্বর বাবু প্রমুখ এই কার্য্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। আর বিহারিলাল এই কার্য্যে কিরূপ পরিশ্রম, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা এই কথা বলিলেই, পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বিহারিলালের কর্ম্মত্যাগের সহিত এই উন্নতিশীল ব্যবসায়ও উঠিয়া গেল। কাশ্মীরি রেশমের ব্যবসায় বঙ্গদেশে আর চলিল না।

এই কার্য্যকালে বিহারিলালের প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ ও প্রলোভনও উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু বিহারিলাল সহজেই এই প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। অসদুপায়ে এক কপর্দ্দক উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, সে চিন্তাও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কোন উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী এই সময়ে কাশ্মীর মহারাজের জন্য কলিকাতায় এক খানি অট্টালিকা ভাড়া করিয়া সুসজ্জিত করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ঐ উদ্দেশে বালুগঞ্জে একখানি বাটী নির্ব্বাচন করিয়া সজ্জিত করিতে দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে ধার্য্য করিলেন। সাহেবের অর্থপ্রাপ্তি ও কার্য্য সমাধা করা কেবল মাত্র বিহারিলালের মতের উপর নির্ভর করিতে ছিল। বিহারিলাল তখন কাশ্মীর মহারাজের স্থানীয় প্রতিনিধি স্বরূপ। বিহারিলাল সাজ সজ্জার তালিকা ও মূল্যের অনুসন্ধান লইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে—ঐ কার্য্যে চল্লিশ সহস্র মুদ্রার অধিক ব্যয় হওয়া উচিত নহে। কোথায় সার্দ্ধ এক লক্ষ আর কোথায় ৪০ সহস্র মুদ্রা! বাটী সজ্জিত করা হইল না। কিন্তু বিহারিলাল যদি সাহেবকে পোষকতা করিতেন তাহা হইলে এই বিষয়ে অন্য কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিত না এবং সাহেবও হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে ২০।২৫ সহস্র মুদ্রা উৎকোচ স্বরূপ প্রদান করিয়া, নিজেও বিলক্ষণ লাভ করিত। বিহারিলাল এইরূপ মর্ম্মের

ইঙ্গিতও পাইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সাহেব মহোদয় নিরস্ত হইয়াছিল।

যাহা হউক এই কাশ্মীর রাজের অধীনে কার্য্যটীই বিহারিলালের প্রথম ও শেষ চাকুরী। দুইবৎসর কাল মাত্র এই কার্য্য স্থায়ী হইয়া অনুমান ১২৮০ সালে ইহার শেষ হয়। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই বিহারিলালের পিতা নানারূপ ব্যাধিতে এবং পরিশেষে কাশ-রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন। বিহারিলালের বয়ঃক্রম তখন চল্লিশ বৎসর হইবে। ইতি পূর্ব্বেই বিহারিলাল কুলক্রমাগত পৌরহিত্য কার্য্যেই জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন স্থির করিয়া, উহাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবং প্রিয়পুত্রগণকে সুশিক্ষা দান ও আদরের কন্যাগণকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার আশায়, বিহারিলাল কত যত্ন ও আগ্রহের সহিত এই পৌরহিত্য কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা দেখিলে ৺ দীননাথ ঠাকুর বুঝিতে পারিতেন যে তিনি যে বিহারিলালকে অকর্ম্মণ্য বা অলস স্থির করিয়া ছিলেন, তাঁহার সে ধারণা কত ভ্রান্তিমূলক। জীবনের অবশিষ্ট কাল বিহারিলাল এই যজমান রক্ষা কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও সদ্ব্যব-হারে তাঁহার যজমান মাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত এবং বিহারিলালও তাঁহার যজমানদের সর্ব্বান্তঃকরণে হিতকামনা করি-তেন ও ভালবাসিতেন। বিহারিলালের বন্ধুগণের ন্যায় তাঁহার যজ-মানদেরও প্রত্যেকেরই ধারণা, তিনিই বিহারিলালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। পরন্তু এই পৌরহিত্য কার্য্যেও বিহারিলালের আয় নিতান্ত অল্প ছিল না, ইহাতে তিনি প্রতিমাসে ন্যূনাধিক ২৫০৲ আড়াই শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। বিহারিলাল ইচ্ছা করিলে এই আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিতেন, কিন্তু বিহারিলালের সে

চেষ্টা আদৌ ছিল না। মিতব্যয়িতা কাহাকে বলে বিহারিলাল তাহা জানিতেন না, অথচ তিনি কোনরূপ অন্যায় কারণে অর্থের অপচয় করিয়া যান নাই।

বিহারিলালের অনেক গুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল। তিনি পুত্রগণকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিয়া ছিলেন এবং পরে কন্যাগণকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। উভয় কাৰ্য্যই ব্যয় সাপেক্ষ। এতদ্ভিন্ন বিহারিলালের একটী সখ ছিল, আত্মীয় বন্ধু গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাদেয় ও পর্য্যাপ্ত ভোজন দানে পরিতুষ্ট করা। এখনও তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণ বিহারিলালের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার কথা স্মরণ করিয়া বলেন, ধনিগণের মধ্যেও অতি অল্প লোকই বিহারিলালের ন্যায় আহার করাইতে পারেন। বিহারিলালের বাটীতে কোন আত্মীয় বা বন্ধু গমন করিলে, তাঁহারা যার পর নাই অভ্যর্থনা, যত্ন ও পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইতেন, কাহারও অপ্রীতঅন্তরে বা অপূর্ণ পাকস্থলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

অভ্যাগতগণকে পরিতুষ্ট করিবার উপযোগী বিহারিলালের আর একটী নৈসর্গিক ক্ষমতাও ছিল। সেটী তাঁহার কথোপকথনের আকর্ষণী শক্তি; তাঁহার গল্প বর্ণনার এমন একটু চমৎকারিত্ব, এমন একটু মধুরত্ব ছিল, যাহাতে শ্রোতা মাত্রেই তৃপ্ত ও মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। ক্রমশঃ

দুর্ভিক্ষে লর্ড কার্জন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা কখন কোন গভর্ণর-জেনেরেলকে প্রজাদিগের সভায় নেতা হইতে দেখি নাই। জমীদার মহাজন আদি সভা করিয়া

মন্তব্য স্থির করেন এবং এইরূপে যে সকল মন্তব্য স্থির হয় তাহার একখানি নকল গভর্ণমেণ্টে দাখিল করা হইত; তাহার পর গভর্ণমেণ্ট সেই মন্তব্য কি ভাবে লইলেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অন্ততঃ ইচ্ছুক কি না তাহা আর জনসাধারণে কেহ জানিতে পাইত না। ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছিল যে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য গভর্ণমেণ্ট করিবেন এবং প্রজারা কেবল নিজ দুঃখ নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে; প্রজা রক্ষা গভর্ণমেণ্টের কার্য্যই আছে এবং প্রজারা তাহাতে কোনরূপ সহায়তা করিলে করিতে পারে। লর্ড নর্থব্রুক প্রভৃতি যাঁহারা অকাতর পরিশ্রম করিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ দমন করিয়াছিলেন এবং করিবার উপায় করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই এইরূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রজাদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য প্রজারা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০০, শুক্রবার, টাউনহলে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে আহূত সাধারণ সভায় রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন সদলে উপস্থিত থাকিয়া গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত সঙ্কোচ ভাব—উহা সঙ্কোচ ভাব নহে ত আর কি বলিব—দূর করিয়া দিয়াছেন। মহামতি লর্ড কার্জনের এই অভূতপূর্ব্ব কার্য্য দেখিয়া সেদিন মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। গভর্ণর জেনেরেলকে সদস্য সহকারে সাধারণ কার্য্যে সাধারণের সহিত যোগদান করিতে দেখিয়া বোধ হইল যেন দুর্ভিক্ষে আর ভয় নাই এবং সেই সভার কার্য্য হইতেই প্রকৃতভাবে এই ১৯০০ শতাব্দির সর্ব্বব্যাপি দুর্ভিক্ষ মহামারি বিনাশের পন্থা উদ্ভাবিত হইল। এই ভাব আসিবার কারণ যাঁহাদের আদেশে প্রকৃত কার্য্য হইবে তাঁহারাই সেই সভার কার্য্যপ্রণালী পরিচালিত করিতেছেন এবং দেশের গণ্যমান্য সর্ব্বদেশীয় রাজা মহারাজা ধনী ও দাতা মহোদয়েরা

উপস্থিত ছিলেন। এক অতি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে গেলে যে সকল ব্যক্তির থাকা প্রয়োজন এবং উপস্থিতি প্রার্থনীয় তাহা সকলই ঘটিয়াছিল। সাড়ে চারিটা হইতে সাড়ে ছয়টা অবধি সভার কার্য্য হয়; ইহা এরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় যে তখন যেন আমরা আপামর সকলেই ইম্পীরিয়াল কাউন্সিলে যোগদান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যদিও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই সভার মন্তব্য পাঠ ও প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল মন্তব্য স্থির করিবার সময় সভার প্রথানুযায়ী উপস্থিত ব্যক্তি সমূহের মত গ্রহণ করায় বোধ হইল, যেন এ দেশের প্রজাদের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে মতামত দিবার অধিকার জন্মিয়াছে।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ সভা আহ্বান করিয়া যে সকল মন্তব্য ঠিক করে, তাহা যথার্থই কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে, ইহার প্রধান কারণই শাসনতন্ত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই প্রকার সভায় যোগদান করিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও অনেক প্রকার সভা সমিতি হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে বক্তৃতা করিয়া কেবল সময়ের অপব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র। যাঁহারা এই সভায় যোগদান করিয়া থাকেন তাঁহারা কেহই শাসন-তন্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন। সুতরাং তাঁহারা যে সকল মন্তব্যাদি স্থির করিয়া থাকেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা কতদূর সুবিধাজনক ও যুক্তিসিদ্ধ সে বিষয়ে নির্দ্ধারণ করিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অপারক। প্রবীণ, বিজ্ঞ, ও বহুদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও সভায় যোগদান করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের দেশে কিন্তু বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোকের সংখ্যা বড়ই কম এবং যাহাও বা আছে তাহাও সভা সমিতিতে পূর্ণমাত্রায় দেখা যায় না। এই সকল ব্যক্তির পরিবর্ত্তে যত অপরিণত বয়স্ক অপরিণাম ও স্বল্পদর্শী লোকই উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক

সভায় এইপ্রকার লোকই অধিকসংখ্যায় বর্ত্তমান থাকায় সভার উদ্দেশ্য সফল হয় না। কেহ হয় ত বলিবেন যে যখন সাধারণ সভা তখন সাধারণের উপস্থিতি কেহ নিবারণ করিতে পারে না। কিন্তু ইহা বুঝা উচিত যে আমাদের দেশে যে শাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা সাধারণের মতানুযায়ী নহে। এখানকার জনসাধারণে এ শাসনতন্ত্র বুঝিতে পারে না। তাহারা রাজশক্তিকে যথেষ্ট ভয় ও মান্য করিয়া থাকে, কিন্তু রাজকার্য্যের বিচার করিতে তাহাদের অধিকারও নাই ক্ষমতাও নাই। ইংলণ্ডে জনসাধারণে মত দেয় বলিয়া আমাদের দেশেও জনসাধারণে মত দিবে, ইহা মনে করা ভুল। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যেরূপ উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন আমাদের দেশের জনসাধারণ সেরূপ নহে। লণ্ডনের মুটে মজুরে রাজকার্য্যের যে খবর রাখে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহা রাখেন না। ইংলণ্ডের লোকে কি প্রকার চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু তাহা সেখানকার খবরের কাগজের সংখ্যা দেখিলেই বুঝা যাইবে। এক "ডেলি-মেল" নামক দৈনিক সংবাদ পত্রের দৈনিক বিক্রয় দশ লক্ষ! ইহা দেশের লোকের পাঠপ্রিয়তারই পরিচায়ক। কিন্তু আমাদের দেশে নিজভাষায় দৈনিক কাগজ আছে কি না তাহা কেহ জানে না। যে কয়েকখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের লেখা ও প্রচার দেখিয়া বোধ হয় দেশের লোকের রুচি ও ইচ্ছা আদৌ উন্নত হয় নাই। ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও কুৎসা, অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন বিষয়ে কাগজের কলেবর অনেকাংশই পূর্ণ থাকে। কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে আমাদের দেশের লেখকেরা পুরাতন শাস্ত্রের রচনাদি উদ্ধৃত করিয়া নানা প্রলাপ বকিয়া থাকেন। যখন লোকের আচার, ব্যবহার, শিক্ষা দিক্ষা কিছুই শাস্ত্র সম্মত নহে,

তখন শাস্ত্রীয় বচনের উল্লেখ করার কোন অর্থই নাই। এরূপ অবস্থায় কোন প্রয়োজনীয় বিষয়েরই প্রকৃত আলোচনা হয় না। কিন্তু যদি কোন কাগজে রীতিমত কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করা হয় তাহা হইলে আবার তাহার পাঠক জুটে না। এ দেশের সাধারণ পাঠকেরা কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা দেখিলেই শিহরিয়া উঠেন। কি ইতিহাস, কি সাহিত্য, কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি কোন বিষয়েরই গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করিবার সময় এই সকল পাঠকের নাই। কিন্তু এই সকল বিষয়েই তাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিতে সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত। আমরা এই সকল লোককেই হয়ত আমাদের দেশের প্রধান বল বলিয়া স্থির করিব কিন্তু যথার্থ ক্ষমতাশালী ও প্রতিভাসম্পন্ন ইংরাজজাতি ইহার বিপরীতই স্থির করিবেন ও করিয়াছেন। যে দেশের লোকে, কি ধনী, কি দরিদ্র, কেবল চাকুরী করিবার জন্য লেখা পড়া শিক্ষা করে, মার্জ্জিত বুদ্ধি বা উন্নতস্বভাব লাভ করিবার জন্য নহে তাহাদের পক্ষে রাজনীতির কূটতর্ক মীমাংসা করিতে যাওয়া যে বিড়ম্বনা ও বরং হানিকারক তাহা বলা বাহুল্য। দেশের এরূপ অবস্থায় সাধারণ সভা আহূত করা কর্ত্তব্য নহে। এখন "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান" সভার ন্যায় সভাতেই প্রকৃত কার্য্য হওয়া সম্ভব এবং হইয়াও থাকে। যাঁহাদের গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারাই কেবল একত্রিত হইয়া মন্তব্যাদি স্থির করিলে কার্য্য হইতে পারে। যখন জনসাধারণের ক্ষমতা জন্মিবে তখন সাধারণ সভা আহ্বান করা কর্ত্তব্য। আলোচ্য দুর্ভিক্ষ সভায় যে বাজে লোক ছিল না তাহা নহে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। কার্য্যভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত তাঁহারা উপস্থিত থাকায় এই সাধারণ সভায় যে কি মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা

আর কাহারও অবিদিত নাই। ইহাতেই "ইণ্ডিয়ান ফেমিন চ্যারিটেবল্ রিলিফ ফাণ্ড্" স্থাপিত হয় এবং এই ফাণ্ডে কেবল ভারতবর্ষের ধনী ও দাতা মহোদয়েরা সাহায্য করিয়াছেন এমন নহে সমস্ত পৃথিবীর ধনী ও দাতাগণ মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতেছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মণি, অষ্ট্রেলীয়া, সিলোন, প্রভৃতি নানা দিগদেশ হইতে ভূরি ভূরি অর্থ আসিয়া পড়িতেছে। যেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজার দুঃখে পৃথিবী কাঁদিয়া উঠিয়াছে। এ সকলই লর্ড কার্জনের অদ্ভুত ক্ষমতার ফল। যথার্থ ই প্রজার দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে। জগদীশ্বর তাঁহাকে চিরজীবী করুন। আমরা তাঁহার ন্যায় শাসনকর্ত্তাকে লাভ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যত দিন ইংলণ্ডে এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন ততদিন ইংলণ্ডে লক্ষ্মী অচলা থাকিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পরনিন্দার পাঠশালা।

(Society aided)

(সমাজ কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য। আমি কিছুদিন উক্ত পাঠশালার ইন্‌স্পেক্টার ছিলাম, কিন্তু ঐ কার্য্য বড় কঠিন বোধ করিয়া আমি ঐ চাকরিতে রিজাইন দিয়া এক্ষণে "প্রয়াসের" অনারারি রিপোর্টারের কার্য্য করিতেছি। দোহাই, আমায় যেন কেহ উক্ত পাঠশালার ছাত্র বিবেচনা করিয়া মানহানির মোকদ্দমা আনিয়া আমায় ফ্যাসাদে না ফেলেন। আমি হলপ্ করিয়া বলিতেছি কোনও ব্যক্তি বা

সম্প্রদায় বিশেষকে গালি দেওয়া আমার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। আমি রিপোর্টার মাত্র, যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাই রিপোর্ট করিতেছি। তবে একথা বলিতে পারি না যে আমার রিপোর্ট একেবারে নির্ভুল, কোনও পার্থিব রিপোর্টই সেরূপ হয় না।

পাঠশালার বিবরণ। পরনিন্দার পাঠশালা মান্ধাতার আমল হইতে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে দুইটি বিভাগ আছে, প্রথম স্ত্রী বিভাগ, দ্বিতীয় পুরুষ বিভাগ (বালক ও বালিকাবিভাগ নহে, কারণ তথায় বালক হইতে বালকের বাপ পিতামহ মেসো, পিসে প্রভৃতি ও বালিকা হইতে তাহার মাতা, মাতামহী, ঠানদিদি প্রভৃতি সকলেই পড়েন)। "পাঠশালা" নাম বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন উহা সামান্য একটি গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, খোলার ঘরে বা গাছের তলায় উহার বৈঠক হয়। আদৌ নয়, ইহার বৈঠক সুবিধামতে প্রায় সর্ব্বত্রই হয়, কখন বৈঠকখানায়, কখন অন্দর মহলে, কখন গঙ্গার ঘাটে ইত্যাদি। ইহাতে রীতিমত স্কুল ও কলেজ ডিপার্টমেণ্ট আছে। স্কুল ডিপার্টমেণ্টের স্ত্রী বিভাগে দুইটি শ্রেণী যথা ১ম শ্রেণী বালিকাদিগের জন্য, ২য় শ্রেণী যুবতীদিগের জন্য। স্ত্রীবিভাগের কলেজ ডিপার্টমেণ্টেও দুইটি শ্রেণী যথা ১ম প্রৌঢ়াদিগের জন্য, ২য় বৃদ্ধাদিগের জন্য। পুরুষ বিভাগেও ঠিক ঐরূপ চারিটি শ্রেণী, দুইটি স্কুল ও দুইটি কলেজ ডিপার্টমেণ্টে। যথা, প্রথম, বালকদিগের, দ্বিতীয়, যুবকদিগের, তৃতীয় প্রৌঢ়দিগের, চতুর্থ বৃদ্ধদিগের শ্রেণী। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় বিভাগেরই কলেজ ডিপার্টমেণ্টের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ও ভয়ানক, কারণ কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলি অত্যন্ত গুরুতর। আমি যথাক্রমে স্কুল ও কলেজে কিরূপ পড়া শুনা হইয়া থাকে তাহার নমুনা দিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীবিভাগের বর্ণনাই যুক্তি সিদ্ধ, কারণ আগে Ladies,

তৎপরে Gentlemen. একটা কথা বলিয়া রাখি এই পাঠশালায় কোন শিক্ষকের প্রয়োজন নাই, সমাজই ইহার পৃষ্ঠপোষক ও শিক্ষক।

স্ত্রীবিভাগ।

প্রথম শ্রেণী—বালিকাদিগের জন্য।

পাঠ্য পুস্তক একখানি মাত্র, যথা—"সমবয়স্কা সহ-আড়িভাব সূত্র।"

১ম বালিকা। দ্যাখ ভাই গঙ্গাজল, তুমি যদি ভাই সুশীলার সঙ্গে কথা কও ত ক্ষতি বড় দিব্বি আছে।

২য়। কেন ভাই গঙ্গাজল সে কি করেছে?

১ম। সে ভাই বড় দুষ্ট। তা'র পুতুলের অতগুলো ছোবান কাপড় রয়েছে, আমি একখানা চাইলুম, তা দেওয়া হ'ল না। আচ্ছা, নাই বা দিলে তাই বা কি, এবার আমায় খেল্‌তে ডাক্‌লে আমি দিব্বি কচ্চি আর কখনও সুশীলার সঙ্গে খেল্‌তে যা'ব না। তুমি যদি ভাই সুশীলার সঙ্গে খেলা কব বা কথা কও তবে তোমার সঙ্গে আড়ি কর্‌বো।

২য়। না ভাই গঙ্গাজল, আমি সুশীলার সঙ্গে খেলা কর্‌বো না, সে ভাই বড় দেমাকে। পূজোর সময় তা'র মা তা'কে ভাল কাপড় দিয়েছিলো তাইতে তার জাঁক কত, যা'কে তা'কে দেখিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। কেন ভাই আমার বাপ্‌ মা গরীব দুঃখী বলে কি ঐ রকম ক'রে ঠাট্টা কর্‌তে হয়? আমাদের না হয় ভাল জামা কাপড় নেই তা বলে অত অখার ভাল নয়।

৩য় বা। অখারের কথা যদি বল্লে ভাই বকুল, তবে সুশীলার

চেয়ে সৌদামিনীর আরো বেশী। আমি তা'র পুতুলকে আমার জামাই করতে চাইলুম, সে আমার খেলা ঘর দেখে বল্লে "ওমা, এই তোমার খেলাঘর, এত ছোট! এই কটি পুতুল!! না ভাই তোমার ঘরে আমার ছেলের বে দিতে পারবো না। সে অমন ছোট্টো শ্বশুর-বাড়ী থাক্‌তে পারবে না, হাঁপিয়ে উঠ্‌বে।"

৪র্থ। হ্যাঁ, ভাই আতর, সৌদামিনী বড় দুষ্ট মেয়ে, তা'র সঙ্গেও এস আড়ি করি। সে দিন তা'র একটু কাপড় ছিঁড়ে দিছলুম বলে সে গুরুমাকে ব'লে আমায় কত মার খাওয়ালে।

১ম। ঠিক বলেছ ভাই মনমিছ্‌রি, সৌদামিনীর সঙ্গেও আড়ি করা দরকার, সে একটু ভাল পড়া বল্‌তে পারে ব'লে গুমরে মরে, আমাদের সঙ্গে ভাল করে' কথা কয় না।

২য়। তবে বলি শোন গঙ্গাজল, শোন ভাই বকুল, সে দিন আমরা ক'জনে মিলে সৌদামিনীকে বল্লুম বৌ বৌ খেল্‌তে। সৌদামিনী, ভাই, কত গুমর ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো "আমি যখন সত্যিকার বৌ হ'ব তখন আমি লেখা পড়া জানি বলে' আমার বর আমায় কত ভালবাস্‌বে। তোদের বর তোদের তত ভাল বাস্‌বে না। তোদের বরের চেয়ে আমার ভাল বর হ'বে।" কেন ভাই আমরা পূজা করি, সাবিত্তির বের্‌তো করি, আমাদের ভাল বর হ'বে না, আর উনি জুতা মোজা পায়ে দেন, ঠাকুর দেবতা মানেন না, খিরিষ্টানি বই পড়েন, ওঁর ভাল বর হ'বে।

৪র্থ। বর ভাই, যার কপালে যেমন আছে তেমনি হ'বে, তা' নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করা কেন? আমাদের বর খারাপ হয়, কি ক'রবো তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌বো। ভাই আতর, তোর নাকি ভাই বের সম্বন্ধ ঠিক্ হ'য়ে গেছে? ঠিক্ ক'রে বল্ ভাই!

৩য়। না ভাই আতর, বের এখনও কিছু ঠিক্ হয় নাই, সম্বন্ধ আস্‌ছে বটে। হারীর বের ঠিক্ হ'যে গেছে।

১ম। আঁ্যা, হারীর বের ঠিক্ হয়ে গেছে আমাদের মোটে বলে নি? দেখ্‌লি ভাই, হারী কত চাপা! না ভাই, আমি হারীর সঙ্গে আর কথা কইবো না। কেন আমাদের বল্লে কি বর কেড়ে নিতুম্? আমি জানি হারী বরাবরই কেমন চাপা।

(এই সময়ে পাঠশালার ঘণ্টা বাজাতে ছুটি হইয়া গেল।)

দ্বিতীয় শ্রেণী—যুবতীদিগের জন্য।

পাঠ্য পুস্তক দুইখানি—যথা (১) সমবয়স্কাগণ-রূপনিন্দা মঞ্জরী।

(২) সমবয়স্কাগণ-স্বামী প্রণয় ব্যাখ্যা।

রূপসী, সুকেশী, বেলা, চামেলি, গর্বিণী, সোহাগিনী,

প্রফুল্ল-নলিনী, আসীনা।

রূ। দ্যাখ্ ভাই বেলা, সে দিন সৌদামিনী আমাদের বাড়ি এসেছিল, আমি তা'কে দেখে হেসে মরে যাই। মরি, ঐ ত চেহারা, তার ওপর আবার একখানা লাল বারাণসী সাড়ি পরা হ'য়েছে। তাতে যে কি বাহার হ'য়েছিল তা তিনিই জানেন।

বে। মা গো, বারাণসী সাড়ি না কি আজকাল আবার পরে। আমি সাত জন্ম ও গুলো দেখ্‌তে পারি নি। এত রকম সিল্কের সাড়ি রয়েছে তা বুঝি পছন্দ হ'ল না।

গ। হ্যাঁ, সৌদামিনীর আবার পছন্দ, যেমনি চেহারা, তেমনি পছন্দ। রংটিত ভোমরার মত, তার ওপর কখনও লাল বারাণসী পরে?

সু। খালি রং কালো ? চুল ছোটো, কপাল উঁচু।

গ। দাঁতগুলো মূলোর মত।

রূ। চোখ দুটো ভাই, বড় ছোট। তা না হ'লে নাকটা একটু খ্যাঁদা হ'লেও তবু যাহোক মানাতো।

চা। ওলো, তবু গুমর কত, বলা হয় ওঁর সোয়ামী ওঁকে যেমন ভালবাসে এমন আর কোন সোয়ামী তার মাগ্‌কে ভাল বাস্‌তে পারে না। কেন ভাই, আমাদের কি সোয়ামী নেই, না তা'রা ভালবাস্‌তে জানে না। আমরা অমন সাতজন্ম গুমর করিনি, এই যা। ওঁর সোয়ামী যে কি দেখে ওঁকে ভালবাস্‌বেন তা'ত বুঝ্‌তে পারলুম না। পুরুষেরা রূপে ভোলে। সেইটেই ওঁর অভাব।

ক। যা'র যত অভাব, সে ততই সে অভাব ঢাক্‌তে চেষ্টা করে। কই আমরা ভাই লোককে কত ব'লে বেড়াচ্ছি।

চা। বিনোদিনীরও, ভাই, বড় ব'লে বেড়ান অব্যেস, তা'র রূপেরও ভাই বড় অভাব।

ক। আহা ভারি ত রূপ, রংটা ফ্যাকাসে, চোখদুটো পর্য্যন্ত কটা। তা' যাই বল ভাই, ছিরি মোটে নেই।

গ। ছিরি একটুও নেই, খালি রংটা সাদা হ'লে কি হয়, গড়ন মোটে ভাল নয়। ঢ্যাঙা, রোগা, যেন হাওয়ায় দোলে।

রে। অত রোগা ভাল নয়। আবার মাতঙ্গিনীর মত মোটাও ভাই ভাল নয়। মাতঙ্গিনী যদি অত মোটা না হ'ত তা হ'লে বরং একরকম মানাত।

ক। না, ভাই মাতঙ্গিনীর ঠোঁট একটু পুরু।

রে। তা হ'ক রং নেহাত মন্দ নয়, ছিরিও আছে, কিন্তু যে মোটা, মাতঙ্গিনী ত মাতঙ্গিনী।

চা। ওলো মাতঙ্গিনীর কর্ত্তাটিও যে গজেন্দ্র। তাই দুজনে খুব ভাব।

প্র। ভাই মাতঙ্গিনীর সোয়ামী মাতঙ্গিনীকে সে সব চিঠি লিখ্‌তো, আমি দেখেছি। সে যদি তোরা দেখ্‌তিস্ ত হেসে হেসে মরে যেতিস্। কত পদ্য, কত রঙ্গ, কত বিরহ যে উথ্‌লে উঠ্‌তো তা বলা যায় না। কখনো নাম সই করতেন "মাতঙ্গিনীর পাগ্‌লা হাতী।" কখন বা "মাতঙ্গিনীর শুঁড়", কখনো বা "শ্রীচরণের ছুঁচো," কখনো বা "তোমার পায়ের আল্‌তা" এই রকম কত কি থাক্‌ত। মাতঙ্গিনীও তেমনি জবাব দিত, লিখ্‌তো—"গণেশের ইন্দুর", "শ্রীচরণের বুটজুতো," "গজেন্দ্রের মাহুত।" দুজনে ভাই বেশ রঙ্গ করতো।

চা। ওলো অমন আমার সোয়ামীও কত রঙ্গ করে। আমাদের সব চিঠিপত্র তোকে একদিন দেখাব এখন।

প্র। দেখাবি? কবে দেখাবি ভাই বল? আমার ভাই, অন্যের চিঠি পড়তে বড় ভাল লাগে, সে দিন ভাই, রোহিণীর চিঠি আমি লুকিয়ে পড়িছিলুম বলে রোহিণী আমার সঙ্গে কত ঝগড়া কল্লে, আজ পর্য্যন্ত কথা কয় না।

ক্ষ। ওলো, তা'র মানে আছে। রোহিণীর সোয়ামীত তা'কে দেখ্‌তে পারে না, চিঠিপত্রও বড় লেখে না। রোহিণী ৭।৮ খানা লিখ্‌লে তবে রেগে একখানা জবাব দেয়, তা'তে রোহিণীকে যা' ইচ্ছে বলে। বলে তুমি মরলেই আমি বাঁচি, আজও মরনি" ইত্যাদি।

বে। আহা রোহিণীর ত বড় কষ্ট। আচ্ছা কেন ভাই তা'র সোয়ামী তাকে দেখ্‌তে পারে না? রোহিণীর স্বভাব ত বেশ শান্ত? দেখ্‌তেও ত মন্দ নয়?

ক্ষ। তা হ'লে কি হয়? রোহিণীর সোয়ামী যে খারাপ, দিন রাত

মদ খেয়ে এক মাগীর বাড়ি পড়ে আছে। শুনিছি, সে মাগী দেখ্‌তে নাকি সেওড়া গাছের পেত্নী। পুরুষগুলো কেমন চোখের মাথা খেয়ে থাকে, ঘরে সুন্দরী মাগ মনে ধরে না, বাইরে গিয়ে সব পেত্নী আর রাক্ষসী ভজে। আমার ইচ্ছে করে ওই রকম পুরুষ গুলোর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই, আর বেশ্যা মাগীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিই।

সো। আমার সোয়ামী যদি অমন হ'ত, দেখ্‌তুম্ একবার—

প্র। অমন জাঁক করিস্‌নি ভাই। পুরুষদের বিশ্বাস নেই। আজ ভাল আছে, দুদিন পরে খারাপ হ'তে কতক্ষণ? রেবতীর কি হ'ল? তার সোয়ামী তাকে কি রকম ভালবাস্‌তো; চোখের আড়াল হ'লে থাক্‌তে পারতো না। এখন আর মোটে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আহা ছুঁড়ির দশা দেখ্‌লে চোখে জল আসে।

সু। কেন মনমোহিনীর কি হ'ল? অমন ছেলে দেখে বাপ মা ১০ হাজার টাকা দিয়ে মনমোহিনীর বে দিলে, অত ঘটা ক'রে বে হ'ল, তার পর দু' এক বছর যেতে না যেতেই ছোঁড়াটা বয়ে গেল, মনমোহিনীর কপাল ভাঙ্গ্‌লো।

বে। বেলা গেল চল ভাই আজ এখন যাই, কাল আবার খেয়ে দেয়ে আস্‌বো এখন।

(সকলের প্রস্থান)

প্রয়াসের রিপোর্টার।

লক্ষ্ণৌ।

—*—

শুক্রবার অতি প্রত্যূষের গাড়ীতে লক্ষ্ণৌ পঁহুছি। তখন কুয়াশায় চারিদিক অঁাধার ছিল। আমি একা, স্থান অপরিচিত, তাই বারান্দার বেঞ্চে খানিক বসিয়া অপেক্ষা করিলাম। কুযাসা ভাঙ্গিবা কিছু পরিষ্কার হইলে ষ্টেশন ঘরের ভিতরে ঢুকিলাম। সে স্থানে তখনও মসীজীবী কেরাণীকুল চবৰি বংশ ধ্বংশ করিয়া হিসাবে গুজামিল দিতে ছিলেন।

কাশীস্থ আমার একটী বন্ধু তাঁহার লক্ষ্ণৌস্থ জনৈক বন্ধুর নিকট আমার সম্বন্ধে একখানা চিঠি দিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে ষ্টেশন রুমে প্রবেশ করিয়াই একটা কেরাণী বাবুর সহিত দুচার কথায় আমার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিয়া গেল। তিনি হিন্দুস্থানী। তাঁহার নিকট আমার মালপত্রগুলি রাখিয়া দিলাম। তিনি একজন চৌকিদার সঙ্গে দিলেন তাহাকে লইয়া আমি আমার গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলাম।

পশ্চিমে যাইয়া বেলার আন্দাজটা আমি কিছু কম পাইতাম। আমি যখন বাসায় পঁহুছিলাম আমার বিশ্বাস ছিল তখন বেলা ৮টার বেশী হয় নাই। কিন্তু খানিক পরেই আমার সে ভ্রম দূরীভূত হইয়া গেল। মাথার উপরে টন্‌টন্ করিয়া দশটী ঘা পড়িয়া গেল। আমি যাঁহার বাসায় গিয়াছিলাম সে ভদ্রলোকটী তখন আফিসে যাইতে-ছিলেন আমাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহার হস্তে বন্ধুপ্রদত্ত চিঠিখানা দিলাম। চিঠিখানা পড়িয়া তিনি আমার হাতটী ধরিয়া আচ্ছা করিয়া একটু নাড়িয়া দিলেন, আমাকে পাইয়া যেন

তিনি কতই আপ্যায়িত হইয়াছেন। খানিকক্ষণ শিষ্টাচারের পর তিনি জোড় হাত করিয়া আমার নিকট ক্ষমা চাহিবার মত করিলেন। আমি বুঝিলাম, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম। তিনি আফিসে চলিয়া গেলেন।

বন্ধুটী আফিসে যাওয়ার কালে তাঁহার ভাগিনেয়কে আমার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। তাহার বয়স আন্দাজ ষোল সতর বৎসর হইবে। আমার তখনও প্রাতঃকৃত্যাদি কিছুই হয় নাই। বালকটী চাকর ডাকিয়া ও নিজে সকল উদ্যোগ করিয়া দিতে লাগিল।

খাওয়ার পরেই দেখি আমাদের দরজায় গাড়ী হাজির। বালকটী জিজ্ঞাসা করিল "বিশ্রাম করিবেন কি ?" আমি বলিলাম "বিশ্রাম করা আমাদের অভ্যাস নাই।"

তখনই গাড়ীতে চড়িয়া দুইজনে নগর দর্শনে বহির্গত হইলাম।

অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌ, অতি প্রাচীন স্থান। কথিত আছে ত্রেতাযুগে অযোধ্যার মহাসমৃদ্ধির সময় এই স্থানে রাজধানী অযোধ্যার সিংহদ্বার ছিল। তার পর রঘুকুল চূড়ামণি রামচন্দ্র সিংহাসন অধিরোহণ করিয়া ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণকে পুরদ্বারের রক্ষক নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মণ মহা সমারোহের সহিত সৈন্য সামন্ত লইয়া নূতন গড় বা নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধিই ইহা লক্ষ্মণ গড় বা লক্ষ্মণ নগর নামে অভিহিত হয়। সেই লক্ষ্মণনগরই ক্রমে মুসলমান শাসন কর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক সংক্ষিপ্ত হইয়া লক্ষ্ণৌ নগরে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ্মণের বাস ভবনের স্থলে মুসলমান মসজিদ ধর্ম্মদ্বেষী যবনের হিন্দু-বিদ্বেষভার সপ্রমাণ করিতেছে।

এখন সে অযোধ্যাও নাই, সে সিংহদ্বারও নাই। বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ মুসলমান নবাবদের যৌবনের সুরঞ্জিত বিলাসকক্ষ ও অন্তিমের বিরাট সমাধিস্তম্ভ বক্ষে ধারণ করিয়া অভিনব গৌরবে তাঁহাদিগের অনন্ত

সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নগরের মধ্য দিয়া গোমতী নদী প্রবাহিতা। লোক সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ হইবে।

অযোধ্যা প্রদেশ বহুকাল দিল্লী সিংহাসনের শাসনাধীন ছিল। বাহাদুর সাহার মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই সময়ে অযোধ্যার তদানিন্তন শাসনকর্ত্তা সওদৎ খাঁ স্বাধীনভাবে অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। নিম্নে অযোধ্যার নবাবদিগের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

নবাব সওদৎ খাঁ—১৭৩২—৩৯ খৃঃ অঃ
„ মনশুর আলী খাঁ সফাদর জঙ্গ—১৭৩৯—৫৩ „
„ সোজা উদ্দৌল্লা—১৭৫৩—৭৫ „
„ আসফ উদ্দৌল্লা—১৭৭৫—৯৭ „
„ সদোতালী খাঁ—১৭৯৭—১৮১৪ „
„ গাজি উদ্দিন হায়দর—১৮১৪—২৭ „
„ নসির উদ্দিন হায়দর—১৮২৭—৩৭ „
„ মহম্মদ আলী সা—১৮৩৭—৪২ „
„ আমাদ আলী সা—১৮৪২—৪৭ „
„ ওয়াজিদ আলী সা—১৮৪৭—৫৬ „

নবাব সওদৎ খাঁ ও মনশুর আলী খাঁ সফাদার জঙ্গ—এই দুইজন মাত্রই লক্ষ্ণৌর সিংহাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। সুজা উদ্দৌল্লা ইংরেজের সহিত গোলযোগ বাঁধাইয়া দিলেন। তাহার পরিণামে বক্সারের প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয়ের শক্তি পরিমিত হইল। সুজা উদ্দৌল্লা পরাজিত হইলেন, অযোধ্যায় বৃটিশ রেসিডেন্সি স্থাপিত হইল। ১৮৫৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত সেই ভাবেই ছিল। অতঃপর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সহিত মতান্তর ঘটায় ওয়াজেদ আলী রাজ্যচ্যুত ও

মেটেবুরুজে কারারুদ্ধ হন। অযোধ্যা বৃটিশ রাজ্য ভুক্ত হইয়া যায়। এইত লক্ষ্ণৌর অতীত ইতিহাস। এখন বর্ত্তমান দৃশ্য—

লক্ষ্ণৌর পার্কগুলির তুলনা নাই। আমরা প্রথমেই "উইন ডিউ" পার্কে গেলাম। সে উদ্যানটী এত সুন্দর ও মনোরম যে আমি আর কোথাও এমন দ্বিতীয় একটী সুরম্য উদ্যান দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহা সহরের পূর্ব্ব অংশে অবস্থিত। আমরা উভয়েই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পার্কটী ঘুরিয়া দেখিলাম। মাঝে মাঝে দুই একটি শ্বেত প্রস্তরের রমণীয় রমণীমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন কুৎসিত রুচির পরিচায়ক। সে স্থান হইতে আমরা কেশর বাগে আসিলাম। সেটী একটী উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত প্রকাণ্ড বাগানবাটী। এই স্থানে বেগমদিগের বাসস্থান ছিল।

বাগানের প্রশস্ত চত্তরে সুন্দর সুন্দব অনেকগুলি গৃহ আছে। ক্যানিং কলেজের সুরম্য গৃহটীও সেই উদ্যানের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমরা কেশরবাগ হইতে বাহির হইয়া "ছাত্রমঞ্জীল" দেখিয়া নবাব আসক উদ্দোল্লার "ইমাম বড়ায়" আসিলাম। লক্ষ্ণৌ সহরে অনেক গুলি ইমাম বাড়ী আছে। এটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দেখিবার উপযুক্ত স্থান। আমবা সোপানতলে জুতা ছাড়িয়া "ইমাম বড়ায়" উঠিলাম। ইহা একটী প্রকাণ্ড গৃহ। এই প্রকাণ্ড ভবন ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় শ্রমজীবীদিগের সাহার্য্যার্থ নবাব আসক উদ্দোল্লা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এইখানে তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। "ইমামবড়া" দেখিয়া "মচ্ছি ভবনে" গেলাম; এটীও একটী প্রকাণ্ড মসজিদ। এই স্থানেই প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যার সিংহদ্বার ছিল। সিংহদ্বারের নিকটেই

লক্ষ্মণ প্রতিষ্ঠিত "রণকালীর" গৃহ ছিল। সেই রণকালীর গৃহের উপরেই হিন্দুদ্বেষী আরঙ্গজেব এই মস্‌জিদ্ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাকে মচ্ছি ভবন বা মচ্ছি বাওয়ান কেন বলে তাহা জানি না। কেহ বলেন ইহাতে অনেকগুলি মাছের ছবি আছে বলিয়া ইহার মচ্ছি বাওয়ান নাম করা হইয়াছে। অতঃপর আমরা সুপ্রসিদ্ধ "লামার্টিনিয়ার কলেজ" ও সাহানাজফ্ সমাধি দেখিয়া "মিউজিয়াম" দেখিতে যাই। সেদিন মিউজিয়াম বন্ধ থাকায় দেখিতে না পাইয়া "বেলি গার্ড" দেখিতে গেলাম। বেলিগার্ডে দেখিবার অপেক্ষা জানিবার বিষয় অনেক বেশী। "বেলি গার্ডের" ইতিহাস—ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস। বেলিগার্ড ভারতীয় সৈনিক কৰ্ম্মচারীদিগের শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থল। "সেকেন্দরা বাগে" আসিয়া গাড়ী বিদায় দিলাম এবং উভয়ে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এখানকার জুম্মামস্‌জিদ্, হোসেনাবাদ ও রেসিডেন্সিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

শ্রীভাগবত ধৰ্ম্ম।

(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেহের অবস্থান্তরের সহিত অথবা দেহান্তর প্রাপ্তির সহিত আত্মার অবস্থান্তর বা বিকার নাই। আত্মার কখনও জন্ম বা মৃত্যু নাই, তিনি অজ, নিত্য, অক্ষয়, ও পুরাণ ; শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। যথা গীতাবাক্যে "অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং

পুরাণো, নহন্যতে হন্যমানে শরীরে।" যদি কেহ বলেন, যে আত্মাকে বিকার শূন্য কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যেহেতু আমরা কখন ক্রোধে প্রজ্বলিত অথবা শোকে অবিভূত হইতেছি, অতএব আত্মার ঈদৃশ বিকার নিয়তই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তর যথা—সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম্ম, উহা আত্মাতে নাই। তবে দেহ আত্মার আবরণ হেতু দৈহিক ধর্ম্ম সকল আত্মাতে প্রতীতি হয় মাত্র। যথা—গগনস্থ সূর্য্যমণ্ডল জলে প্রতিবিম্বিত হইলে, ঐ সূর্য্য-প্রতিবিম্বকে কখন কম্পিত কখন বা শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন গগনস্থ সূর্য্যমণ্ডল স্থির রহিয়াছে তখন উহার প্রতিবিম্বের কম্পন কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? অতএব প্রতিবিম্ব স্থিরই আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। তবে যে প্রতিবিম্বে কম্পন প্রতীতি হইতেছে উহা জলেরই ধর্ম্ম। সেইরূপ সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম্ম আত্মার নহে, দেহের ধর্ম্ম দেহীতে প্রতীতি হয় মাত্র। অতএব নিত্য নির্ব্বিকার আত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত হইলেও সেই আত্মাতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। যেরূপ আমরা জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করি, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করেন মাত্র, যথা—গীতা-বাক্যে "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

অতএব পরজন্মে সেই আত্মা নূতন দেহ পাইবেন বটে, কিন্তু দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এইগুলি নূতন নহে। ঐ সপ্তদশ সূক্ষ্ম জড় তত্ত্ব মৃত্যুর পরে আত্মার সহিতই আসিয়াছে আত্মার এই নূতন দেহের বৃদ্ধির সহিত ঐ সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। পূর্ব্ব জন্মের কার্য্য কলাপ চিত্তে সংস্কাররূপে

আবদ্ধ রহিয়াছে, যে যে বিষয়ের উন্নতি করিয়াছে, সেই সকল উন্নতি মৃত্যুর সহিত নষ্ট হয় নাই, উহা সংস্কাররূপে চিত্তসত্তে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সেই চিত্তই যখন আত্মার সহিত আসিয়াছে তখন আর বাকী কিছুই নাই সকলই আসিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যে যে বিষয়গুলি অর্থাৎ আস্তিক ভাব, নাস্তিক ভাব, বিষয় স্পৃহা, সম্ভোগলালসা, লাম্পট্য, যশোস্পৃহা বিদ্যোন্নতি, বা ঈশ্বরে ভক্তিভাব প্রভৃতি যাহা সেই চিত্তে সংস্কাররূপে অন্তর্নিহিত ছিল, জীব সেই চিত্তের সহিত সেই সেই ভাবগুলিও ইহ জন্মে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং শৈশব হইতে বয়োবৃদ্ধির সহিত অর্থাৎ যথাকালে ঐ সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ও সংস্কারাবদ্ধ চিত্তবৃত্তিগুলির স্ফুরণ হওয়া প্রযুক্ত, সেই সেই বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হইয়া থাকে। এইরূপে অনন্তকাল ব্যাপিয়া, অনন্তবার জন্মাইয়া, অনন্ত বিষয়ের সংস্কার মানবচিত্ত গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু তথাপি মানবচিত্তে স্থানের অভাব নাই ও কখন অভাব হইবে না। অতএব এই সকল অলৌকিক তত্ত্ব যে বেদাদিশাস্ত্র প্রকাশ করিতেছেন, সেই শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ বেদাদিশাস্ত্র যে অপৌরুষের অর্থাৎ কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতু অলৌকিক বস্তু মনুষ্যবুদ্ধির অতীত।

অতএব জীব সকল অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত পথে ভ্রমণ করিতেছে, এই সংসার পান্থশালা মাত্র, অর্থাৎ কর্ম্ম-ভোগের স্থান। প্রতি জন্মেই চিত্ত-বৃত্তিগুলির অনুশীলনে কেহ উন্নতি কেহ অবনতি মার্গে ধাবিত হইতেছে। কেহ মনুষ্য মধ্যে দেবতা কেহ বা মনুষ্য মধ্যে অসুর হইতেছেন, কেহ বা পাশব বৃত্তিগুলির তীব্র অনুশীলনে ক্রমশঃ পশুত্বে পরিণত হইতেছে। সমুদ্র মন্থনের কথা অনেকে শুনিয়াছেন। যথা—"মন্দার পর্ব্বতের দ্বারা সমুদ্র মন্থন করিলে, অমৃত ও গরল উঠিয়া

থাকে। যাহারা গরল পান করিল তাহারা অসুর এবং যাঁহারা সুধা পান করিলেন তাঁহারা দেবতা।" মানব হৃদয়ই সেই সমুদ্র এবং মনই মন্দারপর্ব্বত। অতএব মনের দ্বারা হৃদয়সাগর মন্থন করিয়া দেখিলে সুধা ও গরল এই দুই পাওয়া যায়। সম, দম, ক্ষমা, তিতীক্ষা এবং বিদ্যা এই পাঁচটী সুধা অথবা দিব্যবৃত্তি এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য্য এই পাঁচটী গরল অথবা পাশববৃত্তি। এই সুধাময় বৃত্তিগুলি মানবহৃদয়ে আছে বলিয়াই মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব। পশুর ক্রোধ আছে কিন্তু দম শক্তি নাই, সুতরাং পশুদিগের ক্রোধ হইলে তাহারা ঐ ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের সম, দম প্রভৃতি শক্তি গুলি আছে বলিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পাশব বৃত্তিগুলিকে দমন করত ক্রমশঃ উন্নতি মার্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা রজস্তমোগুণের প্রভাবে সুধাময় বৃত্তিগুলি উপেক্ষা করিয়া পাশব বৃত্তি-গুলির অনুশীলনে সর্ব্বদাই রত থাকেন, তাহারা যে ক্রমশঃ পশুত্ব প্রাপ্ত হয়; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে চিত্তই আমাদিগের অনন্ত পথের সম্বল। এই চিত্তই আমাদিগের উন্নতি বা অবনতির একমাত্র কারণ। ইহজন্মে এই চিত্তকে এরূপ সদ্‌গুণের দ্বারা ভূষিত করা কর্ত্তব্য যে মৃত্যুর পর উহাই আমাদিগের অনন্তপথের সম্বল হয় এবং পর-জন্মে আমরা ঐ চিত্তের প্রভাবে আরও উন্নত হইতে পারি। কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—"Prepare yourself for the next."

শ্রীবনমালী-মিত্র।
শ্রীবৃন্দাবন।

যোগিনী।

(১)

দু'টী বালক বালিকায় বড়ই ভাব,—বালকটীর নাম ধীরেন্দ্রনাথ ও বালিকাটির নাম চারুশীলা।

মধুর প্রাতেঃ বালসূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি ছড়াইয়া পড়িলে, এই বালক বালিকা দু'টী একত্র সম্মিলিত হয়; সারাদিন একত্রে খেলা করে, কেহ কাহাকেও একতিল ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত উভয়ের ভাব ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

(২)

স্ফীত মৃদুল তরঙ্গ তুলিয়া কুলুকুলু সুমধুর সঙ্গীত ঢালিয়া রূপ নারায়ণ নদ প্রবাহিত হইতেছে তাহারই প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে কমলপুর নামক একখানি পল্লীগ্রাম। কৃষ্ণমোহন রায় মহাশয় ঐ পল্লীগ্রামের জমীদার, তাঁহার ২।৩ খানি ভাউলে নৌকা; ইহাতেই তিনি একজন সম্পত্তিবান সদাশয় ব্যক্তি বলিয়া দেশ বিদেশের নিকট সম্মানিত, প্রকৃত পক্ষে তিনি সর্ব্ব সাধারণের প্রশংসার যোগ্য পাত্র। প্রৌঢ়ের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, আজও পর্য্যন্ত স্বার্থপরতা, কুটীলতা, ধনগর্ব্ব প্রভৃতি পাপ কালিমা তাঁহার পবিত্র অন্তঃকরণ কলঙ্কিত করিতে পারে নাই, সংসারে তাঁহার গৃহিণী, একমাত্র পুত্র আর পুত্রবধূ; তাঁহার পরম স্নেহের পুত্রের নাম ধীরেন্দ্রনাথ। ধীরেন্দ্রনাথের উদ্বাহ-বন্ধন বাল্যাবস্থায় সম্পন্ন হইয়াছে। রায় মহাশয়, প্রসিদ্ধ জমীদার মুক্তারাম সামন্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন; আশা বংশের গৌরব ও সম্মান বৃদ্ধি হইবে।

বিনোদবালা শত আদরের বড় ঘরের মেয়ে—দিব্য সুন্দরী; কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত হতভাগ্য, তাহাকে লইয়া সংসারে সুখী হইতে পারিল না। সেই ধূলাখেলার মধুময় বাল্যস্মৃতি সেই মর্ম্মভেদী বিদায়ের একখানি সুন্দর মুখ অনুদিন তাহার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়া জীবনকে অত্যন্ত অশান্তিময় করিয়া তুলিতে লাগিল কিন্তু মনের ব্যথা মনে চাপিয়া রাখিল, বিনোদবালাকে ইহার বিন্দুমাত্রও জানিতে দিল না।

(৩)

সংসারের পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল, একটুকু পা হড়কাইলেই মহাবিপদ। পুরুষ জাতির পা হড়কাইলে তবু রক্ষা আছে, স্ত্রী জাতির আদৌ নাই, সমাজে পরিত্যক্তা। হতভাগিনীদের আর একটুও দাঁড়াইবার স্থান থাকে না।

আমাদের চারুশীলাকে তাই বাল্যস্মৃতি হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় আত্ম সংযম করিতে হইয়াছে; হতভাগিনীকে বেশ্যা ও পাপাসক্ত কদাচারী স্বামীর পায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইয়াছে, নিষ্ঠুর স্বামীর শত উৎপীড়নে বুক পাতিয়া দিতে হইয়াছে। আর বিনোদবালা? যদিও বিনোদবালা চারুশীলার ন্যায় কদাচারী স্বামীর হাতে পড়ে নাই, কিন্তু রমণী জীবনে যাহা অনন্ত স্বর্গ সুখ সেই স্বামী সোহাগ সুখলাভে বঞ্চিতা! এ ন্যায়ান্যায় বিচার বিবর্জ্জিত —এ শত অত্যাচার নিপীড়িত নিষ্ঠুর সংসারে স্বামী-সোহাগ বঞ্চিতা হতভাগিনীদিগকে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, পাঠক গণের মধ্যে বোধ হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আহা! দুর্ভাগিনী বিনোদবালাকে নীরবে শত উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে।

সামন্ত মহাশয় একদিন বেহাই বাড়ীতে আসিয়া কন্যার কঙ্কাল,

মরী বিষাদমূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সংগোপনে কন্যাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনই উত্তর পাইলেন না।

এ সংসারে এক ধরণের কলহপ্রিয় পরনিন্দুক মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা তিলকে তাল করিয়া তুলে। তাহারা পরম আত্মীয়-দের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বাধাইয়া রঙ্গ দেখিতে বড়ই আমোদ বোধ করে। "নির্দ্দয়া শাশুড়ীর ও নিষ্ঠুর স্বামীর অযথা উৎপীড়নে ও অযথা প্রহারে বিনোদ বালার এই দুর্দ্দশা" তাহাদের নিকট নানাবিধ ভূমিকার সহিত ইহার ইতিবৃত্ত অবগত হইয়া সামন্ত মহাশয় রাগে জ্বলিয়া যেন তেলে বেগুনে হইলেন। বেহাই জানিয়া শুনিয়াও ইহার প্রতিবিধান করেন নাই—এই ধারণায় বেহাইয়ের প্রতিও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। কোন সামান্য কর্ম্মোপলক্ষে পনর দিনের কড়ার করিয়া কন্যাকে লইয়া গেলেন, কিন্তু পনর দিন স্থলে একমাস হইয়া গেল দেখিয়া রায় মহাশয় বৌমাকে আনিতে বেহাই বাড়ীতে লোক পাঠাইলেন। সামন্ত মহাশয় কন্যাকে পাঠাইলেন না—পরিবর্ত্তে এমন ভাবের একখানি পত্র পাঠাই-লেন যে তাহাতে পরস্পরের মধ্যে বেশ চটাচটি হইয়া গেল। রায় মহাশয় ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, পরে মনে করিলেন—"চিরদিন কিছু এরূপ ভাবে যাইবেনা, বয়স্থা কন্যাকে বেহাই মহাশয় কয়দিন বাড়ীতে রাখিবেন? রাগ পড়িয়া গেলে অবশ্য পাঠাইবেন।" কিন্তু সামন্ত মহাশয় তেমন প্রকৃতির লোক নহেন, উপযুক্ত প্রতিশোধ প্রদানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

বিনোদবালা কিন্তু ইহার বিন্দু বিসর্গও টের পাইলনা। পিতা পাঠাইতে অসম্মত হইলে মনে করিল "এমাসে না হয় ও মাসে যাব। মেয়ে বাপের বাড়ী আসিলে এমন অনেকের ঘরে পনর দিনের স্থলে দুইমাসও যায়" বিনোদবালার এরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কিছু

অসঙ্গত নয়, বিশেষ যে মেয়ে পিতার অত্যন্ত স্নেহের; সামন্ত মহাশয়ের গৃহিণী জীবিতা নাই, বোধ হয় এইজন্য এসব ব্যাপার অন্দর পর্য্যন্ত গড়ায় নাই সুতরাং বিনোদবালাও কিছুই জানিতে পারে নাই।

(৪)

রাত্রি প্রভাত প্রায়, ততটা ফর্সা হয় নাই, কাক কোকিল ডাকিয়া উঠে নাই, গাছপালায় এখনও আঁধার, এখনও আবছায়া রকম আঁধার সংসারের গায় জড়াইয়া আছে; এমন সময় বাগহাটার মুক্তারাম সামন্ত মহাশয়—ওরফে ধীরেন্দ্রনাথের শ্বশুর ও রায় মহাশয়ের বেহাই—রূপা বাঁধান হুঁকা হস্তে বহির্বৈঠকে আসিলেন। সামন্ত মহাশয় মণ্ডল ঘাটের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ জমীদার, ইহার ৪৫ খানি তালুক, প্রায় ২।৩ লক্ষ টাকার মহাজনী তেজারতী, কিন্তু বড় কৃপণ; অতিথি ভিখারী কখনও ইহার বাড়ীতে একমুঠা ভিক্ষা পায় কিনা সন্দেহ। এমন সময় বীরেশ্বর আসিয়া বাদশাহী ধরণের একটী নমস্কার ঠুকিল। সামন্ত মহাশয়ের স্ফীত গণ্ড গম্ভীর বদনে ঈষৎ হাস্য রেখা উদ্ভাসিত হইল, বীরেশ্বরের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "আমি ভাব্‌ছিলুম আজ বুঝি তোমার যাওয়া হবে না।"

বীরেশ্বর মৃদুমধুর হাস্যের সহিত উত্তর দিল—"আজ্ঞে! এ নেমক হারামের কথায় মিথ্যা করে পেয়েছেন, বলেছি এবারে নানাবিধ বায়—শেষে হাতটান—সেদিকে জমীদারীর খাজনা দেওয়ার দিন সন্নিকট, সবেমাত্র চার দিন বাকী, এই জন্য কর্ত্তার ছেলেশুদ্ধ রওনা।"

"হাঁ, হাঁ, বল কি? তা হ'লে আরও ভাল।" এই বার একটু অন্তরালে গিয়া চুপি চুপি অনেকক্ষণ কি কথা বার্ত্তা হইল, কিছুই শোনা গেল না, "নল দাঁড়ি—যেন ভুল না হয়" শেষ অস্পষ্ট এই দুইটী

কথা শ্রুতিগোচর হইল। গুপ্ত কথা সমাপ্ত হইলে বীরেশ্বর একটী লম্বা চওড়া প্রণাম ঠুকিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

(৫)

দিবা দ্বিপ্রহর, নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড উত্তপ্ত কিরণ উদ্গীরণ করিতেছে, যেন অনল বৃষ্টি হইতেছে, বৃক্ষ পত্র ঝলসিয়া যাইতেছে, পশু, পক্ষিগণ ঘন পত্রবিশিষ্ট নিবিড় কাননের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তপ্ত বায়ুর উষ্ণ নিশ্বাস জীব জন্তুর প্রাণে যেন দাবানল জ্বালিয়া দিতেছে; পিপাসায় শুষ্কতালু চাতক নীরদপানে উর্দ্ধনয়নে "ফটিক জল ফটিক জল" করিয়া করুণস্বরে মর্ম্ম স্থল বিদ্ধ করিতেছে। এ পর্য্যন্ত রায় মহাশয় জল বিন্দুও স্পর্শ করেন নাই। অদ্য জমীদারীর খাজনা দেওয়ার দিন, তহবিল শূন্য, মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সমস্ত রাত্রি চক্ষে নিদ্রা নাই, ভাবনা চিন্তায় দুঃস্বপ্নে কাটিয়া গিয়াছে। পাঁচ পাঁচ দিন পুত্র ধীরেন্দ্রনাথকে চাউল বিক্রির পাওনা টাকার জন্য রামকৃষ্ণপুর পাঠাইয়াছেন, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আসিল না দেখিয়া বৃদ্ধ দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছাস্বত্ত্বে বেহাই বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সমস্ত জমীদারী পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া দুই হাজার টাকামাত্র অনেক অনুনয় বিনয়ের সহিত চহিয়া ছিলেন, ক্রূর বেহাই এক পয়সাও দেন নাই, অধিকন্তু সময় পাইয়া মর্ম্মভেদী বাক্যবাণে মর্ম্মে তীব্র আঘাত প্রদানেরও ক্রুটি করেন নাই। রায় মহাশয় অনন্যোপায় হইয়া এখন কেবল উৎকণ্ঠিত চিত্তে পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এবং বিপদহারী মধুসূদনের নাম বারবার স্মরণ করিতেছেন, এমন সময় ধীরেন্দ্রনাথ শুষ্কমুখে শূন্য হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতার সম্মুখীন হইবামাত্র বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল।

"গতরাত্রিতে নল দাঁড়ির নিকট বোম্বেটে দল কর্ত্তৃক নৌকার

তিন হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে।" রায় মহাশয় পুত্রের নিকট এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া "হায় কি হইল বলিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, ভৃত্যগণ ধরাধরি করিয়া রোরুদ্যমান পিতা পুত্রে লইয়া বাড়ীর মধ্যে গেল, রায় মহাশয় সেই দিন হইতে শয্যাশায়ী হইলেন।

(৬)

রায় মহাশয়ের জমীদারী খানি নীলাম হইয়া গিয়াছে। নরপিশাচ মুকুরাম সামন্ত বেহায়ের সম্পত্তি নীলামে ধরিয়া লইয়াছেন। আজ এক সপ্তাহ কাল রায় গৃহিণী গ্রহণী রোগে আক্রান্ত, রায় মহাশয় বিষম জ্বর রোগে শয্যাগত। সমস্ত দাসদাসীকে বিদায় দিয়া যা' কিছু অল্প সম্বল ছিল, শোক সন্তপ্ত চিত্ত ধীরেন্দ্রনাথ সবই পিতা মাতার চিকিৎসায় ব্যয় করিতেছে। কবিরাজ ডাকিতেছে, পথ্য দিতেছে, একাই এসব করিতেছে। নৃশংস জমিদার সামন্ত মহাশয়ের ভয়ে গ্রামস্থ কেহই সহায়তা করে নাই, কিন্তু যাঁহাদের জন্য দিনরাত্র পরিশ্রম করিয়া, না খাইয়া না ঘুমাইয়া এত করিতেছে, সেই পিতামাতার আজ শোচনীয় অবস্থা। কবিরাজ হাল ছাড়িয়াছেন, ধীরেন্দ্রনাথ হতাশ হইয়াছে। হতভাগা দম্পতী মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহাদের বড় স্নেহের পুত্রের মুখ পানে ধীরে ক্ষীণ চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক একবার চাহিলেন, কি বলিবার চেষ্টা করিলেন বলিতে পারিলেন না। কেবল নীরবে তপ্ত অশ্রু তাঁহাদের উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল, কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, ঠিক একই সময়ে উভয়ের পবিত্র আত্মা নিষ্ঠুর সংসার পরিত্যাগ করিল! "তোমরা কোথায় গেলে গো" বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, অনেক ক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, দেখিল—সে শ্মশানে; সেই কৃতজ্ঞ পূর্ব্বভৃত্যগণ আসিয়া চিতা সাজাইয়াছে, ধীরেন্দ্রনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে পিতামাতার সৎকার করিল। ধীরেন্দ্র

ভৃত্যগণকে বলিল—"আর অধিক রাত্রি নাই, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী যাও, তোমরা এখন যাহার প্রজা, সেই নর পিশাচ আমার সাহায্য করিয়াছ, জানিতে পারিলে, তাহার কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইবে, তোমারা অশিক্ষিত দীন দরিদ্র হইয়াও যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছ, ইহা সংসারে অতুলনীয়, এখন গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আর সে শ্মশান ভূমিতে যাইব না, তোমাদিগকে বাস্তুবাটী দিয়া গেলাম।" এই বলিয়া পিতামাতার চিতাভস্ম মস্তকে মাখিয়া উন্মত্তের ন্যায় চলিল। ভৃত্যগণ ধীরেন্দ্রনাথকে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পাষণ্ড জমীদারকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামাভিমুখে গমন করিল।

(৭)

বিষাদময়ী রজনী প্রভাত হইয়াছে। দারুণ মনোকষ্টে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে ধীরেন্দ্রনাথ কোথায় বিবাগী হইয়া গিয়াছে। সবই হতভাগিনী বিনোদবালার কর্ণগোচর হইল। নির্দ্দয় পিতার কীর্ত্তিকলাপ বিনোদবালার আর অজ্ঞাত রহিল না, যেন সহসা শিরে বজ্রপাত হইল। ভূমিতলে মূর্চ্ছিতা হইল, পরিচারিকাগণের বহু সেবা শুশ্রূষার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে ভাবিল—"এ বৃথা রোদনে আর ফল নাই, এখন সংসার বিরাগী স্বামীকে আনিয়া যেরূপে সুখী করিতে পারা যায় সেইরূপ উপায় অবলম্বন করা আমার কর্ত্তব্য, আমি দুর্ভাগিনী, আমি তাঁহার দুঃখের মূল, আমায় লইয়া কখনও সুখী হইতে পারিবেন না। তাঁহার মনোনীতা একটী পরম লাবণ্যময়ী গুণবতী তাঁহার অঙ্কশায়িনী করিয়া, তাঁহাকে সংসারে সুখী হইতে দেখিয়া মরিব" এই মনস্থ করিয়া পিতার নিকট গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার পায় জড়াইয়া ধরিয়া রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামীর প্রতি কৃপা প্রকাশ করিতে অনেক মিনতি করিল। পাষাণের পাষাণ হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইল;

না। বিনোদবালা তাহাতে হতাশ হইল। মনস্থ করিল আর এ গৃহে থাকিব না। আমার ন্যায় অনেক হতভাগিনী এরূপ পাপের সংসারে থাকিয়া বিবিধ প্রকার দুর্গতি ভোগ করিতেছে। পাপ প্রলোভনে চরিত্র রত্ন হারাইয়া লাঞ্ছিতা হইতেছে। অতএব আমার পক্ষে লোকালয় পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ। এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া মনের দুঃখে পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া একদা তমসাবৃতা গভীর রজনীতে কোথায় চলিয়া গেল, নরপিশাচ সামন্ত মহাশয় একমাস কাল কন্যার অনুসন্ধান করিয়া কোনও তত্ত্ব পাইলেন না।

যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, যিনি পাপীর কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের জন্য অনন্ত নরক সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতার নিকট পাপী পাপকার্য্য করিয়া কখনও সংগোপনে রাখিতে পারে না। বিধাতার ইচ্ছায় মহাপাপী সামন্ত মহাশয়ের লুক্কায়িত পাপ কর্ম্ম কিছুদিন পরে ধরা পড়িল, বীরেশ্বরের সহিত চক্রান্ত করিয়া নলদাঁড়ির নিকট বোম্বেটে দ্বারা রায় মহাশয়ের যে তিন হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই জন্য দেশবিদেশে সর্ব্বসাধারণের নিকট ঘৃণিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে সমস্ত জমীদারীর উত্যক্ত প্রজারা উদ্ধত হইয়া তিন বৎসর কাল এক পয়সাও খাজানা দিল না। অনেক পীড়াপীড়ির পর খাতক গণের নিকট যা' কিছু আদায় হইল তাহাও রাত্রিকালে বিদ্রোহী প্রজাগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার জমিদারী গুলি নীলাম হইয়া গেল। পথের ভিখারী হইয়া কৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া দারুণ চিন্তায় বিষম রোগগ্রস্ত হইলেন। এক মাস কাল যম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুর করালগ্রাসে নীত হইলেন। এই রূপে পাপীর পাপ জীবনের অবসান হইল।

(৮)

পোড়া সংসারে দুঃখের মধ্যে যে টুকু সুখ শীঘ্রই কেমন তাহা ফুরাইয়া যায়। এত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও দুঃখিনী চারুশীলার শ্বশুর শাশুড়ীর অনুপম স্নেহাদর একটুকু শান্তির বটে, কিন্তু তা'ও অধিক দিন ভাগ্যে ঘটিল কই? তাঁহারা দুশ্চরিত্র পুত্র গোবর্দ্ধনচন্দ্রের পাশবাচারে উত্যক্ত হইয়া, একমাত্র স্নেহের পুত্রবধূ স্বর্ণকমলিনী চারুশীলাকে শুষ্কপ্রায় হইতে দেখিয়া, মর্ম্মান্তিক মনোব্যথায় ক্লিষ্ট হইতে ছিলেন; গুণধর পুত্রের বিবাহের দশম বৎসর অতীত হইতে না হইতে অতিরিক্ত চিন্তাহেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া জ্বররোগে সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। যা' কিছু ধনসম্পত্তি ছিল গোবর্দ্ধন চন্দ্রের মোক্ষপ্রদায়িনী সুরা ও বারাঙ্গনা দেবীর কৃপায় ২।৪ মাসের মধ্যে নিঃশেষপ্রাপ্ত হইল। মোসাহেব অভাবে গুণধরের শীঘ্রই অন্তর্দ্ধান হইল, আর চারুশীলা—পথের কাঙ্গালিনী হইল।

আমতার সন্নিকটস্থ বাণেশ্বর দেব প্রসিদ্ধ। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে এখানে বিস্তর লোক সমাগম হইত, বাণেশ্বর মস্তকে বিল্বপত্র, দুগ্ধ, ডাবজল ঢালিয়া মুক্তির আশায় যাত্রিগণ দলে দলে আসিত। কঠিন রোগগ্রস্ত রোগিগণ নীরোগ হইবার আশায় বাবার নিকট আসিয়া উপবাস দিত, সময়ে অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শন পাওয়া যাইত। চারুশীলা তথায় গিয়া এক যোগিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিল; যোগিনীর আগমন তথায় সবেমাত্র এক বৎসর অতীত হইলেও তাঁহার গুণে সকলে মুগ্ধ। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, অনাথ রোগীদের সেবা সুশ্রূষা ও চিকিৎসা দ্বারা জীবন দান, পাপ প্রলোভনে বিমুগ্ধা বিপথগামিনীগণকে সদুপদেশ দান ও সংসার বিতাড়িতা দুর্ভাগিনী-গণকে আশ্রয়দান এই গুলি তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ছিল,

অর্থের সদ্ব্যয় হইবে ভাবিয়া সহৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভক্তির সহিত তাঁহাকে যা' অর্পণ করিতেন তিনি তাহা হইতে এতগুলি সৎকার্য্য করিতেন, আর কিছু কিছুও সঞ্চয় রাখিতেন। সঞ্চয়ের হেতু যাহা হউক, দেব মন্দির স্থাপন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে তাঁহার স্বর্গ-লোক গমনের পূর্ব্বে যে তাহা ব্যয়িত হইবে, ইহা সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আনুপূর্ব্বিক জীবনের ইতিবৃত্ত বিবৃতির সহিত চারুশীলার আশ্রয় গ্রহণের পর হইতে কেমন তাঁহার ভাবান্তর হইল, সঞ্চিত অর্থ রাশি সেইরূপ সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে লাগিলেন; দিনে দিনে শীর্ণপ্রায় হইতে লাগিলেন কেহই তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না।

(৯)

আজ তিনদিন যোগিনী একটি রোগী লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অতি যত্নের সহিত শুশ্রূষা করিতেছেন, দিন রাত্রি চক্ষে নিদ্রা নাই অতি ব্যাকুলা, যেন উন্মাদিনী, আশ্রমে অনেক রোগী আসিয়াছে, কাহারও জন্য এত উতলা দৃষ্ট হয় নাই। অবশ্যই কাহারও শুশ্রূষার ত্রুটি হয় নাই, আজ দুই বৎসর কাল চারুশীলা আসিয়াছে, চারুশীলার উপর সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছে। কেবল মাত্র যোগিনী মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাব-ধারণ করেন; প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইলে আনাইয়া দেন, প্রায় সর্ব্ব সময় ঈশ্বরোপাসনায় নিবিষ্টচিত্ত থাকেন। সম্প্রতি পূর্ব্বভাবের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হওয়ায়, দর্শক মাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হই-য়াছেন, অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় চারুশীলা এ পর্য্যন্ত রোগীর অঙ্গও স্পর্শ করে নাই, কি জানি কি মনের ব্যথায় একাকিনী নির্জ্জন অন্তরালে অশ্রুনীরে সিক্তা হইতেছে।

দিবা অবসান প্রায় হইয়াছে, দিবাকর আর যেন শোক তাপ ময় ধরার দুর্গতি দেখিতে না পারিয়া অস্তাচলশায়ী হইতেছেন।

মুমূর্ষু প্রায় রোগী ধীরে ধীরে নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক যোগীনীর পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন "আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই, জীবন অত্যন্ত গুরুভার বোধ হইতেছে, বৃথাই চেষ্টা করিতেছ, আমি অত্যন্ত হতভাগ্য নতুবা তোমার ন্যায় সাধ্বীসতীর এরূপ দুর্দ্দশা হইবে কেন? দুইটি সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইবে কেন?"

"এ পোড়াকপালীর দোষ নাথ: অতি সুখের সংসার ছিল এই হতভাগিনীকে লইয়া গিয়া পথের ভিখারী হইলে, আহা শ্বশুর শ্বাশুড়ী কি নির্য্যাতন না সহিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি কুল-নাশিনী তাই শ্বশুর কুল পিতৃকুল ছারখারে গেল!"

"তুমি কুলের গৌরব তুমি হিন্দুকুলের আদর্শ সতী, কিন্তু বড়ই হতভাগিনী তাই এ হতভাগ্যের হাতে পড়িয়া তোমার ন্যায় দেবীর এ দুর্দ্দশা, আমি তোমার নিকট মহা অপরাধী মহাপাপী আমার সংসারের খেলা ফুরাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু জীবনে বড়ই সন্দেহ বড়ই আক্ষেপ রহিয়া গেল—আমরা সংসারে সুখী হইতে পারিলাম না কেন?"

"বড়ই আশা ছিল নাথ তোমায় সুখী করিয়া তোমার ঐ ম্লান বদনে প্রাণ ভরা হাসি দেখিয়া সুখে মরিব, সেই উদ্দেশে পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া যোগিনী বেশে দেশে দেশে তোমার অনুসন্ধান লইয়াছিলাম, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইল না; আহা! চারুশীলা অত্যন্ত হতভাগিনী।"

"দেবী অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তোমাদের দুইটির নিকট এ সংসারে মহাদোষী, চারুশীলা এখন তোমার আশ্রয়ে, তাহার নিকট সবই শুনিয়াছ, আমি যে তোমার নিকট ইহা আজীবন গোপনে রাখিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলাম তুমি দুঃখিতা হইবে বলিয়া। কিন্তু

ধৈর্য্য ধরিয়াও ধরিতে পারিলাম না, সেই সদা শিশির স্নাত গোলাপ যুথিকাসম ব্রীড়ানত সুন্দর মুখখানি সেই সরলা আবেশময়ী প্রীতিপূর্ণ সুন্দর চাহনি শতচেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিলাম না, তোমার ন্যায় স্বর্গের পারিজাত প্রাপ্ত হইয়াও সুখানুভব করিতে পারিলাম না, এই হেতু তুমি চিরদুখিনী হইলে, সেই অপরাধে আমার এমন দুর্দ্দশা ঘটিল আমি মহাপাপী, তোমায় অনেক কষ্ট অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি। তোমায় সুখিনী করিতে পারিলাম না, জীবনের শেষ সময়ে এই কাতর প্রার্থনা, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

বিনোদবালাকে ক্ষীণস্বরে এই কয়েকটী কথা বলিয়া সেই দুর্ব্বিসহ রোগ রুগ্ন ধীরেন্দ্র নাথ দুইটি চক্ষু মুদ্রিত করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণ বায়ু বায়ুর সহিত মিশিয়া গেল। যোগিনী বিনোদ বালা, গুরুশোকভারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল, আর সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। যোগিনী বিনোদ-বালার বিষাদময়ী কাহিনী উপস্থিত সকলের প্রাণে দারুণ ব্যথা দিল। অভাগিনী চারুশীলা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কি জানি কোথায় চলিয়া গেল! শীঘ্রই ঘৃত চন্দন কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইল; দেখিতে দেখিতে দুইটি দেহ বক্ষে লইয়া ধূ ধূ করিয়া চিতানল জ্বলিয়া উঠিল। হিন্দু সংসারে একটী অভিনয় ফুরাইল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস

মহিষাদল।

——:০:——

ফুলের সাজি।

যদি ভালবাস।

১

যদি ভালবাস,
যেযো শতমুখী নিয়ে ছুটে
বিকৃত বদন করি',
যদি প্রিয় প্রতি তব রাগ এসে জুটে!

২

যদি ভালবাস,
ক'রো অভিমান প্রতি প্রহরে,
সে মান সাধিতে গেলে,
ছেড়ো, পা টিপিযে নিযে, তবে তারে!

৩

যদি ভালবাস,
দিও আল্‌তা পরা চরণ খানি
তব প্রিয়বর বুকে,
তা'র জুড়াইবে তাপিত পরাণি!

৪

যদি ভালবাস,
শত মুখনাড়া দিযে কথা কযো,
সাধিলে চরণে ধ'রে,
তুমি, বদন ফিরা'য়ে চলে যেযো!

৫

যদি ভালবাস,
খেয়ো লুচি সন্দেশ থাল ভ'রে,
প্রিয় তরে রেখ শুধু
দু'টা কড়্‌করে ভাত পাতে ক'রে!

৬

যদি ভালবাস,
শুয়ো যদি কাঁটা ভাল বিছানায়,
তব প্রিয় তরে দিও
শুধু ছেঁড়া কাঁথা খানি অভিলাষ!

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

তুমি।

তুমি শিশু এসে ছিলে, শিশু সম গেলে
অশীতিবরষ পরীক্ষা সয়ে,
শোকের তাড়নে নিযতি ছলনে
ধরার পীড়নে দলিত হয়ে!

তুমি কুটিলতা মাঝে পূত নবলতা
নিরীহ মনেতে পুষিযা ছিলে,
তুমি শত হাহা মাঝে মরম ক্ষত যে
নীরবে সহিতে শিখাযে গেলে।

তুমি ভাঙা বুক চেপে জরা তুফানেতে
তৃণ মোরে ধরে ভাসিযা ছিলে,
আমি তীরে না ঠেকিতে দারুণ আঘাতে
কাঁপিনু, তুমি যে ডুবিযা গেলে।

হায় তব আঁখি জল মুছাতে নারিনু
পিতার পিতা হে পরম গুরু,
আমি পিতায জানিনে তুমি যে আমার
দযার নির্ঝর স্নেহের তরু।

তুমি নিরাশার বাতে দুঃখ ঝঞ্ঝাবাতে
বড় ব্যথা পেযে গিয়াছ ভাসি,
আমি চরণ ধোয়াতে হৃদয় শোণিতে
আশা পথ চেযে রযেছি বসি।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

বিভু প্রেম।

১

চন্দ্রমার স্নিগ্ধ শুভ্র করে,
প্রকৃতির শ্যামল প্রান্তরে,
তরুরাজি দুর্ব্বাদল 'পরে,
তটিনীর তানে, বিহগের গানে,
হেরি কা'র মূরতি সুন্দর?

২

মেঘমুক্ত সুনীল গগণে,
নবোদিত তরুণ তপনে,
সুরঞ্জিত উষার বরণে,
মৃদুল সমীরে, নিশির নীহারে,
কা'র ছবি আঁকা মনোহর?

৩

কার শক্তি ধরি' এ জগত,
যুগব্যাপি চলে অবিরত,
মাস, বর্ষ, ঋতু আদি যত,
হৃদয়ে হৃদয়ে, ভালবাসা দিয়ে,
কে বেঁধেছে প্রেমে বিশ্বময়?

৪

কা'র প্রেমে হৃদয়-উল্লাস,
এ সংসার, নন্দন আবাস,
তম ঘুচে প্রেমের বিকাশ,
জ্ঞানের প্রকাশ, কাটে মায়া-ফাঁস,
অনন্ত নির্ব্বাণে জীব, পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়।

৫

কা'র প্রেমে চায় আত্মদান,
করুণায় বিগলিত প্রাণ,
শান্তি রাজ্যে দেহের প্রয়াণ,
মায়া স্বপ্ন ঘুচে, অশ্রুকণা মুছে,
সুখ দুঃখে, চিদানন্দময়।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমতীর মালাগাঁথা।

প্রভাত হইল সই, বায়স ডাকিছে ওই,
কেন বল প্রাণ সখি ঘুমে আছ অচেতনে!
উঠ উঠ প্রাণ সখি চল যাই কাননে
ফুল তুলে গাঁথি মালা দিব প্রাণ রতনে।
আনন্দে ধরিয়া তান দুজনে গাহিব গান
শুনে সে মধুরস্বর, মুগ্ধ হবে প্রিয়বর।
দুজনে আনন্দ মনে বসি সুখে নিরজনে
গাঁথি মালা যতনে সাজাব শ্যামরতনে।
চল সখি ত্বরা করি শুনিছনা বনমালী
তুলিছে বাঁশিতে তা'র সুস্বর লহরী।
কখন তুলিব ফুল কখন্ গাঁথিব মালা
হইয়াছে এত বেলা উঠ সখি উঠ উঠ।
সাজাইতে কালা চাঁদে বাসনা হ'য়েছে মনে
তাই আসিয়াছি সখি কুসুম তুলিতে বনে।

শ্রীচন্দ্রকুমার বসু।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

যাদুতে জব্দ।—প্রসিদ্ধ মার্ক টোএন্ এবং বিখ্যাত যাদুকর প্রোফেসার হারম্যান্ দৈবযোগে কোন প্রাদেশিক মার্কিন হোটেলে একত্রিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ইঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের গুণগরিমা শুনিয়াছেন। আহারের সময় জলবায়ু সম্বন্ধে অপরাপর অনাবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা চলিতেছে। মার্ক টোএন একটি আলু কাটিবার জন্য ছুরি তুলিয়াছেন অমনি হারম্যান তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "মহাশয় করেন কি? আপনার আলুর ভিতর ও কি রহিয়াছে?" টোএন্ আলুটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন কিন্তু কিছুই অস্বাভাবিক লক্ষ্য না হওয়ায় পুনরায় কাটিতে উদ্যত হইয়াছেন, আবার হারম্যান বাধা দিয়া বলিলেন "মহাশয় ক্ষমা করিবেন, নিশ্চয়ই আপনার আলুর ভিতর কি যেন দেখিতেছি" এই বলিয়া আলুটি স্বহস্তে দ্বিখণ্ড করিয়া দেখাইলেন যে তাহার ভিতর একটি সুন্দর হিরকাঙ্গুরী রহিয়াছে। মার্ক অঙ্গুরীটি দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিলেন "দেখুন আর এরূপ চলে না, আজকাল আমি যেখানে সেখানে হীরক বর্ষণ করিতেছি, সেদিন চিনির বাটীতে হীরকের বোতাম পাইলাম, রাত্রে যে শয্যায় শুইয়াছিলাম প্রাতে আমার চাকর সেখান হইতে কএকটা হীরকের টুকরা পায়। এই সব কুড়াইয়া আমি বিরক্ত হইয়াছি" এই বলিয়া তিনি হোটেলের চাকরকে নিকটে ডাকিয়া তাহার হস্তে হারম্যানের হীরকাঙ্গুরী দিয়া বলিলেন "এই নাও তোমার পারিশ্রমিক স্বরূপ এই সামান্য পুরস্কারটি রাখিয়া দাও।"

যাদুকর ঠকাইতে গিয়া অনেক কষ্টে নিজ অঙ্গুরীয়টি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।
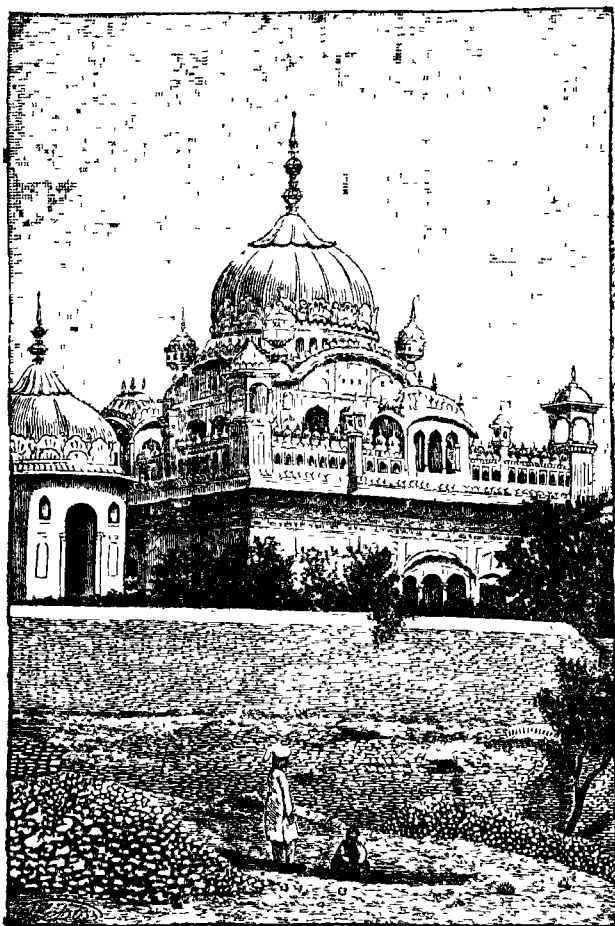
রণজিৎসিংহের সমাধি মন্দির।

প্রবাস ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

ELM PRESS CALCUTTA

প্রয়াস।

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ। জুলাই, … সাল। সপ্তম সংখ্যা।
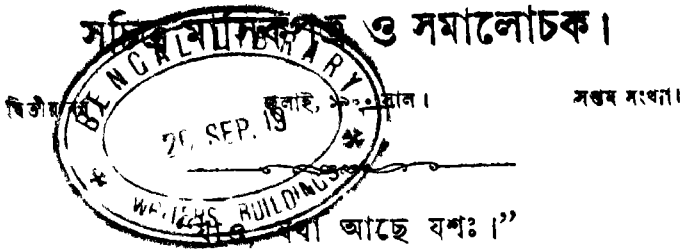
“যাও, যথা আছে যশঃ।”

[Moore বিরচিত “Go where glory waits thee.” সঙ্গীতের অনুবাদ।]

যাও, যথা আছে, যশ: তব তরে,—
কিন্তু প্রাণভরা, যশের ভিতরে,
মনে, সখা, রেখো মোরে।
মধুময় অতি, করম সাধনে
সাধুবাদ যবে, তোষিবে শ্রবণে,—
মনে রেখো তবে মোরে।—

কত জনে তোমা, দিবে আলিঙ্গন,
দিবে সমাদর, প্রিয়তর জন,
কত সুখরাশি, ভরিবে জীবন,
মধুর, মধুরতর!
কিন্তু, সে ঘনিষ্ট, সুহৃদ্ মিলনে,
সে নিবিড় সুখ মাঝে, মনে মনে
রেখো মোরে, প্রিয়বর!

সন্ধ্যায় যবে, করিবে ভ্রমণ,
প্রিয় তারকায়, রাখিয়া নয়ন,
তখন স্মরিও মোরে,
গৃহপথে দোঁহে, ফিরিয়া যখন,
হেরিতাম তা'র, উজল আনন—
—সেই কথা মনে ক'রে!

যখনই, সখা, নিদাঘের শেষে,
গোলাপ-কলিকা, ফুটিবে সে দেশে,
বাধিবে গো আঁখি, মুগ্ধ আবেশে
পূর্ব্বের প্রিয় ফুলে,—
মনে ক'রো তায়,—যে গাঁথিত মালা;
সে ফুলে প্রীতি শিখা'ল যে বালা,
তা'রে যেওনাকো ভুলে!

হেরিবে যখন, তব আশে পাশে,
ঝরিতে তরু, পাতা ঝ'রে আসে,
আমায় স্মরিও তবে,—
যবে নিদ্রাভাগে, অগ্নি-আধারে
আনন্দ-উজ্জ্বল, করিবে আগারে,—
—মোর কথা মনে হবে ?

মনে রেখো,—যবে, সঙ্গীত-তানে
ভাব-প্রতিধ্বনি জাগিবে পরাণে ;—
ভাবের আবেশে, যখন নয়নে
ভরিবে অশ্রুকণা !—
তোমায় শুনা'তে, গে'তাম যে গান,
তা'র স্মৃতি যেন, হয় ভাসমান,—
তখন স্ম'রো এ জনে !

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সরকার।

বিহারিলাল।

অপত্যস্নেহে।

হৃদয়ের অন্যান্য ভাবগুলির ন্যায় বিহারিলালের অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল ছিল, এবং এই স্নেহ প্রকাশেও বিহারিলালের কিছু বিশেষত্ব ছিল। কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশ বাবু বলেন "বাবা আমাদের বড়ই ভাল বাসিতেন।" তিনি পিতাকে ভয় বা ভক্তির পাত্ররূপে দেখিতেন না, তাঁহাকে পরমবন্ধু বিবেচনা করিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহার কোন প্রকার মনোভাবই পিতার নিকট অপ্রকাশ থাকিত না এবং পিতাও তাঁহাকে অপরিণত-বয়স-সুলভ প্রলোভন বা কুপ্রবৃত্তি সমূহ হইতে অন্তরে থাকিবার জন্য সরলভাবে ও বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিতেন।

বিহারিলালের সন্তান সংখ্যা অনেকগুলি হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সকলকেই সমভাবে এবং প্রাণভরিয়া ভাল বাসিতেন। বিহারিলালের সন্তানগণ যেরূপ উৎকৃষ্ট আহার প্রাপ্ত হইতেন অনেক বিত্তবান্ ব্যক্তির নয়নপুত্তলের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটে কিনা সন্দেহ। তিনি

হয়ত বাক্স বাক্স আঙ্গুর বা প্রচুর বোম্বাই আম্র আনিয়া সন্তানদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া যাহার যত ইচ্ছা ভক্ষণ করিতে বলিতেন। তাঁহার এইরূপ অবিধেয় কার্য্য বা অমিতব্যয়িতার জন্য কেহ অনুযোগ করিলে তিনি স্নেহাতিশয্য বশতঃ সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল, এবং এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য তিনি আপনি সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং নিজের নানারূপ অভাব সন্তুষ্ট চিত্তে সহ্য করিতেন। তিনি তাঁহার পুত্রগণকে হিন্দুস্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করেন এবং আপনার অবস্থাতীত অর্থব্যয় করিয়া তাঁহাদের সুশিক্ষা দান করেন। বিহারিলালের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের আশানুরূপ ফলও ফলিয়াছিল। তাঁহার কয়েকটী পুত্রের নাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের সামগ্রী। কবির বন্ধু যোগেন্দ্র বাবু আমাদের নিকট একদিন বিহারিলালের পত্নীকে "রত্নগর্ভা" বলিয়া সম্ভাষণ করেন। যোগেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত আখ্যা বোধ হয় অপাত্রীতে ন্যস্ত হয় নাই।

বিহারিলালের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। বিহারি বাবু তাঁহার এই বংশধরের তরুণ বয়সের সময় তাঁহার বন্ধু অনাথ বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ, কবি হইবে কিন্তু গরিব হইবে।" বিহারিলাল বোধ হয় তাঁহার এই পুত্রের স্বভাবে নিজ প্রকৃতির অনুরূপ মিতব্যয়িতার ও সঞ্চয়স্পৃহার অভাব দেখিয়াছিলেন বলিয়া শেষোক্ত কথাটী বলিয়াছিলেন; আর ষষ্ঠ বর্ষের "ভারতী"তে অবিনাশ বাবুর রচিত গান গুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে

পারা যায়, যে প্রথম উক্তিটী বিহারিলাল নিতান্ত চন্দ্রাশাচালিত হইয়া বা স্নেহ পক্ষপাতিত্ব নিবন্ধন করেন নাই। বিহারিলালের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী ও তৃতীয় পুত্র শ্রীমান শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী উভয়েই এম্ এ, বি, এল। হৃষীকেশ বাবু এম এ পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, ইনি ইতিপূর্ব্বে লাহোর দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ছিলেন; সম্প্রতি ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। শরৎবাবু বি, এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হয়েন এবং এম্, এ, পরীক্ষায় দর্শনে তাঁহার নাম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের তালিকার শীর্ষস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। ইনি এক্ষণে মজফরপুরের একজন উন্নতীশীল উকিল। বিহারিলালের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তীও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র, ইনি বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন।

বিহারিলালের অপরাপর মনোভাবের ন্যায় সন্তানস্নেহও তদীয় কবিতায় স্থান পাইয়াছে। "নিসর্গ সন্দর্শন" ও "বঙ্গসুন্দরী"তে কবি যেরূপ স্বভাবমধুর ভাষায় পত্নীপ্রেমের সহিত এই অপত্যস্নেহ বিজড়িত করিয়াছেন, তাহার তুলনা বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

কবি যৌবনে তাঁহার "যাদু অবিনাশ মণি" কে "প্রেয়সীর কোল আলো করি" থাকিতে দেখিয়া যে অতুল সুখ-সন্তোষ কবিতায় উচ্ছ্বসিত করিয়াছেন, শেষজীবন অবধি তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ হইতে সেই সংসার প্রীতিময় গীতের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। "প্রভাত সঙ্গীতে" কবি তাঁহার "দুধের মেয়ে" পঞ্চম কন্যা 'বরু' (বরদারাণী) ও কন্যার জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

আয়রে আনন্দময়ী, দাও প্রিয়ে কোলে দাও।
স্নেহেতে গলিয়া প্রাণ, ভেসে যায় দুনয়ান,
নাজানি প্রেয়সী এরে নির্জ্জনে কি নিধি পাও!
বৃথা পুরুষাভিমান, প্রেমেতে প্রধানা নারী,
কতই কতই বেশী স্নেহ সুখে অধিকারী।

কবি কন্যাকে বক্ষে ধারন করিয়া অসীম আনন্দে অনন্ত স্নেহে গাহিয়াছেন,—

স্বভাবে অভাব আছে পূরাব কেমন কোরে,
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে।
বিচিত্র বিধাত। তব স্নেহের মোহন ডোর,
ফুরাবেনা স্বপ্ন কভু ভাঙিবেনা ঘুম ঘোর।
অতি অপরূপ মায়া, অপরূপ সমুদয়,
বিশ্বব সৌন্দর্য্যরাশি কি এক পিরীতিময়!

যিনি এই সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে, এই প্রীতি সাগরের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিয়া দেবরাজের সুখসৌভাগ্যকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, তিনিই আবার লোক সমাজে "দুঃখের কবি" বলিয়া সম্ভাষিত হইয়াছেন। এই বিপরীত আখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

দুঃখঅভিব্যক্তিতে।

যে কবির সংসারনিকেতন সুখশান্তিস্নিগ্ধ, যাঁহার জীবনে অভাব বা দুঃখের যাতনাময় স্পর্শ অনুভূত হয় না, সে কবি কেন গায়—

সর্ব্বদাই হুহু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন;
চারিদিকে ঝালা কালা, উঃ কি জলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

যে কবির গৃহে স্নেহপ্রেমের আধার গৃহলক্ষ্মী, করুণাময় জনক; শান্তিপ্রদ পুত্রকন্যা, সে কবি এ দারুণ অতৃপ্তি কোথা হইতে পাইলেন?

যে কবি সংসারের কঠোর সংঘর্ষে জগতের প্রতি বিতৃষ্ণ হইবার বিশেষ কারণ পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না সে কবি কেন বলেন—

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ, যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম, নহে মানুষের ধাম,
পড়ে আছে ভগ্ন অবশেষ।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এই দুঃখপ্রবণতায় হৃদয়ভেদী গানের উৎপত্তি জার্ম্মন্ কবি Goethe হইতে। ফরাশি সমাজবিপ্লবের পর ধর্ম্মে অভক্তি, দেশে অরাজকতা, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, জীবনে অশান্তি আবির্ভূত হইয়া ইউরোপবাসিগণকে অতৃপ্তির দোলায় প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল। Goethe সেই অতৃপ্তিকে প্রথমে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় অভিব্যক্ত করেন। কার্লাইল বলেন Goetheর সেই আর্ত্তস্বর সাহিত্য জগতের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া দেশে দেশে প্রতিধ্বনিত হয় এবং ইউরোপের জনগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। তাহাদের কর্ণে সেই স্বর মধুর মুরলী ধ্বনির ন্যায় বাজিতে থাকে—অন্য শব্দ সম্বন্ধে তাহারা বধির হইয়া যায়। Goethe রচিত "ওয়ার্ত্তারের দুঃখ" দেশব্যাপী অতৃপ্তির অভিব্যক্তি ও স্বাভাবিক। ইংলণ্ডে, Goetheর এই করুণ ক্রন্দন, একদল সেণ্টিমেণ্টাল কবির সৃষ্টি করে, বায়রণ সেই দলের প্রবলপরাক্রান্ত মুখপাত্র।

শেলী এই শ্রেণীর কবিদিগের আর একজন উল্লেখযোগ্য বংশধর। উভয় কবিরই অন্তরে অতৃপ্তিবহ্নি জ্বলিবার অন্যতর কারণেরও অভাব ছিল না। যখন আমরা বায়রণের রিপুপরবশ আকাঙ্খাতাড়িত শিথিলনৈতিক হৃদয়ের, তাঁহার অশান্তিপ্রদ উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা স্মরণ করি, যখন আমরা কবিশেলীর সমাজবন্ধন-বিতৃষ্ণা, বিবাহ-দুর্ভাগ্য, দেশত্যাগ ও শান্তিসুখবিহীন জীবনকাহিনীর কথা চিন্তা করি, তখন

আমরা বুঝিতে পারি যে উভয় কবিরই দুঃখবাদ ও মানববিদ্বেষ স্বাভাবিক।

কালের ও স্থানের দূরত্ব-ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, দুঃখগীতি উদ্ভূত হইবার তুল্যরূপ সমাজগত ও ব্যক্তিগত কারণের অভাব সত্ত্বেও, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এই দুঃখবাদের বা অতৃপ্তির তুফান বঙ্গদেশের কাব্য সাহিত্যকে তরঙ্গায়িত করিয়াছে। কতক বা ইউরোপীয় কবিগণের অনুকরণে, কতক বা অপরিণত-বয়স-সুলভ দুঃখ প্রবণতায় স্রোত-টানে, কতক বা বিষাদসঙ্গীতের মুগ্ধকরী স্বরলহরীর নৈসর্গিক আক-র্ষণে, অনেকানেক নবীন বঙ্গদেশীয় কবি দুঃখসাগরে গা ভাসাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের কবিত্ব সীমানির্দ্দিষ্ট নহে; কেহ কেহ কালের অখণ্ডনীয় বিচারেও বোধ হয় শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কিন্তু ইহাদের দুঃখগীতি অধিকাংশ স্থলেই সেণ্টিমেণ্টাল কারণ-প্রসূত। যে সকল কবিদিগের দেহের অস্থিমজ্জায় হৃদয়শোণিতে দুঃখবেদনা প্রবিষ্ট, যাঁহাদের মর্ম্মের দারুণ ক্রন্দন—অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস—রুদ্ধ কণ্ঠ উন্মুক্ত করিয়া উচ্ছ্বসিত হয়, ইহারা সে শ্রেণীর "দুঃখের কবি" নহেন। কিন্তু সেণ্টিমেণ্টাল হইলেও ইহাদের দুঃখগান বড়ই মধুর ও করুণ এবং প্রকৃত ক্রন্দন অপেক্ষা এই গানের হৃদয়দ্রাবণী শক্তি কোন অংশে ন্যূন নহে। বিহারিলাল বঙ্গের এই নবীন "দুঃখের কবি" সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শক ও সর্ব্বপ্রধান নেতা। বিহারিলালের দুঃখগান সেণ্টিমেণ্টাল।

যে সকল বহিঃস্থ বা অন্তরস্থ কারণে মানবকে ক্রন্দন করায়, যে সকল কারণে মানবকে মানববিদ্বেষী করে, বিহারিলালের জীবনে এরূপ কোন প্রবল কারণের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। তিনি কোনরূপ অসাধারণ দেশীয় অশান্তি বা সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে জন্মগ্রহণ

করেন নাই, তিনি সমাজ কর্ত্তৃক কখন এরূপ ভাবে লাঞ্ছিত বা প্রতারিত হয়েন নাই যাহাতে তাঁহার মানব-বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে। হৃদয়হীন সমালোচনার যেরূপ সুতীব্র কশাঘাতে বায়রণ উন্মত্ত হইয়া আপামর সাহিত্যসেবিগণকে গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন, শেলী দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, কীট্‌স্ ভগ্নহৃদয় হইয়া, কাহারও কাহারও মতে, মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিলেন, সেরূপ নির্দ্দয় সমালোচনাও তিনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। শোক তাপ এবং প্রণয়-নৈরাশ্য সময়ে সময়ে ব্যক্তিবিশেষকে দুঃখগান গাওয়ায়। কিন্তু বিহারিলালের দুঃখ শোকের সুরে নহে, অতৃপ্তির রাগিণীতে, আর শোকও তিনি জীবনে অতি সমান্যই পাইয়াছিলেন, এবং প্রণয়ে নিরাশ হইবার দুর্ভাগ্যও তাঁহার ঘটে নাই। দারিদ্র্য-দুঃখ বিষাদগীতির একটী কারণ; কিন্তু কবিকঙ্কণের ন্যায় বিহাবিলালকে অর্থাভাব বা অত্যাচার পীড়িত হইতে হয় নাই। চির-রুগ্ন বা দুঃসহ ব্যাধিপীড়িত ব্যক্তির চক্ষে জগৎসৃষ্টির প্রহেলিকা একটী অনিপুণ শিল্পির প্রকাণ্ড ভ্রম বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিহাবিলালের ন্যায় স্বাস্থ্য অতি অল্প সংখ্যক ভাগ্যবানেরই অদৃষ্টে মিলিয়া থাকে।

বিহারিলালের দুঃখ রচিত বা কাল্পনিক। সংসারের নিত্যসহচর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখকে তিনি কল্পনাকুশল মনের আবেগে বৃহৎ করিয়া তুলিতেন। কিন্তু প্রকৃত কবির নিকট যোগের সময় কাল্পনিক স্বাভা-বিকেব স্থান অধিকার করে, সুতরাং বিহারিলালের দুঃখ-অভিব্যক্তি স্বভাব-সুন্দর হইবারই কথা। আর একেত "ভবজনমের হাহা"র মধ্যে বিষাদ সঙ্গীতটাই বড় মিষ্ট লাগে, পরন্ত বিহারিলাল সুরজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন সুতরাং তাঁহার কলকণ্ঠে সিন্ধু বেহাগ জয়জয়ন্তীর দুঃখ-গান যে শ্রোতাগণকে মোহিত করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি! দুঃখঅভি-

ব্যক্তিতে বিহারিলাল বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে অতুলনীয় এই অর্থে তিনি "দুঃখের কবি", কিন্তু যদি "দুঃখের কবি" আখ্যায় অসুখ অতৃপ্তি নিরাশা বা মানববিদ্বেষবাদী কবি বুঝায় তাহা হইলে বিহারিলালের প্রতি উপাধি বিতরণের অপব্যবহার করা হইয়াছে।

বিহারিলালের দুঃখ যেরূপ সেণ্টিমেণ্টাল তাঁহার মানববিদ্বেষও সেইরূপ এবং মৌখিক। মানবের খল কপটতা মিথ্যাপ্রবঞ্চনায় সময়ে সময়ে বিহারিলাল, নিরতিশয় বিরক্তি বোধ করিতেন, এবং তাঁহার বাল্যকালের সংযম শিক্ষার অভাবে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশান্তিপ্রদ ঘটনা-গুলিকে তিনি প্রকাণ্ড করিয়া তুলিয়া বলিতেন বটে—

আর কারে করি ভয়, ব্যাঘ্র সর্পে তত নয়,
মনুষ্য জন্তুকে যত ডরি।

তিনি মানুষের মুখে মধু অন্তরে হলাহলের কথা স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে মনের উত্তেজনায় জন সমাজ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি-তেন বটে, কিশোর বয়সে তিনি একবার প্রকৃতই উৎকলদেশে গমন করিয়া এই বিজনতা উপভোগ করিয়া বলিয়াছিলেন—

বেশ আমি সুখে আছি, আসিয়ে নির্জ্জনে,
ক্ষমতার অত্যাচার মিত্রতার কপটতা নাই এই স্থানে।

কিন্তু বিহারিলালের স্বভাব কোথায় যাইবে, যাঁহার স্নেহ করুণ সহৃদয়তা সখ্যতায় হৃদয় পরিপূর্ণ, তাঁহার কি খামখেয়ালী হইয়া টাইমনের (Timon) ভাণ করিলে চলে। তিনি অচিরেই মনুষ্যমুখ সন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেই বিজন প্রকৃতির ঘনশ্যাম স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য অধিক দিন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি গাহিয়াছিলেন—

মানুষের ব্যবহারে জ্বালায়েছে বারে বারে
চোটে গিয়ে নির্জ্জনেতে করেছি গমন,
সেখানে প্রকৃতি এসে সমুখে দাঁড়ায়ে হেসে
প্রেমভরে দিয়াছেন গাঢ় আলিঙ্গন,
তাঁর প্রেমে মগ্ন হয়ে দ্রবীভূত প্রায় রয়ে
করি বটে কিছুদিন আনন্দে যাপন,
পরে ভাল নাহি লাগে কেবলই মনে জাগে
প্রিয়তম মানুষের, মোহন আনন।

যে মানুষের কদাচারে উৎপীড়িত বোধ করিয়া বিহারিলাল বলিয়াছিলেন—

ছি একি কি ভয়ানক জন্তু এ সংসারে।

আবার সেই মানুষকেই উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

মানুষ সৃষ্টির সার দেবতার অবতার
ব্রহ্মাণ্ডের শিরোমণি প্রোজ্জ্বল ভূষণ।

* * *

মানুষ আমার ভাই বড় প্রিয় ধন,
মানুষ মঙ্গল সদা করি আকিঞ্চন।

কবির এই শেষের উক্তি গুলিই আন্তরিক ও স্থায়ী; তাঁহার মানববিদ্বেষ পাপবিরাগী হৃদয়ের অস্থায়ী রোষোচ্ছ্বাস মাত্র। তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে বিলাপ করুণ স্বরে গাহিয়াছিলেন—

থাকা যে জীবন ধরে শুধু জগতের তরে,
জগতের উপকারে এসেছি কদিন?

তিনি মানবকে প্রেমের ভার মানবের তপ্ত অশ্রুজলে ঢালিয়া দিতে উপদেশ দিতেন। তিনি নিজ জীবনে এই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতেন, তিনি কায়মনে লোক হিতসাধনা করিতেন। তাঁহার দুঃখ-

নীতি যে কাল্পনিক, বিহারিলাল শেষ জীবনে নিজেই তাঁহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি "বাউল বিংশতিতে" গাহিয়াছেন—

ভবে কেউ দুখী নয় আমিই দুখী।

বিরোধ বিষম লেঠা, | ভালবাসি হাসি খুসি।
বিধাতা নহেন বাম | সুখভরা ধরাধাম,
হৃদয় আনন্দ ধামে, | নিরানন্দে কেন পুষি!

এই পাপ পুণ্যের বৈচিত্র্যময় জগতের এক অংশ দেখিয়া যেমন তিনি এক একবার ঘনান্ধকারের বিভীষিকাময় দৃশ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, তেমনি আবার শিবসুন্দর প্রকৃতির চারু বিকম্পনে তাঁহার হৃদয়াকাশ শুভ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। বিহারিলালের ন্যায় সৌন্দর্য্যদর্শী কবির নিরাশাবাদী হওয়া অসম্ভব, কারণ নিরাশা অসুন্দর। বিহারিলাল বলিতেন—

বিশ্বের প্রকৃতি এই, একেবারে লয় নেই,
এক যায়, আর আসে, তরুণ সৌন্দর্য্যে ভাসে।
মহাপ্রলয়ের কথা কি বিষম বিড়ম্বনা।
বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে, অনুভবে আসে না।

বিহারিলাল দুঃখ বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বটে, অথচ তিনি প্রেম সৌন্দর্য্য সাগরে অবগাহিত হইয়া যে সুখের উন্মাদনা অনুভব করিয়াছেন তাহা অতি অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটে। এই 'সংসার মরভূ মাঝে', সজল শ্যামল ক্ষেত্র, এই দুঃখ পারাবারের চিরসুখতরী নারীমূর্ত্তি মনে পড়িলে বিহারিলাল, এই জগৎকে, স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠতর, শান্তিময় প্রীতিময়, সুখময়, অনুভব করিতেন; দুঃখ বা অতৃপ্তি চঞ্চল পদে উধাও হইয়া যাইত। তিনি তাঁহার প্রিয়ার প্রেমানন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া বলিতেন—

তোমার পবিত্র কায়া, প্রাণেতে পড়েছে ছায়া
মনেতে জন্মেছে মায়া ভালবেসে সুখী হই,
ভালবাসি নারী নরে, ভালবাসি চরাচরে
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই।

বাগ্দেবীসেবাতে।

তরুণ বয়সে সকল লেখকই কিছু কিছু প্রশংসার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, বিহারিলালও করিয়াছিলেন, কিন্তু বিহারিলালের অদৃষ্টে সে সময়ে আশানুরূপ প্রশংসা লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। না ঘটিবারই কথা; প্রতিভা প্রথম হইতেই কোন না কোন বিষয়ে নবপথ-গামিনী হয়। বিহারিলালের সঙ্গীত শতকের গান গুলি, স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কবিতাগুলি এইরূপ নূতন পথে ধাবিত হইয়াছিল, অথচ এই রচনা গুলির সময়, বিহারিলালের কবিত্ব শক্তি অনুভব করাইবার ক্ষমতা, তাঁহার কোমলমধুর ভাষা ভাব ও সঙ্গীতের বিশেষত্ব তখনও তাঁহার লেখনীতে দেখা নাই, সুতরাং পুরাতন প্রিয় জনসাধারণ যে তাঁহার রচনাকে অনাদর বা উপেক্ষা করিবে ইহা বিচিত্র নহে। তরুণ বয়স উত্তীর্ণ হইয়া বিহারিলাল এই আদর অনাদরের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া সে বিষয়ে অবিচলিত থাকিতেন; কিন্তু যুবাকালে অপরাপর অপরিণত বয়স্ক কবিদিগের ন্যায় বিহারিলালও এই অনাদর অকম্পিত হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তিনি কিছু অশিষ্ট ভাষায়, আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ছিলেন—

পরের পাতড়া চাটা, আপনার নাই,
মতামত কর্ত্তা তাঁ'রা বাঙ্গালার চাঁই।
মন কভু ধায় নাই কবিত্বের পথে,
কবিরা চলুক তবু তাঁহাদেরই মতে।

জনমেতে পান নাই অমৃতের স্বাদ,
অমৃত বিলাতে কিন্তু মনে বড় সাধ।
ভাল ভান যুক্তি ভাণ, ভাল অভিপ্রায়;
ভাটপোরা মাথায় বড় ঘাড়ে তোলা যায়।
সাধারণে ইঁহাদের ধামাধরা আছে
কাজে কাজে আদর পাবেনা কারো কাছে।
এখন মোহন বীণা নীরবেই থাক্,
এ আসরে প্যাঁচাদের নৃত্য হয়ে যাক্।
তুমি যে আমার কত যতনের ধন,
কেন সবে আনাড়ির হের অযতন।
ধৈর্য ধরি থাক বসি প্রফুল্ল অন্তরে,
যথার্থ বিচার হবে কিছু দিন পরে।
পিতারা নিকটে থেকে তাপে জর জর,
পুত্রেরা হেরিবে দূরে জুড়াবে অন্তর।

যাহা হউক বিরুদ্ধ সমালোচনা বা অনাদর তাঁহার উদ্যম শিথিল করিতে পারে নাই, তিনি তাঁহার অন্তর্লীন শক্তিতে অভ্রান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। প্রকৃতি তাঁহাকে কবিতা লেখাইতেছিল, তিনি নিজ আত্মার অব্যক্ত প্ররোচনায় গান গাহিতে ছিলেন, নীরব হইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। একজন প্রতিভাবান পাশ্চাত্য চিত্রকর একটী কল্পনাগঠিত প্রতিমূর্ত্তিকে অনেক চেষ্টাতেও আলেখ্যবস্ত্রে প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হইয়া, অশান্ত স্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন "By God ! it is in me and must come forth of me", বিহারিলালকেও তাঁহার সারদা যৌবনে ঠিক সেই অবস্থায় পাতিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা যে ভবিষ্যতে সমাদৃত হইবে এ বিষয়ে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি এমন কোন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন যাহা বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যকে চির-

দিন অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে, এ সত্য তাঁহার মনে যৌবনেই প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি "প্রেম প্রবাহিণী"তে বলিয়াছিলেন—

মরিতে তিলার্দ্ধ মম ভয় নাহি করে,
ডুবিতে জনমে খেদ বিস্মৃতি সাগরে।
রেখে যাব জগতে এমন কোন ধন,
নারিবে করিতে লোকে শীঘ্র অযতন।

বিহারিলালের কবিত্ব শক্তি পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয়েন নাই,* কিন্তু তখন তিনি জনসাধারণের নিকট যশের প্রত্যাশী ছিলেন না, আত্মসমাহিত ছিলেন। এবং সে সময়ে তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুবর্গ ও কাব্যরসজ্ঞ ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে যে আন্তরিক সম্মান ও আদর করিত তাহাতেই তিনি পরিতুষ্ট ছিলেন। তবে তাঁহার কবিতা আদৃত হইবার পক্ষে দেশ ও কাল যে অনুকূল নহে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন; কারণ শেষ জীবনে বিহারিলাল তাঁহার কবিতা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। বিহারিলাল বলিতেন "ইচ্ছা করে হিমাচলে

---

* ব্রহ্মলোকগত সাহিত্যসম্পাদক কবির মৃত্যুর বৎসরত্রয় পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন—"আমাদের বোধ হয় বিহারিবাবুর কবিতা বাস্তবিক অনাদর অন্ধকারে পড়িয়া নাই। যাঁহারা বাঙ্গালা পড়েন, তাঁহারা বিহারিবাবুকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানেন। বিহারিবাবুর "সারদামঙ্গল" ও "বঙ্গসুন্দরী" বাঙ্গলা সাহিত্যে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠাও আশানুরূপ নহে—"সারদামঙ্গল" প্রণেতার কবিতা, যেরূপ প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তাহা তদনুরূপ নহে। জানিনা বাঙ্গালা সাহিত্যের এইরূপ কলঙ্ক কবে ঘুচিবে, কবে বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে প্রকৃত গুণের আদর হইবে।'

সাহিত্য, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

দাঁড়াইয়া আমি একবার গান গাই, তাহা হইলেই আমার সকল সাধ মিটিয়া যায়।" সাধটী সেণ্টিমেণ্টাল হইলেও বিহারিলালের ন্যায় কবির উপযুক্ত বটে।

যাহা হউক সমসাময়িক লোকসমাজের আদর অনাদরের উপর নির্ভর করিয়া যদি প্রতিভাবান্ কবিগণ কাব্য রচনা করিতেন তাহা হইলে অনেকানেক অমূল্য কাব্য জগতের মুখদর্শন লাভ করিত না। কিন্তু পাঠকের প্রশংসা যে নবীন লেখককে অনেক সময়ে লিখিবার প্রবৃত্তি দান করিবার প্রধান কারণ স্বরূপ হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই, বিহারিলাল সে উৎসাহ লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বিহারিলালের কোনরূপ পদ, বিদ্যা, ধন বা বংশ গৌরব ছিল না, যাহা অনেক সময় নবীন লেখকদিগের রচনায় সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া থাকে, কিন্তু বিহারিলাল এই অন্তরায়টীর কথা ভাবিয়া ছিলেন কিনা তাহা বলা যায় না, তবে তিনি ইহা জানিতেন যে লোকে তাঁহার কবিতা না পড়ে, না পড়িবে কিন্তু তাহাকে কবিতা লিখিতেই হইবে—অন্তরের যে আবেগ তাঁহাকে কার্য্য করাইতে ছিল তাহা অনিরুদ্ধ অদমনীয়। সেই আবেগের বশীভূত হইয়া বিহারিলাল স্বার্থচিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত জীবন এই সাহিত্যসেবা ব্রত সাধনে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কবিতা রচনা সম্বন্ধে বিহারিলালের মতের সহিত প্রতিভাবতী রমণীকবি মিসেস্ ব্রাউনিংএর মতের (Mrs. Browning) সম্পূর্ণ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রাউনিং পত্নী বলিতেন,—

"Poetry has been as serious a thing to me as life itself; and life has been a very serious thing. I never mistook pleasure for the final cause of poetry, nor leisure for the hour of the poet."

"বিহারিলালও কবিতাকে কখন ক্রীড়ার বা আমোদের সামগ্রী, অবসরের উপভোগ্য ভাবেন নাই, কবিতা তাঁহার "সাক্ষাৎ প্রাণ" স্বরূপ

ছিল। তিনি একমনে একতানে সারদার আরাধনা করিয়াছিলেন, পরন্তু এই ধ্যান, এই সাধনা সাংসারিক কার্য্যের অবকাশ ক্রমে হইত না, জীবনের অন্যান্য কার্য্য এই ধ্যানের অবকাশ ক্রমে হইত। এই মহাব্রতের ফল ও তিনি এ জীবনেই পাইয়াছিলেন—তিনি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তাঁহার মনে ধ্রুব ধারণা হইয়াছিল, যে যৌবনে তিনি বঙ্গীয় কাব্য সংসারে যে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার জন্য আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার "সারদা মঙ্গল"এর বিনাশ নাই।

ক্রমশঃ।

বিবাহ।

যে রীতির দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্মিলন জন্মে তাহাকে বিবাহ বলা যায়। এই সম্মিলন পবিত্রভাবে হইলেই দাম্পত্য প্রেমের উৎপত্তি হয়। এই পবিত্র ভাব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নানা দেশে নানা রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে প্রাচীন মহাত্মাগণ যে রীতি যে উদ্দেশ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন কিছুকাল পরে সে প্রণালীমতে সে উদ্দেশ্য সাধন হয় না। প্রাচীন সভ্যতায় গর্ব্বিত নানা সমাজের আপাততঃ এই অবস্থা দেখা যায়। নবযৌবনের সহিত গম্ভীর ও শান্ত ভাব না আসিলে ইহ জীবনে কোনও সুখলাভের আশা করা বৃথা। যুবক ও যুবতীদিগের সংসারিক জীবনের প্রারম্ভেই যদি গভীর পবিত্র ভাবের উদয় না হয় তাহা হইলে তাহাদিগের নিকট সামাজিক বা পারমার্থিক কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে?

জীবনের প্রারম্ভেই যুবক যুবতীকে পবিত্রভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যে প্রকার শিক্ষা হইলে আমরা অনায়াসে বিনা দুঃখে ভগবানের এই সুন্দর সংসারে তাঁহার নিয়ম বুঝিয়া চলিতে পারি, তাহাই সকল সভ্যতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। অন্য প্রকার সভ্যতা অসার ও অকিঞ্চিৎকর। যুবক যুবতীগণকে ধর্ম্মশিক্ষা না দিলে সংসারের সুখস্বচ্ছন্দের কোন আশা নাই।

বিবাহ সম্বন্ধে নানা দেশে নানা রীতি আছে; কিন্তু যে প্রণালীর বিবাহে দাম্পত্য প্রণয়ের উদ্ভব হয় না সে প্রণালী মিথ্যা ও অসার; বস্তুতঃ তাহাকে বিবাহ পদবাচ্য করা যায় না। বিবাহ সামাজিক রীতি বটে কিন্তু ধর্ম্মপ্রদ, কারণ এই সাংসারিক ও পারমার্থিক জ্ঞান লাভই ইহার মূল উদ্দেশ্য। হিন্দুদিগের শাস্ত্রে বিবাহ-রীতির সারমর্ম্ম লিখিত আছে; কিন্তু হিন্দুগণ সে দিকে একবার দৃষ্টিপাতও করেন না। হিন্দুশাস্ত্রে এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা সজীব ভাবে অর্থাৎ সার ভাগ গ্রহণ করিয়া সেই সকল শিক্ষার অনুসরণ করিলে বিবাহতত্ত্বের সার মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রের সারমর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া, আমরা কেবল তাহার খোসা লইয়া, তাহার অসার শব্দগুলির বিচারে তৎপর হই, সুতরাং আমাদিগের সামাজিক অবনতি। বেদ শাস্ত্রই হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্ব প্রাচীন শাস্ত্র। বেদশাস্ত্রে বিবাহ পদ্ধতির বাহুল্য দেখা যায় না বটে কিন্তু বিবাহকালীন দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তৎপশ্চাৎ বিবাহ পদ্ধতির যদিও আড়ম্বর বর্দ্ধিত হয় বটে কিন্তু তখনও তাঁহারা বিবাহের মর্ম্ম পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করিতেন। আর্য্যদিগের সমাজে বিবাহ পদ্ধতি কেবল সামাজিক রীতি বলিয়া পরিগণিত ছিল না। তাঁহারা বিবাহের দ্বারা অনন্তকাল প্রেমভোগের আশা করিতেন। বিবাহ অতি পবিত্র সংমিলন বলিয়া

জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনা করিতেন, যে সকল মন্ত্র ব্যবহার করিতেন সে মন্ত্র আজিও ব্যবহৃত হয় কিন্তু সে মন্ত্রের স্বার্থকতা কি? পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম ক্রমশঃ বিলুপ্ত প্রায় হইলে পর, ভগবান্ পরমাত্মা আর্য্যদিগকে অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। মহাত্মাগণ জীবের উদ্ধারার্থে চৈতন্যরূপিণী রাধা ও তৎপদার্থ শ্রীকৃষ্ণের সংমিলন সম্বন্ধে মধুর সঙ্গীতে জগৎ প্লাবিত করেন। সেই উন্নত শিক্ষাও আর্য্যগণ আজি বিস্মৃত হইয়া নরকাগ্নিতে দহ্যমান হইতেছেন। আর্য্যদিগের সে মাধুর্য্য ও তেজ সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে ; অবশিষ্ট কেবল অসার নির্জ্জীব চর্ম্মখণ্ড।

প্রাচীন বিবাহ পদ্ধতি এখনও প্রচলিত বটে কিন্তু সে পদ্ধতির এক্ষণে কোনও স্বার্থকতা নাই। বিবাহকালে যুবক যুবতী কোন শিক্ষাই লাভ করেন না। কেবল কতকগুলি অসার শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ যে সামাজিক উন্নতি বা সামাজিক জীবনের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন তাহা নহে—ইহা বাস্তবিক অনিষ্টকর হইয়া উঠে। যুবকের মনোগত ভাব কিছুই স্থির হয় নাই, যুবতীর (বালিকা?) চিন্তাশক্তি উদ্রেকও হয় নাই, ভক্তি বা প্রেম কাহাকে বলে তাহার বিন্দুমাত্রও তিনি জ্ঞাত নহেন। এ অবস্থায় দুইটী আত্মার বা মনের মিলন কি প্রকারে সম্ভব? আচার্য্য মন্ত্র পাঠে ব্যস্ত কিন্তু মন্ত্রার্থ অবগত নহেন। কি কারণে অগ্নিদেবকে আহ্বান করেন তাহাও তিনি অবগত নহেন। অগ্নিদেব কোন্ পদার্থ তাহাও তিনি জানেন না। তিনি জড় না চেতন? তাঁহাকেই বা আহ্বানের কারণ কি? তিনি জানেন কেবল স্বদক্ষিণা! যে জাতির এই অবস্থা সেই জাতিতে ধিক্—যে আচার্য্য এই মহাপাপে লিপ্ত থাকেন সেই বেদনিন্দুক আচার্য্যকে কি আর্য্যেরা দূরে ত্যাগ করিবেন না? সামাজিক স্বাস্থ্য চেষ্টা বলবতী হইলে এই কুসংস্কার গুলি

সমূলে উন্মূলিত করিতে হইবে; নচেৎ মৃত্যু নিশ্চিত। রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া সং সাজিবার কোনও অভিপ্রায় থাকিতে পারে না। যদি অগ্নিদেব কোন্ পদার্থ সে জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে হয়, অগ্নিদেবকে পরিত্যাগ করুন নতুবা যথার্থ সার মর্ম্ম শিক্ষা করিয়া সামাজিক উন্নতি লাভ করুন। দাম্পত্য প্রণয়ের উদ্ভবই বিবাহের উদ্দেশ্য সুতরাং যে প্রকার রীতি অবলম্বনে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে বিবাহ বলা উচিত।

আর্য্যজাতি ধর্ম্মজীবন। জীবনে স্বার্থশূন্যতা হওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। ভগবান্ পরমাত্মা জীবগণকে যে ব্রতে ব্রতী করিয়াছেন, সেই ব্রত প্রকৃষ্টরূপে সমাপন করাই জীবনের মন্তব্য। সুতরাং আজ বিশ্বাসের জন্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ভুলিয়া আত্মহারা হওয়া দুঃখের কারণ। কিন্তু এখনও সময় অতিবাহিত হয় নাই। আর্য্যগণের লুপ্তাবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলে এখনও উন্নতির আশা করা যায়। অগ্নিদেবকে এখনও মধ্যে মধ্যে আহ্বান করা যায়, সময়ান্তরে ভক্তিভাবে আরাধনাও করা যায়। সুতরাং অগ্নিদেব কোন্ পদার্থ তিনি সজীব বা নির্জীব, জড় বা চেতন,—বিবাহসম্বন্ধে তাঁহাকে কি প্রয়োজন এই সকলের সারভাব শিক্ষা করিতে পারিলে, সামাজিক ধর্ম্মোন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি কি ও এই পদ্ধতির সার মর্ম্ম কি? কোনও প্রাপ্তবয়স্ক যুবক অধীতবেদ হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে সামাজিক নিয়মে উপযুক্ত কন্যাকে বিবাহ করিবেন। আর্য্যগণ নানা প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মবিবাহ অর্থাৎ ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া পরমাত্মা পরমব্রহ্মের ব্রত সাধনোদ্দেশে যে স্ত্রী পুরুষ সংমিলন হয় তাহাকেই প্রকৃত বিবাহ বলিয়া গণ্য করিতেন।

ব্রাহ্মবিবাহের প্রথা এখনও চলিত আছে। তেজোরূপী জ্যোতির্ম্ময় পরমব্রহ্মস্বরূপ অগ্নিদেবকে সম্মুখে রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময় পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে এই কর্ম্ম সমাপিত হয়। ভগবান্ পরমাত্মা যে প্রণালীতে সৃষ্টি করেন ও রক্ষা করেন সেই নিয়ম শিক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হয় ও এই অভিলাষ করিতে হয় যে, এই স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপ অভেদ জ্ঞানে চিরানন্দ লাভ করুন। কন্যার গাত্র-হরিদ্রার কালে কামদেবের আবাহন করা যায়। এই কাম দেব Latin Cupid বা পৌরাণিক কামদেব নহেন। বৈদিক কামদেব পারমার্থিক অভি-লাষের প্রতিকৃতি মাত্র। সুতরাং এই দেবতাকে আহ্বান করিয়া এই কন্যাকে কার্য্যে ব্রতী করা হয়। তৎপশ্চাৎ পুরুষের জ্ঞানরূপ পুরুষত্বের ধ্যান করা হয়। ইহার সার মর্ম্ম এই যে, কন্যা পুরুষের সাহায্যে ভগবান্ পরমাত্মার সাংসারিক ও পারমার্থিক কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন তাহাই শিক্ষাদান। তৎপশ্চাৎ সম্প্রদান বিধি। জামাতাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কোনও সৌভাগ্য পতি-পুত্রবতী নারী জামাতা ও কন্যার হস্তদ্বয় কুশদ্বারা বন্ধন করিবেন ও এই মন্ত্রটী পাঠ করিবেন—"ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধবতাংশাশ্বতীঃ সমাঃ।" এই মন্ত্রের দ্বারা অনন্তকাল অবিচ্ছেদে প্রেমবন্ধনের জন্য ভগবান্ পরমাত্মার উপাসনা করা হয়। সম্প্রদানের পর জামাতা বলিবেন "আমি স্বেচ্ছায় এই কন্যাকে গ্রহণ করিতেছি; আমাদের চিরকালের জন্য প্রেমবন্ধন যেন নষ্ট না হয়।" তৎপরে কোনও পতিপুত্রবতী নারী দম্পতীর বস্ত্রদ্বয় নারীগ্রন্থীর দ্বারা বন্ধন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—"ওঁ যথেন্দ্রানী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ। রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথানলে। যথা বৈবস্বতি ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী। যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি।" এই মন্ত্রের

সারমর্ম্ম বরকন্যার স্থির প্রেমের নিমিত্ত প্রার্থনা ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ প্রবৃত্ত কর্ম্মে উত্তেজক বাক্য প্রয়োগ। পাণিগ্রহণ কালে জামাতা প্রার্থনা করেন—হে পরমাত্মন্ এই স্ত্রী যেন অমর্ত্ত্য হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত মঙ্গল কার্য্যে ব্রতী থাকেন। এই স্থলে স্ত্রী শব্দটীর অর্থ স্ত্রীর শরীর বলিলে হাস্যাস্পদ হওয়াই উচিত। পাণিগ্রহণ সমাপনান্তে জামাতা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—"ওঁ মম ব্রতেতে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনুচিত্ত স্তে হস্তু, মম বাচমেকমনা জুষস্ব, বৃহস্পতিস্ত্বা-নিযুনক্তু মহ্যম্।" তৎপরে উত্তরবিবাহ কর্ম্ম সমাপন করিতে হয়। ধ্রুব ও অরুন্ধতী দর্শাইয়া জামাতা বলিবেন "নক্ষত্র দুইটী যে প্রকার স্থির ও পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় তুমিও সেই প্রকার হইয়া পতিকুলে বিরাজ কর।" তৎপরে ভোজনধৃতিহোম করা বিধেয়। ইহার প্রথম মন্ত্র এই— "ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিণা বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে। ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" এই সকল মন্ত্রের ভাবার্থগ্রহণ করিলেই হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়।

হিন্দুসমাজ ব্যতীত অন্য কোনও সমাজে কি এই প্রকার ধর্ম্ম্য বিবাহের শিক্ষা নাই? তাহা অসম্ভব। প্রাচীন খ্রীষ্ট ধর্ম্মেও এই প্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়। পুনশ্চ আধুনিক কালে খ্রীষ্টীয়ান যোগী সুইডেনবর্গও (Swedenborg) ঠিক্ এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সময়ান্তরে সে বিষয় পাঠকবর্গের গোচর করা যাইবে। আধুনিক খৃষ্টীয়ান সমাজের যদিও বিবাহ পদ্ধতি একটী সামান্য সামাজিক রীতি (Social contract) বলিয়া পরিগণিত কিন্তু খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মানুসারে বিবাহ একটী পরম ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। হিন্দুদিগের বিবাহপদ্ধতির মধ্যে নিন্দা করিবার কিছুই নাই। সুতরাং যাহাতে এই পদ্ধতির

সারমর্ম্ম সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় সেই চেষ্টা এক্ষণে বিধেয়। এই সকল ধর্ম্মরীতির অবমাননা করাই আমাদিগের সামাজিক অবনতির প্রধান কারণ। যদি এই বিবাহ পদ্ধতি বিদ্বদ্‌গণের অনুমোদিত না হয় তবে এ পদ্ধতি প্রচারিত থাকিবার কোনও আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। অন্যান্য সকল রীতি অপেক্ষা বিবাহ রীতি সামাজিক সম্বন্ধে প্রবল। সুতরাং এ বিষয় সত্বর বিচার করা উচিত। সামাজিক কাপুরুষতার জন্য আমরা অন্যান্য জাতির নিকট অবমানিত হইতেছি লজ্জায় অধোবদন থাকিতেছি কিন্তু যেখানে অতি অল্প পরিমাণ সাহস প্রদর্শন করিলে যথেষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা, সেইটুকু সাহস প্রদর্শন করিতে আমরা পরাঙ্মুখ। আমাদের জাতীয় অন্ধতা দেখিয়া বিশ্বভূমণ্ডল হাসিতে বসিয়াছে, তথাপি আমরা চক্ষু উন্মীলিত করিতেছি না; আমরা যে জাত্যন্ধ তাহা নহে, ইচ্ছা পূর্ব্বক চক্ষু মুদিয়া বহুকাল যাপন করিয়া এক্ষণে দৃষ্টিলোপ পাইয়াছে। আমরা মুখে বলিয়া থাকি, আমরা শাস্ত্র মানি ; কিন্তু শাস্ত্র কি, শাস্ত্রের অভিপ্রায় কি, তাহা অবগত নহি। বন্ধুগণ, এ বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, এই প্রকার ধর্ম্মরীতির অবমাননা করিলে সামাজিক উন্নতি লাভের আশা নাই।

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

বিধির ভুল।

(১)

বি, এ, পাস দিয়ে ছেলেটা এবার,
বাড়া'য়ে তুলেছে ভাবনা অপার,
তাহার উপরে গিন্নি আবার
বিবাহ যে দিতে চায় !

(২)

আমি বলি আগে করুক উপায়
বিবাহের দিন গিয়াছে কোথায় ?
কি ভাবে থাকিলে ভেবে উঠাদায়
টাকা আসে সত্বরায়।

(৩)

কেরাণীর কায ?— অতি লক্ষ্মী ছাড়া,
কাঁচা ভাত খাও—আফিসের তাড়া,
সারাদিন হও খেটে খেটে সারা
পরমায়ু করি ক্ষয়,

(৪)

তবে কি পড়া'ব হইতে উকীল ?
মুখ ফোটা তা'র বড়ই মুস্কীল !
একে সে লাজুক তাহাতে সুশীল
তাই বড় করে ভয়।

(৫)

এটর্ণির কাযে আছে বটে টাকা,
রাস্তাটা কিন্তু অদ্ভুত বাঁকা !
কেমনে চলিবে ভদ্রতা রাখা
ভেবেত পাইনা কূল !

(৬)

আছে বটে মান হইলে ডেপুটী,
বিচার কিন্তু কর যম খাটী,
উপর হইতে খেতে হয় চাটী,
এইত বুঝেছি স্থূল।

(৭)

মুন্সেফের কাযে বিষম খাটুনি
তাহার উপর খিঁচুনি বকুনি
এদিকেতে যিনি অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী
তিনিত উঠেন ফুলে !

(৮)

তবে যদি করি ইঞ্জিনিয়ার ?
হায়রে সে পথ রুদ্ধ তাহার !
এ কোসে'র ছেলে গণিত বিদ্যার
ধারত ধারেনা ভুলে।

(৯)

কি করে' বা দিবে সিভিল সার্ভিস্
এদিকে বয়স হ'ল যে বাইশ !
খরচ করিলে হাজার উনিশ (?)
হ'তে পারে ব্যারিষ্টার,

(১০)

কিন্তু ছেলেকে বিলাতে পাঠা'লে
বিশ্বাস নাই তা'র পরকালে,
দাঁড়কাক যায় ময়ূরের পালে,
ফেলি' নিজ পরিবার।

(১১)

হ'লে হ'তে পারে বটে ডাক্তার ;
কিন্তু সদাচার রাখা হ'বে ভার—
দিনরাত ঘুরে রোগীর দুয়ার
থাকে কি শরীর ধর্ম্ম ?

(১২)

স্কুলমাষ্টার ? ভাল কায বটে,
চেঁচাতে চেঁচাতে কিন্তু গলা ফাটে,
মরিবে কি বাছা শেষে রক্ত উঠে—
দেহ হ'বে হীন চর্ম্ম ?

(১৩)

দূর হোক ছাই ভাবিতে না পারি,
রেখে গেছে বাবা ঢের টাকাকড়ি,
না হয় একটা ব্যবসা দি'করি'
বসে থাকা নাহি সাজে,

(১৪)

যদি একখানা কাগজ চালায় ?
সম্পাদক হওয়া বড় সোজা নয়,
আছে মানহানি, বিদ্রোহের ভয়,
কারাবাস মাঝে মাঝে।

(১৫)

করে' দিব তবে এক ছাপাখানা ?
কম্পোজিটার খাটান সোজা না,
তাহার উপরে পড়ে যে লহনা
কিছুতে মেলেনা হায় !

(১৬)

পুস্তকের যদি দোকান চালায় ?
উই ইঁদুরের ভয় আছে তায়,
বিশেষ গোপনে বই যে ছাপায়,
তা'রি বেশ চলে যায়।

(১৭)

স্কুলপাঠ্য বই লেখে যদি ?
হায়রে সে পথ বিড়ম্বিত বিধি !
দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে নিরবধি
তথাপি হয় না পাস ;

(১৮)

কাচের ব্যবসা ? অদৃষ্ট ভরসা !
লাভ করিবার মনে যত আশা
বাক্স খুলিলে দু'কূল ফর্‌সা
ভেঙ্গে চুরে সর্ব্বনাশ !

(১৯)

চিত্রকর ? বটে মন্দ কায নয়
এদেশে তাহার আদর কোথায় ?
দেখে শুনে ভোদা আর্‌সি বানায়
পয়সা উপায় তরে,

(২০)

দালালের কায নাই বটে গোল,
কিন্তু বলা চাই চোকা চোকা বোল,
ছেলেটাকে নিয়ে একি গণ্ডগোল
মাথা যে উঠিল ধ'রে !

(২১)

হায় ভগবান্ দিয়েছ সঙ্গতি,
দিয়েছ আমায় সুপথেতে মতি,
এ ভাবনা হ'তে দাও অব্যাহতি,
উপায় বলিয়া দাও"

(২২)

পারিনা বুঝিতে তোমার করুণা,
থাকিত না মোর কিছুই ভাবনা,
ছেলেটাকে কেন মেয়ে গড়িলেনা;
তুমিও কি ভুলে যাও !

রণজিৎ প্রসঙ্গ।

জগতের আধুনিক ইতিহাসে দু'জন বীরপুরুষের আবির্ভাব, কার্য্য-কলাপ, প্রতিষ্ঠা ও তিরোভাব খুব অসাধারণ রকমের। অনেক নিপুণ যোদ্ধা, উদার অধিপতি, এবং মন্ত্রণা-কুশলী সচিবগণের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু মহারাজা রণজিৎ সিংহ ও সম্রাট নেপোলিয়ন অনন্যসাধারণ ভাবে সকলের হৃদয় অধিকার করে। হ্যানিবল্ ও সিপিও, অশোক ও শার্লিমেন্, সীজার ও অওরঙ্গজেব, এবং আর আর প্রথিতকীর্ত্তি মহাবীরগণ অসামান্য প্রতিভাবান হইলেও, রণজিৎ ও নেপোলিয়নের নাম স্বতন্ত্র রূপে দেখা উচিত।

কোথায় ভারতের অন্যতম হিন্দুদেশ পঞ্জাব, আর কোথায় ইউ-রোপের সমৃদ্ধিশালী স্থান ফ্রান্স! উভয় দেশের নিসর্গে, শিক্ষায়, সমাজে সংস্কারে বিপুল প্রভেদ; কিন্তু উভয় স্থানেরই সমসাময়িক দু'টী বীর-জীবনে কি বিস্ময়কর সাদৃশ্য! ফ্রান্স যখন বিদ্রোহের শোণিত-লুব্ধ অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত, অশান্তির লীলাভূমি, আচারে ধর্ম্মে উচ্ছৃঙ্খল, তখন নেপোলিয়নের আবির্ভাব—আর, ভারতে যখন দলে দলে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ যুদ্ধ, মোগল আধিপত্যের যখন পতন হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক অত্যাচারে যখন পঞ্জাব সন্ত্রস্ত, তখন মহারাজা রণজিৎ সিংহের উদয়। চরিত্রে, খ্যাতিতে, রণনৈপুণ্যে, দোষে গুণে উভয় বীরই বহুলাংশে সমান ধর্ম্মা। নেপোলিয়নের রাজবংশ বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই; রণজিতের বংশীয়গণেরও রাজত্ব অল্প সময়েই লোপ পাইয়াছিল। উভয় বীরের জীবনী পড়িলে অনেক

সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহাদের একের ইতিহাস পড়িলে অন্যেরও পড়া প্রয়োজন। বীরদ্বয়ের মহতী কাহিনীর তুলনায় আলোচনা সামান্য আয়াস সাধ্য নহে—সে আলোচনা সুবিস্তৃত না হইলে চলিবেনা; সুতরাং "প্রয়াসের" ক্ষুদ্র কলেবরে সে গুরুভার অলঙ্কারের স্থান নাই। রণজিৎ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে যে, প্রবন্ধ-মুখে মহাবীর নেপোলিয়নের নাম পঞ্জাব-কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের সহিত জড়িত করিলাম, তাহা অনুপেক্ষনীয় বলিয়া। নেপোলিয়নের বিষয় সকলেই অল্প বিস্তর জ্ঞাত আছেন। পাঠক দেখিবেন রণজিতে নেপোলিয়নে কতদূর সৌসাদৃশ্য।

রণজিৎ শৈশবেই—সবে মাত্র আট বৎসর বয়সে—পিতৃহারা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা খুব সাহসী ও নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মাতার চরিত্রে ঐতিহাসিকগণ অসতীত্বের কলঙ্ক আরোপ করেন। রণজিৎ তিনবার দার পরিগ্রহ করেন; এবং, ইতিহাসে পড়ি, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও অসচ্চরিত্রা।

উনবিংশ বৎসর বয়সে রণজিৎ লাহোরের শাসন ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য শত্রুগণ দলবদ্ধ হইয়া লাহোর অবরুদ্ধ করে কিন্তু সফল মনোরথ হয় নাই। রণজিতের জীবনের অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধে ও নানা স্থানের জয়চেষ্টায় কাটিয়াছিল—তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই পাই। তিনি অসাধারণ প্রতিভা-বলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই বহু দেশ আপনার অধিকারে আনিয়াছিলেন।

তখন East India Company র হস্তে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড। রণজিৎ প্রথমে ইংরাজদের রণনিপুণতার ও শক্তির যাথার্থ্য সম্যক

জানিতে পারেন নাই। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যশোবন্ত রাওর নিকট ইংরাজের মহতী শক্তির কথা শুনেন; এবং তিনি সহজ বুদ্ধি বলে উপলব্ধি করিয়া লয়েন যে, তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া আপনার স্বাধীনতা অটুট ও বিজয়ী নাম নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হইবেন না। তাই, তিনি পরে ইংরাজের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং ত্রিশ বৎসর যাবৎ উক্ত জাতির সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, "সব লাল হো যা'গা" এই ভবিষ্যৎ বাণী রণজিতেরই; ইহাতে রণজিতের দূরদর্শিতা শক্তি বেশ উপলব্ধি হয়।

অর্থাগমের দিকে রণজিতের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পাতিয়ালার রাজা রাণীর বিবাদ সুযোগে একলক্ষ টাকা বিনা আয়াসে পাইয়াছিলেন। পাতিয়ালার তৎকালীন রাজার স্বীয় পত্নীর সহিত মনোমালিন্য হয়। তাঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিয়া তিনি রাজার নিকট হইতে উক্ত টাকা পুরস্কার স্বরূপ পান।

রণজিতের প্রথমা স্ত্রীর জননী একজন বুদ্ধিমতী বীরাঙ্গনা ছিলেন। ইনি অনেক সময়ে জামাতাকে সাহায্য করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ যখন কাসুর দুর্গ জয় করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন এই রমণী উৎকোচ দানে শত্রু সেনাকে বশীভূত করিয়া দুর্গদ্বার জামাতাকে মুক্ত করাইয়া দেন। কিন্তু ১৮২১খৃষ্টাব্দে রণজিৎ এই উপকারিণীকেই বন্দিনী করেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লয়েন।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ গোবিন্দপুর পুনর্নির্ম্মিত করান এবং তথাকার দুর্গে রাজকোষ রাখিবার ব্যবস্থা করেন। ২০০০ সৈন্য এই দুর্গের পরিরক্ষণে নিযুক্ত হয়। এই বৎসরে ব্রিটিশ কর্ম্মচারী মেট্‌কাফ্‌ সাহেব রাজ্য সীমা স্থিরীকরণ মানসে অমৃতসরে সসৈন্যে উপস্থিত

হয়েন। মেট্‌কাকের মুসলমান সেনাকে মহরম উৎসবে মগ্ন দেখিয়া রণজিতের প্রায় তিন চার হাজার যোদ্ধা একত্রিত হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যোগ করে। মহারাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে মেট্‌কাফের ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে কিন্তু, আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং ৫০০ মাত্র সেনা লইয়া বিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। রণজিৎ তখন গোবিন্দপুরে ছিলেন। দূর হইতে ইংরাজ সৈন্য দ্বারা অনুসৃত আপনার পলায়নপর যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া তিনি স্বীয় শুভ্রবর্ণ কটীবন্ধ মুক্ত করিয়া লইলেন; এবং উহা দোলাইয়া নিবৃত্তি-সূচক সঙ্কেত করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মেট্‌কাফের শিবিরে গমন করিয়া, তাঁহার সৈন্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সেনার রণদক্ষতা দেখিয়া রণজিৎ সিংহ আপন সৈন্যকেও তাহাদের মত শিক্ষিত করিতে অভিলাষ করেন। এবং তদনুসারে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে দু'জন ইউরোপীয় যোদ্ধাকে বাৎসরিক ৫০,০০০৲ টাকা বেতন দিয়া সেনাধ্যক্ষ করেন।

কোট্ কাঙ্গরা (Kote Kangra) জয় করিতে রণজিৎকে খুব কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এখানেও তাঁহার বুদ্ধিমতী শ্বশ্রুঠাকুরাণী তাঁহার সহায়তা করিয়া ছিলেন।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে কাবুলাধিপতি শা সুজা উল্ মূল্‌ক্ মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং মুলতান জয় করিবার পরামর্শ দেন। রণজিৎ অচিরে মুলতানকে করদরাজ্যে পরিণত করেন; কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে তাঁহাকে পরে সাতিশয় আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

জগদ্বিখ্যাত রত্ন শ্রেষ্ঠ কোহিনুর এই শা সুজার ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিত। রণজিৎ তাঁহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লন। রণজিতের অভিলাষ

ছিল তাঁহার মৃত্যুর পর এই হীরক স্বীয় সমাধি বেদীর উপর খোদিত থাকিবে। কিন্তু তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই। এখন এই কোহিনুর সুদূর ইংলণ্ডে—সভ্য ইংরাজের হস্তে পড়িয়া ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কোহিনুর শব্দের অর্থ, আলোর পর্ব্বত।

বহু স্থান স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া রণজিৎ পাঠানদিগকে পরাজিত করেন। এই জয়োৎসব উপলক্ষে লাহোর, অমৃতসর, ও অপরাপর প্রধান নগরী আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল, এবং দুই মাস যাবৎ উৎসব চলিয়াছিল।

ইহার পর রণজিৎ কাশ্মীর সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। মহারাজ বিপুল বাহিনী লইয়া কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রণারম্ভেই দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার বহুসেনা বিনষ্ট হইল। যখন সবে মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ভয়ঙ্কর তুষার পাত হইতে লাগিল। শিখেরা অসহ্য শীতে চারিদিকে পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পাইল না। কিন্তু পলায়ন করিয়াও তাহারা নির্ব্বিঘ্নে কাশ্মীর অতিক্রম করিতে পারিল না; কাশ্মীরবাসীগণ পলাতকদিগের অনেককেই অজস্র প্রস্তর খণ্ডে আঘাত করিয়া আহত ও বিনষ্ট করিল। রণজিৎ এই কাশ্মীর অভিযানের কথা কখনও ভুলেন নাই। তিনি কাশ্মীরের প্রসঙ্গ মাত্রেই ক্রুদ্ধ হইতেন, এবং এরূপ কদর্য্য স্থানে ইংরাজেরা কি বুদ্ধিতে সুখান্বেষণে যায় তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেন না। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশ্মীরের নিকট কর আদায় করিতে সমর্থ হয়েন।

রণজিৎ অশ্ব অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি এমন সুনিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন যে, ঘোটক পৃষ্ঠে সমস্ত দিন অক্লেশে কাটাইতে পারিতেন। কাবুল পতি দোস্ত মহম্মদ খাঁর লাইলী (Lylee) নামে একটী সুন্দর অশ্ব ছিল। রণজিৎ এই হয়রত্নের বিষয় অবগত হইয়াই

উহাকে পাইবার জন্ত তাঁহার একজন প্রধান অনুচরকে ৮,০০০ সেনার সহিত কাবুলে পাঠান ; এবং আদেশ করেন, "যে প্রকারে ও যত ব্যয়ে হউক উক্ত অশ্ব আনিতে হইবে।"

বিফল চেষ্টার পর সংবাদ আসিল, অশ্বটী মারা গিয়াছে। কিন্তু রণজিৎ ইহা বিশ্বাস করিলেন না। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার তিনি তাঁহার অন্যতর য়ুরোপীয় সেনাপতিকে ঘোটকটীর জন্য কাবুলে পাঠাইলেন। ঘটনার আনুকূল্য বশতঃ, সেনাপতি অশ্ববর লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বড়লাট বেনটিঙ্ক্ রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রণজিৎ ইংরাজের সামর্থ্য ও রণদক্ষতা যথেষ্ট মান্যের সহিত ও সভয়ে দেখিতেন ; সেই জন্যই তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইংরাজদেরও একটী মহান উদ্দেশ্য ছিল। কাহারও অজ্ঞাত নাই যে, ইংরাজের রুশভীতি চিরকালই—সে সময়েও খুব প্রবল ছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, রুশ যদি আসে, তাহা হইলে পারস্য ও আফ্-গান রুশের দলে মিশিবেই ; এই রূপে বর্দ্ধিতবল রুশের হিন্দুস্থানে প্রবেশ মুখে প্রতিরোধ করিতে থাকিবে সুমহতী শিখ শক্তি। অতএব রণজিতের সহিত সদ্ভাব রাখা ইংরাজের পক্ষে তখন সুবুদ্ধিরই কার্য্য হইয়াছিল।

ইহার পর উল্লেখ যোগ্য ঘটনা রণজিতের পৌত্রের পরিণয়োৎসব। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। তদুপলক্ষে রণজিৎ অসীম অর্থ ব্যয় করেন। তিনি কয়েক দিবস ধরিয়া সার হেনরি ফেনের সহিত গীতে ভোজে নৃত্যে আমোদে যাপন করিয়াছিলেন।

হরিদাস সাধুর কথা অনেকেই অবগত আছেন। তিনি তাঁহার পরমাশ্চর্য্য অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করাইয়া, রণজিৎ ও অন্যান্য

গণ্যমান্য স্বদেশী ও বিদেশীগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। রণজিৎ-প্রসঙ্গে এই সাধুর নাম উল্লেখযোগ্য।

ইহার দুই বৎসর পরেই কেশরীবিক্রম রণজিৎ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। অর্দ্ধ শতাব্দীর অনেক অধিক হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি প্রত্যেক পঞ্জাববাসীর হৃদয় মন্দিরে সেই অসামান্য গুণ সম্পন্ন সুনিপুণ যোদ্ধা, নীতিবিশারদ অধীশ্বর, স্বাধীনতা-প্রিয় ও শাসনদক্ষ কোহিনুর-পতি মহারাজ রণজিৎ সিংহ সগৌরবে পূজিত হইতেছেন। বস্তুতঃ তিনি বহুধা বিভক্ত শিখ সম্প্রদায়কে আপনার রাজছত্রের নিম্নে সম্মিলিত করিয়া, মুসলমান উৎপীড়কদিগকে বিজিত করিয়া, সাম্য নীতির দ্বারা অজেয়কে বশীভূত করিয়া, এবং অলোক সামান্য প্রতিভা বলে বিস্তৃত ভূখণ্ড শাসন করিয়া যে সুমহতী কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা চিরস্মরণীয়। তাঁহার সমকক্ষ কাহারও নাম করিতে হইলে, কেবল মাত্র মহাবীর নেপোলিয়নের নামই করা যায়—ইহা কি প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে শাশ্বত গৌরবের বিষয় নহে?

রণজিতের আকৃতি বীরজনের মত ছিল না। তিনি খর্ব্বকায় ও বাম-নেত্রহীন ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বসন্ত লাঞ্ছনে পরিপূর্ণ ছিল; এবং বসন্তের কল্যাণেই তিনি বাম চক্ষু হারাইয়াছিলেন। কিন্তু মহার্ঘ রাজ-পরিচ্ছদে তাঁহাকে মন্দ দেখাইত না। তিনি মদ্যপ ছিলেন। ভয় কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তিনি যাবজ্জীবন যুদ্ধেই অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন, এবং প্রতি রণস্থলে অগ্রগণ্য থাকিতেন; পলায়ন অপরিহার্য্য হইলে সর্ব্বশেষ পশ্চাদপদ হইতেন—তিনিই। ফলতঃ রণজিৎ সত্য সত্যই রণ-জিৎ ছিলেন।

তাঁহার সভাসদ ও অনুচর বর্গ খুব মূল্যবান সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ও

আভরণ ব্যবহার করিতেন—তিনি স্বয়ং ত রত্নশ্রেষ্ঠ কোহিনুরের অধি-পতি। পরিতাপের বিষয়, তাঁহার বংশধরগণ কেহই তাঁহার উপযুক্ত হইতে পারেন নাই।

পাঠক এবারকার "প্রয়াসে" যে চিত্র দেখিতেছেন উহাই মহারাজা রণজিৎসিংহের সমাধি মন্দির। এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দির জুম্মা মস্‌জিদের নিকটে প্রতিষ্ঠিত। এখনও এখানে প্রতিদিন শিখগণ তাঁহাদের মৃত প্রভুর পূজা করিয়া থাকেন। মন্দিরটীর খিলানগুলি সুন্দর মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং অন্তর্ভাগ দর্পণ ও বিচিত্র চিত্রাদিতে সুশোভিত। ইহার মধ্যস্থলে একটী বেদী আছে, এবং তাহার কেন্দ্র স্থলে একটী সুমনোহর সুন্দর শতদল খোদিত। রণজিতের ভস্মাবশেষ এই কমলোদরে নিহিত রহিয়াছে। এই সুবৃহৎ পদ্মের চারি পার্শ্বে আরও কতকগুলি ছোট নলিনী খচিত আছে। যে সকল মহিষী মহারাজের সহমৃতা হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ভস্ম উহাদের অভ্যন্তরে রক্ষিত হইয়াছিল।

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

স্বল্পাগল্পা।

(অভিধান অবলম্বনে।)

উর্জ্জের আজ সাতাশ ঘস্র। ভ-খচিত খে দু'এক খানি গবেডু দেখা যাইতেছে। খচমস কদান্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে। ছাত্র-বৃত্তিতে পদক-প্রাপ্তা টেঁপি ওরফে নয়নমণির আজ মেজাজটা ভাল

উর্জ্জ—কার্ত্তিক। ঘস্র—দিন। ভ—নক্ষত্র। খে—আকাশে। গবেডু—মেঘ। খচমস—চন্দ্র। কদ—মেঘ।

নাই। কেন না তাহার আখুভুকটীকে কে উত্তম-মধ্যম দিয়াছে এবং তাহার অম্বা রাইকিশোরী তাহার প্রজ ভবকিঙ্করের উদ্দেশে পৈষ্টীপ, দীর্ঘতুণ্ডার পুত্র, নির্লজ্জ জকুট প্রভৃতি অনেকগুলি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। দোষ ভবকিঙ্করের সম্পূর্ণ, যেহেতু সে মাতাল অবস্থায় নয়নমণির তনুভস্ত্রার বত্রিশ টাকা মূল্যের নোলক হারাইয়া ফেলিয়াছে। গত শনিবার, টেঁপির ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া কনীনিকা ফেলি ওরফে কনকলতা, ভবকিঙ্করের তাম্বূলে একটু পানীয়-বর্ণিকা দিয়াছিল, তাহার আহারের সময় পীতচম্পকটী ফ দিয়া নিবাইয়া দিয়াছিল, এবং তাহার কর্ণদ্বয় পীড়ামান করিয়াছিল। স্বামী-সোহাগিনী ষোড়শী টেঁপি সেই জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে কার্ত্তিক-পূজার দিন ফেলির ভর্ত্তা তাহাদের বাটী আসিলে টেঁপি তাহার কটুকাতে নিদিগ্ধার পরিবর্ত্তে গন্ধশুণ্ডিনী-লোচন দিবে, আফিস যাবার সময় ঘ্রাণদুঃখদাদ্বারা তাহাকে পদে পদে বাধা দিবে, এবং মলিনাম্বু ও চূর্ণ সংযোগে তাহাকে কপি সাজাইবে। ভবকিঙ্কর—ঘর-জামাই, কোম্পানির কাগজের দালাল, ষড়বিংশ-বর্ষীয়। কনকলতার স্বামী সতীশ—প্রখ্যাতবপ্তৃক, এমে পাস, দ্বাবিংশ-বর্ষীয়।

দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিক-পূজার দিন আসিল। নূতন জামাই সতীশ আসিবে বলিয়া রাইকিশোরী ভারি ব্যস্ত। ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "কার্ত্তিকের মা। আজ যেন হারু ঠাকুর আসে। চপ্ তৈরি

আখুভুক—বিড়াল।	অম্বা—মা।	প্রজ—স্বামী।
পৈষ্টী—ধেনো মদ।	দীর্ঘতুণ্ডার পুত্র—ছুঁচার বাটা।	জকুট—কুকুর।
তনুভস্ত্রা—নাক।	কনীনিকা—কনিষ্ঠা ভগিনী।	পানীয়বর্ণিকা—বালি।
পীতচম্পক—প্রদীপ।	ফ—ফুঁ।	কটুকা—পান।
নিদিগ্ধা—এলাচ।	গন্ধশুণ্ডিনী—ছুঁচা।	ঘ্রাণদুঃখদা—হাঁচি।
মলিনাম্বু—কালী।	প্রখ্যাতবপ্তৃক—সদ্বংশসম্ভূত।	

করতে হবে।” আর তিন পোয়া এডক-মেদস্কৎ, এক পয়সার তীক্ষ্ণ-কন্দ, অৰ্দ্ধসের রসগোল্লা, এক পয়সার যমদূতিকা, দুই পয়সার কটুফল, চারি পয়সার ঘর্ঘট ইত্যাদি এক টাকা পৌনে তিন আনার দ্রব্য আনিতে দিলেন। ঝিকে শুনিয়ে কেলিকে বল্লেন, “আজ তাঁত সইএর তৌল ও পৃষাকরা আনিয়ে রেখিচি——”। কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে কার্ত্তিকের মা চুরখানা বোলতার চাকের মতন করে বল্লে, “আঃ পোড়া কপাল! মুনিবদের যতই কর না ক্যান্ চোর বদনাম দিতে ছাড়বেনি।” রাইকিশোরী বলিলেন, “কখন তোকে চোর বল্লুম ঝি?”। কার্ত্তিকের মা বল্লে, “ঐ গুমুরে মাগীর কাছ থেকে কেন দাঁড়ী বাটখারা আনিয়েচ গা? দেখো না ওজন করে। আমি তেমন বাপের বেটী নই যে পরের কুটোগাচটী নোবো”। এই বলে সে তেড়ে বাড়ী থেকে নিষ্কুলীকৃত হয়ে সিমলার ক্রয়ারোহে হাজির হল। তথায় হারু চাটুয্যে নামক একটী লম্বা টোরকাটা কেকরাক্ষ কান্দবিক শিখীর কাছে এসে বল্লে, “এই নেরে বাম্‌না, এই পৌনে তিন আনা শুম্রমুদ্রা আলাদা রাখ্। আমি ঝপ্ করে এই একটা প্রজাদান মুদ্রার বাজারটা করে এসচি। আমাদের মুনিববাড়ী আজ রাঁধ্‌তে যাস্। নতুন জামাই এস্‌বে।” হারু কার্ত্তিকের ইয়ার, বয়সে কার্ত্তিকের চেয়ে তিন বৎসরের

এড়ক—ভেড়া। মেদস্কৎ—মাংস। তীক্ষ্ণকন্দ—পেঁয়াজ।
যমদূতিকা—তেঁতুল। কটুফল—পটোল। ঘর্ঘট—ট্যাংরা মাচ।
তৌল ও পৃষাকরা—দাঁড়ী ও বাটখারা। চুর—মুখ।
নিষ্কুলীকৃত—বাহির। ক্রয়ারোহ—বাজার। কেকরাক্ষ—ট্যারাচোকো।
কান্দবিক—কটিওয়ালা। শিখী—ব্রাহ্মণ। শুম্র—তাম্র।
প্রজাদান—রৌপ্য।

বড়, এবং দুষ্ট লোকে বলে যে গত ভাদ্রমাস থেকে হারু তাহার পর-লোকগত পিতাকে নির্ব্বিবাদে "অফিশিয়েট" কর্‌চে।

ভবকিঙ্করের মদ্যপান সম্বন্ধে দৈনন্দিন কঠিন সমালোচনায় নয়ন-মণির কিঞ্চিৎ চণ্ডোদ্রেক হইয়াছে। রাইকিশোরী উপরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠা ধীলটী—ওথেলো-ভর্ৎসিতা ডেস্‌ডিমোনার ন্যায়, ছোটলাট-তিরস্কৃত "সাবাস আটাশ"-ভুক্ত মিউনিসিপাল কমি-শনরের ন্যায়, বড়বাজার হইতে সুকিয়া ষ্ট্রীট থানায় "বদ্‌লি"-কৃত "উপ্‌রি"-বঞ্চিত পাহারওয়ালার ন্যায়, নববিবাহিত ফেল-হওয়া জামাতার ন্যায়—মলিনবদনা, শোকাকুলা। কাছে গিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন, "ছি মা। আমি বৃদ্ধা মনুষ্যী, আমার উপর কি উম্ করে?" টেঁপি কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল "চিরণ্টী বলে আমি চের সইচি। আর গোবেচারা ঘরজামাই পেয়ে তুমি যা মুখে আসে বলো। আজ আমি এই ছাদ থেকে আছাড় খেয়ে মর্‌ব"। এই বলিয়া সে লাফ মারিবে এইরূপ ভঙ্গী করিল। রাইকিশোরী 'করিস্ কি লো আবাগীর বেটী" বলিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ঠিক এই সময়ে কনকলতা আসিয়া বলিল, "দিদি, সে এসেচে। নিচের আলো নিবে গেচে।" টেঁপি বলিল, "বেশ হয়েচে পোড়ারমুখী"।

রাসভনিন্দিতস্বরে কার্ত্তিকের মা নিচে থেকে হাঁকিল, "ওগো মা ঠাকরুণ। ওগো অ বড় দিদিমণি। বুন্নই বাবু প্রঘণে হাজির। আলো কুথো গো?" রাইকিশোরী ও নয়নমণি তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। সতীশের মুখের কাছে নয়নমণি আলো ধরিয়া বলিল, "আরে কেও।

চণ্ড— ক্রোধ।　　ধীলটী—কন্যা।　　উম্—রাগ।

চিরটী—পিতৃগৃহস্থিতা বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা।　　প্রঘণ—উঠান।

চিনি চিনি কর্‌চি যে! চুরুটের ঘননাভিতে পাড়া নিশাচর্ম্ম করে ফেল্‌লে যে। রঙ্গীন চাদরে বেশ দেখাচ্ছে ত'—যেন পাখমছড়ান ঘন-পাষণ্ড। এস, উপরে এস, দুট' মনের কথা কই!" হাসতে হাস্‌তে হেলে দুলে উপানৎ মস্‌মসিয়ে সতীশ উপরে আসিল।

সতীশ উপরে আসিয়া রাইকিশোরীকে উপসংগ্রহ করিল। নয়নকে বলিল, "হ্যাগা দিদি, পয়সা খরচ হবে বলে কি তোমরা স্নেহপ্রিয় জ্বালাও না? না যুবতী কোন দূতীর অন্ধকার বাড়ী না হলে মন বসে না?"

নয়ন। চুপি চুপি আলো নিবিয়ে খুব রসিকতা হচ্চে দেখ্‌চি যে? (বাস্তবিকই চুরুট ধরাতে গিয়ে সতীশ হঠাৎ আলো নিবিয়ে ফেলেছিল)।

সতীশ। তোমাদের বাড়ী একজন যুবা-পুরুষ ঢুকে আলো নিবিয়ে দিলে তোমরা কিছু বল না! দিন দিন খুব মহেচ্ছ হচ্চ ত'? যদি হোড়া আস্‌ত?

নয়ন। আমার ছোট বোনের উদ্বোঢ়াটী যুবা-পুরুষ বটে, কিন্তু প্রচুরপুরুষও নন আর হোড়া ঘোড়া কিছুই নন। তবে ভয় কি?

সতীশ। কেয়াবাৎ। বিচুটিফুল। চৈতন্য লাইব্রেরি থেকে বই পড়ে অনুপ্রাসের ছটায় ভারতচন্দ্রের মাদী-সংস্করণ হয়ে উঠেছ দেখ্‌চি! কনক কোথা? তাকে দেখ্‌চিনি?

নয়ন। তোমার যে কাকচিঞ্চার মতন চোক, কি করে দেখ্‌বে?

ঘননাভি—ধোঁয়া। নিশাচর্ম্ম—অন্ধকার। ঘনপাষণ্ড—ময়ূর।
উপানৎ—চর্ম্মপাদুকা। উপসংগ্রহ—পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম। স্নেহপ্রিয়—প্রদীপ।
মহেচ্ছ—উদার। হোড়া—চোর। উদ্বোঢ়া—বর।
প্রচুর-পুরুষ—চোর। কাকচিঞ্চা—কুঁচ।

কনক ত' তোমার মেজ বোন লবঙ্গলতার মতন ধৃষ্ণু নয়, যে ভর্ত্তা বাড়ী এলে গুরুজনের সামনে ঝমঝমিয়ে মল বাজিয়ে এসে দরজায় খিল দেবে?

জলসূচির মুখে জলরস পড়িলে যেমন হয় সতীশের তেমনি হল। কথাটা উল্টাবার জন্য বলিল, "দিদি, শূক করে এক গেলাস ক দাও ত'। অনেকটা পথ চলে এসে কটকট ধীতি পেয়েচে।"

নয়ন। ট্রামের পাঁচটা পয়সা খরচ কর্‌তেও বুঝি দাঁতকপাটী লাগে?

সতীশ। আহা, পাঁচটা উড়ম্বর-মুদ্রাই কি উড়ে আসে? আর রাখলে সেটা ত' তোমার বোনেরই থাকবে।

নয়ন। শনিবার হলেই বোনের আমার সাত পাড়া ভেঙ্গে ছ' তিন ডজন ননদাই এসে জোটে। আর এক এক রাত্রে পাঁচ শো গুণ পাঁচ পয়সা খরচ হয়।

সতীশ। Thank you গুরু মহাশয়, খুড়ি গুর্ব্বী মহাশয়া! চাহিলাম বারি দিতেছ মশ।

নয়ন। ভুল হয়েছে ভাই। কম্বল আনাচ্ছি। ওরে ফেলি! তোর সংসার-জলধি-কর্ণধারের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক গেলাস ঋত দিয়ে যা'।

স্বিন্না ঘোমটাবৃতা কনকলতা জলের গেলাস রাখিয়া পলায়ন করিল।

ধৃষ্ণু—নির্লজ্জ।	জলসূচি—জোঁক।	জলরস—লবণ।
শূক—দয়া।	ক—জল।	কটকট—অত্যন্ত।
ধীতি—তৃষ্ণা।	উড়ম্বর—তাম্র।	মর্শ—পরামর্শ।
কম্বল—জল।	ঋত—জল।	স্বিন্না—ঘর্ম্মাক্তা।

জল খেয়ে সতীশ বলিল, "চারিদিক হ দেখছিলুম। এখন বাঁচলুম"।

হংস-গদ্গদা নয়ন বলিল, "বাঁচ্‌লে, জল খেয়ে না গিন্নিকে দেখে ?"

সতীশ। আমি যদি ভবকিঙ্কর দাদার মতন স্ত্রৈণ হতুম তা' হলে বলতুম গিন্নিকে দেখে।

কথাটা শুনে নয়নমণি নন্দথু-তীর্ণ হল, তার মুখে চোখে হাঁসি ফুটে উঠ্‌ল। নয়ন বলিল, "আচ্ছা তোমার জলদাত্রীকে আশীর্ব্বাদ কর্‌লে না ?"

সতীশ। (গোঁফে তা দিতে দিতে) তোমার ভগ্নী আয়ুষ্মতী ও হর্ষয়িত্নুবতী হউন। বলি দিদি ! শুদু জলটা খাওয়ালে ? শুদু জল কি দিতে আছে ?

নয়ন। আচ্ছা ফেলিকে স্বাদুখণ্ড ও হরিমন্থজ আন্‌তে বল্‌চি।

সতীশ। বাঙ্গলা করে বল দিদি। বুদ্ধিগম্য হল না।

নয়ন। তুমি আচ্ছা চিরমেহী ত' ? বাঙ্গলা বোঝ না ? আমার মা গরীব বিধবা ; তোমার জন্য স্বর্ণচূড় ও হরিলোচন কোথা পাবেন ? তাই ছোলা ও গুড়ের বন্দোবস্ত করছিলুম।

সতীশ। ডাক্তারের পরামর্শে অখাদ্য গুলা প্রায় ত্যজ্ ধাতু ঘঞ্ করিচি। এখন প্রাহ্নে খাই দুটী ভক্ত ও হরিনামা-হরেণু এবং অপরাহ্নে ছয়খানি পোলিকা ও একটু দুধ।

হ—শূন্য। হংসগদ্গদা—মধুরভাষিণী। নন্দথু—আনন্দ।

তীর্ণ—আপ্লুত। হর্ষয়িত্নু—পুত্র। স্বাদুখণ্ড—গুড়।

হরিমন্থজ—ছোলা। চিরমেহী—গাধা। স্বর্ণচূড়—কুঁকড়া।

হরিলোচন—কাঁকড়া। ভক্ত—ভাত। হরিনামা—মুগ।

হরেণু—ডাল। পোলিকা—পাতলা রুটি।

নয়ন। কর্ক সংবাদ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি আমার স্মরলেখনীর মতন উদ্ভিদ-ভোজী হও, এবং ফেলি যে বুলি শেখাবে তাহা সমস্ত দিন কপ্‌চাও।

সতীশ। গোড়াটা ditto, শেষটা respectfully protest.

নয়ন। তোমার ই·রাজী ফলান রোগটা—

সিঁড়িতে ভবকিঙ্করের জুতার শব্দ শোনা গেল। নয়ন মাথার কাপড় টানিয়া বাহিরে গেল। সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আসুন দাদা। কেমন আছেন?"। ভবকিঙ্কর বলিল "যেমন রেখেছ ব্রাদার। বসে বসে এতক্ষণ উত্তমসংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছেল ভায়া?"

সতীশ বলিল "ছি! লালপানি পেটে পড়লে আপনার তোদনখানা চুনের বেহদ্দ হয়ে ওঠে"।

দে অনেক প্রজল্পন এবং নবতি মিনিট ধরিয়া আশিত করিল।

কার্ত্তিকের মা নিয়ূহের পাশ হইতে মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছিল এবং কুপীটসাৎ করিবার সময় হ্রিনীয়া করিতে নাই এই সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপদেশ বর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তাহার আন্তরিক ইচ্ছা যে জামাতৃদ্বয় সব কয়টা রসগোল্লা অভুক্ত রাখিয়া যাউক, সে সেগুলি ঘস করে।

নক্ত ১৫ দণ্ড ২১ পল ৩৭ বিপল গত হইলে ভবকিঙ্কর নয়ন-নিলয়ে এবং সতীশ কনক-প্রকোষ্ঠে গমন করিল। যেহেতু—

কর্ক—উত্তম।　　স্মরলেখনী—ময়না পাখী।

উত্তমস গ্রহ—নির্জ্জনে পরস্ত্রীর সহিত অসৎ ব্যবহার।

তোদন—মুখ।　　দে—উভয়ে।　　প্রজল্পন—গল্প।

আশিত—ভোজন।　　নিয়ূহ—দ্বার।　　কুপীট—উদর।

হ্রিনীয়া—লজ্জা।　　ঘস—ভক্ষণ।　　নক্ত—রাত্রি

"যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
মদনরাজার বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে ?"
যুবকেরা মেষপাল, যুবতী আতপ চাল,
স্বামী হুজুগানন্দ ত্রিপদীতে ভণে।

শ্রীগৌরহরি সেন।

———:*:———

নূতন পঞ্জিকা।

শুভমস্তু শকাব্দা ১৯২২, সন ১৪০৭, ইংরাজী ২০০০।২০০১ ইত্যাদি।

হরপার্ব্বতী সংবাদ।

হর প্রতি প্রিয়ভাষে হৈমবতীর কহিবার আর বয়স নাই। এখন জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ বাবাজী বয়স্থ হইয়াছেন, এবং বহুকাল হইতে হাত মক্স করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়াছেন। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক ও করিমুণ্ড লাভ করিয়া অবধিই আছেন। অতএব উক্ত বৎসরের ফলাফল গণেশের শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করিবার জন্য তদীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী উদ্গ্রীব হইয়াছেন। হরপার্ব্বতীর শীঘ্রই পেন্‌সন হইবার কথা হইতেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র নূতন পঞ্জিকা প্রণয়নে কতদূর সিদ্ধ হস্ত তাহা দেখিবার উভয়েরই আন্তরিক ইচ্ছা। বাপের নাম রাখা চাইত। অতএব চিরন্তন প্রথা অনুসারে নূতন পঞ্জিকায় লেখা হইবে—

করিমুখকদলীবধূ সংবাদ।

পতি প্রতি প্রিয়ভাষে কন কলাবতী।
শুভঙ্কর বর্ষফল কহ মূষাপতি॥
কোন ব্যক্তি হৈবে রাজা কেবা মন্ত্রীবর।
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি শুণ্ডধর॥

হেরম্ব হেলায়ে শুণ্ড কহে ততক্ষণ।
শতবর্ষ পরে কার শুন বিবরণ॥

প্রিয়তমে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরের উৎপত্তি ও সুখের কথা পুনরুক্তি করিয়া আর তোমার কাণে শুড়্শুড়ি দিতে চাহিনা। তোমার বৃদ্ধ শ্বশুর ঠাকুর যুগের প্রারম্ভ হইতে ঐ সকল বৃথা বাক্যব্যয়ে এত নূতন পঞ্জিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন যে আমার বাহনের বংশধরগণেরা কাটিয়া শেষ করিতে পারিতেছে না। একশত বর্ষ পরেও কলিযুগের পূর্ণ অবতার, কারণ ৪৩২০০০ বৎসর যাহার পরমায়ু তাহার দু'একশত বর্ষে আর কত কমিবে? বৈবস্বত মনুর তখনও অধিকার থাকিবে। এখনকার নূতন পঞ্জিকায় কলির আহার ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে শতবর্ষ পরে তাহা পৌরাণিক গাথায় পরিণত হইবে। তখন নরের আয়ু শতবর্ষ কমিয়া যাইবে; অর্থাৎ বিশ বৎসর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। মানবদেহ পৌনে আড়াই হস্ত পরিমিত হইবে। নারী-গতপ্রাণ, অর্থাৎ নারীর অঞ্চলের সহিত পুরুষের কচ্ছদেশের অগ্রভাগ গ্রন্থিবদ্ধ থাকিবে। তীর্থ—গঙ্গাই থাকিবেন। তবে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির ভাগা-ধিক্য প্রযুক্ত তীর্থবারির সংস্কার হইবে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে উহা চুয়াই করিয়া ব্যবহৃত হইবে। আর সেই অবস্থায় স্থান পাত্র নির্ব্বিশেষে পবিত্রতা রক্ষা করিবে। ব্যবহার পাত্রের ত এখনি নির্ণয়োর্নাস্তি, তখনও তাই। তবে কাচপাত্র ভাঙ্গিবে না, সোডার বোতল ফাটিবে না। আর মৃৎপাত্র এত সুন্দর হইবে যে দামে সুবর্ণ অপেক্ষা মহার্ঘ, কাযেই স্বল্পমূল্যের সুবর্ণ পাত্র ব্যবহৃত হইবে। সুবর্ণ অপেক্ষা শতগুণ বহুমূল্য ধাতুর আবিষ্কার হইবেও তাহারই আদর হইবে।

কদলীবধূ· তবে কি তখনকার মহিলাগণ স্বর্ণের গহনার জন্য লালায়িত হইবেন না? আঃ পৃথিবী না জানি তখন কতই সুখের হইবে!

গণেশ। না প্রেয়সি বস্তুতক, তোমাদের জাতেরা শতবর্ষে কেন সহস্র বর্ষেও অব্দার ছাড়িবে না। ' বর্ণ যখন সুলভ হইবে সে সময় তাহারা অপর মূল্যবান ধাতুর জন্য ভর্ত্তার ভালবাসা পরীক্ষা করিবে। তখন বিবাহ বন্ধন থাকিবে না কারণ বিবাহ দিবার খরচ লোকের জুটিবে না। আর নর এত স্বাধীনতাপ্রিয় হইবে যে সামান্যা নারীর বশ্যতা স্বীকার সহজে করিতে চাহিবে না। বিজ্ঞান শাস্ত্রের এত উন্নতি হইবে যে বায়ু অগ্নি বরুণ প্রভৃতি নরগণের আজ্ঞাধীন হইয়া তাহাদের সংসার-থিয়েটার নির্ব্বাহ;করিয়া দিবে। তপ জপ বা যোগ-বলের পরিবর্ত্তে কল টিপিলেই ঐ ক্ত দেবতাগণ কার্যাকর হইবেন। যুদ্ধ বিগ্রহাদি কিছুই থাকিবে না। যদি হঠাৎ কোন জাতি কোন জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে বৈজ্ঞানিক কৌশলে একদল আর একদলকে বিনাযুদ্ধে একবারে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে অক্ষম করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। পৃথিবীতে এত লোকাধিক্য হইবে যে শস্য উৎপন্ন করিবার উপযোগী যথেষ্ট ভূমি থাকিবে না এবং নরলোকের জীবন ধারণার্থ বৈজ্ঞানিক কৌশলে পঞ্চভূত মিশ্রিত করিয়া সুস্বাদু আহার্য্য প্রস্তুত হইবে। এতদ্ব্যতীত ইন্দ্রধনু চূর্ণ, চন্দ্রের সুধা, কবিতা-মৃত, মলের নিক্কণ, মশকের ঐকতান প্রভৃতি অলৌকিক দ্রব্য হইতে মেধাবীগণের ক্ষুৎপিপাসা শান্তি হইবে।

পৃথিবীর সন্নিকটস্থ কোনও একটি গ্রহ মানবজাতীর দৃষ্টিপথে আসিবে। সেখানকার অধিবাসীগণের সহিত তাড়িত সংবাদ দ্বারা পরিচিত হইয়া আপন আপন অভাব অভিযোগ পূরণ করিবার প্রয়াস পাইবে। এমন কি অধিক সুদে তাহাদের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে।

পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এ পুরাণমতে অনেকের

আস্থা হইবে না। কাযেই তাহারা অকাট্য যুক্তি বলে প্রমাণ করিবে যে পৃথিবী স্বর্ণময় শৃঙ্খলদ্বারা স্বর্গ হইতে ঝুলান রহিয়াছে, এমন কি অনেকে সেই শৃঙ্খল দেখিবার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইবে।' দৈবাৎ তাহার সন্ধান পাইয়া কোনও বিচক্ষণ কপি-বর সেই শৃঙ্খল বহিয়া বিরহতাপে তপ্ত হইয়া চন্দ্রলোকে গিয়া বাস করিবে।

কদলীবধূ এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন। কপির কথা শুনিয়া মনটা একটু চঞ্চল হইল, বলিলেন, "প্রাণতম বল বল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কি সমগ্র কপিকুল পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইবে না? আঃ এই দুর্দান্তরা আমায় হাড়েনাড়ে জ্বালাইয়া মারিত। নখরাঘাতে গাত্র বিদীর্ণ করিত। তোমরা পৃথিবীতে গেলে যে সোজা শরীরে ২।৪ দিন তোমার পার্শ্বে থাকিব তাহার যোটি রাখিত না।"

গণেশ। না না শ্রীফল পয়োধরি, কপিকুল হইতে আর তোমার ভয় থাকিবে না, তাহারা মানবের পিতৃপুরুষ বৈত নয়। ক্রমে বিজ্ঞানালোকে তাহারা সভ্য ও শিক্ষিত হইয়া দশের একজন হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। তাহা হইলে আর অবলা জাতির প্রতি রূঢ় ও কর্কশ ব্যবহার করিবে না। বিশেষতঃ বানরী ভাষায় তখন লোকের ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং তাহারা স্ত্রীলোকের মানহানি করিলে আদালতে তাহার ক্ষতিপূরণ করিবে।

কদলীবধূ। আঃ তোমার শুণ্ডে কচি ঘাস লাল পানি পড়ুক। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি মূষিকবাহন, সে সময় বিজ্ঞানবলে আমাদের পরিধেয়ের কিরূপ উন্নতি হইবে? আর যে পৃথিবীতে গিয়া লাল পেড়ে আট হাতি কাপড়ে বস্ত্রোকর সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। থুঃ থুঃ কাপড়ে আবার মেঞ্চেষ্টরি দুর্গন্ধ !!

গণেশ। মোচাগর্ব্ববারিণি—সে সময় তোমাদের মজা। মানব-জাতির আদিম বর্ব্বর অবস্থায় বস্ত্রাদির আবশ্যক হইত না। তারপর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করিয়া আবরণে আটঘাট বাঁধা পড়িতেছে। আবার অধিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে। শতাব্দী পরে মাননীয়া এবং মার্জ্জনীয়া স্ত্রীলোক ঊর্ণতন্তুর বস্ত্র পরিধান করিলেও দোষণীয়া হইবে না। উন্নতির মূল মন্ত্রই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। কৈলাস শিখরেই তাহার নমুনা দেখ না উন্নতির চরম সীমায় অধিষ্ঠিত মহাদেব দিগম্বর হইয়াছেন, কাহার সাধ্য তাঁহাকে নিন্দা করে ?

কদলীবধূ। ছিঃ উনি গুরুলোক আর আমি—

গণেশ। আহা তুমি বুঝলে না। আমরা সকলেই সময়ের সহিত অগ্রসর হইতেছি, এই দেখনা আমাদেরই প্রতিমার কত উন্নতি হই-য়াছে। সেই সুরথ রাজার বা রামচন্দ্রের সময়ের প্রতিমার সহিত আজকালের বিলাতী গহনা মোড়া প্রতিমার তুলনা হয় কি ? বল্‌তে কি তখন কলাবন দেখ্‌লেই আমার গা ছম্‌ছম্‌ কর্‌ত, আর এক শতাব্দী পরে যদিও আমাদের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় —(হওয়া সন্দেহ) তবে তখন আর কেহ আমাদের চিনিতে পারিবে না। বছর বছর পরিশ্রম করিয়া না গড়িয়া তখনকার কর্ম্মকারেরা একেবারে কোনও ধাতুর প্রতিমা ঢালাই করিয়া রাখিবে। বস্ত্রের কোন প্রয়োজন হইবে না।

লক্ষ্মী সরস্বতীরও তখন এই দশা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিকেরও রুচি মার্জ্জিত হইবে ভাবিয়া গণেশভামিনী কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন।

গণেশ। তারপর তারকব্রহ্ম নাম। পুরাতন হরের্নামে সত্য সত্যই দুর্গতি নাশ করে না, তাহা দুর্বৃত্ত নবপাষণ্ডেরা তখন বুঝিতে পারিবে। এবং প্রতিভার পূর্ণতেজে তেজীয়ান হইয়া বীরপূজা করিলে

যে এতদপেক্ষা উপকার পাওয়া যায় ইহা ধারণা হইবে। জাতিভেদ থাকিবে না; কাযেই সকল দেশীয় ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর বাক্যবীর যুদ্ধবীর প্রভৃতির নাম সকলের মুখে মুখে ঘোষিত হইবে।

সেদিন জামাই বাবু চুপি চুপি লক্ষ্মীর কাছে বলিতেছিলেন আমার বাহন তাঁহার বিছানা কাটিতে কাটিতে উৎকর্ণ হইয়া সব শুনিয়াছে যে তিনি সত্যযুগে মৎস কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি জানোয়ার অবতারে কিছু মাত্র সুখ পান নাই। বামন অবতারে পদের সুখ এবং পরশুরাম ও রামচন্দ্র অবতারে হাতের সুখ পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ অবতারে পার্থিব সুখ এবং বুদ্ধ অবতারে পরমার্থিক সুখ লাভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু আর একটি মাত্র অবতার অবশিষ্ট আছে এবার পৃথিবীতে যাইয়া একাধারে সকল সুখের আস্বাদ মিটাইয়া আসিবেন। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলে সেটি অদৃষ্টে নাও ঘটিতে পারে কাযেই কোন পাশ্চাত্য দেশ উজ্জ্বল করা সম্ভব। এবং আরও নাকি বলিয়াছেন যে সে সময় পাপীদের তরাইবার একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবিত হইবে—

সবেমাত্র এইটুকু বলিয়াছেন এমন সময় অন্তর্য্যামী ব্রহ্মা গুপ্তচর মুখে সমস্ত অবগত হইলেন এবং মনে মনে কহিলেন এই শিবের ব্যাটা যদি এই রকম করিয়া সৃষ্টিরহস্য ছাপাইয়া বিক্রয় করে তবেই ত আমার সৃষ্টিতে একটিও নর থাকিবে না সকলেই মহাকলিতে উদ্ধার হইয়া যাইবে। এই জন্য তৎপর তিনি কৈলাসের হেড আপিষে একেবারে অর্জেণ্ট তারহীন তাড়িত বার্ত্তা পাঠাইলেন। আর হেলিওগ্রাফিক্ মেসেজ দ্বারা বিষ্ণুকেও সতর্ক করিয়া দিলেন। কৈলাসের হেড আপিষের ভাল ভাল লোক লাটের আগমনে সিম্‌লা আপিষে বদ্‌লি হইয়াছে। নূতন পিয়ন টেলিগ্রামের শিরোনামা লিখিত 'গৌরিপাত হর'কে খুঁজিয়া পাইল না, এরূপ নাম থাকা অসম্ভব এবং

ভুল হইয়াছে ভাবিয়া সে গোরীকান্ত করকে মেসেজ্ ডিলিভারি করিল। তা'র অপরাধ নাই, বেল্‌তলার ভোলানাথ মোহান্ত বলে ও আমার নামে খপর। সে ত এত মূর্খ নয় যে গোরীপতি হর ও ভোলানাথ মোহান্ত এই দুই নামের সামঞ্জস্য করিয়া একের টেলিগ্রাম অন্যকে দিবে। গোরীকান্ত বাবু সামান্য কেরাণী, ষ্টেট্ সিক্রেট্ হস্তগত হইয়াছে ভাবিয়া তিনি কোনও সংবাদ পত্রের আপিষে গিয়া সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে মেসেজ্ বেচিয়া মাল করিলেন।

বিষ্ণু হেলিওগ্রাফ্ পাইয়া চৈতনফক্কা আব্‌দালির দ্বারা ছাপাখানার বড়কর্ত্তার নিকটে এই আদেশ পাঠাইলেন যে তাঁহার কৈলাসস্থ সম্বন্ধী গণেশ বাঁড়ুর্য্যের ১৪০৭ সালের নূতন পঞ্জিকার অংশবিশেষ যেন নরচক্ষুর অদৃশ্য কোনও কালিতে ছাপা হয়।

শ্রীরামপুর—নিবাসী—পবিত্রাত্মা।

বশিষ্ঠাশ্রম।

—০০—

আসাম প্রদেশ প্রকৃতি জননীর একটি রমণীয় লীলাভূমি। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন আমার সুকোমল মনোবৃত্তিগুলি একে একে উন্মেষিত হইতেছিল, যখন সংসারে দুঃখের বিভীষিকাময়ীছায়া, জীবন-সংগ্রামের তীব্র কোলাহল, অদম্য ধনলালসা, আশা-মরীচিকার মায়াবিনী প্রহেলিকা নিরাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস, শোক দুঃখ সন্তাপের মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন, স্বার্থপরতার ঘোর অনিষ্টকারী উত্তেজনা, আমার

কোমল বাল্য-হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই, যখন প্রতারণা প্রবঞ্চনা দ্বেষ হিংসা ক্রোধ লোভের প্রাণদাহিকা উষ্ণতা আমার নিষ্পাপ প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তখন আমি এই প্রদেশের গৌহাটিতে এই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র স্নিগ্ধ শান্তিদায়িনী স্নেহময়ী প্রকৃতি জননীর সুকোমল ক্রোড়ে আর একবার বাস করিতে আসিয়াছিলাম। সে অনেক দিনের কথা কিন্তু প্রভাতের সুখ স্বপ্নের মত, সে কথা এখনও আমার বেশ মনে পড়ে।

আসামের মধ্যে গৌহাটি প্রাকৃতিক শোভায় শোভাময় একটি সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ নগর। ইহার উত্তরে বিশাল ব্রহ্মপুত্রনদ অপরিসীম অম্বুরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্ত প্রেমে সমুদ্রের প্রতি অবিশ্রান্ত ভাবে প্রবাহিত। চতুর্দ্দিকেই সুন্দর সুন্দর পর্ব্বত শিখরের পর পর্ব্বত শিখর। যতদূর চক্ষু যায় মেঘবৎ পর্ব্বতমালা বই আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। গৌহাটি এই পর্ব্বতমালার অভ্যন্তরে অবস্থিত। দেখিলে বোধ হয় যেন প্রকৃতিদেবী এই স্থানটিকে এইরূপ স্বাভাবিক উচ্চ প্রাচীর দিয়া দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন। এই গৌহাটি হইতে বশিষ্ঠাশ্রম প্রায় ৯ ১০ মাইল দূরে অবস্থিত।

এই বশিষ্ঠাশ্রম প্রকৃতিদেবীর একটি শ্যামল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বিভাষিত চির শান্তিময় নিভৃত ক্রীড়া-কুঞ্জ। যখন আমি উহা দেখিয়াছি তখন আমার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সম্যক পরিপুষ্টি হয় নাই! তখন কোকিলের কণ্ঠে, কুসুমের সৌরভে, বৃক্ষপত্রের শর্ শর্ শব্দে, কল্লোলিনী নির্ঝরিণীর কল কল নাদে, এখনকার ন্যায় কি এক প্রকার অব্যক্ত মধুর তান শুনিতে পাইতাম না। তখন অর্দ্ধস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে চন্দ্রতারকা বিভাষিত উর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে নিদাঘ-সন্ধ্যার সুদূর প্রসারিত শস্যশ্যামল প্রান্তর, আর পার্শ্বে মেঘবৎ অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা

আমার হৃদয়ে এখনকার ন্যায় কি এক নূতন ভাব মুদ্রিত করিত না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনকার অকলুষিত তরুণ হৃদয়ে যে একটি মাধুর্য্যময়ী মোহিনী ছবি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তাহা মুছিয়া যাইবার নহে। হৃদয়ে যে একটি মধুর স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে তাহা বোধ হয় মরিলেও যাইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বশিষ্ঠাশ্রম গোহাটি হইতে ৯।১০ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে তথায় যাইতে হইলে হয় পদব্রজে না হয় গো-শকটারোহণে যাইতে হইত। একদিন দাদা আসিয়া বলিলেন "বলি, চল না কাল রবিবার বশিষ্ঠাশ্রম যাওয়া যাক্। আর কালকে দিনটাও ভাল মাঘী-পূর্ণিমা"—আমি বলিলাম "বেশত চলনা—আমরা দু'জনে যাব না আর কেহ যাবে?" তিনি বলিলেন "জীবন বাবুদের বলনা তাঁহারা যদি যান।" আমি জীবন বাবুদের বলিলাম, তাঁহারা যাইতে স্বীকৃত হইলেন; দাদা একখানি গরুরগাড়ী ভাড়া করিয়া আসিলেন। পরদিন আমরা সকলে প্রায় বেলা ৮টার সময় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া বাহির হইলাম। আমাদের গাড়ী ক্রমেই সহরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। এখন আমরা দুই পার্শ্বে অনুচ্চ পর্ব্বত তাহার মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। গো-শকট আরোহণ করিলে আমার মাথা ঘুরিত, গা বমি বমি করিত এত পথ অতি কষ্টে আসিলাম কিন্তু আর না পারায় গাড়ি হইতে নামিয়া পদব্রজে যাইবার স্থির করিলাম। এত পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিব না বলিয়া অনেকে আমায় নিষেধ করিতে লাগিলেন কিন্তু আমি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই অম্লানোজ্জল রবিকর প্রদীপ্ত মেঘ কুহেলিকা শূন্য মন্দানিল বীজিত প্রাতঃকালীন প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলাম; দেখিতে লাগিলাম উভয় পার্শ্বেই অনতি উচ্চ ধূসরবর্ণ পর্ব্বত শ্রেণী

তার মধ্যে সমতল উপত্যকা—উপত্যকা শ্যামল তৃণ শোভিত। কোথাও কোথাও পর্ব্বতের গায়ে পাহাড়ীদের দু'চারখানা পর্ণকুটীর; তাহার চারিদিকেই কদলীবৃক্ষ দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া আমরা একটি নদী পার হইলাম। আবার তাহাকে শীঘ্রই হারাইলাম। সে আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার পর আমরা দুইটি রাস্তার সঙ্গমস্থলে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটী রাস্তা সিলঙের দিকে আর একটি বশিষ্ঠাশ্রমের দিকে গিয়াছে। আমাদের গাড়ী অবশ্য এই রাস্তা দিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া আবার আমরা সেই নদীটীর সাক্ষাৎ পাইলাম। কোথা হইতে সে আঁকিয়া বাঁকিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে পুনরায় যোগ দিল। এবারে কিন্তু তাহাকে শীঘ্র হারাইলাম না। তাহার পর দূর হইতে কোলাহল ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। শব্দকে লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, দেখিয়া বোধ হইল দূরে একস্থানে কতকগুলা লোক গোল পাকাইয়া কোলাহল করিতেছে। নিকটে যাইয়া জানিতে পারিলাম সেটি একটি বাজার। সে দিন রবিবার, তথায় একটি হাট বসিয়াছে আমরা গাড়ী থামাইয়া বাজারের ভিতর গেলাম। দেখিলাম বাজারটিতে একখানি ছোট চালা ভিন্ন দোকান বসিবার আর চালা নাই। দুই একখানি ছাড়া অপর সমস্ত দোকানগুলি খোলা জায়গায় বসিয়াছে। তথা হইতে আমরা জহাচাউল*

---

* "জহা চাউল" এক প্রকার চাউল—আসামে এক রকম ধান্য জন্মে তাহা হইতে এই চাউল উৎপন্ন হয়। ভিজাইয়া দধি বা দুগ্ধ ও গুড়ের সাহায্যে চিঁড়ার পরিবর্ত্তে আসামীরা [illegible] করে। খাইতে মন্দ নহে।

"বিচাফল†" ক্রয় করিলাম। আমাদের মধ্যে একজন "গুয়া" ‡ প্রিয় ছিলেন। তিনি ঐ গুয়া চর্ব্বণের লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিলেন না; দু'পয়সা ক্রয় করিয়া লইলেন। এই প্রকারে আমাদের কেনা বেচা হইয়া গেলে পুনরায় আমরা চলিতে লাগিলাম। প্রায় বেলা ১১টার সময় আমাদের গাড়ি বশিষ্ঠাশ্রম যে পর্ব্বতে অবস্থিত ঠিক্ তাহার পাদদেশে আসিয়া পৌছিল। আমি তথা হইতে একটি ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইতে লাগিল একি একটা প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত। সে প্রকার শব্দ আমি পূর্ব্বে আর শুনি নাই।

সেই পর্ব্বতের ২০।২১ ফিট উচ্চে একটু খানি সমতল ভূমি; তাহার উপর এই আশ্রমটি অবস্থিত; আমি তাড়াতাড়ি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাহাড়ে উঠিয়া যেখান হইতে ঐ শব্দ আসিতেছিল তথায় উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা অতীব সুন্দর। ঐরূপ দৃশ্য আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আর ঐরূপ দৃশ্য জীবনে কখনও দেখিব কিনা সন্দেহ। যে মহান্ দৃশ্য আমার নয়ন সমক্ষে পতিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তাহা বর্ণনা করিতে হইলে যে বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন যে উপকরণে আবশ্যক আমার তাহা কিছুই নাই। সে হৃদয় মুগ্ধকারী দৃশ্যে সে সুকোমল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে, সে মধুর মোহিনী বিকাশে যে কবিত্ব বিদ্যমান তাহা জগতে অতুল। তাহা কোনও গ্রন্থে পাওয়া

---

† বিচা ফল,—এক প্রকার বীজে পূর্ণ কদলী খুব মিষ্ট আসামীরা ও হিন্দুস্থানীরা অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে।

‡ গুয়া;—অর্থাৎ আমাদের সুপারি। ইহা এক অতি আশ্চর্য্য পদার্থ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এক প্রকার। অপক্ক সুপারি মৃত্তিকার ভিতর পুঁতিয়া রাখা হয়। যখন আবশ্যক মত পচিয়া যায়, তখন তুলিয়া খোলা সমেত বিক্রয় হয়; আসামীদের ইহা অতি উপাদেয় সামগ্রী। খাইলে মুখে অবিকল বিষ্ঠার ন্যায় দুর্গন্ধ বাহির হয়।

যায় না ; সুকবির কল্পনাতে তাহা আসে না ; সুগায়কের সংগীতেও তাহা দুষ্প্রাপ্য। তাহা কেবল প্রকৃতির রমণীয় রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আর উহা বর্ণনার বিষয়ও নহে। একক থাকা আর নিজেকে সেই সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবাইয়া রাখা ভিন্ন উহা উপভোগ করা যায় না। উহা দেখিবার—দেখাইবার নহে, বুঝিবার, বুঝাইবার নহে। শুধু চাও আর নিজেকে বিস্মৃত হও ইহা ভিন্ন ভাবিবার আর কিছুই নাই। সেই উদার নির্ঝরিণীর মর্ম্মস্পর্শী চির কলতান, সেই বিহঙ্গম কুলের কমনীয় কণ্ঠের সুন্দর সংমিলন, সেই মাধুর্য্যময়া প্রকৃতির এক স্নিগ্ধ মাধুরী ভরা করুণতার সঞ্চার, সেই অম্লানোজ্জ্বল রবিকর পরিপ্লাবিত প্রস্ফুট যৌবন স্বপ্নে মগ্ন বনফুল, সেই বন্যশোভায় শোভাময়ী শ্যামল পল্লবদল সজ্জিত উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী, আর সেই স্থানের পবিত্রতা ও নির্জ্জনতা সম্মুখ হইতে বিশ্বসংসারকে অপসারিত করিয়া দেয়। তখন মনে হয় আমি এক সৌন্দর্য্য সাগরে ভাসমান আর সম্মুখে বিশ্বরূপিণী প্রকৃতি দেবী, আর আমার চরণপ্রান্ত হইতে সংসার সরিয়া গিয়াছে। প্রাণ তখন কোমলতা প্রাপ্ত হইয়া আপনা আপনিই তাঁহার চরণ যুগলে অবনত হইয়া যায়।

এই স্থানটির নামই বশিষ্ঠাশ্রম। ইহা আজ কাল হিন্দুদিগের তীর্থ স্থান হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের গায়ে এক খণ্ড সমতল ভূমি তাহার এক পার্শ্ব দিয়া একটি নির্ঝরিণী অবিশ্রাম গতিতে ঝর ঝর নাদে প্রবাহিত। অবিশ্রান্ত বারিপাতে সমস্ত মৃত্তিকা বিধৌত হইয়া যাওয়ায় প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এবং জল নানা ধারে প্রবাহিত হওয়ায় প্রস্তরের উপরিভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অনেক নিম্ন-রেখা হইয়া গিয়াছে। এবং সেই জন্য অনেক প্রস্তর-দ্বীপের সৃজন হইয়াছে। এইরূপ একটি উপলদ্বীপের উপর মহর্ষি বশিষ্ঠ তপস্যা

করিতেন। বাস্তবিক তপস্থার পক্ষে ইহা অতি উপযুক্ত স্থান। স্থানটির মাহাত্ম্যে হৃদয়ে আপনা আপনিই ভক্তির উদ্রেক হয়। সেই উপল খণ্ডের পার্শ্বে একটি অনতিপরিসর গহ্বর। তাহাতে সমস্ত জল আসিয়া পড়িতেছে। আবার তথা হইতে উচ্ছলিত হইয়া নিম্নে পতিত হইতেছে। এই বারি পতনেই ঐ ভয়ানক শব্দের কারণ। মাঘ মাস স্নানের প্রশস্ত সময় সুতরাং ঐ সময় তথায় যাত্রীদিগের সমাগম হইয়া থাকে। আমরা মাঘীপূর্ণিমার দিন গিয়াছিলাম, যাত্রীর সংখ্যা কিছু বেশী বলিয়া বোধ হইল, সেই গহ্বরে স্নান করিয়া তথায় রন্ধন করিয়া আহার করিয়া আসাই ঐ তীর্থের প্রধান কার্য। আমি তথায় স্নান করিলাম। সেই প্রস্তরের উপর একজন পাণ্ডা বসিয়াছিলেন, আমাকে কি একটা মন্ত্র পাঠ করাইলেন। হস্তে একটি ফুল দিলেন আমিও তাঁহাকে দক্ষিণা স্বরূপ কিছু দিলাম। এই সমস্ত ব্যাপার প্রায় এক মিনিটের মধ্যে হইয়া গেল। কারণ একে জনতা বেশী তাহাতে আবার শীত কাল; জল বরফের ন্যায় শীতল এক মিনিটের অধিক থাকিলে হাত পা অবশ হইয়া যায়। এ ছাড়া তথায় আরও দু'একটি প্রস্তরখোদিত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাহা মন্দিরের অভ্যন্তরে বাহিরে সমতল ভূমি অপেক্ষা অনেক নীচে। মন্দিরের ভিতর বড়ই অন্ধকার দিবা রাত্র ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা থাকে। একে একে সবগুলি দর্শন করিলাম। তাহার পর শুষ্ক বসন পরিধান করিয়া কিছু জলযোগ করিলাম। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা আসিয়াছিলেন; তাঁহারা স্নানাদি সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। আমি ইত্যবসরে সেই নির্ঝরিণীর একটি প্রস্তর দ্বীপের উপর উপবেশন করতঃ সেই কল্লোলিনী নির্ঝরিণীর কলনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এবং সেই প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে লাগিলাম। বাস্তবিক উহা একবার দেখিলে

পরিতৃপ্তি হয় না। বাল্যসুলভ চপলতা প্রযুক্ত সেই পর্ব্বত তরঙ্গিণীর বারিধারা লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম। রন্ধনাদি শেষ হইলে আহারাদি করিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া ঐ স্থানটির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে পশ্চিমধ্যে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র রজত কিরণে জগত প্লাবিত করিয়া গগনমার্গে উদিত হইলেন। আমিও হৃদয়ে একটি মধুর স্মৃতি লইয়া জ্যোৎস্না-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

আজ প্রায় অনেক দিন হইল আমি ঐ আশ্রমটি দেখিয়াছি কিন্তু এক দিনের জন্য উহা ভুলিতে পারি নাই। এখন মাঝে মাঝে এই নাগরিক জীবনের কোলাহল পূর্ণতার মধ্যে নিমজ্জমান থাকিয়া এক একবার বাসনা হয় যে সেই নির্ঝরের চির কলতান বিহগকুলের সুন্দর রাগিণী মন্দপবনবিকম্পিত বৃক্ষপত্রের শর্ শর্ শব্দে আর প্রকৃতির সেই মুখভরা হাসিতে সংসারের শোক তাপ বিস্মৃত হই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ফুলের সাজি।

রমণী হৃদয়।

(১)

চল চল ললনার বদন নলিনী,
সোহাগ মাধুরী মাখা কমনীয় কায়,
নয়ন ভুলান রূপ ছটায় দামিনী।
(কিন্তু) পাষাণ অনলময় রমণী হৃদয়;—
"চির অপবাদ হায় জানিবে কি যাতনা।
উপহাস পাত্র শুধু পাষাণের বেদনা॥

(২)

কি বলিব, যবে নব অনুরাগে
উথলি' আকুলি' প্রাণ
হৃদয়ে না পাই স্থান
উজান মাধুরী সব ভাসাত ভুবন,
তখন ছিল কি হৃদি পাষাণ গঠন ?

(৩)

প্রকৃতি হাসিত, আমোদে ভাষিত
সদা পাখী সব করিত কূজন,
নারীনর সবে ছিলরে স্বজন,
বাসনাসৌরভ ময় ছিল প্রাণ মন :
তখন ছিল কি হৃদি পাষাণ গঠন !

(৪)

নদী কাল বশে
জলধির কোলে ধায়,
জলে জল মিশে যায়,
শান্তি মাখা বিলয়ের সুখ সম্মিলন ;
তখন ছিল কি হৃদি পাষাণ গঠন !

(৫)

যে দিকে চেয়েছি আদর পেয়েছি,
শিখেছি যতন তায় ,
এখনও প্রাণ চায়
করিতে যতন, হায়কার ! ঝরে দুনয়ন !
পোড়া হৃদি এ কেমন পাষাণ গঠন !

(৬)

হাসিতে জেনেছি, কাঁদিতে শিখেছি,
বড় দুখে আজ হৃদি বিদারেছি।
মমতা যাতনা শুধুই পেয়েছি !
হের বহে অশ্রুধারা মমতা যাতনাময় !
বলনা ললনা আর পাষাণ হৃদয়।

শ্রীমতী অ—মিত্র।

অফুটে প্রস্ফুটে।

হেমন্ত উষায়, মধুর ভূষায়,
একটী নবীন কলিকা।
লতার মাঝারে মুখানি ঢাকিয়া,
হাসিয়া উঠিল বালিকা।

দেখে নাই চেয়ে, আকাশের পানে,
আকুলি ওঠেনি ভ্রমরের গানে,
অমুগ্ধ হৃদয় মৃদুল পবনে,
জানেনা রূপের মাধুরী।

দেখে নাই ধরা, প্রেমে মাতোয়ারা,
কারে দিতে চেয়ে কারে দেয় ধরা,
প্রকৃতির কোলে সবে নিজহারা
হৃদয়ে খেলে কি লহরী।

কার তরে চাঁদ গগনেতে ওঠে ?
অফুট কলিকা কা'র তরে ফোটে ?
কুসুম সৌরভ কা'র তরে ছোটে
মিশিয়া মলয় পবনে ?

কেন বিহঙ্গম কলকণ্ঠে গায়
উলসে তটিনী কার পানে ধায়,
বিজলী চমকে জলদের গায়
কোন্ সুখ-আশা স্মরণে ?

ধরণীর তত্ত্ব না লয়ে রূপসী,
হাসিয়া উঠিল প্রাণহরা হাসি,
নামাইয়া আঁখি, বিমল সরসী—
মুকুরে বয়ান হেরিল।

"আহা! মরি, মরি, কি রূপের শোভা,
মুদিত জীবন তবু মনোলোভা,
একটু ফুটিলে আরও হবে কিবা,"
ধীরে ধীরে ধীরে কহিল।

বলিল লতার ঘোমটা তুলিয়া,
স্ফুট গোলাপেরে, সোহাগে ঢলিয়া
মৃদুল সমীরে ঈষৎ দুলিয়া
রুচি মুখ নত করিয়ে।

শুধিল "গোলাপ বনবিমোহিনী,
কি অমিয় মাখা ওই মুখখানি
প্রতি দলে দলে মধুর নিস্বনি
কি গীত গাইছে মলয়ে?

"কালো কালো ওই কালো আঁখিতারা
গুন্ গুন্ রবে হ'য়ে মাতোয়ারা
তোমারে চুমিছে কেগো সখি ওরা
কি দিয়ে কি ল'য়ে চলেছে?

"কাঁপাইয়া বুক করিয়া ঝঙ্কার,
কেন আসে যায় পরসি আবার,
কোন্ দেশে বাস কি নাম ইহার
কেন তোমা সনে মিলিছে?

"আমি আছি সখি একপাশে ব'সে
হেরি তোমাদের মরি হেসে হেসে,
সংম তেয়াগি কি সুখের আশে
দিয়াছ হৃদয় খুলিয়া?

রূপের গৌরব দেখাইতে ধনি।
ফুটিয়াছ ভাল বন-প্রমোদিনী!
দরশিতে দাও পরশে স্বজনী
কি কায সরম টুটিয়া?"

"আপনার রূপ দেখাতে অপরে,
মাখাইতে সুধা প্রণয়ী অধরে,
অধীর যতনে বিশ্ব চরাচরে
এই ব্রত আশা করিছে।

আমিও রূপসী। তোমার মতন,
পাতায় ঢাকিয়া সলাজ আনন,
দেখিতাম লুকি প্রেম আচরণ,
গোপনে কে কা'রে চুমিছে।

ভাবিতাম মনে অফুট রহিব,
এ জীবন মন কা'রে না সঁপিব,
লুকাইয়া আছি লুকায়ে ঝরিব
চাহি নাই কভু ফুটিতে।

এ আশা হৃদয়ে পোষিনি কখন,
করিয়া অপরে প্রেম আবাহন,
তুষিব সাদরে দিয়ে আলিঙ্গন
গভীর হৃদয় কূপেতে।

কে বোধিতে পারে প্রকৃতির গতি,
জীবনে যৌবন হইল অতিথি,
কহিল, "হৃদয় খোললো সুমতি,
একবার যা'র দাঁড়া'য়ে।"

মলয় আসিয়া দুই করে ধরি,
পাতার ঘোমটা সরাইল ধীরি,
লাজে নত আঁখি সরসে শিহরি
তাহার পরশ লভিয়ে।
জাননা'ত বালা কি মোহ তাহাতে,
চেতন পরাণ অচেত' করিতে,
মুকুলিত হৃদি ফুটায়ে তুলিতে
কি অজানা সুধা পরাণ
কাঁপিতে কাঁপিতে মেলিয়া নয়ন,
আধ ঘুম ঘোরে আধেক স্বপন,
খুলে দিনু রূপ বিশ্ব বিমোহন
পাইতে তাহারে পরশে।
গন্ধবহ ধীরে সুগন্ধ বাহিয়ে,
সারা কাননেতে উঠিল গাহিয়ে,
"ফুটেছে যে ফুল নয়ন মুদিয়ে
মিটেছে সরম বাসনা।"
শুনিয়া উঠিয়া এল অলিকুল,
মধুর গৌরবে হইয়া আকুল,
লয়ে যায় সুধা বিঁধি হৃদিমূল
দিয়ে প্রাণে সুখ-যাতনা।
"আনন্দ যাতনা দুই আছে কলি!
যেখানেই প্রেম সেখানে শিকলি,
ধরার এ গতি এমনি সকলি
না ফুটিলে ফুটাইবে।
"সুখ আশা আগে না জাগিতে পাশে,
দুঃখের ছায়ায় হৃদি ঘিরে আসে,
মিটাইতে প্রেম আকুল পিয়াসে
জীবন চলিয়া যাবে।
"সুখে দুঃখে গাঁথা বিধাতার খেলা
তুমি কি তাহারে পালটিবে বালা
ঘুচাইতে এই জীবনের জ্বালা
জীবন করিবে দান?
"অফুট জীবন মরণের কোলে,
না চাহিতে যদি দিতে পার ঢেলে,
মনের বাসনা তবে যদি মেলে
তবে যদি রহে মান।"
কহিয়া গোলাপ নীরবিলা ধীরে
ভ'রে এল আঁখি নীহারাশ্রুনীরে,
চাহিয়া চাহিয়া প্রেম প্রীতি ভরে
নব কলিকার পানে।
একথা শুনিয়া হাসিল মুকুল
গরবের ভরে হইয়া আকুল
প্রতিধ্বনি কহে "ভুল ভুল, ভুল,
সকলি ভুল জীবনে।

শ্রীসরসীবালা।

আত্মসমর্পণ।

ওই বুঝি বাজিলরে সন্ধ্যার আরতি
জাহ্নবীর তীরে,
এল বুঝি মা' আমার শান্তির মূরতি
সন্ধ্যা দেবী ধীরে।
পদরক্ত শতদলে হেরি আজি তা'র
মূর্ত্তিমান স্নেহ—
যেন মৌন বিশ্বহারা ভক্ত সাধনার
হৃদি-শূন্য গেহ।

শ্রান্তিহীন' সুনিপুণ দুটি হস্ত হেরি
কল্যাণ-আধার,
মঙ্গল বাসনা বাজি প্রতি অঙ্গ ঘেরি'
প্রীতি-অলঙ্কার।
যেমন বল্লরী-বালা পুষ্পভারানতা
ধীরে পড়ে ঢলে',
এমনি এ বসুন্ধরা নোয়াইছে মাথা
ও চরণতলে।
দিবসের স্বার্থ বহ্নি, সন্তাপ-অশনি
নির্ব্বাপিত দেবি
এ মহা নির্জ্জন রাজ্যে এসগো জননি'
পদযুগ সেবি।
জর্জ্জর, কাতর আমি, জীবন ভরিয়া
যন্ত্রণা অসহ
তোমার কোমল কোলে লহগো তুলিয়া
লহ মোরে লহ।

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

সব যাবে।

মধুর ফুলের বাস মধুর চন্দ্রমা হাস
নির্ম্মল নীলাকাশ তরঙ্গিণী জল,
মধুর' তরুণ উষা, তারা ঝল্ মল্,
অপ্সরীর মধুবিনা রূপসীর রূপ
নধর নিকুঞ্জ লতা কিরীটিন ভূপ
ওই বাস উড়ে যাবে, চন্দ্রমাও অস্ত যাবে
আকাশে নীরদে ছাবে, তরঙ্গিণী শুষ্ক হবে
উষা কেঁদে চলে যাবে নক্ষত্রও ডুব দিবে
বীণা হবে সুর হীনা ওইরূপ জলে যাবে
নিকুঞ্জও শুখাইবে নৃপেন্দ্রর প্রাণ যাবে
কালে লীন হ'বে সবে একই পরিণাম
ধন মান যশ আশা বৃথা আকিঞ্চন।

শ্রীভূপেন্দ্র কৃষ্ণ মল্লিক।

হতাশের আক্ষেপ।

আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে
কাঁদাইতে অভাগারে কেন আসে বারে বারে
আবার জঠরে কেন আসি দেখা দেয় রে
গরিব ক্ষুধার চোটে মারা বুঝি যায় রে।

কাল যে ফলার ছিল লেগেছিল বড় ভাল
উদর প্রসন্ন ছিল দিনেকের তরে রে;
কিন্তু কি বলিব হায়! হজম হইয়া যায়
সব আশা চুর মার হয়ে গেল আজ রে
জ্বলিল সে দাবানল পুনরায় উদরে

লুচি-ত কালিয়া যোগ সুচারু মোহন ভোগ
মনে হলে কালিকার সে দারুণ ভোজ রে
হৃদয় ফাটিয়া যায় নয়নে সলিল ধায়
হায়বিধি' সেসুযোগকোথা পাই রোজরে।
গরিব ফলার বিনা মরে বুঝি আজ রে।

সন্দেশের হুড়াহুড়ি ক্ষীর দধি ছড়াছড়ি
কত যে বর্ণিব আমি একমুখে তাই রে
ইচ্ছা হয় পাখী হয়ে দ্রুতগতি উড়ে গিয়ে
এখনি চাপিয়া ধরি সেই কলাপাত রে।
হে ধরণী, দ্বিধা হও আর আমি নাই রে।

কোথা হে ডাক্তারকুল সবে হোলে প্রতিকূল
কত রোগে দিয়ে থাক কতই ঔষধ রে
রাতটী হইলে গত ক্ষুধা কেন লাগে এত
ইহার ঔষধ কিছু কেন নাহি দাও রে ?
মরি আমি তবু দয়া কেন নাহি হয় রে ?

কায নাই বৃথা ক্ষোভে মোহনফলার লোভে
নৈরাশ্য রাক্ষসী এবে হয়ে থাক্ দূর রে ;
চলে যাই রাজপথে আশাটী লইয়া সাথে
লুচির সন্ধানে যথা প্রাণ মম যায় রে
মেঘ দরশনে যথা চাতকিনী ধায় রে।

বিধি না হইলে বাম পূর্ণ হবে মনস্কাম
জুটে যাবে অচিরাৎ একটী ফলার রে ;
সবুরেতে মেওয়াফলে হেন কথা লোকে বলে
পাবনা কি সারাদিনে সে বাঞ্ছিত ধনে রে
কিন্তু সেটা কত দেরি ভাবিতে যে নারি রে ॥

কাঁদাইতে অভাগারে কেন আসে বারেবারে
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে,
কোথা তুমি হা ফলার ! দেখাদাও একবার
তোমাবিনা গরিবের প্রাণ হেথা যায় রে।

শ্রীশ্যামাচরণ চৌধুরী।

বিরহ।

অই যে সুখিনী হত সুখ কথা স্মরিয়ে,
ওই যে দুখিনী হ'ত দুখগাথা ভাবিয়ে,
ওই যে হরষ হ'ত পরমোদ দেখায়ে
ওই যে বিষাদ পেত পরমাদ গণিয়ে,
যা'র তরে সে আকুলা আকুলতা পাইয়ে
ওই যে মলিনা হত মলিনতা হেরিয়ে,
গোপনে রাখিত যেই মনোভা'ব লুকায়ে
আড়ালে যাইত যেই প্রেম খেলা খেলায়ে,
পীরিতি না পেয়ে ওই অভিমান ভাবিয়ে,
যে ওই গরবে র'ত গরবিণী হইয়ে,
সরসের সাজে যেই পারহার করিয়ে,
আসিত যে ধীরি ধীরি অধৈরয হইয়ে,
অধর তাম্বুল রাগে বিভূষিত করিয়ে,
সমীপে আসিত যেই চারু বেশ ধরিয়ে,
ওই যে কহিত কথা রূপরাশি ছড়া'য়ে,
মরণের ব্যথা ছাপি মুখ ভরা হাসিয়ে,
ওই যে সুখের তরে কত ফাঁদ পাতিয়ে
আহ্বানিত প্রিয় ধনে কত মত কহিয়ে
সাদর আলাপ তরে কত সাধ করিয়ে,
কহিত যে রস ভাষ প্রীতি গুণ গাহিয়ে,
ওই যে ধরিয়ে কর নিজ কর বাড়ায়ে
ভাঙ্গিত সে অভিমান গলে ভুজ বাঁধিয়ে,
বিষাদ কালিমা আজি কেন সেই হৃদয়ে,
বিচ্ছেদ বিপদ এক আছে সুখ প্রণয়।

শ্রীনীরদকান্ত মাইতি।

বিদায়।

প্রভাত শর্ব্বরী প্রিয়ে,—বিদায় এখন,
চেয়ে দেখ, উদিত তপন ,—
সরসে নলিনী চায়, বিপিনে বিহঙ্গ ধায়
কুমুদিনী বিরহে মগন,
হের, ওই লে ফুলে, মধুর গুঞ্জন তুলে
না : সুখে মত্ত অলিগণ ,—
প্রভাত .র্ব্বরী প্রিয়ে, বিদায় এখন।

২

বিদায় হৃদয়েশ্বরী,—আসিব আবার,—
শুনিলে সে কোকিল ঝঙ্কার ,
মধুরা প্রকৃতি যবে, হাসি মুখে চেয়ে রবে
বীণা রবে পূরিবে কান্তার—
নবীনা ব্রততী সনে, বিটপী প্রফুল্ল মনে
শোধিবে সে প্রণয়ের ধার,—
তখন হৃদয়েশ্বরি, আসিব আবার।

যখন হেরিব কুঞ্জে বিটপী নর্ত্তন,
ধীরি ধীরি মলয় পবন ;—
অপূর্ব্বমাধুরীমাখি,গোলাপীমেলিবেআঁখি
লভিতে সে অলির চুম্বন,—
বভসেঅবশহ'বে, মল্লিকা, মালতীসবে,
হেরি মুগ্ধ হইবে নয়ন,—
জানিও হৃদয়েশ্বরি, আসিব তখন।

৪

যাই তবে প্রাণময়ি, জাগিল অবনী,
সুখে থাক, অয়ি চন্দ্রাননি !
বিষাদেথেকোনাআর,ফেলিওনাঅশ্রুধার
মনে রেখো দিবস রজনী !
আবারআসিলেফিরে,অইকুঞ্জ নদীতীরে
উভয়েতে খেলিব তেমনি,
যাই তব প্রাণময়ি, জাগি অমনী !

শ্রীঅটলবিহারী দাস,
বারুই পাড়া।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

স্মৃতি শক্তির অভাব—আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেরই থাকিতে পারে। তাই বলিয়া তাঁহারা যেন জীবনে এক-বারে নিরাশ না হন। অনেক বড় বড় লোকের যে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক প.

হইবেন। বিবাহের দিন আমরা প্রায়ই ভুলি না। সার্জেও ছিল, এক কোন বিখ্যাত পুলিশ কর্ম্মচারী কোনও ঘটনার তদন্তে এতই অন্যমনস্ক হইয়া ছিলেন যে তাঁহার বিবাহের সময় অতীতপ্রায় একথা স্মরণ করাইয়া না দিলে বোধ হয় তাঁহার ভাবী পত্নীকে অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। সল্‌সবেরির বিশপ টমাসকেও বিবাহের দিন চাকর দ্বারা স্মরণ করাইয়া দিতে হইয়াছিল। এই ধার্ম্মিক প্রবর এতই আত্মবিস্মৃত যে একদিন কোন ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে পায়ে একটী মশক দংশন করিলে, তিনি হেঁট হইয়া সেই ভদ্রলোকটির পা চুল্‌কাইতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে দংশন জ্বালা লাঘব হইল কিনা বলিতে পারি না! সুবিখ্যাত লেখক লাফাণ্ড (La Fontains) তাঁহার একখানি পুস্তক (Fables) রাজাকে উপহার দিতে যান। কিন্তু রাজ সন্নিধানে এতৎসম্বন্ধে একটি বিশাল বক্তৃতা করিয়া দেখেন যে বইখানি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। একজন বিখ্যাত প্রোফেশর তাঁহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বন্ধু সম্প্রতি রোগ মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার জন্য এক থোলো আঙ্গুর হাতে করিয়া লইয়া গেলেন। ক্রমে বন্ধুর সহিত কথায় কথায় অন্যমনস্ক ভাবে এক একটী আঙ্গুর ছিঁড়িতে লাগিলেন এবং ক্রমে সমস্তই নিজে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। বিদায় কালে বন্ধুকে বলিয়া আসিলেন "দেখিও সব আঙ্গুর গুলি নিজে খাইও ইহাতে বল প্রদান করিবে।" আর একটী বড়লোক মাঝে মাঝে সামান্য ভুল করিতেন। একদা তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট একটী বিশেষ রহস্যপূর্ণ সংবাদ অবগত হন। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে সেই বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া তাঁহারই সংবাদটী তাঁহাকে সাগ্রহে বলিতে আরম্ভ করিলেন। পরে, বন্ধু

ঐ কোথায় শুনি ... র প্রাণের

কথা স্মরণ হওয়ায় বিশেষ লজ্জিত হইলেন। এবং অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইবার সময় হাত মুছিতে মুছিতে টেবিলের ন্যাপ্‌কিন্ খানি রুমালের পরিবর্ত্তে বুকপকেটে পুরিয়া চলিয়া গেলেন।

***

আমাদের দেশে একজনের স্মরণ শক্তি কিছু কম ছিল; কিন্তু যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকায় এক প্রকারে উদ্ধার হইয়াছিল। একদিন তাহাকে ধুলে গ্রামের মধু সিংহের বাড়ী জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতে বলা হয়। পাছে সব কথা গুলি মনে না থাকে এই জন্য গুটীকত সহজ কথা ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিল। পথে একজন মুসলমানকে নমাজ পাঠে রত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মেযে মদ্দ উটু পড় ভাই, ধুলোগ্রামে গুড় ব্যাঘ্রের বাড়ি কোথা যাই?'

***

সহজ প্রশ্ন। ৪৫ সংখ্যাকে চারভাগে এমন করিয়া বিভক্ত কর যে প্রথম ভাগে ২ যোগ করিলে, দ্বিতীয় ভাগ হইতে ২ বাদ দিলে, তৃতীয়ভাগকে দ্বিগুণ করিলে চতুর্থ ভাগকে দুইভাগ করিলে প্রত্যেক বারের ফল সমান হইবে।

***

ইংরাজি পঞ্জিকা রহস্য। বুধবার শুক্রবার কিম্বা রবিবারে কোনও শতাব্দীর প্রথম দিন হইতে পারে না। ১লা জানুয়ারি যে বারে, অক্টোবরের প্রথম দিনও সেইবার হইবে। এরূপ এপ্রেল জুলাই, সেপ্‌টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিন এক। ফেব্রুয়ারি, মার্চ্চ ও নভেম্বর এই তিন মাস একই বারে আরম্ভ হয়। আবার যে বারে কোনও বৎসর আরম্ভ হয় সেই বারেই সেই বৎসরের শেষ হইবে। লিপ্ ইয়ারে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির পরমায়ু যে বর্ষে একদিন অধিক হয় তখন উপরোক্ত নিয়ম গুলি খাটে না। বর্ত্তমান বর্ষ যে লিপ্ ইয়ার নহে ইহা সকলের জানা উচিত।

হঠাৎ আগুণ লাগিলে নিকটস্থ কোনও মোটা বেপ্লথ বা শতরঞ্চ চাপা দিলে আগুণ নির্ব্বাণ হয়; বায়ুরোধই ইহার মূল রহস্য ইহা সকলের জানা উচিত। সম্প্রতি কোন মার্কিন সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে খানিকটা এমোনিয়া অগ্নির উপর নিক্ষেপ করিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সত্বর এবং সহজে আগুণ নির্ব্বাপিত হয়। ইহা অনেক স্থানে পরীক্ষিত হইয়াছে।

* * *

বাবুর বখ্‌শিস্‌। একটি বাবু কোন হোটেলে খাইয়া উঠিয়া আসিবেন এমন সময় খানসামা বখ্‌শিস্‌ চাহিল। বাবুর পকেটে তখন আর এক পয়সাও নাই অথচ অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহেন, বলিলেন "দেখ এই টেবিলের নীচে আমার একটা দোয়ানি পড়িয়া গিয়াছে, খুঁজিয়া দেখ যদি পাও আমাকে ফিরাইয়া দিও, আর যদি না পাও তুমিই না হয় উহা রাখিয়া দিও।" এই বলিয়া ঝটিতি প্রস্থান।

* * *

মাতালের পা। এক মাতাল বাবু রাত্রি দুই প্রহরের সময় গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন। গাড়ি অনেকক্ষণ থামিয়াছে অথচ বাবু নামিতেছেন না দেখিয়া গাড়োয়ান বলিল "বাবু নামুন না, এই ত আপনার বাড়ি, এই সিঁড়ি, এই ফটক, ঐ আপনার ঘরে আলো জ্বলছে।" বাবু জড়িতস্বরে বলিলেন "সবই ত বুঝলুম, আমার পা কোথায়? ব্যাটা এখনও ঢাকছিস্‌, শীগ্‌গির বল্‌ আমার পা কোথায়?"

* * *

উবলের কৈফিয়ৎ। পরামানিক। আজ্ঞে, কামাবার দরুণ একটা পয়সা দিলেন যে, আর একটা দিতে হবে।

ভদ্রলোক। কেন, বরাবরই ত একটা দিয়ে থাকি, তা ছাড়া আজ ঘা করিয়ে দিয়েছ, এখনও জ্বালা করছে।

খরামানিক। আজ্ঞে সেই জন্যেই ত আর একটা পয়সা চাইচি, ক্ষুরখানা আজকের ভোতা ছিল কিনা সেই জন্য আমার ডবল সময় লেগেছে।

***

দম নিষ্প্রয়োজন। একজন পল্লীগ্রামবাসী নিরীহ ভদ্রলোক বিখ্যাত ঘড়িওয়ালার দোকানে ঘড়ি কিনিতে গিযাছেন। ঘড়িওয়ালা একটি ঘড়ি দেখাইযা বলিল "এই ঘড়ি দম না দি এক টানা পনর দিন চলিবে"। ভদ্রলোক বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বলিল "যদি দম না দিযে পনের দিন চলে, দমদিলে কত দিন চলিবে ?

সমালোচনা।

শিলাদিত্য। শ্রীশরৎচন্দ্র দে প্রণীত। ইহা একখানি নাটক। লেখকের রচনা সুমিষ্ট, লিখিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু চরিত্র চিত্রণে এখনও সিদ্ধ হস্ত হইতে পারেন নাই। আর তিনি যে ছন্দে লিখিয়াছেন আমরা সে ছন্দের পক্ষপাতী নহি, উহা অমিত্রাক্ষর নহে, উহাকে পুস্তকের "কলেবর-বৃদ্ধি-ছন্দ" বলা যাইতে পারে, যেহেতু যাহা এক পংক্তিতে লেখা যায়, তাহা তিন চারি পংক্তিতে লেখা হয়, যথা—

ভগ্নি !—
জানি আমি,
অভাগীর তরে
দুঃখী তুমি সদা !

আঁখি জল। শ্রীমৌলবী আবদুল গণি প্রকাশিত, ও ইমাদুল হক, বি এ প্রণীত। ইহা একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক, কাগজ ও ছাপা

অতি সুন্দর। কবিতা গুলিও বেশ হইয়াছে। একজন মুসলমান যুবকের পক্ষে বাঙ্গালায় এরূপ কবিতা লেখা প্রশংসনীয়। আমরা এই নবীন মুসলমান লেখকের মঙ্গল কামনা করি, তাঁহার লিখিবার শক্তি আছে, চর্চ্চা থাকিলে কালে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

সবিতা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ইহাও একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। লেখক সূচনায় লিখিতেছেন, "প্রাচ্যের বৈদিক ঋষি এবং প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক উভয়ের চক্ষেই সবিতা জ্ঞানের আধার প্রাণের আধার। এত উৎসাহ, এত তেজ আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। মানবের এমন গুরু আর নাই তাই আমাদের প্রাণহীন জাতিকে অতীত ও বর্ত্তমান স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত আজি ঐ প্রাণময় অমিত তেজা বিশ্বজ্ঞানরূপী সবিতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস।" পুস্তিকাখানির উদ্দেশ্য মহৎ ও প্রশংসনীয়, লেখক নবীন হইলেও লিখিবার ক্ষমতা আছে।

বীণাপাণি। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। বৈশাখের বীণাপাণিতে লক্ষ্ণৌএর পত্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি, কারণ "প্রয়াসে" ও ঠিক ঐ প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে বীণাপাণির বা প্রয়াসের কোনও দোষ নাই, দোষ লেখকের। একই প্রবন্ধ দুই খানি পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করা অতীব নীতিবিরুদ্ধ। আমরা ঐ প্রবন্ধপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বে উহা অন্যত্রে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য লেখককে পত্র লিখিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি উহা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন উহা অন্যত্রে প্রকাশিত হয় নাই।

রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ।
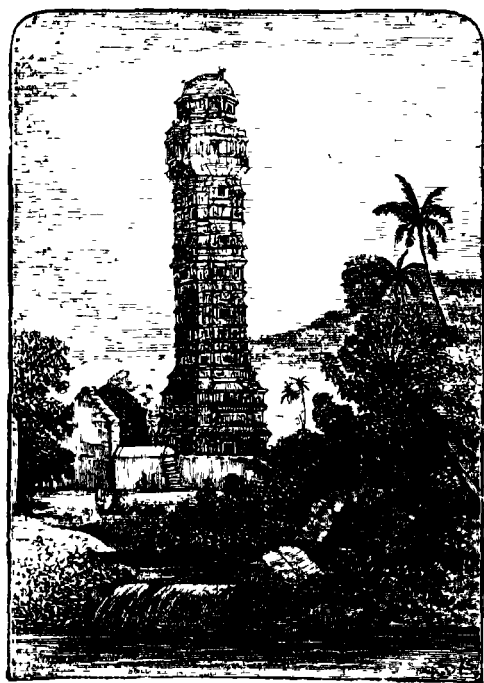
প্রবাস, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।   FLM PRESS, CALCUTTA
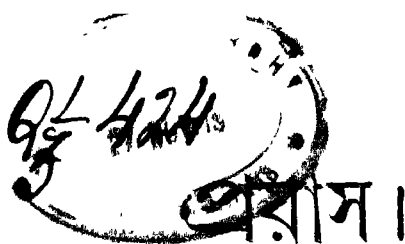
প্রবাসী।

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক।

তৃতীয় খণ্ড । আষাঢ় ১৩১০ সাল। [অষ্টম সংখ্যা।

"থাক্‌!—আর নাম ক'রো না তাহার!"

[Moore বিরচিত 'Oh! breathe not his name' সঙ্গীতের অনুবাদ।]

থাক্‌—আর নাম ক'রো না তাহার—
আঁধারে সে থাক ঘুমে—
যথা অবশেষ,—অমানে আঁধারে,
নিহিত যথায় ভূমে!—

নীরবে, নীরবে, আঁধারে আমরা,
এস, ফেলি অশ্রুজল
নৈশ শিশির সিঁচে যথা ধীরে
তা'র শিরে তৃণদল!—

যদিও নিশিতে, শিশিরেরা ফেলে,
নীরবে, অশ্রু ধার,—
শ্যাম শষ্প সাজে শোভিবে তাহায়,
বিরাম আলয় তার!

বিরলে তেমতি, যদিও মোদের,
ঝরে নয়নের বারি—
মনোভূমি'পরে রাখিবে তাহাতে
সুনবীন স্মৃতি তারি।

শ্রীস্থ—

বিহারিলাল।

নারীমাহাত্ম্য।

বিহারিলাল বাল্যকাল হইতেই নারীজাতির ভক্তিমান ছিলেন। তিনি যৌবনকালে "বন্ধু বিয়োগ" কাব্যে নারীজাতির প্রতি যে পবিত্র ও অকৃত্রিম স্নেহ মমতার পরিচয় দিয়াছেন, পতিতা রমণীগণের উদ্ধারের জন্য তিনি বিলাপকাতর সজল নয়নে সকরুণ বাক্যে সমাজের যে কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার উদার অন্তঃকরণের এবং সৎসাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি বলিয়াছিলেন, যে সমাজ, পুত্রের শত কলঙ্ক কালিমার দিকে চাহিয়াও দেখে না কিন্তু—

মেয়ে কিছু করিলেই সর্ব্বনাশ হয়।
একবারে করে দেয় গৃহের বাহির,
যেথা ইচ্ছা চোলে যাক হইয়ে ফকির
এত বড় দুনিয়ার অতটুকু মেয়ে,
অকূলে বেড়ায় ভেসে কূল চেয়ে চেয়ে।
নীড়ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় শাবক যেমন,
চারিদিকে শূন্যময় হেরে ত্রিভুবন।
কেহ নাই যে তাহারে ডাকিয়ে সুধায়,
ভাল পথ দেখাইয়ে বিপদে বাঁচায়।

* *

অনা সে দুরাত্মা পুত্র গৃহে স্থান পায়
পাপ স্পর্শ মাত্র কিন্তু কন্যা ভেসে যায়!

কত দিন আর হায় কতদিন আর
অবাধে চলিবে এই ঘোর অবিচার !

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিহারিলাল সমাজের নিকট, আর্ত্তস্বরে, অবলা-গণের প্রতি সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিতে পারে এরূপ দৃঢ়তর অস্থিমজ্জা, হীনবল বঙ্গ সমাজের কেন, সুসভ্যতম পাশ্চাত্য সমাজেরও, এখনও হয় নাই। কিন্তু সমাজ শুনুক আর নাই শুনুক, কবির ক্রন্দন অনিবার্য্য। সুসভ্য দেশের কবিগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই করুণ স্বরে কাঁদিতেছিলেন—

"Alas ! for the rarity
Of Christian Charity
Under the sun !
O ! it was pitiful !
Near a whole city full
Home she had none !" (Hood)

কিন্তু বঙ্গে এরূপ গান বিহারিলালের কণ্ঠেই বোধ হয় প্রথম শ্রুত হয়। * এই স্খলিতপদা কুকর্ণার পাত্রিগণকে পাপপঙ্কিল অন্ধকারময় গহ্বরের গভীরতম দেশে পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিহারিলাল যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সকলে একত্র হয়ে ছাতি পেতে থাক, যে পড়িছে তাহাকেই বুকদিয়ে রাখ।
পড়িয়ে গিয়েছে যারা, তাহাদের তরে, নরকে নামায়ে দাও সিঁড়ি থরে থরে।
উদার অন্তরে গিয়ে স্নেহে হাত ধরি, আস্তে আস্তে তুলে আন উপরি উপরি।
তা হইলে তোজোমান চরিতার্থ হবে, যথার্থ বীরের ন্যায় মন সুখে রবে।

হায় কবি, আপনার মত কোমলেকঠিন বিস্তৃত বুকের ছাতি সমাজে কয় জনের আছে! যথার্থ বীরের সংখ্যা সংসারে বড় বেশী নাই।

বিহারিলাল সুকুমার বয়স হইতেই স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী

* 'বন্ধু বিয়োগ" ১২৬৬ সালে রচিত।

ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সমাজে বিস্তার লাভ করিলে সুশিক্ষিতা গৃহলক্ষ্মী-দের সহযোগে বঙ্গের গৃহে গৃহে যে সুখ শান্তি ধারা প্রবাহিত হইবে সেই ভবিষ্যৎ সুখচিত্রের আলোকময় অংশ কল্পনা করিয়া কবি চতুর্দ্দশ শাস্ত্র বর্ষ বয়সের সময় আনন্দ-পরিপ্লুত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

সকলেরি মুখে হাসি খুসি মন প্রাণ।
মহানন্দে সারদার গাবে গুণ গান।
কোথাও ললিত বালা অচল নয়নে
নত মুখে শিল্প কর্ম্মে আছে একমনে।
কোথাও জননী লয়ে কুমারী কুমার,
শিখান সহজে কত কথা সার সার।
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে,
আছেন কবিতামৃত রস আস্বাদনে।
বিনোদিনী বিদ্যার হইলে অবস্থান
আহা সেই স্থান কিবা হয় শোভমান।

চিরজীবনই বিহারিলাল রমণীকুলের শিক্ষা সম্বন্ধে সুফলের আশায় উদ্দীপিত ছিলেন। তিনি বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান কার্য্যের সাহায্যার্থে স্বরচিত গ্রন্থ বিতরণ করিতেন, এবং সর্ব্বদাই স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি কল্পে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। স্ত্রীজাতির পুরুষ-দিগের সহিত লোক সমাজে সকল বিষয়েই তুল্যাসন প্রাপ্ত হওয়া উচিত, বিহারিলাল এক সময়ে এই অতিসভ্য মতের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং সেই অসর্ব্ববাদিসম্মত মতের প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার সম্পাদিত ১২৭৬ সালের "অবোধবন্ধু"তে একজন হিন্দু লেখিকার গ্রন্থের যে উৎসাহপ্রদ সমালোচনা করা হইয়াছিল তাহার উপ-সংহার ভাগ পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তি আশয়ে উদ্ধৃত করিলাম—

"বিশ্ব শোভা—গ্রন্থকার শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী।

*   *   *

ভাষ্য—

আমরা স্ত্রীলোককে "গ্রন্থকর্ত্রী" না বলিয়া "গ্রন্থকার" বলিয়াছি, তাহাতে পাছে পাঠকবর্গ ভাবেন যে, আমরা ব্যাকরণের স্ত্রীপ্রত্যয় পড়ি নাই, এ আশঙ্কায় এই ভাষ্য লিখিয়া দিতে হইল। আমাদের বক্তব্য এই যে, আজি কালি ইয়োরোপে ও আমেরিকাতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির সমকক্ষতা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে, আমরা সে সম্পর্কে সমকক্ষতার দলভুক্ত। আমাদের বিশ্বাস আছে যে সভ্যতার উন্নতি সহকারে স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে সর্ব্বাংশে একরূপ হইয়া উঠিবেক, কেবল সন্তানকে গর্ভে ধারণ এই বিষয়ে যাহা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকুক। আমরা মনে করি যে, অন্যান্য বৈলক্ষণ্য কৃত্রিম অস্থায়ী অনিত্য আগন্তুক এবং উভয়ের সুখের ব্যাঘাতক। সুতরাং গ্রন্থ রচনা বিষয়ে লিঙ্গভেদ করা অনভিপ্রেত বলিয়াই আমরা স্ত্রী প্রত্যয়ের শরণাপন্ন হই নাই।"

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে বিহারীলাল হিন্দু সমাজ ভুক্ত একজন যাজক ব্রাহ্মণের পুত্র, এবং যে সময়ে উপরোক্ত মত প্রকাশিত হয় তখন বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার ঊষাকাল। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন বিহারীলাল কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তিনি নারীজাতিকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, শেষ দশায় বিহারীলালের, স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে, মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সে বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের অবিকল অনুকরণের পক্ষে দেশ ও কাল অনুপযোগী এবং উহার ফল আশানুরূপ সুফলপ্রদ হইবে না, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন।

বিহারীলালের নারীপূজার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি "বঙ্গসুন্দরী"তে। ঐ পুস্তকে বিহারীলাল যে নারীবন্দনা করিয়াছেন তাহা লৌকিক বা কবিজনসুলভ বাচনিক নহে, উহা তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে

উঠিয়াছে। এই কঠোর পৃথিবীতে, যাহা কিছু কোমল, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই, বিহারিলাল নারীতে একধারে বিদ্যমান দেখিতেন; তিনি জানিতেন নারীই জগতের প্রাণ স্বরূপ, নারী—

প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর, করুণা নিঝর দয়ার নদী;
হ'ত মরুময় সব চরাচর, না থাকিতে তুমি জগতে যদি।

বঙ্গীয় ললনাগণের জন্যই তিনি এই সুজলা সুফলা মাতৃভূমিকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন—

হেন ধরাধাম থাকিতে সমুখে সুরলোকে লোকে কেনরে ধায়।
নরে কি অমরে আছে মন সুখে, যদি কেহ মোরে সুধাতে চায়!
অবশ্য বলিব নারীর মতন, সুখ শান্তিময়ী অমৃত লতা
নাই যেই স্থানে, নহে সে এমন, শচী পারিজাত কপোল কথা।
এ মর্ত্ত্য ভুবন কমল কাননে নারী সরস্বতী বিরাজ করে,
করে সমাদরে, সদানন্দ মনে পূজিতে তাহারে শিখিবে নরে!

অন্যান্য মতামতের ন্যায়, বিহারিলালের নারীভক্তি ইহজীবনের সাথী ছিল, কালের পরিবর্ত্তনে তাঁহার সেই প্রেমভক্তিময় মহান্ প্রবাহে জোয়ার ভাঁটা হইত না, তিনি শেষ জীবনেও অচলা ভক্তি ও প্রেমের সুরে গাহিতেন—

(আছে) বিশ্বজয়ী শান্তিময়ী নারী এধরায়,
তাই নরে নিধি পায়,
আমার সেই স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ ধারি কেবল প্রেমের ধার।

কেহ কেহ বলেন যে বিহারিলাল কোমত মতাবলম্বী প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) ছিলেন সেইজন্য তিনি নারী পূজা করিতেন। আমরা এই প্রসঙ্গ স্থানান্তরে পুনরুত্থাপন করিব। কিন্তু কারণ যাহাই হউক বিহারিলাল নারীপূজার যে পবিত্র উদার ও উচ্চতম আদর্শ দেখাইয়া

গিয়াছেন তাহার তুলনা, শুধু বাঙ্গালার কেন, অন্য কোন দেশের কাব্য সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। এসম্বন্ধে একজন সুবিজ্ঞ লেখকের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

রমণীকে অনেকেই, অনেকেই কেন সকলেই সচরাচর দেবী বলে, কিন্তু দেবী বলিয়া অর্চনা, আরাধনা, প্রকৃত প্রস্তাবে দেবীবৎ ব্যবহার তাঁহাকে কয়জন লোকে করিয়া থাকে ; এ পাপ পৃথিবীতে একাল পর্য্যন্ত ছোটবড় কয়জন লোকে করিয়াছে ? আমরদেশীয় আর্য্য শাস্ত্রে নারী পূজার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু, পূজকের পবিত্রতা এবং আন্তরিকতার অভাবে তাহার আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইয়া, সে ব্যবস্থা ক্রমে কৃত্রিম, প্রাণশূন্য এবং শুষ্ক লোকাচারে, কিম্বা জঘন্য বিকৃত ব্যাভিচারে পরিণত হইয়াছিল,—পরিণত হইয়াই আছে। পরন্তু পাশ্চাত্য পৃথিবীতে পুরাকালের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে নারী সমাজ বা সমষ্টিত নারী জাতির প্রতি আধ্যাত্মিক অনুরাগের অভিমত আমরা দেখিতে পাই, কেবল প্লেতোতে। পাশ্চাত্য ভূমে প্লেত রমণী পূজার প্রবর্ত্তক। পরবর্ত্তী কালে মহাত্মা আগস্ত কোমৎ এ পূজার আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠাতা। মহামনস্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিলেও আমরা এই অনুরক্তির আভাস পাই। ইহারা সকলেই দার্শনিক। কিন্তু কবিকুলে এই মহামন্ত্রের উপাসক লোক কই ? মহাজন বৈষ্ণব কবিগণ ? হাঁ একথা অসত্য নহে। বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায় এবং শাক্ত কবিদিগেরও কেহ কেহ বটে রমণীমাহাত্ম্য অনেক বর্ণনা করিয়াছেন। রমণীর সর্ব্বাঙ্গীন শক্তিও তাঁহারা অনুভব না করিয়াছিলেন, এমন নহে। কিন্তু, তাহা সুরলোকের আদর্শ বা অবতাররূপিণী দেবী মাহাত্ম্যের বিবৃতি মাত্র, কচিৎ আন্তরিক অনুভূতিই বটে। এই সকল কবিদিগের কেহ নরলোকের নারীজাতির সমষ্টিতে জগদ্ধাত্রী ও জগৎ পালয়িত্রী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সম্যক রূপে মোহিত হইয়াছিলেন এবং তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করিয়া কবিতা উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন, এমত বলা যায় না। পক্ষান্তরে কালিদাস হইতে একালের কালাচাঁদ পর্য্যন্ত সকলেই কেবল রমণীর রূপ বর্ণনা ও রমণীকে লইয়া ক্ষষ্টিনষ্টি মাত্র করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ভাবে রমণী মাহাত্ম্য প্রায় কেহই সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন নাই। পাশ্চাত্য কবিদিগের মধ্যেও প্রায় এই ভাব। রমণী সমাজের মাহাত্ম্যানুভব কল্পে শেলির সুনাম আছে বটে, কিন্তু

সুনামের সহিত দুর্নামও জড়িত। অতএব, কিঞ্চিৎ আত্ম গর্ব্ব প্রকাশিত হইলেও আমরা সত্যের খাতিরে বলিতে পারি যে, আমাদের এই অধঃপাতিত বাঙ্গালী জাতির আধুনিক কালের বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন দুইটী কবি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাদের অকৃত্রিম কাব্যোচ্ছ্বাস রমণী মাহাত্ম্য মূলক এবং সে উচ্ছ্বাস করুণ ও অকৃত্রিম, মর্ম্ম-স্পর্শী এবং সার্ব্বভৌমিক, সুতরাং পৃথিবীর কোনও কবির গীতি উচ্ছ্বাস অপেক্ষা হীন নহে। এই দুই কবির একজন "মহিলা" নামক ক্ষুদ্রকাব্য গ্রন্থের চির স্মরণীয় কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—অপর "বঙ্গ সুন্দরী" ও "সারদা মঙ্গল" প্রণেতা—বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী।"*

এই স্থানে আর একটী সত্য আমরা নিজের ভাষায় না বলিয়া অপর একজন লেখকের মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

"৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের যে 'মহিলা' বঙ্গসাহিত্যে এখন আদর পাইতেছে সেই 'মহিলা' 'বঙ্গ সুন্দরী' প্রচারিত হইবার পরে † রচিত হয়। ৺ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তৎকালে এডুকেশন গেজেটে 'বঙ্গসুন্দরীর' সমালোচনা করেন। 'বঙ্গসুন্দরী' সমালোচনায় ভূদেব বাবু যে ইঙ্গিত করেন সেই ইঙ্গিতে সুরেন্দ্রনাথের মহিলার জন্ম।" ‡

কবি সুরেন্দ্রনাথ যে যে আকৃতিতে "মাতা" "জায়া" ও "ভগ্নী"কে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন সেই সেই আকৃতির রেখাপাত, বিহারিলাল তাঁহার "বন্ধুবিয়োগ", "প্রেমপ্রবাহিণী" কাব্যে এবং উজ্জ্বলভাবে তাঁহার "বঙ্গসুন্দরী"র নারীবন্দনা ও প্রিয়তমা প্রভৃতি সর্গে করিয়া গিয়াছিলেন। এবং এই সকল রচনা পাঠ করিয়া কবি সুরেন্দ্রনাথ যে

---

* শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, নব্যভারতে (শ্রাবণ, ১৩০১)

† শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ ১৩০১ ১০ম সাং।।

‡ "বঙ্গসুন্দরী" ১২৭৪ সালে প্রকাশিত হয়, "মহিলা" ১২৭৮ সালে রচিত হয়।

কিয়ৎ পরিমাণে নারীপূজাত্মক কবিত্বে উদ্দীপিত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উভয় কবির মধ্যে পরিচয় ও সম্প্রীতি ছিল।

বিহারিলালের নারীপূজায় উদ্দীপনা স্বতঃসিদ্ধ; তিনি নারীপূজক কবিদিগের প্রথম বলিয়া বরণীয় এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্মরণীয়।

রচনা প্রণালীতে।

বিহারিলালের রচনা প্রধানতঃ রজনীযোগেই লিপিবদ্ধ হইত। অধিকাংশ সময় এই কার্য্য তাঁহার নিজ শয়ন কক্ষেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু কখনও কখনও তিনি উন্মুক্ত ছাদোপরি সমস্ত নিশাই যাপন করিতেন, এবং সুধাংশুর শুভ্র জ্যোৎস্না অথবা অমানিশার তমোগাম্ভীর্য্য তাঁহার অন্তর্জ্জগতে প্রবিষ্ট হইয়া গীতোচ্ছ্বাস ছলে পুনরায় নৈশ সমীরণে মিলিত হইত। তিনি সাধারণতঃ শয়নাবস্থায় রচনা লিপিবদ্ধ করিতেন, এবং পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার প্রায় সকল কবিতাই গানে আরম্ভ গানে বৃদ্ধি এবং গানেই পরিসমাপ্ত হইত। তিনি কয়েকটী পংক্তি বা দুই একটী শ্লোক রচনা করিয়া মৃদুস্বরে গান করিতেন এবং গান করিতে করিতে সুরলয়ে সংযোজিত বাক্যে সেই গান পুষ্টিলাভ করিয়া কবিতার আকার ধারণ করিত।

বিহারিলালের ধ্যানের গভীরতা এতই ছিল যে সময়ের গতি ও কায়িক শ্রান্তি বা অবসাদ, তাঁহার সেই একাগ্রতা সহজে ভঙ্গ করিতে পারিত না। তিনি তাম্রকুট সেবন করিতে অতিরিক্ত ভাল-বাসিতেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যানের নেশার সময় ঐ নেশাটীর কথাও ভুলিয়া যাইতেন! এমন ঘটনা ঘটিয়াছে, যে তিনি সন্ধ্যা রাত্রে তামাকু সজ্জিত করিয়া তাঁহার প্রিয় হুঁকাটী ছাদের আলিসায় রক্ষিত করিয়া-ছেন, এবং কবিতা লিখিবার মনস্থ করিয়া বসিয়াছেন; ইচ্ছা,—তাম্র-

কুট ধরিয়া উঠুক ইতিমধ্যে তিনি একবার কল্পনা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লয়েন, পরে তামাকু সেবন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিবেন; সাক্ষাৎকার পরিসমাপ্ত হইল, তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া হুঁকাটী লইয়া তাহাতে টান দিলেন,—ধূম নির্গত হইল না, কলিকায় উত্তাপের সংস্পর্শ মাত্র নাই। কবি চাহিয়া দেখেন উষা দেবী ধীরচরণে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কনকাধরে হাসিতেছেন, পাখীরা প্রভাতে গাহিতেছে। তখন দুইটী করিয়া তোপ পড়িত, একটী সন্ধ্যাবাত্রে, আর একটী প্রত্যূষে। প্রথম তোপটীর সময় কবির ধ্যান আরম্ভ হয়, শেষ তোপটীর সময় সেই ধ্যান ভঙ্গ হয়। এইরূপ সাধনার পর বিহারিলালের রচনা আরম্ভ হইত।

বিহারিলাল যখন লিখিতে বসিতেন তখন তাঁহার বিরাম থাকিত না, আহার নিদ্রার কথা মনে পড়িত না। যতক্ষণ না তাঁহার কল্পনা ভারাক্রান্ত মনের শান্তি লাভে হইত ততক্ষণ তাঁহারা শ্রান্তি বোধ করিবার অবসর ঘটিত না, কিন্তু সেই শান্তি লাভ হইলেই বিহারিলাল আবার ধ্যানমগ্ন, নিশ্চেষ্ট, হয়ত বহুদিন লেখনী স্পর্শই করিতেন না। পরন্তু লেখনী হস্তে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ লিখিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করা বিহারিলালের স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।

ভাষা ও সঙ্গীতের উপর তাঁহার কত দৃষ্টি ছিল, তাহা যিনি বিহারিলালের কান্তকোমল পদাবলী অভিনিবেশের সহিত পাঠ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু মনের অনিবার্য্য উচ্ছ্বাসের উপযোগী ভাষা সকল সময়ে আসে না,—কবিকল্পনার সীমা নাই কিন্তু মানবের ভাষা সঙ্কীর্ণ। সুতরাং বিহারিলাল একবার লিখিয়াই, তাঁহার ভাষায় সন্তুষ্ট হইতেন না। যতক্ষণ না তাঁহারা ভাষা ভাবের সম্পূর্ণ উপযোগী হইত, যতক্ষণ না ভাষা মোলায়েম হইয়া মধুর সঙ্গীতে তাঁহার সুশি-

ক্ষিত কর্ণ পরিতৃপ্ত করিত, ততক্ষণ বিহারিলালের বাক্য-যোজনার পরিবর্ত্তন ক্ষান্ত হইত না। কবি হয়ত অন্যমনে বসিয়া বা শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার কি মনে হইল, তিনি উঠিয়া দুই একটী পংক্তি লিখিয়া রাখিলেন; অথবা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিকটে থাকিলে তাঁহাকে বলিলেন "অবিনাশ চট্‌করে এই লাইনটা লিখিয়া রাখ," এইরূপ অসংলগ্ন পংক্তি যেখানে সেখানে লেখা থাকিত, কবি অবসর মত সে গুলিকে কবিতায় সন্নিবেশিত করিতেন। আমরা কবির হস্তলিখিত নিম্ন লিখিত পংক্তি দুইটী একখানি চিঠির খামের উপর দেখিতে পাই—

"প্রাণের ঘুমের ঘোরে
ভোরে বাঁশী বাজে"

"সারদা মঙ্গল" কাব্যের একটী বাক্য পরিবর্ত্তনের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস আছে। ঐ কাব্যের অন্তর্নিবিষ্ট—

"ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী"

এই পংক্তিটী প্রথমে নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হয়—

"ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিনোদিনী"

পরে আণ্ডামান দ্বীপে নিহত গবর্ণর জেনারেল লর্ডমেয়োর মৃতদেহ কলিকাতার রাজপ্রাসাদে আনীত হইলে যে সামরিক শোকবাদ্য-ধ্বনিত হইয়াছিল, বিহারিলাল উহা শ্রবণ করিয়া আসিয়া "বিনোদিনী"র পরিবর্ত্তে "বিষাদিনী" কথাটী সন্নিবেশিত করেন। যিনি উক্ত ঘটনা স্থলে, অথবা সার্ জন্ লরেন্সের সামরিক অন্ত্যেষ্টিযাত্রা কালে উপস্থিত থাকিয়া অগণ্য বংশীর হৃদয় বিদারক ক্রন্দন-ফুৎকার শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি এই বাক্য-পরিবর্ত্তনের সার্থকতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবেন।

এই ভাষা-পরিবর্ত্তন বা রচনা-সংশোধন কার্য্যও বিহারিলাল সময়ের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা বিচার না করিয়া সম্পন্ন করিতেন না। সেই জন্য কেহ তাঁহাকে তাঁহার কোনও একটী কবিতা মুদ্রাঙ্কণের জন্য সংশোধন করিয়া দিতে বলিলে তিনি কখনও কখনও বলিতেন "এখন সে নেশায় নাই"। বিহারিলাল বলিতেন মনের যে অবস্থায় কোন একটী কবিতা রচিত হয় তাহা সংশোধন করিতে হইলে, মনের ঠিক্ সেইরূপ "প্রমত্ত নেশার নয়ন" প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এই বিশ্বাসে বিহারিলাল, যতদিনে উক্ত মনকে অনুকূল ভাবাপন্ন না দেখিলে কোন কবিতা সংশোধন করিতেন না, এবং সংশোধন ব্যতিরেকে কোন কবিতা প্রকাশ করাও তাঁহারা মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। বিহারিলালের প্রচুর কবিতার পাণ্ডুলিপি মধ্য হইতে, একবার তাঁহার একজন স্নেহ পাত্র, একটী মাত্র কবিতা কোন মাসিক পত্রে প্রকাশের জন্য তাঁহার নিকট হইতে যাচ্ঞা করেন কিন্তু কবিতাটীর সংশোধন হয় নাই বলিয়া কবি পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও সেই ভদ্রলোকের প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। কবি তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন—"তুমি আমার প্রিয়, কিন্তু কবিতা আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। তাহাদের উপর অন্যায় ব্যবহার আমি জীবন থাকিতে করিতে দিব না। আমি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তুমি এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যাহা ভাল বিবেচনা কর করিও।" *

বিহারিলাল সংশোধনের সময় তাঁহার রচনার কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতেন, তাহা যিনি আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত "সারদামঙ্গল"এর সহিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত সারদামঙ্গল খানি মিলাইয়া দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। দেখিবেন উভয় পুস্তকের ভাষা স্থলে স্থলে

* চিকিৎসাতত্ত্ব-জ্ঞান ও সমীরণ, ১৩০১, চৈত্র।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এবং দ্বিতীয় সংস্করণের সময় বিহারিলাল যে পংক্তি গুলি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইগুলির সমষ্টিতে, একখানি অনতি-বৃহৎ উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য রচিত হইতে পারে।

বিহারিলাল তাহার "সাধের আসন" কাব্য ও অপরাপর অনেক অপ্রকাশিত কবিতার পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়, ব্যাধি ও মৃত্যু বিহারিলালকে সে গুলির সংশোধনের আর অবকাশ দেয় নাই। সম্প্রতি কবির পুত্রগণ সেই সাধারণের দ্রব্য সাধারণকে অর্পণ করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্যদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু কবি লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে যদি এই কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, তিনি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট তাহা বলিতে পারি না।

বিহারিলাল যেমন তেমন করিয়া কবিতা লিখিতেন না, যেমন তেমন করিয়া কবিতা প্রকাশ করিতেন না, এবং যেমন তেমন করিয়া কবিতা মুদ্রাঙ্কনেরও তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। মুদ্রাঙ্কনের ভ্রম প্রমাদের উপর তাঁহার এরূপ তীব্র ও অপ্রিয় দৃষ্টি ছিল, যে কয়েকটী সামান্য মুদ্রাঙ্কন প্রমাদের জন্য তিনি তাঁহার "সঙ্গীত শতক" পুস্তকের প্রথম মুদ্রিত খণ্ডগুলি নষ্ট করিয়া উহাকে পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। বিহারিলাল 'ভ্রম সংশোধন' পৃষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন না। "বঙ্গসুন্দরী" প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত করিবার সময় কবি একদিন বন্ধু-গণের সহিত তরণীযোগে রাজনন্দন ডিউক অব্ এডিনবরাকে দর্শন করিবার অভিলাষে প্রিন্সেপস্ ঘাটের দিকে যাইতে ছিলেন। পথি-মধ্যে তিনি বঙ্গসুন্দরীর এক খণ্ড প্রুফে দেখিলেন যে এক স্থলে "ভূত" স্থানে "ভত" মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি সবে মাত্র উক্ত প্রুফ্ কর্ম্মকারে ছাপাইবার অনুমতি দিয়া আসিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্ত্তনের

পূর্ব্বে উহা মুদ্রিত হইয়া যাইবে। কবি বুঝিলেন যে ঐ "উ"কার ভ্রমের কথাটী হৃদয়ে থাকিতে তাঁহার আমোদ উপভোগের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। বিহারিলালের রাজনন্দন-সন্দর্শন বাসনা স্থগিত রহিল। তিনি অর্দ্ধ পথে নৌকা তটস্থ করিয়া ফিরিলেন এবং ভ্রম সংশোধন করাইয়া কয়েক ঘণ্টা পরে বন্ধুগণের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। কবির জীবিত কালে মুদ্রিত "সারদামঙ্গল"এ যত্ন বা সতর্কতার অভাব-সূচক ভ্রম আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। কয়েকটী কথায় বর্ণ যোজনা অপ্রচলিত বা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা কবির ইচ্ছাকৃত, যথা "মাঝ" স্থলে "মাজ" ইত্যাদি। "বঙ্গসুন্দরী"র দ্বিতীয় সংস্করণে একটীমাত্র মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া কবি নিরতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছিলেন।

শেষ জীবনে।

প্রৌঢ় বয়সে বিহারিলালের পাদমূলে মধ্যে মধ্যে এক প্রকার স্ফোটক হইয়া তাঁহাকে কয়েকবার কিছুদিনের জন্য শয্যাশায়ী রাখিয়াছিল, এবং অস্ত্রচিকিৎসায়, ও একবার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ঐ বেদনাযুক্ত পীড়া হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ইহা ব্যতীত অনুমান ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর নিরোগ ছিল। কিন্তু এই সময়ে কাল বহুমূত্র ব্যাধি তাঁহার দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার বলক্ষয় করিতে লাগিল এবং তাঁহার অদম্য তেজ ও কার্য্যক্ষমতা হ্রাস করিয়া আনিল। তাঁহার "সাধের আসন," "মায়াদেবী" "শরৎকাল," "বাউল বিংশতি" প্রভৃতি শেষ রচনা গুলির অধিকাংশই এই অসুস্থতার সময়ই রচিত এবং জীবনাবসানের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার পীড়া প্রবলতর আকার ধারণ করিয়াছিল, তখনও

শযন কক্ষের নিভৃতে বসিয়া তাঁহার কণ্ঠ মৃদুস্বরে ধ্বনিত হইত, তখনও অবসাদগ্রস্ত অন্তরে, দুর্ব্বল হস্তে তিনি মধ্যে মধ্যে লেখনী ধারণ করিতেন। আমরা ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার এই শেষ রচনা গুলি গান, সে গুলিকে তিনি রাগরাগিণী সহযোগে গুণ গুণ স্বরে গান করিতেন। ঐ সময়ে ব্যাধিপীড়িত দেহ ও মনের শক্তির হ্রাস হেতু তিনি কোনরূপ বিস্তৃত আয়তনে রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিফল মনোরথ হইতেন, ও সকরুণস্বরে সাশ্রুনয়নে গাহিতেন—

ফুল ফুটে না আর সাধের বাগানে
মুকুলে মরিয়া যায় ব্যথা দিয়ে প্রাণে,
তবু যেন চারি পাশে,
সদাই সৌরভ ভাসে,
সুদূর সঙ্গীত ধ্বনি, কেন গো কে জানে।

মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী এই কয় বৎসর, মনের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির অভাব-হেতু এবং দেহের অবসন্নতা প্রযুক্ত বিহারিলাল, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বাটীর বাহির হইতেন না। কিন্তু শেষ দশায় তাঁহার এভাবটীরও বৈলক্ষণ্য ঘটে, তিনি বাটীতে আসিলে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় অস্থির হইতেন এবং থাকিয়া থাকিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে বাটী হইতে বাহিরে যাইতেন ও পল্লীর মধ্যে যেখানে হয় এক জায়গায় বসিয়া থাকিতেন। এই অবস্থায় তাঁহার নয়ন পথে বারদ্বয় একটী অনৈসর্গিক দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছিল। এক দিন তিনি নিজ বাটীর সন্নিকটস্থ রাজপথে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সম্মুখস্থ জনতা-স্রোত, সৌধমালা সমস্তই বিলীন হইয়া গেল, তিনি দেখিলেন কেবলই আলোক—সে আলোকের তীব্র জ্যোতিতে নয়ন ঝল-সিয়া যায়, এবং সেই বিদ্যুদ্দাম-বিচ্ছুরিত দিগ্মণ্ডল-পরিব্যাপ্ত আলো-

কের মধ্যে, তিনি যে মূর্ত্তির আজীবন সাধনা করিয়া ছিলেন, সেই কবিকল্পনার সৌন্দর্য্যসার সারদামূর্ত্তি। আর একবার নিজবাটীর ছাদোপরি বসিয়া বিহারিলাল, এই দৃশ্য অবলোকন করেন। বিহারিলালের ন্যায় একাগ্রচিত্ত, একনিষ্ঠ সাধকের জীবনব্যাপী ধ্যানাবাসনপ্রাক্কালে এরূপ মস্তিষ্ক-বিকার (hallucination) হওয়া বিচিত্র নহে; যাঁহারা অতিপ্রকৃতে বিশ্বাস করেন তাঁহারা এই ঘটনায় অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

বিহারিলালের সংসারস্নেহ বন্ধন ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি ছয়টী পুত্র ও ছয়টী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন, এবং পাঁচটী কন্যাকে বিবাহিতা ও তন্মধ্যে দুইটীকে সন্তানবতী দেখিয়া গিয়াছিলেন। কবির মৃত্যুকালে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাটী ১০ম বর্ষীয়া কুমারী, এবং প্রথম পৌত্রটীর বয়সও তখন দশমবর্ষ হইবে। পুত্রগণের কোনটীকেই তিনি উদ্বাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অপর পুত্রেরা তখন পাঠদশায় অবস্থিত, সর্ব্ব কনিষ্ঠটী তিন বৎসরের শিশু মাত্র।

বিহারিলাল একটী বিলুপ্তপ্রায় বংশকে, পরিবারবহুল রাখিয়া গিয়াছেন। এবং সংসারের প্রবল শোকও তাঁহাকে পাইতে হয় নাই। তাঁহার দুইটী সন্তান অতি শৈশবে বিনষ্ট হইয়া যায় সুতরাং তাহা শোকের মধ্যে পরিগণ্য হইবার নহে। পিতা ও পিতামহীর মৃত্যু তাঁহার প্রৌঢ় বয়সে ঘটে এবং মাতৃ বিয়োগ সময়ে তিনি অজ্ঞান শিশু। তাঁহার প্রথমাপত্নী বিয়োগ জনিত নয়ন জল ঝরিতে না ঝরিতে, দ্বিতীয়া পত্নীর প্রবলতর প্রেম দৃষ্টিতে তাহা বিশুষ্ক হইয়া যায়।

পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করা তাঁহার জীবনের প্রবল আকাঙ্খা গুলির মধ্যে একটী প্রধানতম ছিল। সে সাধও তাঁহার পূর্ণ হইয়াছিল অথবা

অদূর ভবিষ্যতে তাহা নিঃসন্দেহ পূর্ণ হইবে এ আশা তাঁহাকে শেষ-জীবনে, সংসারের শত অভাব ও কন্যাগণের বিবাহদায় জনিত অর্থ-চিন্তার মধ্যে, শান্তি দিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মৃত্যুর বৎসরেক পূর্ব্বে তাঁহার মধ্যম পুত্রকে এম, এ, পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে দেখেন, এবং তৃতীয় পুত্র বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন এবং চতুর্থ পুত্র প্রবেশিকার পরীক্ষায় উচ্চবৃত্তি পাইয়াছেন এ সংবাদও তিনি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু শেষোক্ত দুইটী সুসংবাদ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ; সে সময়ে তাঁহার অবস্থা হর্ষবিষাদাদি মনোভাব প্রকাশের অতীত—তখন তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত প্রায়—তিনি অন্তিম শয্যায় শয়ান।　　ক্রমশঃ

রাজসিংহ অনুশীলন।

রাজসিংহ একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু "ঐতিহাসিক উপন্যাস" আখ্যাটি "misnomer" বা ভ্রান্তি মূলক বলিয়া বোধ হয়। কেন না, ঐতিহাসিক সত্য বজায় রাখিতে গেলে উপন্যাস হয় না, chronicle বা ইতিবৃত্ত হয়। ইহাকে যদি উপন্যাস বলিতে হয়, তবে সার ওয়াল্টার স্কটের Tales of a Grandfather কিম্বা টডের "রাজস্থান"ই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু নীরস ঐতিহাসিক সত্যকে কল্পনা সাহায্যে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিতে পারিলে তবে তাহাকে উপন্যাস বলা যায়। ঐরূপ করিতে হইলে শুধু কঠোর সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না, নূতন নূতন চরিত্র ও ঘটনাবলীর সৃষ্টি করিতে হইবে। ইতিহাস, শীতোপগমে পত্র পুষ্প-শাখা-বিবর্জ্জিত শুষ্ক তরুর ন্যায়; উপন্যাস, বসন্তসমাগমে নব-পল্লব ফলফুল-শোভা

বিশিষ্ট সরস ও সজীব পাদপের ন্যায়। দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ ; ইতিহাস তরুশাখার সহিত উপন্যাস বৃক্ষশাখার কলম বাঁধিলে তাহাতে একটি নূতন সুন্দর তরু সৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই ; কল্পনা ও সত্য সংমিশ্রণে এক প্রকার নূতন সুমিষ্ট ফল ফলিবে, কিন্তু সেই ফলের নাম "ঐতিহাসিক উপন্যাস" না দিয়া "অলৌকিক উপন্যাস" দিলেই ভাল হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস যে misnomer তাহা বঙ্কিম বাবু স্বয়ং বুঝিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই ৪র্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন "উপন্যাস লেখক সর্ব্বত্র কাব্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে সকল স্থানে উপন্যাস ইতিহাসের আসন গ্রহণ করিতে পারে না। * * * * উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।" আর এক স্থলে বলিতেছেন "আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই তাহা বলা বাহুল্য।" বঙ্কিম বাবু বিনয় বশতঃ এরূপ বলেন নাই, বাস্তবিকই তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কোনও লেখকই পারেন না। কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক বঙ্কিমবাবুর অপরাপর উপন্যাস গুলি অপেক্ষা রাজসিংহ অনেক নিকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। ইতিহাস উল্লিখিত দুই একটি ব্যক্তির বিবরণ বা ঘটনা বিবৃত থাকিলেও আমরা তাহাকে ঐতিহাসিক আখ্যা প্রদানে অনিচ্ছুক। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে যে কারণে ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে না, রাজসিংহও সেই কারণে

উক্তপদ বাচ্য হইতে পারে না। অতএব সাধারণত আমরা উপন্যাসকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার পক্ষপাতী, ১ম Realistic বা প্রাকৃতিক, ২য় Romantic বা অলৌকিক। স্বাভাবিক বা সম্ভবপর ঘটনাবলীর সমাবেশ অর্থাৎ যথার্থ উক্তিই প্রথম শ্রেণীর লক্ষণ। অনৈসর্গিক বা অতিরঞ্জিত ঘটনাবলীর সমাবেশ অর্থাৎ অত্যুক্তিই দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণ। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল Realistic বা প্রাকৃতিক শ্রেণীর অন্তর্গত, বঙ্কিম বাবুর অবশিষ্ট সমুদায় উপন্যাস গুলি Romantic বা অলৌকিকশ্রেণীভুক্ত। অতএব আমরা রাজসিংহ অনুশীলনে অতিরঞ্জিত বা অলৌকিক বর্ণনার আলোচনা করিব না, কারণ উহাই এই শ্রেণীর উপন্যাসের লক্ষণ।

বিষবৃক্ষের প্রথমেই গ্রন্থকার জ্ঞান বশতঃ বা অজ্ঞান বশতঃ আখ্যায়িকার পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন। নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা ও প্রবল ঝটিকা, ভবিষ্যতে প্রবল রিপুরূপ ঝটিকা দ্বারা রূপতরঙ্গে নগেন্দ্রের মনতরি উদ্বেলিত হইবার সূচনা মাত্র। কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রথমে হরলালকে পুস্তকের নায়ক বলিয়া ভ্রম হইলেও কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝিতে পারা যায় হরলাল ইংরাজি নাটকের prologue স্বরূপ। রোহিণীর সহিত প্রথম সাক্ষাতে তাহার যেরূপ পরিচয় পাই, তাহাতে আখ্যায়িকার একপ্রকার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। চন্দ্রশেখরেও প্রথম হইতে ঐরূপ পূর্ব্বাভাস একপ্রকার প্রদত্ত হইয়াছে, দেখাইয়াছি। রাজসিংহেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। চঞ্চল কুমারীর দ্বারা ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলনে, প্রথম হইতেই আখ্যায়িকার পূর্ব্বাভাস ও নায়িকার-ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট একপ্রকার অবগত হওয়া যায়। কিন্তু রাজসিংহে এক চিরন্তন প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নাটক নভেলে নবীনায় নবীনেই প্রেম দৃষ্ট হয়, প্রবীণের প্রতি নবীনার অনুরাগ স্বল্পই দেখা যায়। কিন্তু

রাজসিংহে প্রবীণের প্রতি নবীনার অনুরাগের দুইটি দৃষ্টান্ত পাই, প্রথম রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর ; দ্বিতীয়, মাণিকলালের প্রতি নির্ম্মলকুমারীর। চঞ্চল কুমারী রাজসিংহের চিত্রদর্শনেই চিত্ত হারাইয়া ছিল। কিন্তু চিত্ত হারাইবার বিশেষ কারণ ছিল না, কেননা রাজসিংহের বয়স হইয়াছিল, তাঁ'র দুই উপযুক্ত পুত্র ছিল, এবং নির্ম্মল কুমারীর ও স্বয়ং রাজসিংহের মুখে শুনিতে পাই রাণা এমন যে খুব সুপুরুষ ছিলেন তাও নয়। তবে তাঁহার ছবি দেখিয়া সর্ব্বশোভাময়ী ধবল-প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমাতুল্য চঞ্চল কুমারীর মুগ্ধ হইবার কারণ কি? রোহিণী গোবিন্দলালের অনুপম সৌন্দর্য্যে মজিয়াছিল, কুন্দ-নন্দিনাও নগেন্দ্রের রূপে ভুলিয়াছিল, যাবতীয় নায়িকাই রূপ ও যৌবন দেখিয়াই মুগ্ধ হয়, কথাতেই আছে "কন্যা কাময়তে রূপম্"! কিন্তু চঞ্চলকুমারীর প্রেম যৌবন-সুলভ সাধারণ রূপজমোহ নহে, উহা বীরের প্রতি বীর নারীর আন্তরিক অনুরাগ। নির্ম্মল যখন চঞ্চলকে বলিল "তা মানুষটার (অর্থাৎ রাজসিংহের) বয়সও হয়েছে, এমন যে সুপুরুষ তাও নয়, তবে দেখিতেছিলে কি?" উত্তরে চঞ্চলকুমারী বলিয়াছিল—

গৌরী সম্‌ঝে ভসম ভার,
পিয়ারী সম্‌ঝে কালা।
শচী সম্‌ঝে সহস্র লোচন,
বীর সম্‌ঝে বীরবালা॥
গঙ্গা গর্জ্জন শম্ভুজটৈপর,
ধরণী বৈঠত বাসুকী ফন্‌মে।
পবন হোয়ত অগুণ সখা,
বীর ভজত যুবতী মনমে॥

রাজসিংহ যখন স্বয়ং চঞ্চলকুমারীকে বলিলেন "আমি যুবা নহি।"

চঞ্চল উত্তর করিল—"যাহার বাহুতে বল আছে, রাজপুত কন্যার কাছে সেই যুবা। দুর্ব্বল যুবাকে রাজপুত কন্যাগণ বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য করেন।

রাজসিংহ। আমি সুরূপ নহি।

চঞ্চল। কীর্ত্তিই রাজাদিগের রূপ।

অষ্টাদশ বর্ষীয়া রমণীর পক্ষে ছবি দেখিয়া হঠাৎ এরূপ প্রণয় সঞ্চার হইতে পারে কি না তাহার উত্তরে গ্রন্থকার স্বয়ং বলিতেছেন—"পারে, যদি তুমি ছবি ছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখ, তার পর ছবিখানাকে বা স্বপ্নটাকে সেই মন গড়া জিনিষের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর।" ইহা হইতে আভাস পাওয়া যায় ছবি দেখিবার পূর্ব্বে হইতে চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। ডেস্‌ডিমোনাও ওথেলোর বীরত্ব কাহিনী শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাঁ'র প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিল। বীরের প্রতি রমণী হৃদয়ের কেমন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। রমণী না কি অবলা, আত্মরক্ষায় অসমর্থা, তাই, যে অনাথা অবলার রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ তাঁ'র প্রতি স্বতঃই তাহার বিশ্বাস ও অনুরাগ হয়, বিশেষতঃ বীরাঙ্গনাদিগের।

চঞ্চলকুমারী নামটির খুব সার্থকতা আছে, তিনি বড়ই চঞ্চলা ও বালিকাস্বভাবা, গাম্ভীর্য্য আদৌ নাই। তাঁহার বালিকা-সুলভ ঔদ্ধত্য ও অবিমৃষ্যকারিতা কখনও যায় নাই। তাই তিনি নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনিলেন, ঔরঙ্গজেব বাদসাহের প্রতিমূর্ত্তি চরণে দলিত করিলেন! এ আমোদ নিতান্ত রুচি বিরুদ্ধ। বলিতে কি চঞ্চল

কুমারীর এই আচরণে তাঁহার প্রতি তাদৃশ সহানুভূতি থাকে না। নিরপরাধ ব্যক্তির বিপদে যাদৃশ সহানুভূতির উদ্রেক হয়, অপরাধী ব্যক্তির জন্য তাহা হওয়া কখনই সম্ভব নহে। ঐতিহাসিক ঔরঙ্গজেব যতই মন্দ লোক হউক না কেন, এই আখ্যায়িকায় তাহার শয়তান চরিত্রের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং নির্ম্মল কুমারীর প্রতি সদয় ব্যবহারে তাহার গুণের পরিচয় পাই ও তাহাকে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। এই কারণে তাহার বিপদের সময় তাহার প্রতি সহানুভূতি হয়। চঞ্চলকুমারীর বিপদ স্বেচ্ছাহূত, তাহাতে ঔরঙ্গজেবের কোনও দোষ নাই, দোষ তাহার নিজের। প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লির সম্রাট্ সামান্যা রমণীর দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলে, সে অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁহার সহ্য না হওয়াই স্বাভাবিক এবং উহার প্রতিকার না করিলে তাঁহার প্রবল প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে কেমন করিয়া? অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করায় ঔরঙ্গজেবের কোনও দোষ দেখি না, তবে অনেকে বলিতে পারেন প্রকাশ্যে উহা না করিয়া কুটিলতা অবলম্বন করাতেই তিনি নিন্দনীয় হইয়াছেন। তিনি রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশ পত্র জারি করিলেন, তাহাতে লিখিত হইল যে "বাদসাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাও সাহেবের সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদসাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদসাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন।" কিন্তু এই কুটিলতা অবলম্বনে আমরা ঔরঙ্গজেবের বিশেষ দোষ দেখি না। প্রকাশ্যভাবে প্রতিহিংসা সাধন করিতে গেলে একটী রমণীর জন্য, অকারণ শত শত নির্দ্দোষ মোগল ও রাজপুতের রক্তে রূপনগর প্লাবিত হইত। এরূপ স্থলে সরল পথ অপেক্ষা কুটিল পথ অবলম্বনই শ্রেয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেব

বের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল না, চঞ্চলকুমারী রাজসিংহকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার আশ্রয় লইলেন। চঞ্চলকুমারীর পত্রখানি একটু প্রগল্‌ভতা পূর্ণ, বিশেষতঃ শেষ অংশটুকু। যদিও উহা চঞ্চলকুমারীর হাতের লেখা নয়, নির্ম্মলকুমারীর হাতের লেখা, তথাপি যে উহা চঞ্চল কুমারীর অজ্ঞাতসারে লিখিত হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। রাজসিংহ যখন চঞ্চলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ তোমার পত্র বটে", চঞ্চল বলিল "আজ্ঞা হাঁ"। রাণা যখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন পত্রের শেষ ভাগটা চঞ্চলের হাতের লেখা কিনা, চঞ্চল বলিল "আমার হাতের নহে।"

রাজসিংহ। কিন্তু তোমার সম্মতি ক্রমে লিখিত হইয়াছিল?

গ্রন্থকার বলিতেছেন "প্রশ্নটা অতি নির্দ্দয়। কিন্তু চঞ্চলকুমারী আপনার উন্নতস্বভাবের উপযুক্ত উত্তর করিলেন, বলিলেন "মহারাজ, ক্ষত্রিয় রাজগণ বিবাহার্থেই কন্যাহরণ করিতে পারেন। অন্য কোন কারণে কন্যা হরণ মহাপাপ। মহাপাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব কি প্রকারে?" ইহাতে রাজসিংহের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না, চঞ্চলকুমারীর সম্মতি ক্রমে উহা লিখিত হইয়াছিল কিনা বিশেষ জানা গেল না। তবে বোধ হয় যেন তাহার অজ্ঞাতসারে লিখিত হয় নাই। পত্রের শেষ অংশটুকু প্রগল্‌ভতাপূর্ণ কিনা তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—"মহারাজ আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলে নহে। আমি এ বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগল হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথা শাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। * * * * তবে আমি যে আপনার মহিষী হইবার কামনা করি, ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা বটে। যদি আমি আপ-

নার গ্রহণ যোগ্য না হই, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অন্যবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার কি ভরসা করিতে পারি না ? অন্ততঃ যাহাতে সেরূপ অনুগ্রহও আমার অপ্রাপ্য না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া গুরুদেবের হস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন। তারপর আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আপনার হাতে।" অন্যবিধ সম্বন্ধটা কিরূপ তাহা ভাল বুঝা গেল না, আশা করি দূষণীয় সম্বন্ধ নয়। এরূপ লেখায় যেন একপ্রকার লোভ দেখান হয়। রাজসিংহ সে লোভে ভুলিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। শরণাগতকে রক্ষা করা রাজধর্ম্ম, সেই রাজধর্ম্ম পালন করিবার জন্য তিনি চঞ্চল কুমারীকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। চঞ্চলকুমারীর চরিত্র আমাদের তত ভাল লাগিল না, তাহার ঔদ্ধত্য ও প্রগল্‌ভতাই ভাল না লাগিবার কারণ। দিল্লীশ্বরের প্রিয়তমা মহিষীকে তামাক সাজিতে বলা অতিশয় নিষ্ঠুরতা বলিয়া বোধ হয়। রাজপুত কন্যারা তামাক সেবন করেন কি না জানি না, কিন্তু হিন্দু রমণীর তামাক সেবনের কথা শুনিলে অন্ততঃ বাঙ্গালির মনে কেমন একটা বীভৎস ভাবের উদয় হয়, উহাতে রমণীর রমণীয়তা একেবারে অপস্থত হয়। চঞ্চলকুমারীর চিত্ত সংযম ক্ষমতা আদৌ নাই। প্রথমে উদিপুরীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অভিমানিনী সম্রাট মহিষীর স্বাভাবিক ও মার্জ্জনীয় গর্ব্বিতভাব দেখিয়া চঞ্চল কুমারী একেবারে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া তাহাকে তামাক সাজিতে বলিলেন। সে কথায় উদিপুরীর সর্ব্বশরীরে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল। তথাপি অত্যন্ত গর্ব্বকে হৃদয়ে পুনঃ স্থাপন করিয়া কহিলেন "বাদসাহের বেগমে তামাকু সাজে না"। "তুমি যখন বাদসাহের বেগম ছিলে তখন তামাকু সাজিতে না। এখন তুমি আমার বাঁদী, তামাকু সাজিবে আমার হুকুম।" হায়,

চঞ্চলকুমারীর হৃদয়ে কি একটুও কোমলতা নাই? উদিপুরী রাগে কাঁপিয়া বলিল "তোমার এতবড় স্পর্দ্ধা যে আলমগীর বাদসাহের বেগমকে তামাকু সাজিতে বল?" কিন্তু সেবার আর উদিপুরীকে তামাকু সাজিতে হইল না। ঐ কায করিবার পূর্ব্বেই সংজ্ঞা শূন্যা হইয়া প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া গেলেন। উদিপুরীর সকল দোষ সত্বেও তাহার প্রতি সহানুভূতি হয়। কিন্তু চঞ্চল কুমারীর হৃদয় গলিল না, এই ঘটনার পরও সে উদিপুরীকে তামাকু সাজাইয়া ছিল। উহা না করিলে মহত্ব ও উদারতা প্রকাশ পাইত, করাতে সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

যেমন নায়িকা চরিত্র তত পরিস্ফুট হয় নাই, নায়ক চরিত্রও সেইরূপ। রাজ সিংহ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই। তিনি বীর, ধীর এবং ধার্ম্মিক। কিন্তু তাঁ'র বীরত্বে প্রাণ উত্তেজিত হয় না, তাঁ'র ধার্ম্মিকতা হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। তিনি নায়ক হইলেও নায়ক চরিত্র অপেক্ষা উপনায়ক অর্থাৎ মাণিকলালের চরিত্র আমাদের ভাল লাগে, ও অধিকতর পরিস্ফুট বলিয়া বোধ হয়। মাণিকলালের কৌশলেই রাজসিংহ রুদ্ধ পথ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। রাজসিংহ বীর, যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন; কিন্তু কৌশলে মাণিকলাল রাজসিংহ অপেক্ষা অধিক সুনিপুণ। মাণিকলালের সাহস বুদ্ধি, বীরত্ব মনুষ্যত্ব ও প্রভুভক্তি দেখিয়া রাজ সিংহ অপেক্ষা তাহার প্রতি মন অধিকতর আকৃষ্ট হয়। দস্যু মাণিকলাল রাজসিংহকে চিনিয়াও বলিয়াছিল "মহারাজ আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন নহিলে এই বর্শার বিদ্ধ করিব।" ইহা কম সাহসের কথা নয়! মাণিকলাল ভয়ে রাজসিংহের শরণাগত হয় নাই বা জীবন ভিক্ষা করে নাই। সে বলিল, "আমি মরণে ভীত নহি, কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে

সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যা হইলে গিয়া আহার দিব তবে সে খাইবে; আমি তাহাকে বাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে, আমাকে মরিতে হয় তাহাকে আগে মারুন।" দস্যুর চক্ষে জল পড়িয়াছিল ইহাতে বুঝা যায় মাণিকলাল দস্যু হইলেও তাহার মমতা ও মনুষ্যত্ব ছিল। অবলীলাক্রমে তর্জ্জনী অঙ্গুলি ছেদন ও তৎপরে তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাতে তাহার বীরত্ব ও সহিষ্ণুতারও পরিচয় পাওয়া যায়। মাণিকলালের প্রভুভক্তিও প্রশংসনীয়। মাণিকলালের আর একটি গুণ ছিল সে বড় রসিক। রাজসিংহ উপন্যাসে হাস্য রসের বড়ই অভাব, শুধু হাস্য রস কেন, করুণ রসেরও বড় অভাব। বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলে যেরূপ হাস্য ও করুণ রসের সংমিশ্রণ দেখিতে পাই রাজসিংহে তাহার কিছুই নাই। এই জন্য রচনা সৌন্দর্য্যে বা ঘটনা চাতুর্য্যে রাজসিংহ কেবল বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল অপেক্ষা নয়, বঙ্কিম বাবুর অপরাপর উপন্যাস গুলি অপেক্ষায় অনেক নিকৃষ্ট। কেবল মাণিকলাল ও নির্ম্মলকুমারীর চরিত্রে অল্প পরিমাণ হাস্যরস দৃষ্ট হয়। মাণিকলালের সহিত নির্ম্মলের কোর্টশিপটা আমাদের বড় ভাল লাগিল; কারণ উহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, ভাল বাসা বাসির কথা একটিও নাই, বহুকাল সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই, হে প্রাণ, হে প্রাণাধিক প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ বেশ লাগিল। ইহা পড়িয়া David Copperfield এ "Barkis is willing" এর কথা মনে পড়ে।

যেরূপ নায়ক চরিত্র অপেক্ষা উপনায়ক চরিত্র অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনি নায়িকা চরিত্র অপেক্ষা উপনায়িকা বা নির্ম্মলকুমারীর চরিত্র অধিকতর সুন্দর ও পরিস্ফুট হইয়াছে। নির্ম্মল নায়িকার স্থির-

বুদ্ধিশালিনী, তাই তস্‌বির ওয়ালির হস্তে আসরফি প্রদান করিয়া তাহাকে চিত্রদলন ব্যাপার কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায় যদি এরূপ নিষেধ না করিতেন তাহা হইলে হয়ত বুড়ি ও কথা কাহাকেও বলিত না। এইখানে বলিয়া রাখি তস্‌বীর ওয়ালী চরিত্র বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। নির্ম্মল, চঞ্চলের সহোদরাধিকা, তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। নির্ম্মল চঞ্চলের মত উদ্ধত স্বভাব নহে, তাহার সাহস, চতুরতা ও কোমলতা আছে। সে সাহস ও চতুরতায় ঔরঙ্গজেব পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবকে বলিয়াছিল "আমিও তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।" বাদসাহ বাক্‌শূন্য। যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত, পৃথিবীতে যাঁহার গৌরব ঘোষিত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাস, তিনি আজ এই অনাথা, নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত, পরাস্ত। ঔরঙ্গজেব পরাজয় স্বীকার করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ অমূল্য রত্ন, ইহাকে নষ্ট করা হইবে না। আমি ইহাকে বশীভূত করিব।" কিন্তু নির্ম্মলকে বশীভূত করিবার আগে নিজে বশীভূত হইলেন। এরূপ উদ্ধত বাক্যের পরও নির্ম্মলের প্রতি ঔরঙ্গজেবের সদয় ব্যবহারে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি হয়। যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত তিনি এক সামান্যা রমণীর উদ্ধত বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন, আর চঞ্চলকুমারী সেই পৃথিবীপতির শিরস্তমা মহিষীর উহা অপেক্ষা অনেক অল্প ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিলেন না। এই বিষয়ে উভয় চরিত্রে কত প্রভেদ! ঔরঙ্গজেব বশীভূত হইল, স্পষ্ট বলিল আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকে ভাল বাসি নাই। এজন্মে কেবল তোমাকেই ভাল বাসিয়াছি। * * * তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার আর নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরীর

অপেক্ষা নও। বোধ করি, আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখন পাই নাই, সেই জন্য বোধ করি তোমার বুদ্ধি, চতুরতা আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। যাই হোক, আলমগীর বাদসাহ তোমার ভিন্ন আর কাহারও কখন বশীভূত হয় নাই। আর কাহারও চক্ষুর কটাক্ষে মোহিত হয় নাই। আর একস্থলে ঔরঙ্গজেব বলিতেছেন "দুনিয়ার বাদসাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না, কাহারও সাধ মিটে না। পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভাল বাসিয়াছি কিন্তু তোমায় পাইলাম না। তোমায় ভাল বাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না, ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ তাহা করিব না। তুমি যাও। আমাকে স্মরণ করিও। যদি কখনও আমা হইতে তোমার কোন উপকার হয় আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।" ইহা যথার্থ প্রেমের লক্ষণ, কুটিলতা কিছুমাত্র নাই। নির্ম্মলও বশীভূত হইল, ঔরঙ্গজেবের প্রতি তাহার সহানুভূতি হইল। যখন ভারতপতি, রাজপুত ভূইঞার নিকট সসৈন্যে পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিকের অবস্থায়, ক্ষুদ্র রাজপুত কুলবালা নির্ম্মলকে উদ্ধারকারিণী মনে করিয়া তাহার পারাবত উড়াইয়া দিলেন, নির্ম্মলের কোমল প্রাণ ব্যথিত হইল, সে পত্র পড়িয়া কা'র না হৃদয় ব্যথিত হয়? পত্রখানা এইরূপঃ—"আজ পৃথিবীশ্বর দুর্দ্দশাপন্ন, লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে অনাহারে মরিতেছি। দিল্লির বাদসাহ আজ এক টুকরা রুটির ভিখারী; কোন উপকার করিতে পার কি না? সাধ্য থাকে করিও।" নির্ম্মলের কৃপায় দিল্লীশ্বর সে যাত্রা উদ্ধার পাইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজ সিংহ উপন্যাসে হাসাইবার যাহা কিছু আছে তাহা মাণিকলাল ও তদীয় উপযুক্তা পত্নী নির্ম্মল চরিত্রে। এই পুস্তকে

করুণ রস যাহা কিছু আছে তাহা জেব উন্নিসা ও মবারক চরিত্রে। জেব উন্নিসার প্রেম ও মবারকের অদৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী। এই দুইটী চরিত্র অতিশয় পরিস্ফুট হইয়াছে; জেব উন্নিসা জানিত না যে মবারককে সে ভাল বাসিত, বাদসাহজাদী মনে করিত, তাহার কাছে সব সমান। কিন্তু মবারকের মৃত্যু সংবাদ আসিবা মাত্র তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, বুঝিল বাদসাহজাদীরাও ভাল বাসে। তখন বড় অনুতাপ হইল। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। জেব-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদন্ত নির্ম্মিত রত্ন খচিত পালঙ্কে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু হৈ সাহজাদী, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত রত্নরাজি ভূষিত পালঙ্কে শয়ন করিলেও ত চক্ষুর জল থামে না? আর একদিন উদয়পুরে বন্দিনী অবস্থায় জেব উন্নিসা কতই বিলাপ করিয়াছিল, সে বিলাপ বড়ই প্রাণস্পর্শী। "হায় মবারক! মবারক! মবারক! তোমার অমোঘ বীরত্ব কি সামান্য ভুজঙ্গম গরলকে জয় করিতে পারিল না! সে অনিন্দনীয় মনোহর মূর্ত্তিও কি সাপের বিষে নীল হইয়া গেল। এখন উদয়পুরে কি এমন সাপ পাওয়া যায় না, যে এই কাল ভুজঙ্গীকে দংশন করে? হায় মবারক মবারক, মবারক! তুমি একবার সশরীর দেখা দিয়া, কাল ভুজঙ্গী দিয়া একবার আমায় দংশন করাও; আমি মরি কি না দেখ। ঠিক সেই সময়ে মবারক সশরীর দেখা দিল। ইহাতে বড় dramatic effect হইয়াছে। জেব উন্নিসা পুনরায় তাহাতে সেই সুখস্বপ্ন দেখিতে পায়, যে জন্য চন্দ্র কুমারীর নিকট কাতর প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। পর-দিন রাত্রিতে জেবউন্নিসা মৃত মবারককে আর একবার দেখিবার মানসে জাগ্রত রহিল, কত কাঁদিল, সামান্য কীটের দংশনে অস্থির হইয়া কতই আক্ষেপ করিল। বলিল, ("পিপীলিকার

দংশনে আমি কাতর। এই অনন্ত দুঃখের সময়ও আমি কাতর! আর পিপীলিকা দংশন সহ্য করিতে পারিতেছি না, আর অবলীলাক্রমে আমি, যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়! তাহাকে ভুজঙ্গম দংশনে প্রেরণ করিলাম। এমন কেহ নাই কি যে আমাকে তেমনই বিষধর সর্প আনিয়া দেয়। হয় সাপ নয় মবারক!" আবার সেই dramatic effect কথা শেষ হইতে না হইতে মবারক পুনরায় দেখা দিল। জেব-উন্নিসা মবারককে পাইল, তাহার সহিত বিবাহ হইল। সে আর এখন বাদসাহজাদী নহে। কিন্তু একজনকে বঞ্চিত করিয়া আর এক-জনের সুখ কেমন করিয়া হইবে? মবারক দরিয়ার, দরিয়া পতি প্রেমে পাগলিনী কিন্তু বড় প্রতিহিংসা পরায়ণা। দরিয়া স্বামীর জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া মবারককে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু মবারক সাহজাদী প্রেমে মজিয়া দরিয়াকে ভুলিল, তাই তাহার অদৃষ্টে সুখ ঘটিল না, দরিয়ারই হস্তে মৃত্যু হইল। মবারকের হৃদয় অতি মহৎ, সে হৃদয় বীরত্বে ও মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণ। চঞ্চলকুমারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে দিল্লি লইয়া যাইতে মবারক স্বীকৃত হয় নাই। মবারক বাদসাহজাদীর প্রেম ও অবহেলা করিয়া, দরিয়া সহ কাল যাপন করিতে কৃতসংকল্প করিয়াছিল। তাহাই তাহার কালস্বরূপ হইল! জেব উন্নিসার বিষ নয়নে পড়িয়া সর্পের দ্বারা দংশিত হইল। মবারক অকৃতজ্ঞ নহে মাণিকলালের হস্তে পুনর্জীবন লাভ করিয়া সে উপকার কর্ত্তার প্রত্যুপ-কার করিয়াছিল। তাহারই কৌশলে ঔরঙ্গজেব রন্ধ্র পথে অবরুদ্ধ হন। কিন্তু তজ্জন্য মবারকের অনুতাপও করিবার বিশেষ কারণ ছিল না, যে হেতু ঔরঙ্গজেবেরই মবারকের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। অবশ্য জেব উন্নিসার প্রোরচনায়। কিন্তু স্বদেশীয় বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল বলিয়াই মবারকের অনুতাপ। মবারক চরিত্র অতি

সুন্দর, পরিশেষে জেব উন্নিসার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে গিয়া মবারক সব ভুলিল, দরিয়া ভুলিল, মনুষ্যত্ব ও প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইল। কিন্তু ওরূপ অবস্থায় দরিয়াকে ভুলিয়া জেব উন্নিসার প্রেমে পতিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। মবারকের জন্য আমাদের অত্যন্ত সহানুভূতি হয়, ততোধিক সহানুভূতি হয় খর্ব্বিত গর্ব্ব বাদসাহজাদী জেব উন্নিসার জন্য। জেব উন্নিসা ও মবারকচরিত্রই রাজসিংহ উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়াছে; নতুবা উহা নীরস হইত ও পড়িতে ভাল লাগিত না।

জামাই সপ্তমী।

বিলাসপুরে গোবর্দ্ধনের বিবাহ হইয়াছে। বিলাসপুর একখানি গণ্ড-গ্রাম, সেখানে কৃষকের সংখ্যাই অধিক। যে কয়ঘর ভদ্রলোক আছেন, তাঁহারা অধিকাংশই চাষবাসের উপর নির্ভর করেন। অতএব আধুনিক সভ্যতা সেখানে ততটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই সেখানকার চালচলন অনেকটা সেকেলে।

গোবর্দ্ধনের শ্বশুর নাই। খুড়া শ্বশুরও গোবর্দ্ধনের বিবাহের দুই মাস পরে মারা যান। গোবর্দ্ধনের শ্বশুর বাড়ি এক প্রকার অভিভাবক শূন্য গোবর্দ্ধনের স্ত্রী গৌরার বয়সও অল্প। সুতরাং বিবাহের পর গোবর্দ্ধনের ৪।৫ বৎসর শ্বশুর বাড়ী যাওয়া ঘটে নাই। গোবর্দ্ধনের একটি নিজের শ্যালক আছেন। তাঁহার নাম ফণি। তাহার বয়স পাঁচ বৎসর। তিনি বিদ্যালয়ে যাইতেন কিনা জানা নাই। নবীন নামে আরও একটি খুড়তুতো শ্যালক আছেন। নবীন গোবর্দ্ধনের সহাধ্যায়ী। উভয়ে কলিকাতার এক স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই সূত্রে বিলাসপুরে গোবর্দ্ধনের বিবাহ হয়। তাহাকে কিছু অতিরিক্ত ভাল মানুষ দেখিয়া নবীনের খুব পছন্দ হয়।

গোবর্দ্ধন অতি নিরীহ ও অত্যন্ত লাজুক। তাহার মন অতি সরল। নবীন তাহার বিপরীত। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ভালবাসা ছিল তথাপি মধ্যে মধ্যে ঝগড়া হইত। নবীন অনেক চেষ্টা করিয়াও গোবর্দ্ধনকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া যাইতে পারে নাই। সেই জন্য সে মধ্যে মধ্যে বড়ই উৎপাত করিত। গোবর্দ্ধন যে একটি 'আস্ত বাঙ্গাল' তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সে যথেষ্ট চেষ্টা করিত। কারণ, গোবর্দ্ধনকে বাঙ্গাল বলিলেই সে চটিয়া উঠিত। সেও নবীনকে চাষা বলিতে ছাড়িত না। কারণ নবীনদের পাঁচখানা লাঙ্গল আছে।

গোবর্দ্ধনের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। তাহার এফ. এ পরীক্ষা উপস্থিত। সেই সময়ে তাহার পিতার বড় জ্বর। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। অধিকন্তু পরীক্ষার পরই তাহার পিতার স্বর্গলাভ ঘটিল। তিনি জামালপুরে সামান্য বেতনে চাকুরি করিতেন। গোবর্দ্ধনকে বাধ্য হইয়া পড়া শুনা ত্যাগ করিতে হইল। পিতার মৃত্যুর পর জামালপুরে তাহার চাকুরি হইল। সেই সময় হইতেই তাহার সহিত আর নবীনের প্রায় দুই বৎসর দেখা হয় নাই। জামালপুরের আফিসে ছুটী বড়ই কম। সুতরাং গোবর্দ্ধনের আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। নবীন বি, এ পরীক্ষার পর হঠাৎ একদিন গোবর্দ্ধনকে দেখিতে জামালপুরে আসিল। আসিয়া দেখে গোবর্দ্ধনের আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জামালপুর স্বাস্থ্যকর স্থান। গোবর্দ্ধন বেশ মোটা সোটা হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার দাড়ি ও গোঁফের এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে তাহাকে চেনা কিছু দুষ্কর।

নবীন আসিয়া বলিল "কি হে গোবর্দ্ধন, বাঙ্গালের মত যে খুব দাড়ী গোঁফ রেখেছ। চিনিতেই পারা যায় না। আর বয়সও, ত কম হল না। গোবর্দ্ধন বলিল "আর চিনিবে কেমন করিয়া,

কল্‌কাতা দেখে একেবারে ভুলে গেছ। আর ত কোথাও যেতে ইচ্ছা কর না!'

নবীন বলিল 'কেন যাব না, তোমার মত ত আর শ্বশুরবাড়ি যেতে ডরাই না।'

গোবর্দ্ধন বলিল 'তোমার মত ত আর বেহায়া নই, যে বিনা নেমন্তন্নে শ্বশুর বাড়ি যা'ব।'

উত্তর শুনিয়া নবীন একটু অপ্রতিভ হইল। বাস্তবিক এ পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধনকে রীতিমত নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। কিন্তু নবীন ঠকিবার ছেলে নয়। সে বলিল—'আচ্ছা সামনেই ত জামাই ষষ্ঠী। এবার নিমন্ত্রণ করিলাম। কেমন যাস্ দেখিব।'

নবীন জানিত গোবর্দ্ধন যাইবে না। কিন্তু, গোবর্দ্ধনের যে শ্বশুর বাড়ি যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা সে জানিত না। নবীন কিছুদিন জামালপুরে কাটাইয়া দেশে চলিয়া গেল।

শেষে জামাই ষষ্ঠী যত কাছে আসিতে লাগিল, গোবর্দ্ধন ততই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে যে কি করিবে কিছু ঠিক্ করিতে পারিল না। তাহার একটি ভৃত্য ছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসাও করিল। হরিদাস বলিল—'দাদা বাবু, শ্বশুর বাড়ী যা'বে তা'তে আর লজ্জা কি? অনেক দিন ত যাও নাই।' গোবর্দ্ধন বলিল 'তুই ত সব বুঝিস্, নিমন্ত্রণ না হইলে যাই কেমন করিয়া? এবার নবীনদের বাড়ি যাইব।' হরিদাস জানিত নবীনদের বাড়ীও যা' গোবর্দ্ধনের শ্বশুর বাড়িও তা'। কাযেই সে জিনিষ পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

গোবর্দ্ধনের কিছুদিন ছুটি পাওনা ছিল। এবার রবিবারে ষষ্ঠী।

গোবর্দ্ধন ছুটির জন্য দরখাস্ত করিল। দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। সে কথা আফিসের কাহাকেও জানিতে দিল না।

রবিবারে হরিদাসকে লইয়া গোবর্দ্ধন রওনা হইল। বিলাসপুরে যখন আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। নবানদের বাড়ি গিয়া শুনিল নবীন বাড়ি নাই। কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছে। গোবর্দ্ধনের মাথায় যেন বাজ পড়িবার উপক্রম হইল। নবীন ভিন্ন আর কাহারও সহিত আলাপ নাই। কাযেই কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হরিদাস দেখিল সব বুঝি মাটি হয়। সে গোবর্দ্ধনকে বেশ চিনিত। আর বাক্যব্যয় না করিয়া গোবর্দ্ধনের শ্বশুর বাড়ির দরজার কাছে গিয়া 'নবীন বাবু আছেন, নবীন বাবু আছেন' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ফণিবাবু সেই সময় দিদিমার কাছে গল্প শুনিবার উপক্রম করিতে ছিলেন। অতএব, হরিদাস সহজে উত্তর পাইল না। অনেক ডাকাডাকির পর দোর খোলা হইল। বাড়িতে পুরুষ নাই। সুতরাং ভিতর হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল 'কে গা?' হরিদাস সে কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'নবীন বাবু আছেন?' যেন কিছুই জানে না। কিন্তু, ইহাতে গোবর্দ্ধনের একটু সুবিধা হইল। তাহার ইচ্ছা নয়, যে তাহার পরিচয় দেওয়া হয়। তখন ফিরিবার ট্রেণ ছিল না, এবং অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং হরিদাসের কোন কার্য্যে বাধা দিতে পারিল না।

ভিতর হইতে উত্তর হইল যে নবীন বাড়িতে নাই, নিমন্ত্রণে গিয়াছে কখন আসিবে তাহার ঠিক্ নাই। কিন্তু, হরিদাসের আর নড়িবার ইচ্ছা নাই। সে বাহিরের দালানে বসিয়া বলিল 'এস না দাদা বাবু, একটু বসা যাক্, নবীন বাবু হয়ত এখনই আসবেন।' গোবর্দ্ধনের পা কিন্তু ওঠে না। পাছে হরিদাস বেশী গোল করে, তাহা ভাবিয়া

দালানে বসিল। বাড়ির সকলে জানিল যে এক জন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। সুতরাং বাহিরের ঘর খুলিয়া দেওয়া হইল। ফণি বাবুর আর গল্প শুনা হইল না। তিনি মহা বিরক্ত হইয়া হরিদাসের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা কে গা?' হরিদাস বলিল 'আমরা জামালপুর থেকে আসচি।' ফণি বাবু দৌড়িয়া গিয়া খবর দিলেন যে একজন দেড়ে বাবু আসিয়াছেন। কিন্তু, পরিচয় কিছু দিতে পারিলেন না। বাড়ির লোকেরা অনেক ভাবিয়া কিছু ঠিক্ করিতে পারিল না। তাঁহাদের জামাই আসিবার ত কোন সম্ভাবনা নাই। নবীন একবার জামালপুর গিয়াছিল। বোধ হয়, কোন বন্ধু দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাহাই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা একটু আদর যত্ন করিলেন। জলযোগের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু, হরিদাসের তাহাতে মনস্তুষ্টি হইল না। সে ভাবিল, এটা ত উপরিলাভ। নবীন বাবু আসিলেই নূতন বন্দোবস্ত হইবে।

ক্রমে যত রাত্রি হইতে লাগিল, হরিদাসের ততই চিন্তার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে গোবর্দ্ধনকে বলিল 'দাদা বাবু, আর ত চুপ করে' থাকা চলে না। পরিচয়টা দেওয়া যাক্।' গোবর্দ্ধন দেখিল মহা বিপদ। এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এখন পরিচয় দিলে লোকে কি মনে করিবে!

গোবর্দ্ধন বলিল 'দ্যাখ হরে, এখন আর গোলমাল করিস্ না। কোন রকমে রাত্রি কাটাইয়া ভোরেই চলিয়া যাইব। বেশী চেঁচামিচি করিস্ নে।' হরিদাস বলিল 'তাও কি হয়, দাদা মশায়, জামাই ষষ্ঠীর রাতটা, অম্নি যাবে! পরিচয়টা দিতে দোষ কি?'

গোবর্দ্ধনের এইবার রাগ হইল। তাহার যে লজ্জায় প্রাণ ওষ্ঠাগত তাহা হরিদাসকে জানিতে না দিয়া বলিল, "বেশী চেঁচাবি ত গলা টিপে

ধরব। চুপ করে বসে থাক।" হরিদাস দাদা বাবুকে চিনিত। এরূপ অবস্থায় দাদাবাবুর যে কিছুই অসাধ্য নাই তাহা সে বুঝিল। সে আর কি করিবে? চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু, জঠরাগ্নিতে সে কিছু অস্থির হইয়া পড়িল। নবীনের তখনও দেখা নাই। ভিতরকার লোকেরা মনে করিতেছেন যে এরা আবার কোথা হইতে আসিল। কিন্তু, কি করিবেন। অতিথিকে কিছু বলা যায় না। সুতরাং আহারেরও বন্দোবস্ত হইল। কি আপদ, নবীন গেল কোথায়?

এইবার গোবর্দ্ধনের বিষম বিপদ উপস্থিত। বাড়ির ভিতর আহার করিতে হইবে। সে প্রথমে ভিতরে যাইতে আপত্তি করিল। কিন্তু, হরিদাস কিছুতেই রাজি হইল না। সে বলিল 'যদি ভিতরে না যাও ত সব কথা প্রকাশ করিয়া দিব।' সে ভাবিল ভিতরে গেলেই সব গোল মিটিবে। কিন্তু, হায় অদৃষ্টের গতি কার সাধ্য বোধ করে? গোবর্দ্ধন সর্ব্বাঙ্গ উত্তম রূপে আবৃত করিয়া বাড়ির ভিতর আহারে বসিল। গোবর্দ্ধন বাড়ীর ভিতর গিয়া বোধ করিল যেন চারিদিক অন্ধকার। আহারে বসিয়া শুনিতে পাইল জানালার পাশে কাহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে। গোবর্দ্ধন ডাল মাখিতে ঝোল মাখিয়া ফেলিল। পার্শ্বে দিদি শাশুড়ি ঘোমটা টানিয়া ভোজন কর্ত্তার মুখের দিকে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া আছেন। কিন্তু, গোবর্দ্ধনের গোঁফ দাড়ি তাহার মুখের সকল পরিচিত চিহ্ন আবৃত করিয়াছে। দিদি শাশুড়ির দৃষ্টিবাণ সে ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না। গোবর্দ্ধনের শাশুড়ি ফণিকে লইয়া ব্যস্ত। বিশেষতঃ, আগন্তুক অপরিচিত বলিয়া বাহিরে আসিলেন না। হায় গোবর্দ্ধন! হঠাৎ জানালার মধ্যে একটি কিল মারার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে হাতের চুড়ি বাজিয়া উঠিল। গোবর্দ্ধন দুধের বাটিতে লেবু চট্‌কাইয়া ফেলিল! পাকা আম পাত্রে

পড়িয়া রহিল। এক চুমুকে দুধ খাইতে দিয়া বিষম খাইল। দিদি শাশুড়ি বলিলেন "ষাঠ ষেঠের বাছা, অত তাড়াতাড়ি কচ্চ কেন? আম দু'টা খাও। নবীন ত বাড়ি এলো না। কে আর খাওয়ায় বল?' গোবর্দ্ধন কি করে। আম খাইতে লাগিল। এই সময় দিদিশাশুড়ি একবার বাহিরে আসিলেন। হরিদাসের পাতে প্রায় আধখানা কাঁঠাল দিয়া গেলেন। হরিদাস বিনা আপত্তিতে তাহা উদরস্থ করিল। ইত্যবসরে গোবর্দ্ধন বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। অন্ধকূপ হইতে মুক্ত ইংরাজ সৈনিকের সহিত তাহার কতকটা তুলনা করা যাইতে পারে:

এদিকে বাড়ির ভিতর সেই জানালার পাশে একটি ছোট খাট যুদ্ধ উপস্থিত। নবীনের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী ও গৌরীতে একটি কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। আগন্তুকের ভোজনের সময় গৌরী তাহার দিকে এক মনে চাহিয়া ছিল কেন, এই কথা লইয়া মহা তর্ক উপস্থিত। গৌরী কিছুতেই স্বীকার করিবে না যে সে মুখের দিকে চাহিয়াছে। হেমাঙ্গিনী দেখিয়াছে যে সে শুধু তাকায় নাই।' তাহার চোক যেন অন্ধকারে জ্বলিতেছিল। কিন্তু, সে কথা হেমাঙ্গিনী কিছু বলিল না। আরও একটু কথা ছিল। আগন্তুকের নাকটি যেন কেমন কেমন, ভাগি্যা চোক দেখিতে পায় নাই।

দিদিমা আসিয়া তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। কিন্তু, হেমাঙ্গিনী সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন। সে একটা মতলব ঠিক্ করিল। যেরূপ গতিক তাহাতে নবীন রাত্রে বাড়ি আসিবে না। সে ফন্দি করিয়া গৌরীর সহিত আলাদা ঘরে শুইবার বন্দোবস্ত করিল। দিদিমা বলিলেন 'কিলো হেমা, আজ ষষ্টীতে নাতজামাই আসেনি বলে কি তুই সেই ভারটা নিলি না কি'? হেমাঙ্গিনী বলিল 'ঘরে থাকতেই বড় পাওয়া যায়। তা' আবার বিদেশ থেকে আস্‌বেন। ভিতরে ভিতরে

কিছু বন্দোবস্ত হয় নাই ত। রাত্রে এলে যেন ঘরে টেনে নিও না।' দিদিমা বেগতিক দেখিয়া প্রস্থান করিলেন।

হেমাঙ্গিনী গৌরীকে ঘরে লইয়া গিয়া খিল দিল। অনেক ধস্তা ধস্তি করিল। গৌরী কিছুই প্রকাশ করিল না, কিন্তু হেমাঙ্গিনী মনের সন্দেহ মিটিল না। কিছুক্ষণের পর দু'জনে ঘুমাইয়া পড়িল।

হঠাৎ হেমাঙ্গিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে শুনিল গৌরী ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ফোঁপাইতেছে। হঠাৎ বালিসে হাত পড়াতে দেখিল বালিশটা ভিজা ভিজা! সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। তখন বাহিরে আলো ফরসা হইয়াছে। শুকতারা উঠিয়াছে। সে ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরের জানালার কাছে কান পাতিয়া রহিল। কিছুক্ষণের পর ভিতর হইতে কে বলিল "হরে, ও হরে, উঠ না। যেতে হবে না।' হরিদাসের সমস্ত রাত্রি পেট কামড়াইয়াছে। সবে মাত্র তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সে ঠেলা খাইয়া উঠিয়া বলিল 'একি দাদাবাবু, বাড়ির ভিতর যাও নি। এরা মনে করবে কি? কাযটা কি ভাল হল?'

গোবর্দ্ধন বলিল "ভাল হল, কি মন্দ হল তোর সে কথায় দরকার নেই। যাবি ত এই বেলা চল্।"

হরিদাসের আবার উদরের পীড়া উপস্থিত। সে বলিল "দাদাবাবু পরিচয়টা না দিয়ে ভাল কল্লে না। জামাই ষষ্ঠীর রাতটা অমনি গেল। আমি একবার বাহিরে থেকে আসি।"

হরিদাস ঘটি লইয়া বাহিরে আসিবা মাত্র দেখিল কে যেন সরিয়া গেল। তাহার গা টা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

হেমাঙ্গিনীর আর বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু, হায়! সাধের জামাইষষ্ঠী কাটিয়া গিয়াছে। তখন বেশ আলো হইয়াছে। বকুল গাছে পাপিয়া শিস্ দিতেছে। সুখের (?) নিশা পোহাইয়াছে।

ভোরেই নবীন বাড়ি ফিরিল। সে আসিয়া দেখে গোবৰ্দ্ধন পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। একটু লজ্জিতও হইল। সে বলিল 'আরে, গোবৰ্দ্ধন কতক্ষণ? এসো, এসো, ভিতরে এসো।' কিন্তু গোবৰ্দ্ধন আর ভিতরে যাইতে চায় না।

এমন সময়ে হরিদাস ঘটি হস্তে উপস্থিত হইল। সে আসিয়া নবীনকে সকল কথা বলিয়া দিল। নবীন দেখিল ধরিতে গেলে তারই দোষ। কারণ, নিমন্ত্রণের কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যাহা হউক, সে অনেক বুঝাইয়া গোবৰ্দ্ধনকে বাড়ি আনিল।

নবীন বাড়িতে কোনও কথা বলিল না। প্রথমে একটি পরামাণিক ডাকাইয়া গোবৰ্দ্ধনের দাড়িটির ধ্বংস করিল। পরে উভয়ে স্নান করিয়া একেবারে দিদিমার কাছে হাজির। সকলে ত দেখিয়াই অবাক্!

তখন বড় বড় ঘোমটা দিবার পালা পড়িয়া গেল। নবীন বলিল 'একে ত খালি চোকেই কিছু দেখিতে পাও না। তা'র উপর আবার ঘোমটা।'

গোবৰ্দ্ধনের শ্বাশুড়ি ত অপ্রস্তুতের এক শেষ। কিন্তু, স্ত্রীলোকে কখন নিজের দোষ স্বীকার করিতে রাজি হন না। ক্রমে সকল দোষ গোরীর ঘাড়ে গিয়া পড়িল। সে যে চক্ষের মস্তক একেবারে ভক্ষণ করিয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ রহিল না। শুধু এক জন তাহার মনের কথা বুঝিয়াছিল। সে আমাদের হেমাঙ্গিনী।

সপ্তমীতে জামাইষষ্ঠী করিয়া গোবৰ্দ্ধন বাড়ি ফিরিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখন দাড়ি রাখিবে না।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র গুপ্ত।

অবসানে।

জীবন উপান্তে আজি দাঁড়াইয়া নিরাশা-লাঞ্ছিত
প্রিয়তমে! হে চিরবাঞ্ছিত।
যৌবনের রূপস্পর্দ্ধা, প্রণয়ের উদ্দাম গরব,
মিলন-গাথার তীব্র, বিরহের, ম্লান গীতরব,
বাসনা ও বিভ্রমের সুমিশ্রিত বিচিত্র ঝঙ্কার
জাগিতেছে হৃদি-মাঝে, নাচে শুধু মৌনঅহঙ্কার
বক্ষের মাঝার,
উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল; কমল-নয়না।
হে ফুল্ল আননা!
চারু তব অবয়ব নবনীত শিরীষ কোমল,
আঁখি দুটী পুলক-চঞ্চল,
প্রকৃতির মহিমায় প্রভাবিত তোমার ললাট
স্বাধীন, বন্ধনহীন, অমানুষী প্রতিভা বিরাট,
বর্ণবিভা কুন্দশুভ্র, কেশরাশি অযত্ন-স্খলিত,
স্বভাবের সূক্ষ্ম শিল্পে দেহলতা সযত্নে গঠিত
মাধুরী বঞ্চিত।
উচ্ছ্বসিত রূপরঙ্গে, মুগ্ধ আমি প্রাণে;
প্রীতি নিমগনে!
পিপাসিত ওষ্ঠ দিয়া ও অধর করিয়া মন্থন,
জীবনের হে সর্ব্বস্ব ধন!
প্রাণের শোণিত দিয়া রচি ওই অপূর্ব্বমূরতি
তৃষিত নয়নে যবে, করেছিনু তোমার আরতি
যৌবনের প্রবস্নেহে শান্তস্নিগ্ধ কোমল হৃদয়
দিয়াছিনু সিক্ত করি, অন্তরের নিভৃত-নিলয়
অন্তিম সময়ে,
আছে কি তাহার স্মৃতি? মহিমা মণ্ডিত
অয়ি! শুচিস্মিতা!
একদিন সুখস্বপ্নে কবে তব যৌবন মাধুরী
উঠেছিল আবেশে শিহরি!
ধরণীর মূক বক্ষে কবে তব নূপুর নিক্কণ,
সৌন্দর্য্যের চতুর্দ্দিকে সোহাগের দৃঢ় আলিঙ্গন,
চঞ্চল পরশভয়ে হয়েছিল অধীর আকুল,
প্রীতির কাননে কবে ফুটেছিল মধুময় ফুল
প্রেমের বকুল।
আজি হেথা ছায়া সম, আভাস তাহার
জাগে অনিবার।
বৃহৎ জগত হতে আজি শেষ বিদায়ের কালে
গরবিনি! স্বপনের জালে
ঘেরিয়াছে সর্ব্বদেহ মোর, দেখিতেছি বায়ুভরে
তোমার অঞ্চল প্রান্ত লুটাইছে ত্রিজগৎ'পরে
তোমার নয়ন হ'তে ছুটিতেছে বিদ্যুতের বাণ
ইঙ্গিতে আমায় যেন ডাকিতেছে তোমার আহ্বান
রুদ্ধকণ্ঠে গান,
তোমার সঙ্গীত বাঁশি পড়ে মুরছিয়া
হৃদয় ছাইয়া।
অলস সায়াহ্নে আজি তন্দ্রামগ্ন দীর্ঘ জীবনের

লো প্রতিমা চির গৌরবের,
মৃত্যুঞ্জয়ী তব স্পর্শে, অনুপমা তব করুণায়,
বিমল প্রেমের তব উদ্ভাসিত অরুণ আভায়
ঢেকে দিও পরাণের অন্তর্দাহী বেদনা সকল,
মুছাইও দিয়া তব স্থবিস্তৃত সোহাগ অঞ্চল
নয়নের জল,
তোমার হৃদয় গৃহে করিও রচনা
অন্তিম শয়ন।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।—

মুক্তি।

"সাহিত্য-সংহিতায়" মুক্তি শীর্ষক একটী প্রবন্ধ দেখিয়া আমরা বড় সুখী হইলাম। আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল যে এ প্রকার বিষয় সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হওয়া অসম্ভব। প্রবন্ধলেখক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, মুক্তিসম্বন্ধে তাঁহার অপরোক্ষানুভব কিছুই নাই এবং তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস যে বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া মুক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রবন্ধলেখক গোস্বামী মহাশয় আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, মুক্তির যথার্থ পরিচয় দেওয়া কাহারও ক্ষমতায়ত্ত বলিয়া প্রতীতি হয় না। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গোস্বামী মহাশয় যে বিষয় সকলেরই ক্ষমতার অতিরিক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তদ্বিষয় নিজের করায়ত্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। যদি তিনি বলিতেন যে, এতৎ সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া তাঁহার ন্যায় অসিদ্ধ পুরুষের ক্ষমতায়ত্ত নহে, সে কথা আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করিতে সক্ষম হইতাম। কিম্বা তিনি যদি বলিতেন যে "মুক্তির যথার্থ পরিচয় দিয়া অসিদ্ধ পুরুষকে মুক্ত করা কাহারও ক্ষমতায়ত্ত বলিয়া প্রতীতি হয় না"—, তাহা হইলেও আমরা কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম। লেখকের আন্তরিক বিশ্বাস যে মুক্তি শব্দটী কোনও বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধের প্রলাপ—;

বাক্য। মুক্তি সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া যদি কাহারও ক্ষমতায়ত্ত না হইত, তাহা হইলে ষড়্দর্শনের উৎপত্তির কারণ কি? তাহা হইলে প্লেটো হইতে আধুনিক লর্ড বিশপ ওয়েলডন পর্য্যন্ত কোন্ বিষয়ের পরিচয় দিবার জন্য উৎসুক? আমাদিগের বিশ্বাস যে মুক্তি মিথ্যা হইলে, জীবের জীবন মিথ্যা। জীবন সত্য, মিথ্যা নহে। জীবের মুক্তিও সত্য, মিথ্যা নহে। মুক্তি অপ্রাকৃত বা মিথ্যা হইলে জীবমাত্রেরই অন্তরে মুক্তি সম্বন্ধে আস্থা, ভক্তি, ও বিশ্বাস থাকিত না। লেখকের বিশ্বাস যে, সংসারী জীব যদি সংসারে থাকিয়া বাক্যাতীত অপ্রাকৃত মোক্ষানন্দের আস্বাদন পাইলে, কেহই আর সংসারের দিকে দৃষ্টিপাতও করিবে না, এই ভাবিয়া লীলাময় আপন মোক্ষানন্দ সুগুপ্ত রাখিয়াছেন। এ বিশ্বাসের প্রমাণ আছে কি না, আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, পরমাত্মা পরমব্রহ্ম যদি লীলাময় হয়েন, তাহা হইলে জীবকে বদ্ধ ও উন্মুক্ত করাই তাঁহার অভিপ্রেত হওয়া সম্ভব। লীলাময় বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে জীবকে বদ্ধ করিয়া তদবস্থ রাখিয়া দিলে, তাঁহার লীলার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে। এই পরিচ্ছেদে যে মুক্তি বা মোক্ষানন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা কোন্ সাম্প্রদায়িক মুক্তি? বৈদান্তিক মুক্তি বলিলে, এ পরিচ্ছেদ অর্থশূন্য, নিরর্থক হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব মুক্তি বলিলে, বৈষ্ণবচরিত্রের উপর দোষারোপ করা হয়; কারণ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে আপনার স্বার্থরক্ষার জন্য ভক্তকে চিরবন্ধনে বদ্ধ রাখিবেন? ইহা বৌদ্ধনির্ব্বাণও নহে, কারণ লীলাময়ের সহিত বৌদ্ধনির্ব্বাণের কোনও সম্পর্ক নাই।

লেখক ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রের কিয়দংশের সাহায্য লইয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মনুষ্যের জ্ঞানাধিকার সীমাবদ্ধ। এই

সিদ্ধান্তটী ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় দর্শন মতেই অগ্রাহ্য। জীব পদার্থের অবরোধ থাকিলে জীবের অনন্ত ও অমৃতত্ব সহজেই বোধগম্য হয়। বিজ্ঞান শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় একটী। সেই পদার্থের নাম যাহাই বলা যায়, সে পদার্থটী সকলের পক্ষেই সমান। তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়া অসম্ভব। গড্, আল্লা, পুরুষ, পরমব্রহ্ম— সকলই এক পদার্থের নামান্তর মাত্র। সকলেই জানেন যে, পরমাত্মা পরমব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি লীলা বা ইচ্ছা বা মায়া বা অবিদ্যা সহকারে বহুরূপ ধারণ করিলেন। এই বহুরূপের মধ্যে অজ্ঞান পরমাত্মা হইতে প্রভেদ জ্ঞান একটী রূপান্তর। এই প্রকার অজ্ঞান অনাদি বা অনন্ত নহে; কারণ আমরা বুদ্ধি সহকারে দেখিতে পাই যে এই ভ্রম নির্ম্মূল। ইহার সত্যসম্বন্ধে কোনও ভিত্তি নাই। বাস্তবিকই এই ভ্রম রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়। এই প্রকার ভ্রমাপনোদনই যদি মুক্তি হয়, তবে সংসারই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট স্থান।

প্রবন্ধটীর অন্য দোষ যাহাই থাকুক, কিন্তু শাস্ত্রীয় বাক্য সকল সঙ্কলিত হওয়ায়, প্রবন্ধটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন যে তাঁহার সামান্য বুদ্ধিতে যেরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তদনুসারে জীবের ঐক্য ও আনন্দময়ত্বই স্থির সিদ্ধান্ত। লেখকের নম্রতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ হইতে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সিদ্ধান্তবাক্য আপ্ত বাক্য নহে। তাঁহার সিদ্ধান্ত পক্ষে দুই একটী প্রমাণ সঙ্কলন করিলে, এই প্রবন্ধটী অতি সুপাঠ্য হইত, সন্দেহ নাই। লেখকের বিবেচনা করা উচিত যে, অধিকাংশ পাঠকই মূর্খ, স্থূলবুদ্ধি ও নাস্তিক সুতরাং সপ্রমাণ বাক্য না বলিলে মুক্তির কথাতেও মুক্তি নাই।

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।

গোতমং তমবেত্যৈব যথা চিত্ত তথৈব সঃ॥

ঋষি চার্ব্বাক যেমন গোতমের মুক্তি স্বরূপ স্থির করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সামান্য বুদ্ধি আমি যে গোস্বামীর মুক্তি স্বরূপ স্থির করিতে পারিব না, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

শ্রীভাগবত ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মানব চিত্ত সম্বন্ধিও শ্রুতি সঙ্গত রহস্য গুলি বর্ণিত হইল, এক্ষণে উপসংহারে আরও দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। কথাটী বহুমূল্য! ও উপদেশ মূলক! বন্ধন ও মুক্তি এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও উহা মানব চিত্তে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে চিত্তই জীবের ভব বন্ধনের হেতু এবং ঐ চিত্তই আবার মুক্তির কারণ। যথা—

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতং।

গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৩ স্ক॥ ২৫ অ!

শ্রীভগবান বলিতেছেন যথা আত্মনিষ্ঠ যোগই জীবের নিশ্রেয়সের কারণ, যে হেতু তাহাতে সুখ এবং দুঃখ উভয়েরই অতিশয় রূপে উপরতি হয়। কিন্তু ঐ যোগ, চিত্ত সংযম ব্যতিরেকে সর্ব্বাঙ্গ নৈপুণ্য হইতে পারে না যে হেতু চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। চিত্ত, অনিত্য জড় সংসারে আসক্তা হইলে জীবের ভব বন্ধন

ঘটে, এবং ঐ চিত্ত, পরম পুরুষ শ্রীভগবচ্চরণে যৎসামান্য রতিলাভ করিতে পারিলে ঐ চিত্তই মোচনের হেতু হইয়া থাকে।" অতএব আমাদিগের চিত্ত যাহাতে সর্ব্বদা শ্রীভগবানে অর্পিত থাকে তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ কখন ভগবন্নাম জপ, কখন নবীন নীরদ শ্যাম মূর্ত্তির ধ্যান, কখন শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন অথবা পাঠ, কখন ভগবল্লীলামৃত কথা শ্রবণ, আস্বাদন, বা কথন; অথবা সংসারের নিখিল কার্য্য ভগবানের প্রীতি কামনায় করণ; অর্থাৎ সাংসারিক বা বৈষয়িক, বা সামাজিক অথবা রাজ নৈতিক বিষয় গুলিকে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় করিয়া সেই সকল কার্য্য কলাপ ঈশ্বরের প্রীতি সাধন উদ্দেশে সম্পন্ন হইলেই আমাদিগের চিত্ত সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পিত থাকিল। ইহাই ভগবদ্ ভক্তের ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম।

অহঙ্কার মন বুদ্ধি ও চিত্ত এই চারিটী অন্তরেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বৃত্তিগুলি প্রথক্ রূপে বর্ণিত হইল। কিন্তু এই অন্তরেন্দ্রিয় চতুষ্টয় দ্বারা ইহ জগতের যাবতীয় কার্য্য কলাপ সম্পন্ন হইতেছে। যদিও ঐ বৃত্তি গুলি জড় তথাপি চৈতন্যের যোগে উহারা চেতনবৎ হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছি যথা মনে কর, একটী শব্দ হইল। প্রথমতঃ চিত্ত, ঐ শব্দটি কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করিয়া বিচারালয়ের আসামির স্থলভুক্ত হইলেন। মন, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক সুতরাং উকিলের স্থলভুক্ত হইয়া ইহা সিংহের ধ্বনি, অথবা হস্তির নিনাদ, কিম্বা মেঘের গর্জ্জন ইত্যাদি বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, কারণ মনের চিন্তন মাত্রই ধর্ম্ম। অহঙ্কার, স্বীয় অভিমান হেতু সাক্ষ দিলেন এই শব্দ আমি স্বয়ং শুনিয়াছি" বুদ্ধি, নিশ্চয়াত্মিকা সুতরাং বিচারক, সিদ্ধান্ত করিলেন "এই শব্দ অন্য কিছুই নহে, উহা মেঘের গর্জ্জন।" ইহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এইরূপ চারিটি অন্তরেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহ জগতের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত, আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক রহস্য সকল প্রকাশিত, আইন্ সংক্রান্ত অথবা দার্শনিক কুট তর্ক সকল মিমাংশিত, হইয়া থাকে। আত্মা বা পুরুষ কিছুই করেন না, কিন্তু দেহে অহং অভিমান হেতু ঐ সকল কার্য্য তাঁহার স্বকৃত বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে।

তৈজস অর্থাৎ রজোগুণ প্রভব অহঙ্কার হইতে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) এবং পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু কর্ণ, নাশা, জিহ্বা, ত্বক) উৎপন্ন হয়। এবং তামস অহঙ্কাব কাল প্রভাবে প্রেরিত হইয়া তাহা হইতে রূপ রস শব্দ, গন্ধ স্পর্শ এই পাচটী তন্মাত্র এবং ভূমি জল অনল বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। এই বিংশতি তত্ত্ব ও চিত্ত, বুদ্ধি মন ও অহঙ্কার এই চারিটী অন্তরেন্দ্রিয় লইয়া সাকল্যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই বিশ্ব সৃষ্টির উপাদান কারণ বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহাই সাংখ্য দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিলের মত, এবং এই মতই শ্রুতি সঙ্গত। মহর্ষি কপিল, সত্যযুগে কর্দ্দম ঋষির পুত্র রূপে ও মনুর কন্যা দেবহুতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভগবানের অবতার ও সাখ্য দর্শনেব আদি কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাব প্রণীত সাংখ্য মত শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মহর্ষি কপিল যে শ্রীভগবানের অবতার তাহা তাঁহার গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। যথা

নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধান পুরুষেশ্বরাৎ।
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥ ৩৮
মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ ৩৯
জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তেন ভক্তি যোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদ মূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ং ॥ ৪০

অন্যার্থ—ভগবান কপিল তাঁহার জননি দেবহুতিকে বলিতেছেন যথা মা! আমার ভক্তি বিনা- জীবের মুক্তির অন্য উপায়ান্তর নাই, যে হেতু আমিই ভগবান, আমিই প্রধান পুরুষের ঈশ্বর অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, প্রদুম্ন, ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতিই আমার পুরুষাবতার অর্থাৎ প্রকৃত্যন্তর্যামী, সমষ্ট্যন্তর্যামী, ও ব্যষ্ট্যন্তর্যামী, ইহারাই প্রধান পুরুষ ; মা! আমি ইহা-দিগের ঈশ্বর। (এই মন্ত্রের দ্বারা মহর্ষি কপিল রূপী ভগবান স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনিই বেদের প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ)। মা! আমি সর্ব্ব প্রাণির আত্মা, আমা ভিন্ন অন্য কাহা হইতে ও সংসারের ভয় নিবৃত্ত হয় না। (৩৮)

আমার ভয়েতেই বায়ু বহন করে, আমার ভয়েতেই সূর্য্য উত্তাপ দেন, আমার ভয়েতেই ইন্দ্র বর্ষণ করেন, আমার ভয়েতেই অগ্নি দগ্ধ করেন, এবং আমার ভয়েতেই মৃত্যু প্রাণির উপর ধাবমান হয়। (৩৯)

মা! আমার ভজন হইতেই যে জীবের মোক্ষ হয়, এ বিষয়ের সদা-চার প্রমাণ দেখ, যোগিগণ, তাহাদের পরম কল্যাণার্থে, জ্ঞান, বৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তি যোগ দ্বারা, অকুতোভয় স্বরূপ আমার পাদমূল সেবা করিয়া থাকেন। (৪)

উপরোক্ত মন্ত্র গুলির দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে সাংখ্য প্রণেতা মহর্ষি কপিল এবং স্বয়ং শ্রীভগবান একই তত্ত্ব। এবং ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে বেদের অলৌকিক তত্ত্ব সকল, যাহার অর্থ দুরবগাহ ও মনুষ্য বুদ্ধির অতীত, এবং যে তত্ত্ব সকলের সম্যক জ্ঞান লাভ হইলে, জীবের জন্ম মরণ রূপ সংসার দুঃখ নিবৃত্তি হয় ও ভগবচ্চরণে ভক্তি লাভ করিয়া জীব পরম গতি লাভ করিতে পারে, করুণানিধান শ্রীভগ-বান সেই সকল তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব বেদ এবং

অপৌরুষের অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহের অবসর কৈ?

সাংখ্য দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিল দুই জন। তন্মধ্যে একজন। সত্য যুগে, অপর জন ত্রেতাযুগে আবির্ভাব হয়েন। সত্য যুগের মহর্ষি কপিল সম্বন্ধে বর্ণিত হইল। ইনি ভগবদবতার ও সাংখ্য দর্শনের আদি কর্ত্তা। আর ত্রেতাযুগের মহর্ষি কপিল অগ্নিবংশজ, যিনি সগর রাজার বংশ ধ্বংশ করেন। এই শেষোক্ত মহর্ষি কপিল প্রথমোক্ত সাংখ্য মতের সার সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি ঐ গ্রন্থে অনেকাংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। ঐ শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ সকল সন্নিবেশিত থাকাতেই প্রচলিত সাংখ্য দর্শন গ্রন্থের অনাদর হইয়াছে। যদি চ এই গ্রন্থে আত্ম তত্ত্ব সম্যকরূপে আলোচিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য জ্ঞানাংশে বেদান্তের সহিত ঐক্য থাকিলেও ঈশ্বর প্রতিষেধাংশরূপ শ্রুতি বিরুদ্ধ দোষ বশতঃ সাধু সমাজে ঐ গ্রন্থের আদর নাই।

সাংখ্য দর্শনের সাংখ্য শব্দটী যোগরূঢ়। তত্ত্ব সংখ্যানার্থক উহার সাংখ্য সংজ্ঞা। এই প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের মতে পঞ্চবিংশতিটী তত্ত্ব। ঐ তত্ত্ব সকল যথা মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ মহাভূত ও পুরুষ। মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিক। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। গুণ সকল জড় ও পরিণামী। নিখিল জগৎই গুণ পরিণাম। সত্ত্ব গুণ সুখস্বরূপ, লঘু ও প্রকাশক। উহার বৃত্তি শান্তা। রজো গুণ দুঃখরূপ ও প্রবর্ত্তক, উহার বৃত্তি ঘোরা। তমোগুণ মোহস্বরূপ, গুরু ও আবরক। উহার বৃত্তি মূঢ়া। এই গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটী ধাতুর ন্যায় কার্য্য কালে

পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। জগৎ সত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণাম বলিয়া সুখ দুঃখ মোহাত্মক হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনের প্রধান দোষই অচেতন প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করা। প্রকৃতির কর্তৃত্ব বেদে নাই। বেদে পুরুষেরই কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়া থাকে। "আমি করিতেছি" ইত্যাদি প্রতীতি হেতু কর্ত্তারই চৈতন্য প্রতীত হইতেছে, অতএব প্রকৃতির কর্তৃত্ব যুক্তি সঙ্গত নহে। চেতন ব্যতিরেকে জড়ের কার্য্যকারিতা সম্ভব হয় না বলিয়া পুরুষের প্রয়োজকতা স্বীকার করিলে সাংখ্যমত বেদান্তেরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে। পুরুষ নিজ শক্তি স্বরূপা মায়া দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ রচনা করেন, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত।

শ্রীবসন্তলাল মিত্র।

আলেয়া।

একবার একটু কার্য্যোপলক্ষে শ্রীরামপুর গিয়াছিলাম। ট্রেণে কলিকাতা আসিবার জন্য সন্ধ্যা ছয়টার সময় শ্রীরামপুর ষ্টেশনে আসিলাম। তখনও ট্রেণ আসিতে প্রায় দেড়ঘণ্টা বাকি ছিল। আমি প্লাট্‌ফরমে বসিয়া একখানি সংবাদ পত্র পড়িতে লাগিলাম।

প্রথম ঘণ্টা পড়িতে আমি একখানি মধ্যমশ্রেণীর টীকেট্ লইয়া বেঞ্চে আসিয়া বসিলাম। যথা সময়ে ট্রেণ আসিল আমি ট্রেণে উঠিলাম।

কৃষ্ণপক্ষ। আমি গাড়ীর একটা শার্শীর ধারে বসিয়াছিলাম। দূরে মাঠে কিছু দেখা যাইতেছিল না; হুহু করিয়া বাতাস আসিয়া আমার মুখে লাগিতে ছিল, আর গাড়ীর গ্যাসের আলোকে পথ পার্শ্বস্থ কাল কাল ছায়াবৎ বৃক্ষগুলি দেখিতে ছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম মাঠের

মধ্যে একটা আলো ছুটাছুটী করিতেছে। মনের মধ্যে একটা ধাঁধা লাগিয়া গেল। আলোটী একবার নিবিয়া গিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল ও চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিল ও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার সহযাত্রী একবৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম পদার্থটা কি? তিনি বলিলেন "ও আলেয়া।"

আলেয়া জিনিষটী অতি অদ্ভুত। অন্ধকার রাত্রিতে মাঠের মধ্যেই ইহাকে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে অনেকে ইহাকে ভুত মনে করে। বাস্তবিক ইহার গতি বিধি ও স্থায়িত্ব এমন অস্বাভাবিক যে এরূপ মনে করা আশ্চর্য্য নহে। রাত্রে মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ সম্মুখে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল ও ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া নিবিয়া গেল। হয়ত কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে আবার সম্মুখে ঐরূপ জ্বলিয়া উঠিল!

একবার শুনিয়াছিলাম হুগলী জেলার একজন কৃষক নিশাকালে গৃহে যাইবার পথে মাঠের মধ্যে উপর্য্যুপরি অনেক বার আলেয়া দেখিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল--আর তাহার চৈতন্য হয় নাই।

প্রকৃত পক্ষে আলেয়া দর্শনে ভীত হইবার বিশেষ কিছুই নাই। কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস্ ও বায়ুর সংযোগে এই আলেয়ার উৎপত্তি। সাধারণতঃ জীব জন্তু, বৃক্ষলতা পচিলেই এই বাষ্প উৎপন্ন হয়। শ্মশান ও জলাভূমিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কার্ব্বণিক বাষ্প উঠে। নিশাকালে এই বাষ্প উঠিতে থাকে, উহাতে বায়ুসংযোগ হইলেই জ্বলিয়া উঠে। মানুষ তাহার নিকট অগ্রসর হইলেই তথাকার বায়ুস্তর কম্পিত হয় ও আলেয়া দূরে সরিয়া যায়। ইহাতে লোকের আরও ভীতির সঞ্চার হয়।

কার্ব্বণিক বাষ্প বায়ুমণ্ডলে ২৫০০ ভাগের মধ্যে একভাগ থাকে।

আমরা যে, প্রশ্বাস ফেলি তাহাও কার্ব্বণিক বাষ্প। বৃক্ষলতা এই বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে ও আমাদের ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। অতএব বৃক্ষলতা না থাকিলে আমাদের পক্ষে জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইত। কার্ব্বণিক বাষ্প অতিশয় বিষাক্ত, এই নিমিত্ত শ্বাস প্রশ্বাস অধিকক্ষণ বন্ধ রাখিলে প্রাণনাশের বিশেষ সম্ভাবনা।

একটী ক্ষুদ্র গৃহে বহুসংখ্যক লোকে শয়ন করা অতিশয় দোষাবহ। ইহাতে সেই গৃহের বায়ু শীঘ্রই দূষিত হইয়া যায় ও সেই গৃহে অধিকক্ষণ থাকিলে নানা প্রকার রোগ জন্মাইতে পারে। এসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

নির্জ্জন প্রান্তর, জলাভূমি ও শ্মশানে লোকে আলেয়া দেখিতে পায় বলিয়া অনেকে ইহাকে ভয়ের চক্ষে দেখে। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের এ ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছে। আলেয়ার জীবন চরিত যিনি জানেন, তিনিই আলেয়াকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার বলিয়া স্বীকার করিবেন। আমিও এক সময়ে আলেয়ার নামে ভয় পাইতাম, কিন্তু এখন আলেয়ার প্রকৃত প্রকৃতি জানিয়া তাহার সহিত খেলা করিতে ইচ্ছা হয়।

ভগবানের সৃষ্টরাজ্যের বিচিত্রতা দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নীরব নিশাকালে কোথায় মাঠের মধ্যে উজ্জ্বল আলোকরাজি নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, জোৎস্না প্লাবিত আকাশের নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্য হইতে উল্কাপিণ্ড সকল ঝক্ ঝক্ করিতে করিতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে, নদীতরঙ্গে বাড়বানল অতুলন শোভা খেলাইতেছে।

ঈশ্বরের বিধান আমাদের বোধগম্য নহে, মানবের ক্ষুদ্র শক্তি

তাঁহার জ্ঞান সাগরের যে কণিকামাত্র লাভ করিয়াছেন, তাহারই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাণা কুম্ভ।

(সচিত্র)

১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাণা কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। মিবারে যতগুলি রণকুশল এবং তেজস্বী রাণা শত শত বর্ষ প্রবলপ্রতাপে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, সেরূপ কোনও দেশেরভাগ্যে ঘটে নাই। এই সময় মিবারের লক্ষ্মী অচলা। একশত বর্ষ পূর্ব্বে বিধর্ম্মী যবনের অত্যাচারে চিতোর শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। সেই শ্মশানের চিতা-ভস্ম হইতে ক্রমে ক্রমে বীরেন্দ্রকেশরী রাজপুতগণ তাঁহাদের লুপ্ত-রত্নের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, হৃতগৌরব যবনশোণিতে প্রক্ষালিত করিয়াছেন। এই সময় ককেশশের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এবং মধ্য আসিয়ায় যে তাতার-জাতির মেঘসঞ্চয় হইতেছিল তাহা একশত বর্ষ পরে ভারতবর্ষে তুমুল ঝটিকায় পরিণত হয়। রাণা সঙ্গসিংহের রাজত্বকালের সেই ঝটিকা-বেগ প্রশমিত করিবার উদ্দেশে তদীয় পিতামহ রাণা কুম্ভই এখন হইতে উদ্যোগ করিতেছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে দিল্লীর অধীনে যবনগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র যবনরাজ্যের মধ্যে মালবা এবং গুর্জ্জরখণ্ড, কুম্ভের সিংহাসন অধিরোহণের সময় শক্তিসঞ্চয় করিতে-ছিল এবং যখন রাণা গৌরবের উচ্চসীমায় উন্নত (খ্রীঃ ১৪৪০ অব্দে) তখন এই দুই প্রতাপশালী যবনরাজ একত্রে বিপুল সৈন্য সমাবেশ

করিয়া মিবার আক্রমণ করিল। রাজপুতগণের বিপদে সাহস এবং ধৈর্য্য জগদ্বিখ্যাত; এই সমবেত যবন বাহিনীর আক্রমণ সংবাদে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া রাণাকুম্ভ একলক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং চৌদ্দশত হস্তী লইয়া মিবারের প্রান্তসীমায় মালবারাজ্যের বিস্তীর্ণক্ষেত্রে শত্রুসম্মুখীন হইলেন। এই ভীষণ সমরে রাজপুত বীরগণ সুদক্ষ যবনসৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং পরাজিত করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, ইতিহাসের অমর পৃষ্ঠায় উজ্জ্বলঅক্ষরে তাহা অনন্তকাল অঙ্কিত থাকিবে।

এই যুদ্ধে মালবারাজ, মামুদ খিলিজীকে রাণা বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন খিলিজীর পাপের প্রতিশোধ এতদিনে হইল। চিতোর আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল। রাণাকুম্ভ এই আনন্দের সময় বৈরীভাব বিস্মৃত হইয়া চিরশত্রুকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন। সসম্মানে সওগাতসহ মামুদ মুক্তিলাভ করিল। কুম্ভের উজ্জ্বল কীর্ত্তি উজ্জ্বলতর হইল। পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ কর, এরূপ মহানুভবতা এরূপ উদারতা এরূপ নির্ভীকতা অতি বিরল। হিমাচল হইতে কুমারীকা পর্য্যন্ত, ব্রহ্মপুত্র হইতে অরবল্লী অবধি হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রই ইহা নৈনন্দিন ব্যাপার। ইহা রাজনীতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, এই অপরিণাম দর্শিতার জন্য অনুতাপ আসিতে পারে, কিন্তু বীরের ক্ষমাই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই হিন্দুর মোক্ষ। এই বীরোচিত কার্য্যে কুম্ভের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই বরং কৃতজ্ঞ যবন মিবারের জন্য দিল্লীশ্বরের বিপক্ষেও অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এরূপ কথিত আছে।

এই ঘটনার এগার বৎসর পরে কুম্ভ, যবনবিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি জয়স্তম্ভ স্থাপিত করেন। দশ বৎসরে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। এই স্তম্ভ প্রস্তরনির্ম্মিত, কাষ্ঠের ন্যায় মসৃণ এবং পাদদেশ হইতে

শিখর অবধি বিচিত্র কারুকার্য্যে শোভিত। ইহা ১২২ ফুট উচ্চ এবং নয়টি স্তরবিশিষ্ট; প্রত্যেক স্তরে আরোহণ করিবার জন্য মধ্যে সুরম্য সোপানাবলী আছে। একটি সুপ্রশস্ত চত্বরের মধ্যস্থলে স্থাপিত। এই বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ বক্ষে ধারণ করিয়া চিতোর গরীয়সী কি না জানি না—কিন্তু ইহা জানি যে তাহার প্রত্যেক ভগ্নমন্দির, প্রত্যেক দুর্গচূড়া প্রত্যেক গিরিরন্ধ্র, এমন কি পার্ব্বত্যপথের প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ডও অতীত ইতিহাস অমরত্ব লাভের যোগ্য।

ভারতের এই স্তম্ভ প্রাচীন রোমের ট্রয়যুদ্ধস্তম্ভের ন্যায়; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক কারুকার্য্য খচিত ও শিল্প নৈপুণ্যসহ নির্ম্মিত। দিল্লীর কুতবমিনার ভারতে ইহার একমাত্র তুলনা, কিন্তু এতদপেক্ষা উচ্চ হইলেও যবনের মিনার, শিল্পে নিকৃষ্ট। কথিত আছে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণে নব্বই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত রাণাকুম্ভ অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ব্রহ্মার মন্দির প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার মন্দিরে কেবল কুম্ভের পিতা রাণা মুকুলের একটি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বোধ হয় রাণা একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং এই মন্দিরে বিশ্বস্রষ্টার আরাধনা করিতেন, ভারতে ব্রহ্মার একমাত্র মন্দির পুষ্করতীর্থের সন্নিকটে স্থাপিত; এইখানেই চতুর্ম্মুখের প্রস্তর মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে।

মিবার রক্ষার্থে চৌরাশীটি দুর্গের মধ্যে রাণাকুম্ভ ৩২টি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কমলমীর দুর্গ দুর্গম গিরিপথে শত্রুসৈন্যের অভেদ্য অচলের ন্যায় কুম্ভের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। চিতোরদুর্গ রাজস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে কমলমীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

মারবারের প্রধান রাঠোর বংশের কন্যা মীরাবাই কুম্ভের মহিষী

ছিলেন। মীরা যেরূপ অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী সেইরূপ বিদুষী ছিলেন। কথিত আছে মীরাবাই বিষ্ণুপ্রিয়া পরমা বৈষ্ণবী ছিলেন। তাঁহার ভাবপূর্ণ রচনা সমূহ এখনও বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ আদরের সামগ্রী।

রাণাকুম্ভ বীরোচিত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সরস্বতীর সেবায় বিরক্ত ছিলেন না। তৎকালীন রাজন্যবর্গ স্বকীয় কীর্ত্তিগাথা রচনা করিয়া অথবা কোন ঈপ্সিত মহিলার রূপবর্ণনা করিয়া স্ব স্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। রাণা কুম্ভ এ পথেও অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গীতগোবিন্দের টীকা লালিত্য এবং ভাবমাধুর্য্যে জয়দেবের রচনা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

কুম্ভ পঞ্চাশ বর্ষ সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৪৯৬ অব্দে হত্যাকারীর গুপ্ত অস্ত্রে রাণার অকালে জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল। সেই হত্যাকারী অপর কেহ নহে—তাঁহার রাজ্যাভিলাষী পুত্র। ইতিহাস এই পিতৃহন্তা পাপিষ্ঠের নামোল্লেখ করিতেও কুণ্ঠিত।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।

ফুলের সাজি।

পতিভক্তি।

সংসারের সুখ হায় দেখি জল বিম্ব প্রায়,
নিত্য ধন পতি-ভক্তি কর আকিঞ্চন।
নারীর পরম ধর্ম্ম　পতি সেবা-পুণ্যকর্ম্ম
সেই ব্রতে ব্রতী হও হে আমার মন!

সেই শান্তিপদ আশে রহি' সদা পতি-পাশে
পতি-দেব মূর্ত্তি হৃদে কর রে স্থাপন।
পুরাকালে আর্য্য নারী পতিপদ সার করি'
পশেছেন স্বামী সনে গহন কানন

অগ্নি-পরীক্ষার তরে রাম আজ্ঞা শিরে ধরি'
হাসি' সীতা করেছেন চিতা আরোহণ।
নারী-হৃদে স্বামী-ভক্তি পুরাণে বেদেতে উক্তি,
সেই আর্য্য-জন্ম লয়ে কেন অন্ধ মন?
কাচের সৌন্দর্য্যে ভুলি', মণিরে দিওনা ফেলি'
হেলায় ফেলনা দূরে অমূল্য রতন,
সতীর ধরম তরে, পতি-পদ পূজা করে'
নিত্য পতিপ্রেমসুখে হওরে মগন।

শ্রীমতী বসন্ত কুমারী দেবী।

ভাগিরথী।

১

ভাগিরথি! কলস্বনে কি গাহিছ গান,
সিক্ত করি' মানবের পরিণাম স্থান?
নির্ম্মল আনন্দ ভরে, চলিয়াছ কা'র তরে,
তুলিয়া তরঙ্গ ভীম সহস্র উজান?
অপার প্রেমের বলে, কা'র হৃদয়ের তলে,
ধ'রে দিতে যাও দেখি! ও হৃদয় খান?
সাগর সলিলে বুঝি মিশা'বে পরাণ।

২

পার্শ্বে তব মানবের পরিণাম স্থান,
মহাতীর্থ পূণ্যক্ষেত্র পবিত্র শ্মশান।
শ্মশান সৈকতে বসি, হেরিলে তরঙ্গ রাশি,
আতঙ্ক ভক্তিতে পূর্ণ হয় মন প্রাণ।
মনে পড়ে কত কথা, কত যে পুরান ব্যথা
সংসারের মায়ামোহ হয় বিসর্জ্জন।
তোমার অনন্ত ভাবে পূর্ণ হয় মন।

৩

হে জাহ্নবি! তুমি ভবে মহাতীর্থ স্থান।
অশেষ পাপের পাপী করে যদি স্নান,
পরশে পবিত্র বারি, পাপরাশি যায় তরি,'
পাপ শূন্য হ'য়ে জীব হয় পুণ্যবান।
মাতর্গঙ্গে ব'লেডাকে, শতেক যোজন থেকে,
তখনি সে তরি' যায় অকৃতী সন্তান,
এমন করুণা মাগো জীবে কর দান।

৪

"গঙ্গে গঙ্গে" ব'লে যেন ডাকে মম প্রাণ
ক্ষণতরে ভুলি' যেন না থাকি ও নাম।
অযোগ্য সন্ততি বলে, দিওনা চরণে ঠেলে
মানব তারিণি! তুমি কর দয়াদান।
যবে শ্মশানেতে আসি, হবে দেহ ভস্মরাশি,
কৃপা করি সিক্ত কোরো বাহিয়ে উজান।
অভাগিনী মোরে মাগো দিও পদে স্থান।

৫

তুমি মাগো প্রেমময়ী তুলিয়ে উজান,
চলেছ সাগর হৃদে মিশাইতে প্রাণ।
প্রেমিকা তুমি মা সতী, পবিত্রতা পুণ্যবতী
তারিলে অধম কত দিয়ে পদে স্থান।
আমারে অভাগী ব'লে, ফিরে কি মা পায়ে ঠেলে

পতিত পাবনী তুমি বুঝিব কেমন—
কর কি না মোরে দয়া আসিলে শমন।

শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী।

পরাণে পরাণে।

পরাণে পরাণ বাঁধিব দুজন
অটুট বাঁধনে।
হৃদয়ে রণিত গান, মন্দিরা মিশ্রিত তান,
গাহিব দু'জনে বাঁধিয়া সুতানে
অলস পরাণে।
মানস সরসী পরি' বাহিব সোণার তরী,
হেরিব দুজন, দুলিবে কেমন,
লহর আঘাতে।
জ্যোৎস্না ভূষিত রাতে মৃদুল মলয় বাতে,
পরাণে পরাণে মিশায়ে দুজনে
(থাকিব) তোমাতে আমাতে,
অটুট বাঁধনে।

শ্রীলালবিহারী দত্ত।

নিরাশ।

বিকচ কুসুম সম তরুণী ললনা
শয়নে শয়ন করি নিদ্রায় মগনা,
অরবিন্দ সম মুখ, স্বেদ বিন্দু তা'য়
শোভি...ক প্রভাতের শিশিরের প্রায়;
কুসুম কোমল কান্তি, না'হি অলঙ্কার
সেবররবপুতে তা'র—তবুও তাহার।

দেহের কনক ছটা উজলিছে গেহ,
কুঞ্চিত কুন্তল দাম মুক্ত অহরহ।
সহসা ফুটিল মৃদুহাস্য সে অধরে,
ধীরে ধীরে মুখখানি সরায়ে সত্বরে,
কোমল মৃণাল ভুজ যেন বা কাহারে
ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল বাঁধিবারে।
স্বপনে হেরিয়া বালা স্বীয় প্রাণেশ্বরে,
যে জন গিয়েছে ত্যজি' বহুদিন তরে
স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে যাহার,
সেই প্রাণ পতি গলে বাঁধি ভুজহার
লভিতে চুম্বন, বালা প্রফুল্ল হিয়ায়
ধীরে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু একি, হায়!
সহসা জাগিয়া বালা দুই চক্ষু চাহি'
হেরিল, বহিল অশ্রু দু'কপোল বহি',
ফেলিল একটী অতি তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস',
চির অভাগিনী বালা হইয়া নিরাশ!!!

শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।
ফকির চক।

ভালবাসি কেন তারে?

ভাল বাসি কেন তারে কে দিবে উত্তর,
যখন যে দিকে চাই,
কেন তারে দেখি; তাই—
প্রাণভোরে ডাকি তারে:'কেন্ ভালবাসি
সায়াহ্নে নক্ষত্র রাজি শোভিত গগনে,
তারকার চন্দ্রহার
কটিদেশে পরা তা'র,

দেখি যবে হাসিতরে, কেন ভালবাসি?
তিমির বসনে ঘন ঢাকিয়ে বদন,
সমুজ্জ্বল সুখ আবেশে,
যেন মৃত মৃদু হাসে,
হাসিছে রজনী যবে ; কে দিবে উত্তর
কেনতাবে ভালবাসি ! মন প্রাণ ভরে,
চেয়ে থাকি অবিরত,
দেখেছি মাধুরী কত
মধুর হাসিনী আহ। বসন্তের কালে !
কোকিলের কুহুস্বরে স্মিত মুখে যবে
চেয়ে থাকি ফুল্ল মনে
শোভিত কুসুম পানে
তখনই জাগে মনে মূরতি তাহার,
ভালবাসা স্মৃতিসনে। কে বলে আমায়
কেন তারে ভালবাসি
হৃদয়ে অমৃত রাশি,
উথলিবে প্রেমভরে যবে নিরন্তর,
যখন সুনীলাম্বরে পয়োধর রাজি,
ঘন ঘটা আয়োজনে
গর্জ্জিতেছে ঘনে ঘনে
দেখিতে মানস-প্রদ, কে দিবে উত্তর,
কেন তারে ভালবাসি হৃদয় সবলে,
প্রফুল্ল কমল সম,
প্রস্ফুটিত হৃদ মম,
অনুক্ষণ কেন, চেয়ে থাকি তার পানে,
যবে সান্ধ্য সমীরণে নাচে তালে তালে,

জাহ্নবী জীবন রাশি,
বিম্বাধরে মাখি হাসি;
বহিতেছে যবে গঙ্গা সিন্ধু উদ্দেশে।
দেখেছি সুখদ দৃশ্য পুলকিত চিতে,
যখন যে দিকে চাই,
কত মত দেখি তাই,
কেমনে বর্ণিব আহা। ভালবাসি কেন?
কেন ভালবাসি তারে বলিতে না পারি
সূত্রে গাঁথা মণি যথা,
মণিকা প্রস্ফুটিত তথা,
একই বন্ধনে এবে আছে নিরন্তর,
কেন ভালবাসি তারে কে দিবে উত্তর
সুখময় স্মৃতিসনে
আছে গাঁথা এক প্রাণে,
কাটিবে শৃঙ্খল যবে জানিবে তখন,
কেন ভালবাসি তারে পাইবে উত্তর

শ্রীযোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বর্ষালীলা।

আজি দিগন্তে খেলিছে দামিনী,
ঘনাইছে ঘন গগনে।
(ওই) যত দিকে হেরি ঝরে বারিধারা,
মগন বসুধা স্বপনে।
(যেন) দিক বধূ যত মিলিয়া,
আকুল চিকুর খুলিয়া,
(চাক) মুখে মৃদুহাস, পরিধেয় বাস,

উড়ায় হরষে পবনে।
(যত) লাজহীনা অভিসারিকা,
(যায়) অভিসারে ফুল মালিকা
(ঘন) আঁবার বিধুর, কনক নূপুর,
শিঞ্জিছে চল-গমনে।
(আজি) ধন্য ভবনে শয়নে,
পূজিছে মানস জননে,
(যত) মুক্তবসনা ছিন্নবসনা,
আবেশ মুদিত নয়নে।

কোথা ওগো অভিমানিনি!
প্রেমময়ি!-মৃদু হাসিনি!
(মম) চিরউপোষিত, তাপিত তৃষিত,
লুণ্ঠিত চিত, চরণে।
(বাঁধ) কিশলয় ভুজ বাঁধনে;
(থাকি) সক্কব হৃদ-শয়নে
(ভুলি) বিরহ মিলন, হরষ বেদন,
জনম মরণ, সলনে॥

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি, এ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পণ্ডিত। "বহ্' ধাতু লট্ তি কি হব?

ছাত্র। বহতি।

পণ্ডিত। আচ্ছা, একটা পদ রচনা কর দেখি।

ছাত্র। (ভাবিয়া) অশ্বঃ শকটং বহতি।

পণ্ডিত। 'আচ্ছ' ঐটিকে অনুজ্ঞা অর্থাৎ লোট "হি" দিয়া ব্যবহার করিলে কিরূপ হইবে?

ছাত্র। (অনেক ভাবিয়া) চল্, হট্-হট্, ডি-ডি ডি।

* * * *

আদেশ প্রতিপালন। মা। মেধো, তোকে আর বোঁধোকে দুজনকে দুটো কমলানেবু দিয়ে বল্লুম এখন খাস্‌নি বিকেলে খাবি। তোরাও তখন দুজনেই বল্লি "তাই হবে"। তবে যে বড় আমার কথা অগ্রাহ্য কল্লি?

মেধো। না, মা, তোমার কথা ত অগ্রাহ্য করিনি। বোধোর লেবুটা আমি খেয়েছি, আমারটা বোধো খেয়েছে।

ছেলের খরচ। বাবু। হাঁহে গোবর্দ্ধন, কতকগুলা জিনিষ আমার নামে খাতায় খরচ লিখেছ আমি ত এসকল এখান হইতে লই নাই—এই দেখনা—এর মানে কি? এক মুঠা ছোলা—৫, এক পকেট কিস্‌মিস্—/১০, দুগাল চিনি—৫১০ ?

মুদি। আজ্ঞে এর মানে, বাবুরা ছেলে নিয়ে বাজার করতে এলে ছেলের খরচ শুদ্ধ দিতে হয়।

* * *

মিস্ সুমিষ্টা-ষোড়শী। বুটে আপনার আঙুল মাড়িয়ে ফেলেছি—লেগেছে বোধ হয়—মিঃ ডট্ ?

মিঃ দত্ত। (অত্যধিক নম্রতা সহ)—কিছু না, কিছু না, কিছু-মাত্র লাগে নি—আমার আঙুল আছে বলে মাপ করবেন!

* * * *

সেকালের লোক পাগল ছিল না। সেকালের লোক জুয়া খেলিত না, কাযেই রাতারাতি আমীর হইবার আশায় ফকির হইত না। তাহারা জামা গায় দিত না—সে জন্য তাহাদের বোতাম হারাইত না। এমন কবিতা লিখিত না, যাহা পত্র-সম্পাদকেরা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিত। তাহাকে এক গোছা চাবী লইয়া অন্ধকারে তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিতে হইত না। এক মিনিটের জন্য ট্রেণ ফেল হইয়া পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ষ্টেসনে রাত্রে তিন ঘণ্টা বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইত না। সিল্কের জামা পরিয়া শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় তাহাদের বাড়ীর দরজায় কাদায় পড়িতে হইত না। আদালতে মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিয়া এটর্ণির বিলে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। স্ত্রীর প্রথম গহনা খানি স্বর্ণকারের নিকট হইতে লইয়া আসিবার সময়

পথে হারাইতে হইত না। এই সকলেই লোককে পাগল করে। সেকালে এ সব ছিল না, কাযেই তখনকার লোক পাগল ছিল না।

* * *

প্রঃ। এ সংসারে সুখী কে?

উঃ। যে নিজে কালা, অথবা যাহার গৃহিণী বোবা।

* * *

ট্রাম কন্‌ডক্টার। হাঁগা তোমার ছেলের বয়স কত?

যুবতী মাতা। আ মর মিন্‌সে, আমি বুড়ি নাকি? তাই আমার ছেলে এত বড় যে তা'র ভাড়া লাগ্‌বে?

* * *

বুঝিবার ভুল। আজকাল চীনযুদ্ধ প্রসঙ্গে লাই হংচাংএর নাম অনেকের পরিচিত। এই মন্ত্রীবরের বিলাত প্রবাসের সময় তাঁহার কোনও বন্ধু একটী সুন্দর টেরিয়ার কুকুর পাঠাইয়া দিয়া নিম্নলিখিত প্রাপ্তিস্বীকার পত্র পাইয়াছিলেন।—

প্রিয়—,তোমার প্রেরিত কুকুর পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি আজকাল সারমেয় মাংস পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার পারিষদবর্গকে কুকুরটি দিয়াছিলাম, তাহারা বলে এরূপ সুস্বাদু মাংস অনেক দিন হইল আস্বাদন করে নাই। ইহাতে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হইবে।

তোমারই

"লাই"

* * *

ছোট লোক। আন্দামান দ্বীপবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় জাতি। ইহাদের দৈর্ঘ্য গড়ে চার ফুটেরও কম এবং

ইহাদিগের মধ্যে এক মণ ওজনের লোকও খুব কম। কলিকাতার মিউজিয়মে এই জাতির প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

* * *

ঘোটক বলি। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসভূমি প্যারি সহরে বৎসরে লক্ষাধিক ঘোটক ভক্ষ্যার্থে নিধন করা হয়। সেখানকার অনেকগুলি হোটেলে ঘোটক মাংস অপরাপর সুখাদ্যের সহিত পরিবেশন করা হয়। প্যারি সহরে যাহা কিছু প্রবর্ত্তিত হয় তাহাই ফ্যাসান্; কারণ ইয়োরোপের আরও কএকটি মহানগরীতে উদর পূজায় ঘোটক বলি হইতেছে।

* * *

চীন প্রসঙ্গ।—চিনের মুল্লুকে ঘোড়ায় নৌকা টানে। গাড়ী পাল ভরে চলে। বৃদ্ধ লোকেরা বল খেলে ও ঘুড়ি ওড়ায়, আর বালকেরা গম্ভীরভাবে তাহা দেখে। কোনও চীনবাসী তাহার শত্রুর মরণ কামনা করিলে সে সেই শত্রুর দ্বারে গিয়া আত্মহত্যা করে। ইহাতে তাহার শত্রু ত বিনষ্ট হইবেই বরং চৈনিক আইনে তাহার শত্রুর পরিবার বর্গেরও জীবন সংশয়।

* * *

গ্রীনল্যাণ্ড দেশীয় বৃহৎ হোএল (whale) এক একটির ওজন প্রায় ২৭৫০ মণ অর্থাৎ ৮৮ টি হাতী বা ৪৪০টি বড ভালুকের সমান ভারী।

* * *

বোতল চুরীর প্রশ্ন। এক বুড়ির ৩২ বোতল মধু ছিল। সে বোতল গুলি এরূপ ভাবে সাজাইয়া রাখিত যে প্রত্যেক দিক হইতে গণিয়া সে নয়টি বোতল দেখিতে পায়, যথা :—

পল্লির এক পাজি ছেলে সেই ঘরে ঢুকিয়া বুড়ির মধুর বোতল চুরি করিত। সে তিন দিন ঘরে গিয়াছিল এবং প্রতিদিন চারিটি করিয়া বোতল সরাইয়া, বাকীগুলি এমন কৌশলে সাজাইয়া রাখিত যে বুড়ি প্রত্যহ যথাসময়ে চারিদিক হইতে নয়টি বোতল গণিয়া ঠিক আছে ভাবিত। পাজি ছেলেটা প্রতিদিন চারি বোতল লইয়া বাকী গুলি কি কৌশলে সাজাইয়া যাইত সুধীর পাঠক বলিয়া দিবেন কি ?

* * *

উল্টা নীতি। ভাবিয়া অস্থির ভোলা, বিধাতার একি লীলা, চানাচুর খেতে ভাল, তাহে ব্যামো করে। ঔষধ বিস্বাদ অতি, তাই খেলে দিবারাতি, থাকি ভাল উল্টানীতি, বিশ্বের ভিতরে।

* * *

শিক্ষক। যদি আমি বলি "ছাত্রেরা শিক্ষককে ভক্তি করে", এটি কিরূপ sentence হ'ল ?

ছাত্র। বিদ্রূপাত্মক।

* * *

নীতিবাক্য। কঠিনী (লেখনী) পুস্তিকা কন্যা পরহস্তগতা গতা়।
উদ্বেগঃ কলহঃ বস্তুঃ সেব্যমানে চ বর্দ্ধতে।

সমালোচনা।

আলাপিনী। সঙ্গীত বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা। সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রাদি অনেক আছে, সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক পত্র আর আছে কি না আমরা অবগত নহি। আলাপিনী সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিগণের একটি অভাব দূর করিয়াছে। "আলাপিনী"তে সঙ্গীতের স্বরলিপি ও সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। মূল্য সহরে ১৷৷০, মফস্বলে ১৸৶০।

প্রচারক। মধুমিয়া দ্বারা সম্পাদিত। "যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রকাশ কর", কোরান হইতে উদ্ধৃত উক্ত পদটিতেই "প্রচারকে"র উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ইহার লেখকগণ অধিকাংশই মুসলমান। ধর্ম্ম বিদ্বেষ ও জাতি বিদ্বেষ ভুলিয়া সত্য প্রচার করিতে পারিলে "প্রচারকে"র দ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে। হিন্দু মুসলমানে যতই প্রীতি স্থাপন হয় ততই মঙ্গল। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, ইহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হইল।

রাজভক্তি। "যাহাতে রাজভক্তি বীজ বালক বৃদ্ধ বনিতা হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় তাহাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য"। ইহাতে ছাত্রবৃন্দের লিখিত রাজভক্তিসূচক প্রবন্ধ গৃহীত হইয়া থাকে। পত্রিকা খানি অতিশয় ক্ষুদ্র, মূল্য সহরে ।৴০, মফস্বলে ৷৷০। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র পত্রিকাদ্বারা ওই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব কি না সে বিষয় সন্দেহ। আর এক কথা, রাজভক্তির কি এতই অভাব হইয়াছে? আর যদি সত্য সত্যই হইয়া থাকে, তবে রাজা ভিন্ন প্রজা[illegible] হৃদয়ে [illegible] উৎপাদনে অন্য কেহ সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না।
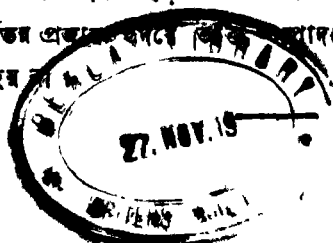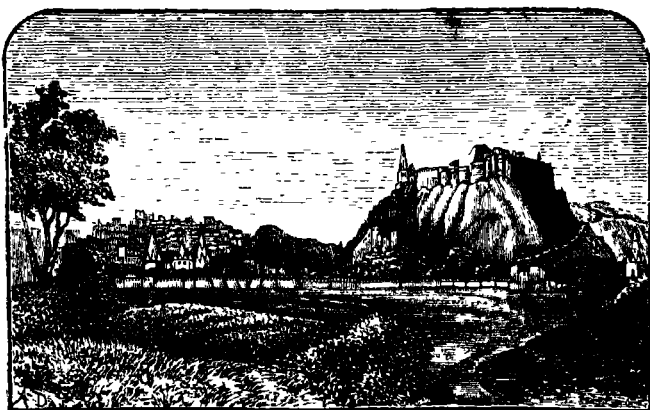
যোধপুর।

প্রয়াস ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। ELM PRESS, CALCUTTA

প্রয়াস।

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ। সেপ্টেম্বর, ১৯০০ সাল। নবম সংখ্যা।

সাত্ত্বিকা।

১

ঢালিছে দোয়েল মুক্ত আকাশে,—
—গহন বক্ষঃ মথিত বাতাসে,—
সঙ্গীত ধারা,—প্রত্যূষে হাসে
রবিকরে তাল তরু;
অলি গুঞ্জন, পরশে শ্রুতি,
ডালে খঞ্জন, সুন্দর অতি,
ভাসে নিকুঞ্জে, বসন্ত গীতি,
বিহরে কলাপী চারু।

বসিয়া হরিণী, দীর্ঘ নয়না,
ধ্যান মগ্না দিক অঙ্গনা,
উঠে প্রকৃতির পূর্ণ প্রার্থনা,
মুক্ত স্বর্গ পানে
উন্নত ভাবে মুগ্ধ হৃদয়,
হেরি চারি ধার, কি মহিমাময়,
আনন্দ স্রোত, উথলিয়া বয়,
ভক্তি ঢালিয়া প্রাণে।

২

লভিয়া বিরাম, উরসে গিরির,
হেরি বিস্তৃত নিম্নে কুটীর,
বিরাজে সৌম্য তাপস সুধীর,
সুরভি কুসুম প্রায়;
ধাইছে সরিৎ, ভেদি' ছায়া রাশি,
সফেণ উর্ম্মি হাসে অট্ট হাসি,
উদাস প্রকৃতি, বায়ু উচ্ছ্বাসি'
পরাগে পূজিয়া যায়।

শিহরে শান্ত, শষ্প শ্যামল,
শীকরে স্রান্ত, পুষ্প—সকল,
সুদূর অস্ত, প্রভাত বিমল,
ক্লান্ত কানন ভূমি;
দূর হ'তে আসে আরতি-ধ্বনি,
বসি' সানুদেশে, স্তোত্র হ'য়ে শুনি,
অন্তরে ভাসে, ভাব মন্দাকিনী
এই যে দীনেশ তুমি!

আনে আনন্দ, সান্ধ্য পবন,
হ'তে নির্ঝর, শ্যাম কানন,
আমারে বেষ্টি' বরি' বিচরণ,
মধুর মন্দ বয়;
শস্য মর্ম্মর শ্রুতি পরশে,
নিশা সঙ্গীত, ঝিল্লি ঝঙ্কারে,
আসিছে তন্দ্রা, পূর্ণিমাকাশে,
সুখে ভাসে তারা চয়।

শিশির বিন্দু, ক্ষেত্র শোভন,
কাঁপে পল্লব, তট নির্জ্জন,
নগ্ন প্রকৃতি, মগ্ন নয়ন,
শান্তি মানসে রাজে;
মাধুর্য্যে ভরি' উঠেছে হৃদয়,
নেহারি বিশ্ব, যেন ছায়াময়,
হাসে সম্মুখ, অমর আলয়,
বিকচ আত্মা মাঝে।

স্বভাব দায়িকা, সাত্বিকা অয়ি
তুমি যে অমরী, কল্যাণময়ী,
দিব্য প্রসাদে, করিছ বিজয়ী,
নিত্য জীবন রণে,
হইলে আর্ত্ত, তাপ বিষণ্ণ,
মোহিলে মর্ত্ত্য গর্ব্ব জঘন্য
কর প্রশান্ত, সুধা প্রসন্ন,
বিতরি খিন্ন মনে।

শুষ্ক হৃদয়ে, দৈন্য বিনাশি'
পূণ্য নয়নে, জ্যোতিঃ বিকাশি'
বিভিন্ন করি, কল্মষ, রাশি,
স্বর্গ আশিষা দাও;
প্রীতি প্রফুল্ল করিয়া হৃদয়,
আপ্লুত করি' স্নেহ, করুণায়,
দিবায় নিশায়, তব গরিমায়,
পবিত্র করিয়া যাও।

শ্রীরসময় সাহা।

বিহারিলাল।

ধর্ম্ম বিশ্বাসে।

বিহারিলালের জীবদ্দশায় একটী অপবাদ ছিল—তিনি নিরীশ্বরবাদী। বিহারিলাল এটীকে অপবাদ বলিয়া গণ্য করিতেন না, প্রত্যুত তিনি নিজেই এক সময়ে সাধারণের এই বিশ্বাসে প্রশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তিনি গাহিতেন—

ফক্কিকার
ফক্কিকার, ফাক্কার, ফক্কিকার।
(আমি) চোক বুজিয়ে শুধুই দেখি অন্ধকার!
ইত্যাদি।

কিন্তু বিহারিলালের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য, তাঁহার প্রত্যেক রচনা, তাঁহার এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিপক্ষে সাক্ষ্য দান করে এবং শেষ জীবনে তিনি নিজেও তাঁহার ভ্রম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার উদার মতাবলম্বী প্রতিভালোকদীপ্ত হৃদয় মানবগঠিত প্রতিমার ধ্যানার্চ্চনায় বা মন্ত্র পাঠে শান্তি পাইত না বলিয়া, তিনি ব্রাহ্মণ কুলোচিত দেবদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি ও প্রেমানন্দে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বলিয়া, মনে করিতেন তিনি বুঝি নাস্তিক, এই ধারণায় তাঁহার হৃদয় নিরতিশয় অনুতপ্তও হইত। তিনি শেষ জীবনে একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া নিকটস্থ দেবদেবীমন্দিরগুলি হইতে সান্ধ্য আরতির শঙ্খ ঘণ্টা রব ও আনন্দবিভোর ভক্তগণের "মা মা" শব্দ শ্রবণে বেদনাব্যঞ্জক করুণ কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

আমার আনন্দ নাই,
আমার সে ভক্তি নাই ;
সেই ভোলা খোলা প্রাণ হারায়ে আঁধারে
করিয়া জ্ঞানীর ভান,
পুষি বুকে অভিমান,
ঘোর পৌত্তলিক, সদা পূজি আপনারে।

বড়ই মর্ম্মান্তিক আত্ম তাড়না। শুধু আত্ম অনুযোগ নহে, কাতর ক্রন্দন, আকুল আহ্বানও আছে। তিনি গাহিতেন—

সবই গেছি ভুলে,
আমি সবই গেছি ভুলে,
জাগহে প্রাণের প্রাণ দাও মনের ধাঁধা খুলে !
ভিতরে কাতরে প্রাণী,
সুখী ভেবে অভিমানী
মরণ যে কি বিষাদ, যেন তা জানিনে মূলে।

যাঁহার অন্তরাত্মা জগৎপাতার দর্শন লাভ করিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া উঠিত, যিনি হৃদয়ের অনিরুদ্ধ আবেগে সজলনয়নে ডাকিতেন—

কোথায় !
দাও দরশন !
কাতর হয়েছে প্রাণ, রহেনা জীবন।
চির সাধনের ধন !
ধ্যানে, কেন অদর্শন !

তিনি কি নাস্তিক ? যিনি আজীবন বিশ্বশিল্পীর রচনা কৌশলে মন্ত্রমুগ্ধ, যিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের, অপার প্রেম করুণার পূজায় একনিষ্ঠ, তিনি যদি নাস্তিক, তবে আস্তিক কে ? নামে কিছু কি আসয়া যায় ? বিহারিলালের আরাধ্যা সারদার কি জগদ্ধাত্রী হইতে স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে ? কবি শেলি প্রকাশ্য ভাবে আপনাকে নাস্তিক বলিয়া জগতের নিকট বিজ্ঞাপিত করিলেও, তাঁহার একজন জীবনী লেখক (Mr. J. A. Symonds) বলিয়াছেন—

"He (Shelley) had a vital faith, and this faith made the ideals he conceived seem possible—* * faith in the gospel of liberty, fraternity, equality; faith in the divine beauty of nature, faith in a love that rules the universe; faith in the perfectibility of man; faith in the omnipresent soul, whereof our souls are atoms; faith in affection as the ruling and co-ordinating substance of morality. The man who lived by this faith was in no vulgar use of the word an Aetheist."

২ sense

বিহারিলালের সাম্য, মৈত্রী, সৌন্দর্য্য, প্রেমের উপর বিশ্বাস শেলি বা জগতের অপর কোন কবি অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। Kant প্রমুখ পাশ্চাত্য নিরীশ্বরবাদী (Aetheist) দিগের ন্যায় জগদীশ্বরের অস্তিত্ব অসম্ভব এরূপ বিপ্লবকারী মতও কখন তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই। শুনা যায় বিহারিলালের শিক্ষাগুরু পণ্ডিত ৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাংখ্য মতাবলম্বী ছিলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন। বিহারিলালের রামকমল বাবুর উপর কিরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রামকমল বাবুর বিশ্বাসে যে তাঁহার আস্থা জন্মিবে ইহা বিচিত্র নহে। সেই কারণেই বোধ হয় তিনি অজ্ঞেয়বাদীদিগের (Agnostic) ন্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে কখন কখন স্রষ্টার স্থিতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেন, কিন্তু, এই দার্শনিক নাস্তিকতা যে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই, ইহা যে ভ্রান্তিমূলক, সে বিষয়ে তাঁহার নিজের রচনাই সাক্ষ্যদান করে। তিনি সঙ্গীতশতকে গাহিয়াছিলেন—

> কেবে এ পাষণ্ড তাঁরে বুঝিবারে চায়?
> পেয়েছে আত্মাতে বোধ যাঁহার কৃপায়;
> গর্জ্জমান বজ্র রোষে কাঁহার মহিমা ঘোষে?
> কাঁর প্রভা চমকিছে বিদ্যুৎ ছটায়?
> সুধাকর স্বচ্ছ করে, চকোরের নেত্রোপরে
> কাঁর গরীয়ান নাম, স্পষ্ট লিখে দেয়?
> যে সময়ে এ সংসার, ধরে ঘোর অন্ধকার,
> বিকট জন্তুর ন্যায়, গ্রাসিবারে ধায়,
> দশ দিক্ ছায় যার, প্রাণ দায় হয় তার;
> সে সময়ে কা'র শান্তি সান্ত্বয়ে আত্মায়?

যে ব্যক্তির ঈশ্বরবিশ্বাস এইরূপ ছিল, তিনি যে কখন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এরূপ ধারণায় ভ্রান্ত হইয়াছিলেন ইহাই বিস্ময়কর। যিনি

বাহিরে শুদ্ধাচারী, অন্তরে পূতমনা ছিলেন, যিনি হিন্দু সমাজের কোন বন্ধনই ছিন্ন করেন নাই, কোন আচারই লঙ্ঘন করেন নাই, তাঁহাকে কেবল নামাবলী, তুলসীমালা, তিলকসেবা ও অন্যান্য ধর্ম্মধ্বজার অভাবে নাস্তিক স্থির করাও অসঙ্গত নহে কি? কয়জন আস্তিক বিবেক সমক্ষে অকপটে বলিতে পারেন "জীবনে এমন কোন কায করি নাই, যাহাতে ঈশ্বরকে ভয় করিতে হইবে।" বিহারিলাল এই কথা বলিতেন। ক্ষুদ্র মানবের বড় স্পর্দ্ধার কথা! কিন্তু বাক্‌সর্ব্বস্ব গর্ব্ব করা বিহারিলালের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল।

বিহারিলালের কবিতায় নারীপূজার প্রাবল্য দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে কোম্‌ত (Auguste Compte) মতাবলম্বী (Positivist) সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে নারীপূজা পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদের একটী অঙ্গ হইলেও, উহা বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের অংশীভূত, সনাতন হিন্দুদিগের জগদ্ধাত্রীও স্ত্রী।

বিহারিলাল বাল্যে যৌবনে এবং শেষজীবনে একেশ্বরবাদী, আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, প্রৌঢ়বয়সে কখন কখন সন্দেহ দোলায় দুলিয়া আপনিও ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং নিরীশ্বরবাদী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া পরকেও ভ্রমে ফেলিয়াছিলেন। শেষজীবনে তাঁহার এই সন্দেহ বিকার অন্তর্হিত হইয়াছিল, তিনি শান্তি স্নিগ্ধ সুরে তন্ময় হইয়া গাহিয়াছিলেন—

কে, কে জানি আমারে ভালবাসে মনে মনে।
যখন যেখানে থাকি, চেয়ে আছে মুখ পানে।
কে আমার কাছে, কাছে সদাই আগুলে আছে,
দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভোরে,
আকাশে প্রকাশে আসি হাসি হাসি চন্দ্রাননে!

অন্তিমে।

দীর্ঘকাল ব্যাধি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিহারিলালের দৈহিক বলের হ্রাস হইয়াছিল, মন অবসাদে গ্রস্ত হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার মনের নৈতিক শক্তি ও তেজ আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল। বিহারিলালের ন্যায় চরিত্রবান ব্যক্তি, ইংরাজিতে যাহাকে "a man with a strong back-bone" বলে, সেরূপ মনের বলে বলীয়ান ব্যক্তি এদেশে এক্ষণে যথার্থই বিরল। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অন্তিম সময় পর্য্যন্ত কিরূপ প্রবল ছিল, তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কন্যাগণের বিবাহ ও পুত্রগণের সুশিক্ষাদানের জন্য বিহারিলালকে শেষ দশায় ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। বিহারিলাল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উক্ত ব্যয় উপলক্ষে নিজ পত্নীর নিকট হইতে কয়েক সহস্র মুদ্রা মূল্যের অলঙ্কার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং ঐ অর্থের তিন সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন নাই। এই ঘটনার পর ৮.১০ বৎসর অতীত হইয়া যায়। বিহারিলালের পত্নী ভ্রমেও একথার উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই এবং কালক্রমে ওকথা বিস্মৃত হইয়া যান। এক দিন অন্তিম শয্যাশায়ী বিহারিলাল সহসা তাঁহার প্রিয় পত্নীকে বলিলেন "আমি তোমার নিকট তিন সহস্র মুদ্রার জন্য ঋণী।" কবির সহধর্ম্মিণী প্রথমতঃ স্বামীর এই আকস্মিক কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু যখন বিহারিলাল স্পষ্ট করিয়া তাঁহার বক্তব্য বুঝাইলেন, তখন সাধ্বী স্ত্রী পীড়িত স্বামীকে সেই অতীত কথার পুনরুত্থাপন করিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। কবি সে

নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় মধ্যম ও তৃতীয় পুত্রদ্বয়কে (উভয়েরই অদূর ভবিষ্যতে কৃতী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল) নিকটে আহ্বান করিয়া আনাইয়া বলিলেন—"আমার একটী আদেশ আছে, তোমরা পালন করিবে কি?" পুত্রেরা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে কবি বলিলেন "তোমরা আমার নিকট শপথ কর যে স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে যত শীঘ্র পার, তোমাদের জননীকে প্রত্যেকে দেড় হাজার টাকা প্রদান করিবে।" পুত্রেরা হৃষ্ট চিত্তে সে সত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহা রক্ষাও করিয়াছেন। বিহারিলাল তাঁহার পত্নীকে যে সকল গুণবান পুত্রগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতে কবির এই কার্য্য অনেকের নিকট অনাবশ্যক বোধ হইতে পারে। বিহারিলাল, তাঁহার পুত্রগণের সদ্‌গুণে ও মাতৃস্নেহে সন্দিহান ছিলেন না, অথচ তিনি ঐ কার্য্য অনাবশ্যক ভাবেন নাই, তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান অনুরূপ ছিল।

বিহারিলালের জীবনীশক্তি অতীব বলবতী ছিল বলিয়াই তাঁহাকে নির্ম্মম ব্যাধি বহু বৎসর শয্যাশায়ী করিতে পারে নাই, এবং পরিশেষে শয্যা গ্রহণ করিয়াও তিনি মাসাবধিকাল উহার সহিত জীবন মরণ সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসারও কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই, তিনি সুপ্রসিদ্ধ ও বিচক্ষণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের এবং পরলোকগত ম্যাক্‌কোনেল সাহেবের চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু বহুমূত্র পীড়ার (Diabetis) নিকট কাহারও নিস্তার নাই, বিশেষতঃ অভাগিনী বঙ্গভূমির প্রতি ঐ ব্যাধি বড়ই দয়াহীন। ভারতচন্দ্র, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রজনীকান্ত প্রভৃতি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের কতগুলি দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ককেই না এই নিয়তিনির্দ্দিষ্ট আততায়ী

কঠোর হস্তে স্থানচ্যুত করিল? প্রাচীন বঙ্গের শেষ কবি বিহারিলালও ইহারই কবলে পতিত হইলেন।

মৃত্যুর পক্ষাতীত কাল পূর্ব্ব হইতে বিহারিলাল সচেতনে অচেতন অবস্থায় জীবিত ছিলেন। সেই সুদীর্ঘ যাতনাময় অবস্থা দর্শকের পক্ষে সময়ে সময়ে অসহনীয় হইত। পুত্র কন্যার আর্ত্তনাদ, প্রাণ প্রতিমা সহধর্ম্মিণীর আকুল বিলাপাশ্রু, মরণের তীব্র যন্ত্রণায় সকলই, অধিকাংশ সময় তাঁহার অননুভূত থাকিত। পরিশেষে বঙ্গীয় ১৩০১ সালের, জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশ দিবসে, বেলা ৯ ঘটিকা ৪৫ মিনিটের সময়, এই অসহ্য যন্ত্রণার অবসান হইল। পূর্ণ আটান্ন বর্ষ বয়ক্রম কালে বিহারিলালের ধ্যানস্তিমিত নেত্র চিরমুদিত হইল। কবির দেহ লইয়া যখন তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ সন্নিকটস্থ নিমতলার দাহ ঘাটে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের অনেকেরই মনে কবির একটী বহুবার কথিত উক্তি, স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হইল। কলিকাতার শ্মশানে একজন পুণ্যাত্মার চিতাশয্যার পার্শ্বেই হয়ত একজন অতি অপবিত্রকায় পাপাচারীর চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া উভয়কে এক সঙ্গে দাহ করা হয়, কবি এই কথার প্রায়ই উল্লেখ করিতেন, ও আত্মসম্প্রীতি প্রকাশার্থে বলিতেন, যে তাঁহার পিতৃদেবের দেহ সৎকারকালে এই অসন্তোষকর ঘটনা ঘটে নাই, সে সময় নিমতলার দাহ ঘাটে আর একটীও শব আনীত হয় নাই। ৺দীননাথ ঠাকুরের মৃত্যুকাল অপেক্ষা বিহারিলালের মৃত্যু সময়ে এই রাজধানীর জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে কবির দেহ সৎকার সময়েও শ্মশান প্রাঙ্গণে আর একটীও মৃতদেহ আনীত হয় নাই, পবিত্রচেতা কবির পূতদেহ নিভৃত ভস্মাবশেষ হইয়াছিল। মানব মনের প্রীতি অপ্রীতির অতীত পুণ্যলোক হইতে কবির মুক্তাত্মা এই দৃশ্য অবলোকন

করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু কবির পুত্র ও আত্মীয়বর্গ এই ঘটনায় কিছু বিস্মিত ও নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

বিহারিলাল জীবনে যাঁহাদের নিকট আদর পাইয়াছিলেন, মরণেও কেবল সেই কয়জনই তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিল। তাঁহার কয়েকটী ভক্ত, হৃদয়ের অনিরুদ্ধ আবেগে বঙ্গীয় মাসিক পত্র সমূহ কবির স্তুতিগান গাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বিষাদের ক্ষীণতান, উচ্চতর কোলাহলময় বঙ্গসমাজের অনাবিষ্ট লোক কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে না করিতেই মিলাইয়া গেল।

বঙ্গসমাজ জানিয়াও জানিল না যে তাহাদের দীনহীন কাব্যজগতে একটী ইন্দ্রপাত হইল। বিহারিলালের ভক্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুকবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের সাময়িক করুণ ও প্রাণস্পর্শী হৃদয়োচ্ছ্বাসটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

(১)

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রাতমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদ কাঁদ—জনমভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

(২)

"এসেছিল শুধু গাহিতে প্রভাতি,
না ফুটিতে ঊষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিল ধীরে ধীরে।
ঘুম-ঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্ন-বাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।

(৩)

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ
কি অতল হৃদি—কি অপার স্নেহ!
হা ধরণি, তুই কি অপরিমেয়
কি কঠোর কি কঠিন।
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি
জেগে থাকে নিশিদিন?

(৪)

উদার আকাশ! প্রভাত বাতাস!
চাহ গো, কাঁদগো, ফেলগো নিশ্বাস।
আরো ফুল ফল আরো তৃষ্ণা আশ
দাও দাও ধরা বুকে।
শিখাও জীবনে করিতে বিশ্বাস,
ঘুমাও মরণ-সুখে।

(৫)

মৃত তোমার ভক্ত কাঁদ মা জাহ্নবি,
মৃত তোমার শিশু কাঁদ গো অটবি,
হে বঙ্গ-সুন্দরি, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর।
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার।

(৬)

কাঁদ তুমি কাঁদ। জ্বলিছে শ্মশান—
কত মুক্তাছত্র, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে।
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান
ওই যায় লোকান্তরে!

(৭)

যাও, গুরো, যাও, বুঝিয়াছি প্রিয়—
মানব হৃদয় কতই গভীর,
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ।
কেবা বাণীপায় রাখে নিজ শির,
নিজ পায়ে পর-মত।

(৮)

বুঝিয়াছি গুরো, কত তুচ্ছ যশ,
কি রূপা কবিতা—কত সুধারস,
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!
পুত মত্ততায় মুগ্ধ দিক্দশ,
তাহা কিবা গরীয়সী।

(৯)

বুঝিয়াছি, গুরো, কোথা সুখ মিলে—
আপনার হৃদে আপনি মরিলে।
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্ম পর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পায়ে লোটে চরাচর।

(১০)

বুঝিয়াছি, গুরো, কিবা শ্রেয় ভবে—
কি যোগ-মত্ততা কবিত্ব সৌরভে।
সুখদুখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিল আরাধ্য লাগি।
ধন জন মান যার হয় হবে—
তুমি চিরস্বপ্নে জাগি!

(১১)

তাই শোক হোক। অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে;
বাল্যহংস সম প্রেম গুঞ্জরণে
চরণ দুখানি ঘেরি।—
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
সকরুণ প্রেম হেরি।

(১২)
তাই হোক তাহা। ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে ;
দেখুক প্রেমিক সুগভীর ঘামে

স্বপনে জগত ঢাকি—
নামিছে অবনী ওই গীত ধরি
আঁচলে মুছিয়া আঁখি।

কুড়ান খাতা।

(১)

বরষাধারাশীতল ধরণীর শ্যামবক্ষের উপর সন্ধ্যার তিমির ছায়া যখন বেশ ঘোরালো হইয়া আসিল, বন্যকুসুমগন্ধবাসিত গীতিময়ী রজনীর নীরবতা, সুষুপ্তির অবসাদ ঘনাইয়া আনিল, তখন শয়ন গৃহের বাতায়নটী খুলিয়া দিয়া শয্যার স্নেহময় কোমল ক্রোড়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলাম। বাদলের দিনে আফিমের মাত্রাটা কিছু চড়াইয়া দিয়াছিলাম।

শয়ন করিলাম বটে ; কিন্তু এমন সঘন মেঘমণ্ডিত বর্ষার কবিত্বময়ী নিশায় কি জানি কেন নিদ্রা আসিল না। গৃহিণী তখনও গৃহান্তরে। বিদ্রোহী সময়টাকে কিরূপে বশে আনিব, বিনিদ্র অবস্থায় কি করিব। ভাবিতে ভাবিতে সহসা সেই পুরাতন জীর্ণ প্রায় খাতা খানির কথা মনে পড়িল। পথে সেখানি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। সেখানি কাহার লুপ্ত স্মৃতির সজাগ ইতিহাস তাহা জানিতাম না। তাই পাশে কত কি অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণ সেই জরাজীর্ণ পুস্তিকা খানির অন্তরালে লুকায়িত ছিল। সময়ে সময়ে তাহার একটু আধটু

---

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত "কনকাঞ্জলী" কাব্যের উৎসর্গ শীর্ষক কবিতা—কবির অনুমত্যানুসারে উদ্ধৃত।

পড়িতাম। সময়টুকু বেশ আমোদে কাটিয়া যাইত। সেই ছিন্ন প্রায় পুস্তিকার প্রতি ছত্রে কেমন একটা মোহ, কেমন এক প্রকার অশরীরী মাদকতা ছিল। পড়িতে পড়িতে সত্য ও অসত্যের মাঝখানে কেমন একটা সন্ধি ও অপার্থক্য ভাসিয়া উঠিত—বাস্তবজগতে অপার্থিব কল্পনা মূর্ত্তিমতী হইয়া উভয়ের ব্যবধানের দূরতা কমাইয়া আনিত।

নিদ্রা আসিতেছে না দেখিয়া বইখানি বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম। কিন্তু কখন আমার নিদ্রাক্লান্ত শিরোভাগ কোমল উপাধানের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছিল, কখন বা জাগরণ ও বিস্মৃতির মাঝখানে সুষুপ্তির মায়া যবনিকা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়াছিল ঠিক্ তাহা স্মরণ হয় না। কিন্তু এ তন্দ্রাঘোর অধিকক্ষণ ছিল না বলিয়া বোধ হয়।

সহসা একটা শব্দ হইল। অমনি নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। শশব্যস্তে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। বোধ হইল কে যেন ডাকিতেছে। অত্যন্ত কাতর, করুণ প্রার্থনার সুরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে। সে অহ্বান, সে ক্রন্দন, সে প্রার্থনা, প্রাণের মধ্যে, হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে একটা বিপ্লব বাধাইয়া দিল। বিপন্ন, সাহায্য প্রার্থনায় যেমন করিয়া ডাকে, ভক্ত ভক্তাধারকে যেমন করিয়া আহ্বান করে, পুত্র স্নেহময় পিতাকে যেমন করিয়া কাঁদিয়া ডাকে, এ যেন তেমনি করুণ আহ্বান!

বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। ছুটিয়া বাহিরে গেলাম।

(২)

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। সুনীল মেঘশূন্য আকাশে শ্বেত জ্যোৎস্নার প্রদীপ্ত মণি হাসিতেছিল। শ্যামল বৃক্ষলতায় রজত জ্যোৎস্না লুটাইয়া পড়িতেছিল। লীলাময়ী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী অস্ফুট কলভাষে প্রাণের গীতি গাহিতে গাহিতে চঞ্চল উচ্ছ্বাসে ছুটিতেছিল। পরপারস্থ শ্যামল

বনানী মধ্য হইতে অপ্সরার প্রণয় সম্ভাষণের মত কি মধুর রাগিণী মৃদু পবন হিল্লোলে ভাসিয়া আসিতেছিল!

বাহিরের এ আকুলতাময় দৃশ্য, প্রকৃতির অপরিহার্য্য কল্পনা প্রভাব, প্রাণের মধ্যে এক প্রকার অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। দূরে—অতি দূরে বংশীর ক্ষীণ তান শুনা যাইতেছিল। যেন কাহার হৃদয়ের সমুদয় বিষাদ বাঁশরীর মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

সেই অনির্দ্দিষ্ট বাঁশরীর তান লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। কেন যাইতেছি, কাহার জন্য চলিয়াছি, কোনপথে গেলে এ অদৃশ্য রাগিণীর সন্ধান পাইব, কিছুই জানিতাম না।

রণভেরী যোদ্ধার সমুদয় শরীরে যেমন একপ্রকার অব্যক্ত উত্তেজনা, সীমাহীন, অসহনীয় অধৈর্য্যের প্রবল তাড়িৎ প্রবাহ বহাইয়া দেয়, এই ক্ষীণ কাতর বংশীধ্বনি আমাকে তেমনি উত্তেজনায় উত্তেজিত করিয়া, মোহাবেশে ডুবাইয়া, টানিয়া লইয়া চলিল।

কোথা হইতে চুম্বকের মত এ তীব্র আকর্ষণ আসিল? কতদূর এইরূপে চলিলাম।

জ্যোৎস্না যেন ক্রমশঃ আরও ঘন, আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। দূরে—শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা যোগমগ্ন তাপসের ন্যায় দণ্ডায়মান। ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলাম। প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যানের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

এ কাহার অট্টালিকা, কাহারই বা উদ্যান? কেমন করিয়া আমি কোথা দিয়া পরের নিষিদ্ধ উদ্যানে আসিলাম কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

প্রাসাদের কোন কক্ষ হইতে উদাস, আকুল বাঁশীর স্বর আসিতে-

ছিল! আর সেই বংশীরবে মুগ্ধ হইয়া আমি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

উদ্যানের ক্ষুদ্র দ্বার আবদ্ধ ছিল। স্পর্শমাত্র যেন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রপ্রভাবে দ্বার মুক্ত হইল! নিঃসঙ্কোচে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একবারও মনে হইল না কেন এমন দুঃসাহসিকতা করিতেছি। যেন কোন অদৃশ্য আকর্ষণ আমার বাহ্য স্মৃতিকে মায়া আবরণে ঢাকিয়া, আমায় টানিয়া লইতে ছিল।

প্রকাণ্ড এক বকুল বৃক্ষ অনেকটা জায়গা অন্ধকার করিয়া নিস্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া ছিল। সেই বিস্তীর্ণ ছায়াময় বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরের বস্তু তখন আমার চক্ষুর উপর ঠিক্ প্রতিভাত হইতেছিল কিনা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কেবল ব্যথিত বেদনার মর্ম্মোচ্ছ্বাস আমার কাণের চারিপার্শ্বে বাজিতে ছিল। বাঁশীর স্বর কি ঠিক্ মানুষের ভাষার মত কাঁদিতে পারে?

সহসা সে ক্রন্দন থামিয়া গেল। কিন্তু শেষ তান তখনও হৃদয়ের মাঝে তেমনি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

পত্র মর্ম্মরের সহিত মৃদু পদধ্বনি আমার লুপ্তপ্রায় চৈতন্য ফিরাইয়া আনিল। চাহিয়া দেখিলাম, এক শুভ্রবসনা রমণীমূর্ত্তি! ওষ্ঠে অঙ্গুলি রাখিয়া সে যেন আমায় কথা কহিতে নিষেধ করিল। তারপর ধীরে ধীরে সম্ভ্রমের সহিত আমার হস্তে কিছু অর্পণ করিল।

প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে দেখিলাম—অঙ্গুরীয়।

বিস্ময়ে আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম। রমণী আমার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিল। আরব্যোপন্যাসের রহস্যময়ী রজনীর কোন স্বপ্ন জগৎ কি আজ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কল্পনা-কাশে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, না সত্য সত্যই আমি কোন অনির্দ্দিষ্ট

দুঃসাহসময় অভিসারের নায়ক! ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—এ ত স্বপ্ন নয়!

সঙ্কেতকারিণীর অবয়ব একটা দ্বারের পার্শ্বে গিয়া মিলাইয়া গেল। কলের পুত্তলী যেমন চালকের অভ্রান্ত, কৌশলময় হস্ত চালনে নির্দ্দিষ্ট পথে ফিরিতে থাকে, এই অজ্ঞাত রমণীর নির্দ্দেশ, ইঙ্গিত অনুসারে আমিও তাহার প্রদর্শিত পথে চলিলাম।

উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না কিরণে অন্তঃপুর প্রবেশ পথে খাটিয়ার উপর প্রহরী শুইয়া শুইয়া আসমানের পরীর স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহার বাম পার্শ্বে মার্জ্জিত, শোণিতপায়ী তরবারী অবহেলে পড়িয়াছিল। দেখিয়া আমার শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ যেন ক্রমশঃ বরফের মত জমিয়া যাইতেছিল।

সাহসে ভর করিয়া উন্মুক্ত পথে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সহসা চারি দিক হইতে একটা সুগন্ধ আমার চারিপার্শ্বে ভাসিয়া উঠিল।

(৩)

ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া গেল। একটা তীব্র উজ্জ্বল আলোক-স্রোত আমার সর্ব্বাঙ্গে উথলিয়া পড়িল। অজ্ঞাত পথ প্রদর্শনকারিণী ছায়ার মত একপার্শ্বে সরিয়া গেল। বিস্মিত কৌতূহলে গৃহের মধ্যে আমি প্রবেশ করিলাম।

অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়ন সন্নিধানে বিচিত্র পর্য্যঙ্কের অমল ধবল শয্যার উপর এক লাবণ্যময়ী, স্ফুটজ্যোৎস্নার মত রমণী বসিয়াছিল। কি স্নিগ্ধ মনোমোহিনী রূপ! তাহার স্থির, কম্পন হীন, সুদীর্ঘ কৃষ্ণতারক নয়নে কি রাগিণী ভরা দৃষ্টি! সেই দৃষ্টির তলে মুহূর্ত্তে কত স্বপ্ন জগৎ জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু বিষাদ ও মর্ম্ম বেদনার ছায়া সেই সৌন্দর্য্য বিলসিত নয়নপল্লবে শোকের চন্দ্রাতপ ফেলিয়া ছিল। যেন হাস্যচঞ্চল

উদ্বেলিত হ্রদের নির্ম্মল নীল জলরাশির উপর বৈশাখী মেঘছায়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল।

আমায় দেখিবামাত্র রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। বিষাদপ্লাবিত নয়নে যেন আনন্দের জয়োল্লাস মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল! তাহার লীলাময় উত্থানের সহিত সমুদয় সৌন্দর্য্যও যেন উচ্ছ্সিত, আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

মুখের দিকে না চাহিয়াই রমণী আমার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। আমার সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। এ কি ইন্দ্রজাল।

রমণী উদ্বেলিত কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি আসিয়াছ? দেবতা, স্বামীন্, অভাগিনীর সর্ব্বস্ব, এতদিন পরে কালামুখীকে মনে পড়িয়াছে? এই দেখ পাপিষ্ঠের কারাগারে শুধু তোমার আসিবার আশায় আজিও এ প্রাণ রাখিয়াছি। পাপিষ্ঠ লম্পটের সহস্র প্রলোভন, ভয় প্রদর্শন সহিয়াছি—সে কেবল তুমি আবার আসিবে বলিয়া। অভাগিনীর কাতর প্রার্থনা স্বর্গের দেবতা এতদিন পরে শুনিয়াছেন।"

আমার বিস্ময়, কৌতূহল সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম। রমণী যেন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—"তোমার ভুল হইয়াছে। তুমি কাহার কথা বলিতেছ?"

শোকমুগ্ধা বালিকা চমকিয়া আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। তাহার অশ্রুসিক্ত নয়নপল্লবে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সে দৃঢ় স্বরে বলিল,—"কে আপনি? এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?"

আমি বলিলাম—"তাহা ত আমি জানি না! কেমন করিয়া আসিলাম তাহাও ভাল বুঝিতে পারিতেছি না!"

রমণী আরও দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

আমি আবার বলিলাম—"ভয় নাই, আমার দ্বারা তোমার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। বরং আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয় তাহা আমি করিব। আমায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানে সকল বলিতে পার।"

সুন্দরী অনেকটা যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিয়াছিল। স্ফাটিকাধারের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি তাহার অশ্রুভরা পাণ্ডুমুখের উপর পড়িয়া জ্বলিতেছিল।

আমার আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কি না জানি না, বালিকা মৃদুস্বরে বলিল—"আপনি যিনিই হউন, আমার মন আপনার সৌজন্যের উপর বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে। আমি সব আপনাকে বলিব।

রমণী বলিতে আরম্ভ করিল।

(৪)

পল্লবিত বৃক্ষচূড়ে নীড় বাঁধিয়া কপোত দম্পতী যেমন অসীম অবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দশন স্বরূপ বাস করে, বীণা ও জ্যোৎস্নাকুমার নদীর তীরে ক্ষুদ্রকুটিরে তেমনি আনন্দে, তেমনি পুলকপুষ্পিত প্রাণে কাল কাটাইতেছিল। কিন্তু একদিন সহসা, অতর্কিত ভাবে তাহাদের সুখ-নির্ম্মল অদৃষ্টগগণে প্রলয়ের কাল মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল! তাহাদের সুখ শান্তিপূর্ণ কুটীরে অদৃষ্টের কঠোর বজ্র পতিত হইয়া, সে সুখ নিকেতন ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল।

বীণার বড় সখ। স্বামীর নিকট সে বড় মধুর বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিল। জ্যোৎস্নাবিধৌত সৈকতপুলিনে, নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া কবির কল্পনার মত দম্পতীযুগল যখন মধুর সঙ্গীত শাস্ত্র আলোচনা করিত, তখন যমুনা সে বংশীরবে উজান বহিত কি না, তাহা জানি না;

তবে কোন গুপ্তশ্রোতার হৃদয়ে যে বাসনার অনন্ত সমুদ্র উদ্বেলিত করিয়া দিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইত না।

কিন্তু এই বংশী শিক্ষাই তাহার অদৃষ্টাকাশের অজ্ঞাত কাল মেঘ খানিকে লোক চক্ষুর যবনিকা পাশ হইতে বাহির করিয়া আনিল।

কোন কার্য্যোপলক্ষে তাহার স্বামী একদিন দূরগ্রামে গিয়াছিল, ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইবে। গৃহকর্ম্মের পর একাকিনী বীণা কুটীর সমীপস্থ ললিত লীলাবিভঙ্গশালিনী তটিনীর তীরে গিয়া বসিল। এমন সে কত দিন বসিয়াছে। কত দীর্ঘ রজনীর অধিকাংশ কাল স্বামীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় থাকিয়া, একেলা বসিয়া বসিয়া, বাঁশী বাজাইয়াছে। সে নির্জ্জন নদীতীরে বড় কেহ আসিত না, কাহারও বড় একটা আসিবার আবশ্যক হইত না। তবে আম্রের সময় কচিত আম্রলোলুপ দুই একটী দলভ্রষ্ট রাখাল বালকের উচ্চকণ্ঠস্বর নদীতীরস্থ আম্রকানন প্রতিধ্বনিত করিত মাত্র, কখনও বা প্রশস্ত নদীর অপর পারে, দুই একখানি গমনশীল নৌকা দেখা যাইত। তাহাদের শান্তিকুটীরে মানবের কোলাহল কদাচিৎ শুনা যাইত।

সে দিন বীণার মনের অবস্থাটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। একটা স্থির গম্ভীর উদাস ভাব তাহার স্বভাব প্রফুল্ল হৃদয়ের উপর থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার হাতের বাঁশীও তেমন বাজিতেছিল না।

ক্রমে রজনী গাঢ় হইয়া আসিল। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোক চঞ্চল তটিনী বক্ষে সমুদয় হাসি যেন ঢালিয়া দিয়াছিল। স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া বীণা বাঁশী বাজাইতে লাগিল।

সহসা বোধ হইল যেন তাহার চক্ষে জগতের আলোক নিবিয়া

গেল। নাগপাশের মত কাহারা তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া শূন্যে শূন্যে লইয়া চলিয়াছে। তা'রপর আর তাহার কিছু স্মরণ হয় না।

তা'রপর যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সভয় কম্পিত হৃদয়ে সে দেখিল, যে সে এই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় এই কক্ষে শায়িত। ৪।৫টী দাসী তাহার সুশ্রূষা করিতেছে।

ক্রমশঃ বীণা জানিতে পারিল তাহার স্বামী যে জমিদারের সঙ্গীতাচার্য্য এই অট্টালিকা তাহারই। লোক মুখে পাপিষ্ঠ, বীণার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও গুণের কথা শ্রবণ করিয়া কৌশলে তাহাকে এখানে চুরি করিয়া আনিয়াছে।

সেই অবধি ছয় মাস বীণা এই কারাগারে আবদ্ধা। লম্পটচূড়ামণি, বীণার আত্মহত্যার ভয়ে এবং আরও কোন অজ্ঞাত কারণে আজিও বীণার শুভ্র পবিত্রতায় কলঙ্ক আরোপ করিতে পারে নাই। বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি ভাবিয়া সে এতদিন চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু আর সে কোন কথা এখন শুনিবে না। আগামী কল্য সে ফিরিয়া আসিবে, সেই দিন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, বীণাকে আত্ম সমর্পণ করিতেই হইবে।

আজ তিন দিন হইল, একদিন বীণা বাতায়নে বসিয়াছিল, এমন সময় দীন দরিদ্র বেশে তাহার স্বামীকে অদূরস্থ পথ দিয়া যাইতে দেখিয়াছে। অনেক কৌশলে সে স্বামীর নিকট তাহার অবস্থা জানাইতে পারিয়াছিল। জ্যোৎস্নাকুমার আজ তাহার উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ গোপনে স্থির হইয়াছিল। সঙ্কেতকারিণী পরিচারিকা বীণার অনুগতা ও বিশ্বস্তা। নিদর্শন অঙ্গুরী, সঙ্কেত স্বরূপ সে ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু বীণার অদৃষ্ট মন্দ, তাই তাহার স্বামী আসিয়াও আসিল না!

(৫)

বীণার কাছে তাহার শোকাবহ কাহিনী শুনিয়া আমার শরীর মধ্যে ক্রোধের তাড়িত প্রবাহ বহিতে লাগিল। মনটাকে খুব উচ্চতানে বাঁধিয়া স্থির করিলাম, বীণার উদ্ধার সাধন করিব।

বীণা ও পরিচারিকার সহিত নানাবিধ পরামর্শের পর উপায় স্থির হইল। নৌকাযোগে পলায়নই প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। উদ্যান পার্শ্বে গৃহস্বামীর একখানি নৌকা আছে জানিলাম। সব ঠিক্ কিন্তু একা হাল ধরিয়া বাহিব কিরূপে ?

বীণা তত দুঃখের সময়ও হাসিয়া বলিল—"সেজন্ত আপনি ভাবিবেন না, হাল আমি ধরিতে পারিব। স্বামীর নিকট ইহাও শিক্ষা করিয়াছিলাম।"

আমার আরও কিছু বুদ্ধি যোগাইল। অনুসন্ধান করিয়া একটী গুলিভরা ছয়নলা পিস্তল ও একখানি তরবারী পাওয়া গেল।

প্রস্তুত হইয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলাম। চারিধার সুপ্তি মগ্ন। বাহিরে তখনও প্রহরী মৃদুসমীর স্পর্শে, অতি আরামে ঘুমাইতে ছিল। সন্তর্পণে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম।

মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রিত প্রহরীর দেহ সবলে খাটিয়ার সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া দিলাম।

বিশাল অন্তঃপুরোদ্যান নিঃশব্দে পার হইয়া তিনজনে বাহিরে আসিলাম। আমাদের গতি রোধ করিবার কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল না।

নদীর তীরে আসিলাম। নদীপার্শ্বস্থ প্রাচীর গাত্রে লৌহকীলকে এক খানি তরণী আবদ্ধ ছিল, দেখিলাম। কিন্তু সেখানি আনয়ন করা কিছু আয়াস সাধ্য।

অন্য উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা সাঁতরাইয়া নৌকার নিকট গমন করিলাম। স্রোতের বিপরীত মুখে যাইতে হইল বলিয়া খানিক পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম।

যেখানে বীণা ও পরিচারিকা দাঁড়াইয়া ছিল নৌকা খানি সেই খানে কোনরূপে আনয়ন করিলাম। সবে তীরদেশে তরণীস্পর্শ করিয়াছে অমনি আমার মাথার উপর দিয়া সশব্দ একটা গুলি সাঁ করিয়া চলিয়া গেল। সভয় কম্পিত পদে উভয়ে তাড়াতাড়ি নৌকারোহণ করিলাম।

কম্পিত হৃদয়ে দেখিলাম যেন কোন মন্ত্রবলে সহসা সেই সুপ্তিমগ্ন অট্টালিকা জাগিয়া উঠিয়াছে। বড় বড় পালোয়ান, প্রহরী দ্রুতবেগে নৌকা ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে।

মুহূর্ত্তের জন্য আমার হস্ত, পদ, সকল ইন্দ্রিয় যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল; কিন্তু তখনি চৈতন্য হইল। উপস্থিত বিপদের বিষয় স্মরণ করিয়া আমার সমুদয় কার্য্যকরী শক্তি একত্রে জাগিয়া উঠিল।

নিপুণ কর্ণধারের মত দুই হস্তে বীণা হাল চাপিয়া ধরিল। আমার সঘন হস্ত সঞ্চালনে ক্ষুদ্র তরণীখানি স্রোতের মুখে পড়িয়া তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

পশ্চাতে কেবল বন্দুকের শব্দ লোকের কোলাহল, ও নিস্ফল ক্রোধের তীব্র চীৎকার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

তরঙ্গায়িত নদীর উপর দিয়া নৌকা দ্রুত মরালের মত ছুটিতেছিল। আমি বলিলাম—"বীণা, কোন দিকে এখন নৌকা ভিড়াইবে?"

বীণা আকাশ পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। পশ্চাতের কোলাহল বা আমার প্রশ্ন তাহার কর্ণে সম্ভবতঃ প্রবেশ করিল না।

সেই অবগুণ্ঠন মুক্ত, ভীত, রক্তশূন্য মুখে উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ পড়িয়াছিল। ফোঁটা কয়েক অশ্রুও বোধ হয় চক্ষু পল্লবে আসিয়াছিল।

আমি আবার বলিলাম—"বীণা, পশ্চাতে যমদূত নৌকাযোগে আসিবার উপক্রম করিতেছে। আমরা নদীর মোহানায় আসিয়াছি; কোন্‌দিকে তোমাদের গ্রাম বুঝিতে পার কি?"

বালিকা আমার পানে চাহিল—দৃষ্টিতে উদাস শূন্যতা লক্ষিত হইল।

সেই সময় চাহিয়া দেখিলাম, দূরে আর এক খানি নৌকা উজান ঠেলিয়া ও দ্রুতবেগে আসিতেছে। যে পারে শত্রু তাহার পরপারে আমাদের নৌকা। দ্বিতীয় নৌকা খানি শত্রুরা যে দিকে সেই পারে।

নৌকা মধ্য হইতে সঙ্গীতের ক্ষীণতান সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছিল। কে যেন গায়িতেছিল—

"কেঁদেছি জীবন ভ'রে, হাসি নাই একদিন!"—

বীণার কর্ণে সে স্বরলহরী বোধ হয় প্রবেশ করিয়া ছিল। বসন্ত সমীর স্পর্শে, শুষ্ক নিকুঞ্জ যেমন সহসা মরণ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠে, তুষার মগ্ন নদীর জল নিবেট পাষাণ স্তূপ ভেদ করিয়া উত্তাপ প্রভাবে সহসা যেমন উথলিয়া উঠে, সেই দূরস্থ নৌকারোহীর ক্ষীণ সঙ্গীততানে বীণা তেমনি ভাবে তাহার বিস্মৃতি-স্বপ্ন হইতে সহসা জাগিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল—"নৌকা ফিরাও।"

বলিতে বলিতে বীণা ক্ষীপ্রহস্তে হাল ঘুরাইয়া ধরিল।" কি কর, কি কর বীণা", বলিতে না বলিতে নৌকা ফিরিয়া চলিল।

বিস্মিত স্তম্ভিত কণ্ঠে বলিলাম,—"বীণা, কি করিলে, এখনি শত্রু হস্তে আমাদের প্রাণ যাইবে।"

বীণা উন্মত্তের মত বলিল—"এ যে আমার স্বামীর কণ্ঠ।"

গানের দ্বিতীয় চরণ এখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—

"আমার ভবের খেলা এরূপে কি হবে লীন?"

সজোরে দ্বিগুণ উৎসাহে হাল বাহিয়া বীণা বলিল "শীঘ্র চল ইনিই আমার স্বামী। ঐ নৌকায় আমার পার্থিব স্বর্গ।"

দ্বিতীয় নৌকা খানি অতি দ্রুত ছুটিতে ছিল। আমরা প্রাণ পণ বাহিয়াও নৌকার নিকটস্থ হইতে পারিলাম না। তখন প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিলাম "নৌকা ফিরাও, পারে শত্রু।"

বাতাসে আমাদের কথা ভাসিয়া গেল। ভবিতব্য অনিবার্য্য।

অগ্রগামী নৌকা ক্রমশঃ সেই অট্টালিকার সমীপস্থ হইল, দূর হইতে দেখিলাম। বহুসংখ্যক লোক কয়েক খানি নৌকা সাজাইয়া আরোহণ করিতে উদ্যত।

তাহাদের হস্তে মার্জ্জিত-অস্ত্র সকল চন্দ্রকিরণে ঝক্ ঝক করিতে ছিল।

বীণাও সকল দেখিয়া অতি হৃদয়ভেদী স্বরে বলিল—"সর্ব্বনাশ! আমার স্বামীর রক্ষা নাই।"

আমাদের নৌকা নক্ষত্র বেগে ছুটিল।

বৃথা চেষ্টা। অগ্রগামী নৌকা বিপক্ষ হস্তে পতিত হইল। জ্যোৎস্নাকুমারকে দুর্বৃত্তেরা বাঁধিয়া ফেলিল। এক ব্যক্তি তরবারী উত্তোলন করিল।

আমাদের নৌকাও তীরসংলগ্ন প্রায় হইয়াছিল। বীণা এক মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল, আর অমনি আমার হস্তস্থিত পিস্তলের গুলি যেন যন্ত্রচালিতবৎ বাহির হইয়া গেল। ঝন্ ঝন্ শব্দে আক্রমণ কারীর তরবারী ভূমে নিক্ষিপ্ত হইল।

তীরে নৌকা লাগিল। নিষেধ শুনিবার পূর্ব্বেই বীণা লম্ফ দিয়া নীচে নামিল। পলকমধ্যে বালিকা স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। আর এক ব্যক্তি সেই সময় জ্যোৎস্নাকুমারের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া বর্শা

তুলিয়াছিল। কিন্তু উন্মাদিনী বীণা সেই বর্ষা ফলকের সম্মুখে আপন বক্ষ পাতিয়া দিল।

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

* * * * * *

বিষম জোরে ঠেলিয়া দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "অমন কচ্ছ কেন, স্বপ্ন দেখেছ নাকি?"

উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া ঊষার স্নিগ্ধ আলোক, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। চক্ষু মুছিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। সত্যই স্বপ্ন দেখিতেছিলাম নাকি?

গৃহিণীর মধুর হস্ত স্পর্শের বেদনাটা তখনও অল্প অল্প বোধ হইতেছিল। শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি পুরাতন খাতা খানি পড়িয়া আছে।

সহধর্ম্মিণীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তাহাও লক্ষ্য করিল। ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিলে—"ঐ ছাই পাঁশ বুঝি কাল শুয়ে শুয়ে পড়েছিলে?" তোমায় বারণ করে দিয়েছি ওখানা পড়িও না তবু ছাই, তুমি কথা শুন্‌বে না।"

বলিতে বলিতে খাতাখানি গৃহিণীর কোমল কর-পল্লবাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলাম, তাইত এমন নভেলটা অসম্পূর্ণ হইয়া রহিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

শ্রীগণেশজী।

লীলাগললুলল্লোল কাল ব্যালবিলাসিনে।
গণেশায় নমো নীলকমলামলকান্তয়ে॥

অমলনীল কমলকান্তি গলদেশে লোলায়মান কালসর্পবিলাসী শ্রীগণেশজীকে প্রণাম।

শ্রীগণেশজী হিন্দুমাত্রের পরমারাধ্য দেবতা। ইনি সিদ্ধিদাতা ও সর্ব্বশাস্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্ম প্রারম্ভে ইঁহাকে স্মরণ করা বিধেয়। শ্রীগণেশজীর মূর্ত্তি সকলেরই হৃদয়ে জাগরূক আছে, সুতরাং এস্থলে ভট্টাচার্য্যকপোলকল্পিত সংস্কৃতচ্ছটাযুক্ত ধ্যান স্মরণ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহাই হউক, লম্বোদরদেব যে এককালে অতি বিস্তৃত রাজ্যভোগ করিতেন, তাহা শুনিলে হিন্দুগণ নিশ্চয়ই হর্ষোৎফুল্ল হইবেন। হিন্দুগণেশজী কিছুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণকায় অসভ্য হিন্দুদিগের পূজায় তৃপ্ত না হইয়া, শুভ্রকায় সভ্য পাশ্চাত্য দেশে রাজ্য বিস্তার করেন। তদ্দেশীয় মহাকবি সল্‌পিসিয়স্ তাঁহাকে সুন্দররূপে বর্ণিত করিয়াছেন যথা :—

Jane pater, Jane tuens, dive biceps biformis.
O cate rerum sator, O principium deorum.

পাঠক। সমুদ্রযাত্রা স্বীকার নিবন্ধন লম্বোদরদেবের নামটী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সিদ্ধিদাতার স্বভাব চরিত্র পূর্ব্ববৎ বিরাজমান আছে। আমরা দেখিতে পাই যে কোনও এক স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে "বসু" সমুদ্রপার করিলেই "ভোস্", হয়েন, 'সেন' "সানি' হয়েন, সুতরাং শ্রীগণেশজী সমুদ্রপার করিলে যে 'জেনসে'

নাম ধারণ করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু হিন্দুস্থানেও অহিন্দুস্থানে বসুজা, সেনজা, ও গণেশজীর জাতি, স্বভাব, চরিত্র সকলই পূর্ব্ববৎ থাকে। গণেশজী সিদ্ধিদাতা ও ধীসম্পত্তির অধিনায়ক দেবতা। ইঁহাকে যে কারণে সভ্যগণ চতুঃস্তুম্ভরূপে বর্ণিয়া থাকেন, সেই কারণেই হিন্দুগণ গজেন্দ্রবদন বলিয়া থাকেন। মোটের উপর, ধীর প্রশান্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আশ্রয়স্থান বলিয়া ইঁহাকে সভ্যাসভ্যমাত্রেই পূজা করিয়া থাকেন। উভয়েই ইঁহাকে সৃষ্টির আদিকারণ, জগৎপিতা, জনিতা, বলিয়া সর্ব্বযজ্ঞের প্রারম্ভে ইঁহার পূজার বিধান করিয়াছেন। সভ্য ও হিন্দুমাত্রেই সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে লম্বোদরকে ধূপাদি দ্বারা বিহিতরূপে অর্চ্চিত করেন। হিন্দুগণ বিঘ্নবিনাশ কামনায় গণাধিপের মূর্ত্তি দ্বারোপরি সজ্জিত রাখেন; সেই কারণে সভ্যগণও বিঘ্নবিনায়কের "জেনাস" নামটী অবলম্বন করিয়া দ্বারদেশগুলি "জেমুই" বলিতেন। "গণ" শব্দ প্রাচীন ব্যাকরণানুসারে "দ্বার" অর্থে প্রযুক্ত হয় কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু দ্বারসজ্জা সম্বন্ধে উভয় দেশেই গণনায়কের একান্ত সাদৃশ্য দেখা যায়।

গণনায়ক সর্ব্বপ্রথমে কোন্ দেশে আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহা সপ্রমাণ বলা সুকঠিন, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, তিনি প্রথমতঃ ভারতবর্ষ ও পশ্চাৎ অন্যান্য দেশ অধিকার করেন। তিনি কোন্ শকে বা কোথা হইতে আসিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। গণনাথের পূজা এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়—কেবল কঙ্কালাদি বিদ্যমান। সর্ব্বস্থানেই গণনাথ উদর ফাঁপাইয়া বসিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে লম্বোদর কেবল ধূনাধূম সাহায্যে উদর ফাঁপাইয়া বসিয়া থাকেন। প্রায় শত বৎসর হইল তৃণ ধান্যাদি তাঁহার পক্ষে গোমাংসবৎ হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি এতই নৃশংস, যে গণ-

নায়কের এই অবস্থা দর্শনে শোকাকুলিত না হইয়া, বরং সর্ব্বসমক্ষেই উপহাস বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। গণনাথ একেবারেই রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ঘৃতদুগ্ধসেবী ছিলেন, ক্রমশঃ পর্ণভোজী হয়েন, কিন্তু এক্ষণে, হায় তিনি বঙ্গদেশে নিরশনে কালাতিপাত করিতেছেন—এমন কি কোন সাধু নাই যিনি ইঁহাকে কিঞ্চিৎ পানীয় দানে রক্ষা করেন? সহরাভ্যন্তরে জলের টেক্স দিতে হয়, সুতরাং আমার সৎপরামর্শ এই যে গণনাথ যেন ত্বরা করিয়া কোনও পল্লীগ্রামে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। রোম রাজ্যে এককালে তাঁহার আধিপত্য ছিল। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, যে, সে সময় গণপতি এত অধিক পরিমাণে পানীয় সোম পান করিয়াছিলেন,* যে অদ্যাপি পানীয় তৃষ্ণার উদ্রেক হয় নাই; ধূমপানেই এখনও চলিতেছে। এতদবস্থ গণপতি সেদিন কোনও ভারতবৎসল সাহেব সকাশে যাইয়া আত্মনিবেদন করায় সাহেব বিনীত ভাবে সকরুণ স্বরে বলিলেন—"মহারাজ, আমি বলিতে আদিষ্ট হইতেছি যে আপনার দুঃখ কাহিনীর সহানুভূতি করিতে রাজকীয় চক্ষের জলে আমার রুমাল ভিজিয়া গিয়াছে। আপনি যদি এই সহরের দ্বাররক্ষক ভাবে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে পারেন ও ভদ্রজনোচিত বিনামার প্রেমালিঙ্গনে যদি আপনার স্পৃহা দৃঢ়তর হয়, তবে ক্রমশঃ আপনার নিমিত্ত কোনও উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করা যাইবে।" এই মর্ম্মস্পর্শী বাক্য শ্রবণে গণনাথ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এই দৃষ্টান্ত হইতে সকল দেবগণেরই সাবধান হওয়া উচিত।

---

* গণপতি বাস্তবিক বিলাতী মদ্যপ্রিয় ছিলেন কিন্তু সে কথা বলিলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পাছে অসম্ভ্রম হয়, সেই জন্য "সোমপান" শব্দটী ব্যবহৃত হইল।—(লেখক)

ইহারা আমাদিগের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের উপকারী বন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইহাদিগের বয়োধিক্যবশতঃ প্রমাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের সানুনয় নিবেদন—হে দেবগণ, মর্ত্ত্যলোক যাও হে ছাড়ি। এক্ষণে বিচার বুদ্ধির প্রভাব চতুর্দ্দিকে প্রতীয়মান। এই বিচার বুদ্ধি প্রাচীন দেবগণের বংশীয় কৃতকার্য্য যুবকবিশেষ। ইনি আর্য্যদিগের ইন্দ্রস্বরূপ, তেজোরূপী অনন্ত সূর্য্যের ন্যায় আমাদিগের সংসারের সহায়। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে আশ্রয়পূর্ব্বক অনন্ত প্রভাকরের ন্যায় তেজে দেদীপ্যমান হইয়া সংসারে সুখী হইবার ইনিই প্রকৃষ্ট উপায়। সুতরাং দেবগণের শূন্য কঙ্কালাস্থি পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগের অন্তঃসারভূত বিচার বুদ্ধির আশ্রয় না করিলে আমাদিগের সামাজিক উন্নতির কোনও আশা নাই।

কস্য শর্ম্মণঃ ?

"দিবা যবে নিভে আসে!"

[Moore-এর "How dear to me the hour" etc.]

দিবা যবে নিবে আসে, নীরব সাগরে,
মিশে রবি-কর, প্রিয় সে সন্ধ্যা আমার!
অতীতের সুখস্বপ্ন জাগে সে বাসরে,
স্মৃতি ফেলে সাশ্রুশ্বাস উদ্দেশে তোমার।

উজল পশ্চিম-পানে যে তরঙ্গ হেসে,
তা'র 'পরে ক্রীড়া করে, হেরি রশ্মি রেখা,
মনে হয়, সেই স্বর্ণ-পথ ধরি' গেলে,
সমুজ্জ্বল শান্তি-দ্বীপ বুঝি পা'ব দেখা!

শ্রীষঃ।

মরীচিকা।

বালুকাময় প্রান্তর। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই বালুকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ঊর্দ্ধে অনন্ত নভোমণ্ডল, নিম্নে অসীম সৈকত ভূমি। প্রকৃতির কোমলতা এখানে দেখা যায় না, সমস্তই কঠোরভাবাপন্ন। তপনদেব তীব্র কিরণ বিস্তার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতেছেন। একটী তরুও এখানে ছায়া বিস্তার করে না। পক্ষীর কলকণ্ঠ নিসৃত সুস্বরগীতি এ প্রদেশে শ্রুত হয় না। পশুগণও এখানে বিচরণ করে না। মানবের বাসও এ স্থানে অসম্ভব। তবে কার্য্যবশতঃ পথিককে কখন কখন এই দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়। এই কালে তাঁহাকে যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে হয়, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা সুকঠিন। কখন পথিক কিছু পথ চলিয়া মনে করিলেন, শীঘ্রই প্রান্তর পার হইয়া তরুলতা পূর্ণ প্রদেশে উপস্থিত হইবেন। পথিমধ্যে দিক্‌ভ্রম হইয়া পথিক, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলেন, তথাপি পথ না পাইয়া অতিশয় ক্লান্ত হইলেন। কখনও বা ক্লান্তি বশতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কখনও বা দুর্গম প্রান্তর পার হইবার সময়, হঠাৎ উষ্ণবায়ু সংস্পর্শে পথিকের দেহ দগ্ধ হইয়া গেল; তিনি উহাতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। দস্যুভয়, শ্বাপদভয় ইত্যাদি পথিকের আরও অনেক ভয় আছে, কিন্তু সে সমস্ত এক্ষণে বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মরীচিকা নামক যে নৈসর্গিক ব্যাপার—এবং উহা হইতে পথিকের যে ভ্রম জন্মিয়া থাকে উহাই আমাদের বর্ণনীয়।

বায়ু সর্ব্বত্রই বিরাজমান। উহা পরিষ্কৃত থাকিলে উহার মধ্য দিয়া সমস্ত পদার্থ অনায়াসে দৃষ্ট হয়। কিন্তু উহা সর্ব্বদা নির্ম্মল

থাকে না। কখন কখন বাষ্পপূর্ণ হয়, এবং কখন কখনও ধূলিময় হয়। এইরূপে নানাপ্রকার অবস্থা ভেদে আমাদের দৃষ্টি ক্রিয়ার ও ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। জলেতে যেমন নিকটস্থ বৃক্ষাদির প্রতিরূপ দৃষ্ট হয় বায়ুর অবস্থাভেদে উহাতেও কখন কখন জল বা অন্য পদার্থের ভ্রম হইয়া থাকে। উহাকেই মরীচিকা বলে। এই নৈসর্গিক ঘটনা বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতেই দৃষ্ট হয়।

মরীচিকার উৎপত্তি কালে এক চমৎকার দৃশ্য নয়নগোচর হয়। কখন প্রশস্ত মরুভূমিকে সাগরের ন্যায় বোধ হয় এবং নিকটস্থ প্রদেশের বৃক্ষাদি সমস্ত পদার্থেরই প্রতিরূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সাহারা প্রভৃতি মরুভূমি অতিক্রম কালে, বণিকগণের বারম্বার উক্ত প্রকার ভ্রম উপস্থিত হয়। নিকটস্থ প্রদেশে এরূপ ভ্রম হয় না, কেবল দূরস্থ প্রদেশেই ঐরূপ হইয়া থাকে। ডাক্তার ক্লার্ক নামক জনৈক ভ্রমণকারী কয়েকটা আরবদেশীয় লোকের সহিত এক প্রশস্ত মরুভূমি পার হইতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে, সম্মুখে এক বিস্তৃত নদী বহিয়াছে; কিন্তু তাঁহার সঙ্গী আরবেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "আর আমাদিগের কোনও আশঙ্কা নাই, আমরা বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিয়াছি।" সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "এখান হইতে নিকটেই নগর দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু কিরূপে এই বিস্তৃত নদীর পরপারে যাইব?" আরবী বলিল "এখানে কোনও নদী নাই। আমরা আর একঘণ্টা মধ্যেই এই বালুকাভূমি অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিব।" সাহেব বলিলেন "তুমি কি আমাকে বাতুল মনে করিতেছ? ঐ দেখ আমার সম্মুখে নদী রহিয়াছে এবং উহার জলে আমি পরপারস্থ নগরের অট্টালিকা ও বৃক্ষাদির ছায়াও পরিষ্কাররূপে দেখিতেছি। তুমি কি বলিতে চাহ যে আমি উহা প্রত্যক্ষ করিতেছি না।" আরবী

বলিল "আমার কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তুমি পশ্চাতে অতিক্রান্ত বালুকাভূমির দিকে দৃষ্টিপাত কর; উহাও জলাশয় বলিয়া তোমার বোধ হইবে। এইরূপে তুমি তোমার ভ্রম বুঝিতে পারিবে।" সাহেব পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া যখন দেখিলেন যে, তাহাতেও ঠিক্ ঐরূপ জলাশয় দৃষ্ট হইতেছে—তখন উঁহার ভ্রম দূর হইল। তিনি সবিস্ময়ে অদূরের ঐ নৈসর্গিক ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন।

বালুভূমিতে যখন প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ পতিত হইতে থাকে, তখনই মরীচিকা দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষের মালব, রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের অনেক মরুস্থলেও মরীচিকা দেখা যায়। ইহার কারণও নির্ণীত হইয়াছে। নিরূপিত হইয়াছে যে, মরুস্থলে বালুকারাশি সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শে উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং সেজন্য লঘুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর উপরিস্থিত বায়ু তত উত্তপ্ত না হওয়ায় কিছু ঘন থাকে। এইরূপে ভূমি হইতে একশত বা দেড়শত হস্ত উর্দ্ধে স্বচ্ছ বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইতে দেখা যায়। ঐ বাষ্পরাশিতে সূর্য্যের আলোক পড়িয়া উহা যেন মুকুরের কার্য্য সিদ্ধ করে; সুতরাং উহাতে উভয় পার্শ্বের বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব পড়িয়া নয়নগোচর হয়। প্রতিবিম্বের নিয়মানুসারে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, আলোকরশ্মি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবধানের (medium) মধ্য দিয়া গমনকালীন কিছু বক্রগতি প্রাপ্ত হয়। এবং ইহার ফলেই অবস্থাভেদে দূরস্থপদার্থ দর্শকের নিকটে এবং নিকটস্থ পদার্থ দর্শকের নিকট হইতে দূরে দেখায়। সুতরাং নিম্নস্তরের বায়ু লঘু হওয়ায় ও স্বচ্ছ বাষ্পরাশি উর্দ্ধে থাকায়, দূরে যে সকল পদার্থ থাকে, তাহা দর্শকের নয়নপথের অতিক্রান্ত ও বহুদূর হইলেও উক্ত-বাষ্পীয় দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া দৃষ্টিগোচর ও নিকটস্থ বোধ হয়। আর জলাশয়ের নিকটস্থ পদার্থ সকল যেমন উল্টা দেখায় মরীচিকাতেও

সেইরূপ পদার্থ সকল উল্টা দেখাইয়া থাকে। এইরূপে সমুদ্র মধ্যে শত ক্রোশ অন্তরে কোনও জাহাজ থাকিলে, পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তরস্থ বাষ্পরাশিতে তাহা প্রতিবিম্বিত দেখা যায়।

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত।

স্বদেশ প্রেম।

ভীষণ সমরানল, জ্বলিল হল্‌দি ঘাটে—
ক্ষত্রিয় যবনে,
ভারত উঠিল কেঁপে, উভয় পক্ষের ভীম—
গভীর গর্জ্জনে।
উদ্ধারিতে মাতৃভূমি, যুঝিতেছে একপক্ষ,
ক'রে প্রাণপণ,
অন্যপক্ষ যুঝিতেছে, পরভূমি পদতলে
করিতে দলন।
এক পক্ষে যুদ্ধ কর্ত্তা প্রসিদ্ধ প্রতাপ সিংহ
মিবারের পতি,
অন্যপক্ষে যুবরাজ সেলিম মোগল বীর
শ্রেষ্ঠ সেনাপতি,
রণমদে নাহি জ্ঞান,—বীর রাজপুত দল,
যবনেরে পেলে—
অসিঘাতে কাটি'শির, জোরে করি' পদাঘাত
চূর্ণ করি' ফেলে।
'মানসিংহ'—যে দুরাত্মা ছার সম্মানের মোহে
প্রফুল্ল অন্তরে—
সমর্পিলা সমাদরে প্রাণসমা সহোদরা
যবনের করে!
'মানসিংহ'—যে দুরাত্মা করিলরে কলঙ্কিত
ক্ষত্রিয়ের নাম;
মাতৃভূমি উচ্ছেদিতে ঘটালে হল্‌দিঘাটে
এ মহা সংগ্রাম।
হৃদয় শোণিতে তা'র, পবিত্র করিতে নিজ
তীক্ষ্ণ তরবার;
ভেদিয়া যবন চমূ, প্রতাপ চৈতকারূঢ়
ছাড়িলা হুঙ্কার।
সম্মুখে সেলিমবীরে নিরখি' প্রতাপ সিংহ
উঠিলা গর্জ্জিয়া;
জলদ গম্ভীরস্বরে সম্বোধিয়া যুবরাজে
বলিলা ডাকিয়া।
"আয় রে যবন আজি দেখাইব ক্ষত্রিয়ের
কত বাহুবল;
মিটাইব রণস্থলে আজি রণ আশা তোর,
পাষণ্ড মোগল!

এত বলি বায়ুবেগে নিক্ষেপিলা শূল দণ্ড
সেলিমের দিকে,
দৈব অনুগ্রহ বলে, সে শূল পড়িল গিয়া—
মাহুতের বুকে।
সেলিমের অপমান দেখিয়া যবন সেনা
উন্মত্ত হইল,
চারি দিক হ'তে যেন প্রবল তরঙ্গ মালা
বহিয়া আসিল।
রাণারে ঘেরিয়া সবে বরষিল অস্ত্রবাজি
বরিষার ধারা,
তবু কি প্রতাপসিংহে একপদ টলাইতে
পারিল তাহারা!!
এইরূপে বহুক্ষণ যুঝিয়া তা'দের সাথে
মিবারের পতি—
শূল, গুলি, তরবার আঘাতে হইল শেষ
অবসন্ন অতি।
কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, যেন তাঁ'র প্রাণ বায়ু
যাইবে ত্যজিয়া,
কয় ফোঁটা অশ্রু তাঁ'র পড়িল মিবার পানে
বিষাদে চাহিয়া।
দূর হ'তে এ দৃশ্য দেখিয়া ঝাল্লার পতি
কাঁদিয়া উঠিল;
'প্রতাপের মৃত্যুকাল," মিবারের আশা ভঙ্গ,
হৃদয় ফাটিল।
যদি না প্রতাপ রহে, মিবার কে উদ্ধারিবে
কে আছে এমন?
"কেহ নাই," "কেহ নাই', তবে কি মিবার ভূমি
লইবে যবন?

পলকে ঝাল্লার পতি ছুটাইল তুরঙ্গম
উন্মত্ত হইয়া,
মুহূর্ত্তকালের মধ্যে প্রতাপসিংহের পাশে
উপনীত গিয়া।
সজোরে মুকুট তাঁ'র তুলিয়া লইয়া হাতে
পরি' নিজ শিরে,—
ইঙ্গিতে প্রতাপ বীরে পলা'তে বলিয়া দর্পে
দাঁড়া'ল সমরে।
প্রতাপ সুযোগ পে'য়ে পলাইলা তীব্র বেগে
ছেড়ে রণস্থল,
কিন্তু এর কণামাত্র জানিতে পারিল নাহি
বিপক্ষের দল।
'প্রতাপ' ভাবিল মনে দুরন্ত বিপক্ষ সেনা
ঝাল্লার পতিরে,
তীক্ষ্ণধার তরবারে পাঠাইল মুহূর্ত্তেকে
শমন মন্দিরে।
"মরিল প্রতাপসিংহ" উঠিল যবন দলে
জয় জয় ধ্বনি,
কিন্তু হায় মূর্খ তা'রা, না জানিল বিন্দুমাত্র
প্রতাপ মরেনি
যে প্রতাপ মাতৃভূমি অতুল প্রতাপে শেষে
করিলা উদ্ধার,
তাঁ'রে রক্ষিবারে আজি, ত্যজিল ঝাল্লারপতি
প্রাণ আপনার!
রাখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি পড়িল ঝাল্লার পতি
সমরে যখনি,
স্বদেশ প্রেমের তরে অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ
হ'ল দেব ধ্বনি।

শ্রীধীরাজকৃষ্ণ সোম।

উপেক্ষিত।

অন্নাভাবে আজ কত সহস্র দুর্লভ মানব জীবন অসময়ে এই পুণ্যধাম ভারতবর্ষ হইতে সাশ্রুনয়নে বিদায়গ্রহণ করিতেছে! কত সহস্র পুত্রকন্যা মর্ত্তালোকে স্বর্গের আদর্শস্থল পুণ্যহৃদয়া স্নেহময়ী জননীর কোমলপ্রাণে কি অসহনীয় শেলই না বিঁধিয়া যাইতেছে। কত সহস্র জনকজননী অসহায় শিশুসন্তান সন্ততিতে বিদীর্ণপ্রায় হৃদয়ে পরমপিতার চরণারবিন্দে উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিয়া শেষমুহূর্ত্তে শান্তির আশায় বৃথা প্রয়াস পাইতেছেন! সুখ শান্তি পরিপূর্ণ কতশত সমুচ্চ বংশের যে সমুচ্ছেদ প্রসাধিত হইতেছে তন্নিরূপণ বড় অল্পায়াসসাধ্য নহে। যে সমুদয় উদারচেতা সহৃদয় ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্তকে আহার না করাইয়া জলগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত বোধ করিতেন, তাঁহারাই এখন মুষ্টিমেয় অন্নাভাবে লালায়িত এবং প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তম পুত্র কন্যাকে অনাহারে নিজ সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিতে হইতেছে। অন্নের অভাবে আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী কঙ্কালাবশেষ অতি দীন হীন ভিক্ষুকের অবস্থায় পরিণত!

সমূহক্লেশ নিদানভূত হৃদয়াস্ত নিবৃন্তনকারী এই দৃশ্য ভারতবাসীর যে আজ প্রথম দেখিতেছেন তাহা নয়। এ দৃশ্য দর্শনে তাঁহারা বহুবর্ষ হইতে অভ্যস্ত এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ও ভাবভঙ্গিমা এ বিষয়ে পরিস্ফুট প্রমাণ প্রদান করিতেছে। এখন প্রায় প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতের কোন না কোন প্রদেশে স্বকীয় মূর্ত্তির অবতারণা করিতেছে এবং তথাকার সম্পূর্ণ

সমুচ্ছেদ সাধনরূপ ব্রতে ব্রতী হইয়া নিজাভীষ্ট পূরণে প্রয়াসী হইয়া থাকে। যতই দিন যাইতেছে ততই দুর্ভিক্ষ ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তিতে সম্প্রাৎ স্বল্পতর সময়ান্তরে আবির্ভূত হইয়া মনোমধ্যে মহাভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছে। কোন বৎসর কোন অংশের উপর প্রচণ্ড প্রপাতে উৎপাতিত হইবে এই ভাবিয়া সকলেই ত্রস্ত। কেবলই ত্রস্ত, প্রতিকার বিধানে কিন্তু একেবারেই নিশ্চেষ্ট।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, এই অনর্থের মূলীভূত কারণ কি? দেশ হইতে সমূহ অর্থের বহির্নির্গমনই যে এই অনর্থের প্রকৃত ও মুখ্য কারণ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এই অর্থনির্গমনের নিমিত্ত সমুদয় দোষই আমাদের রাজার উপর আরোপিত হইতে দেখা যায়। ইহা কতদূর সত্য বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা যে একেবারে অসত্য তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না। কেননা আমাদের রাজা মহাশয় একেবারে নিরীহ ভালমানুষটী নহেন। অপরাপর বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও ইংরাজ বিশেষ সহানুভূতির পরিচয় দিয়া থাকেন। জাতিগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্য এবং প্রকৃতিগত স্বজাতি সহানুভূতি আমাদের রাজাকে এ দোষ হইতে আংশিক মুক্তি প্রদান করে।

কিন্তু আমরা একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, এই সমূহ অর্থনির্গমনে আমরা আপনারা কি পরিমাণে সহায়তা করিয়া থাকি। আমরা গৃহলক্ষ্মীকে হাতে তুলিয়া যে গৃহের বাহির করিয়া দিতেছি সে বিষয় কি ক্ষণতরেও চিন্তা করি? অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়টীতে যদি আমরা সমভাবে উদাসীন থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভারতে দুর্ভিক্ষের উৎপাত আংশিক প্রশমতা লাভ করিতে পারিত। কিন্তু উদাসীন হওয়া দূরের কথা—এ বিষয়টীতে আমরা একেবারে বদ্ধপরিকর। শরীর পতন করিয়াও উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইবে, বিনি

এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া থাকি। কেননা আমরা অজস্র প্রাণপাতে সহায়তা করিয়া আমাদের মোক্ষ সাধনে সঙ্কল্পী। আর আমরাই না তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী বলিয়া আত্মগরিমা করিয়া থাকি। ধন্য আমরা।

আমাদের দেশে কোন দ্রব্যই প্রস্তুত হয় না বলিয়া পূর্ব্বে অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকিত। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে সে আক্ষেপোক্ত মৌখিক মাত্রে পর্য্যবসিত ছিল—হৃদয়াভ্যন্তর স্থল হইতে উদ্ভূত হইত না। কারণ নানাবিধ প্রত্যহ ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য এখন বোম্বাই ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশে প্রস্তুত হইতেছে—যেমন পরিধেয় বস্ত্র। এই বস্ত্রগুলি অনতিসূক্ষ্ম হইলেও ব্যবহারের পক্ষে যে একেবারে অনুপযুক্ত তাহা বোধ হয় কেহই বলিতে পারিবেন না। কারণ তৎতৎ প্রদেশ-বাসীগণ অমিত অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিয়া দিনদিনই নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি বিধান করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের উৎসাহ উদ্ভাবিত কর্ম্মে কয়জন সহানুভূতি দেখাইতেছেন? উঁহারা যে সমূহ অর্থব্যয়ে দেশে নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া চিরানুভূত অভাবটী বিদূরিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রশংসা করা দূরে থাক, সহানুভূতি দেখাইয়া তাঁহাদের উৎসাহিত করা পরের কথা, কেবল তাঁহাদের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় অবদ্য প্রকৃতির প্রতিকৃতি খানি পরিস্ফুট করিয়া অঙ্কিত করিতেছি মাত্র। এখন বরং সকলে বলিতেছেন যে স্বদেশ নির্ম্মিত বস্ত্রগুলি অনতিস্থূল হইলেও আমাদের ব্যবহারোপযোগী সূক্ষ্মতায় উপনীত হইতে পারে নাই। কারণ বিলাতী পেলব পরিধানে আমরা আশৈশব অভ্যস্ত। আর যখন ললিতসূত্র বিলাতী পরিধেয় এরূপ অনায়াসলভ্য, কি নিমিত্ত আমরা ধ্রুব সুখ পরিহার ও অধ্রুবের আশায় বসিয়া থাকিয়া শাস্ত্র-

বিরুদ্ধ কার্য্য করিব। এই কথাগুলি আমাদেরই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই নিমিত্ত বলিতে ইচ্ছা হয় ধন্য আমরা।

যে সমুদয় উদামশীল মহোদয় ব্যক্তি বহুল অর্থব্যয়ে বিলাতি প্রথানুসারে এদেশে বস্ত্র নির্ম্মাণ প্রণালীর প্রথম অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশবাসীগণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই এই দুরূহ ব্রতে ব্রতী হইতে সাহসী হইয়াছেন। এখন আমরা যদি স্বদেশনির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহারে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া বিদেশী বস্ত্র সাদরে গ্রহণ করি, তাহা হইলে ইহা হইতে যে কি এক শোচনীয় ফল উৎপন্ন হইবে সে বিষয় বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। প্রথমতঃ যাঁহারা ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ অচিরম্ভাবী ও অবশ্যম্ভাবী। এবং ইহার সহিত অপর একটী অধিকতর অনিষ্টকর ফল অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। একেইত দেশবাসীগণ উদ্যমশীলতার বরপুত্র। তাহাতে যদি আবার প্রথম উৎসাহশালী কর্ম্মীদের এই শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করেন, তাহা হইলে পরে পুনরায় কেহ যে কোন নূতন বিষয়ানুশীলনে কখনও প্রয়াসী হইবেন, তাহাত আর মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ এক একটা কলে শত শত দেশী লোক অর্থাৎ শত শত দেশীয় সংসার প্রতিপালিত হইতেছে। দেশীয় বস্ত্রের বিক্রয়াভাবে কলগুলি বন্ধ হইলে, অথবা উঠিয়া যাইলে, সহস্র সহস্র লোক কর্ম্মচ্যুত হইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবে। তৃতীয়তঃ দেশে পরিধেয় প্রস্তুত হইলে দেশের অর্থ দেশেই থাকিবে এবং ক্রয় বিক্রয় জনিত যে লাভ, তাহা আমরা আপনারাই পাইতে পারিব। আর ইহা যদি দু'পাঁচ টাকার বিষয় হইত, তাহা হইলে অধিক আসিয়া যাইত না। ভারতে সর্ব্বসমেত অন্যূন ত্রিশ কোটী লোকের বসতি। তন্মধ্যে যদি কুড়ি কোটী লোকেরও পরিধেয় আবশ্যক হয় এবং এক এক খানি

পরিধেয়ের মূল্য আট আনা করিয়া ধরা যা; ও প্রতি বস্ত্র খানি ছয়মাস কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর দেশে কুড়ি কোটী টাকার বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই কুড়ি কোটী টাকা এখন ম্যাঞ্চেষ্টার নিবাসী তন্তুবায়গণ নির্ব্বিবাদে করায়ত্ত করিয়া সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। আর আমরা আমাদের মেধার সুতীক্ষ্ণতাগুণে অন্নের নিমিত্ত সেই ম্যাঞ্চেষ্টারবাসী তন্তুবায়গণের দ্বারদেশে গললগ্নীকৃতবাসে ললিতভাষাবিরচিত আবেদন পত্রিকা ও ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া দীনভাবে কাতরপ্রাণে দাঁড়াইতেছি। এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট অবশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া আমাদের সমুন্নত আর্য্যজাতির গৌরব ও মহিমার মূল প্রদেশে কুঠারাঘাত করিতেছি! ইহাতে মনোমধ্যে কিছুমাত্র ঘৃণা, লজ্জা, অবমাননা বা চিন্তার উদ্রেক হয় না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

এক্ষণে পুনরায় জিজ্ঞাসা যে ইহার প্রতিকার বিধান কি একেবারেই অসম্ভব অথবা সুদূরপরাহত। মনে হয় এখনও আশালতা একেবারে উন্মূলিত হয় নাই। মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ হইলেও নাড়ীহীন হয় নাই। একবার মাত্র টাল ফিরিলেই হয়। সৌভাগ্যের বিষয় যে এই টাল ফিরান কোন অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়ের ইচ্ছাধীন নহে, ইহা আমাদেরই ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী। ইহার একমাত্র প্রতিকার এই যে কিছু দিনের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র সৌখিনতা ত্যাগ স্বীকার এবং এই বিষয়ানুধ্যানে কিঞ্চিৎ সময়াতিপাত করা. সৌখিনতা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে না—কিছু দিনের নিমিত্ত। আমরা যদি এখন অধিক নয়, পাঁচ বৎসর ধরিয়া যতদূর সম্ভব বিলাতি দ্রব্যজাতের ব্যবহার বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত করিতে পারি, তাহা হইলে অচিরেই ইহার হিতকরী ফল জানিতে

পারিব এবং আমাদেব মধ্যে এক নূতন শক্তির অস্তিত্বানুভূতি উপলব্ধি হইতে থাকিবে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য যে আর অধিক বিলম্ব না করিয়া এবং প্রকৃতিগত শৈথিল্য পরিহার পূর্ব্বক যাহাতে দেশীয়দ্রব্যের ব্যবহার দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় সে বিষয়ে কৃতসংকল্প হই এবং যাঁহার যতদূর সাধ্য তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সেই সংকল্পের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপনে যত্নশীল হই।

কেবল পরিধেয়ের বিষয়ই উপরে কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যহ ব্যবহারোপযোগী যে সমুদয় দ্রব্য দেশে আজ কাল প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল ;—

	জুতা,	গেঞ্জি,
লঙ্‌ক্লথ,	ছাতি,	গামছা,
নানাবিধ জামার কাপড়,	ষ্টকিঙ্‌,	সাংসারিক বাসন,
চাদর,	রুমাল,	আরসি,
	তোয়ালে,	ট্রাঙ্ক,

কাগজ,	বিস্কুট্,
কালি,	লজেঞ্জেস্,
ছুরি,	এসেন্স্,
কাঁচি,	ফটোগ্রাফ,
কুলুপ,	

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শ্রীহরিদাস দত্ত।

পদে পদে বাধা।

গঙ্গারাম শর্ম্মা ঘোর অদৃষ্টবাদী। বাল্যাবধি তাহার বিশ্বাস ছিল—সে অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী, কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় তাহার প্রতিভার বিকাশ হইল না, এই বলিয়া গঙ্গারাম প্রায়ই দুঃখ করিত। গঙ্গারাম যেবার প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া আসিল, সকলে মনে করিল—সে প্রথম স্থান অধিকার করিবে, অন্ততঃ দ্বিতীয়; কারণ গঙ্গারাম সকলকে বলিল একটীও প্রশ্ন ছাড়িয়া দেয় নাই, এবং সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখিয়াছে। সেই সময়ে গঙ্গারামের শত শত বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কেননা অমন পাত্র সহজে পাওয়া ভার। গঙ্গারামের পিতা মাতা কেহই ছিল না, দূর সম্পর্কীয় কোনও আত্মীয় তাহার অবিভাবক ছিল। ঐ অবিভাবক অধিকাংশ অবিভাবকের ন্যায় আপন কর্ত্তব্য পালন করিলেন, অর্থাৎ গঙ্গারামের বিবাহ দিয়া যে অর্থ লাভ হইল তাহা নিজের সিন্দুকেই রাখিলেন, এবং এমন কথাও শোনা গিয়াছে যে তিনি ঐ টাকা হইতে আপন পরিবারের দুই একখানি গহনাও গড়াইয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘ দুইমাস কাল পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কৃপায় পরীক্ষার ফল বাহির হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, গঙ্গারামের নাম একেবারেই ভুল! প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কোনও বিভাগেই নাম নাই! গঙ্গারাম প্রথমে বলিল—পরীক্ষকেরা নিশ্চয়ই তাহার প্রশ্নোত্তর পত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তাহার শ্বশুর নম্বর আনাইয়া জানিলেন যে সে ইংরাজি সাহিত্যে ফেল হইয়াছে। তখন গঙ্গারাম বলিল "তা ত হবেই, আগেই কেমন

খট্‌কা লেগেছিল। পরীক্ষার প্রথম দিনে যেমন বাড়ির বাহির হইব অমনি ঝি বলিল 'আজ ধোপার কাছে গেছ্‌লুম, দেখা পেলাম না।' যাত্রা কালে ধোপার নাম? তখনই বুঝিলাম আজিকার দিন ভাল যাইবে না।"

যাহোক গঙ্গারামকে শ্বশুর আবার পড়িতে বলিল। সেবারেও গঙ্গারামের নামের অক্ষর কম পড়িল। সকলে বিস্মিত, গঙ্গারাম সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত। এবারে কেন ফেল হইল কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল পরীক্ষার শেষ দিবসে ঝি মাছের পরিবর্ত্তে বাজার হইতে কাঁকড়া আনিয়াছিল। গঙ্গারাম কাঁকড়া খাইয়াছিল বটে, কিন্তু এ হেন ঘোর অযাত্রা উদরসাৎ করিয়া তাহার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া ছিল। ঐ কাঁকড়াই যে তাহার ফেলের একমাত্র কারণ তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না এবং সেই দিন হইতে কাঁকড়া ত ছাড়িলই, এমন কি পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে এক দিন "দশরথের বিলাপ" পড়িতে বলিলে, সে কিছুতেই পড়িল না. "স্পষ্ট বলিল, পণ্ডিত মহাশয় মাপ করবেন, ওনাম আমি মুখে আনিতে পারিব না. কেননা ঐ নামে যে জীব বুঝায় তাহা উদরসাৎ করিয়া গতবারে আমি ফেল হইয়াছি।" গঙ্গারাম আরও দুইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। কেমন করিয়াই বা হয়? একবার দক্ষিণে শব পড়িল, আর একবার টিক্‌টিকি। যা'হোক গঙ্গারামকে পড়া ছাড়িতে হইল, শ্বশুর বলিলেন "আর পড়িয়া কি হইবে চাকরীর চেষ্টা দেখ।" আজ কাল-কার বাজারে সব জিনিষ মিলে, কেবল কন্যাদায়ে পাত্র মিলে না, আর পেটের দায়ে চাকরী মিলে না। কাযেই চাকরীর অন্বেষণে আরও চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। অনেক কষ্টে এক চাকরী

মিলিল, কিন্তু যে দিন হইতে চাকরীতে যোগদান করিতে হইবে, সে দিন ত্র্যহস্পর্শ, দিন অত্যন্ত খারাপ, তাহার পর চার পাঁচ দিনই খারাপ, কাযেই গঙ্গারাম সে চাকরী তখন গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না, পরে পঞ্জিকা দেখিয়া যখন ভাল দিন পাইল, তখন সে চাকরী আর খালি নাই, অন্য একজন নিযুক্ত হইয়াছে। এদিকে গঙ্গারামের প্রতি ষষ্ঠীদেবীর যথেষ্ট কৃপা হইয়াছে, তাহার দুইটি কন্যা ও একটী পুত্র লাভ হইয়াছে। বয়সও ক্রমে বাড়িতে লাগিল, এখন গৃহিণীর নিকটও দুই চারি কথা শুনিতে হয়। অবশেষে বিদেশে এক চাকুরী জুটিল। স্ত্রী ও সন্তানাদি ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে গঙ্গারাম তাদৃশ ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু গৃহিণীর উত্তেজনায় অগত্যা যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু তথাপি বিলম্ব করিতে দেখিয়া স্ত্রী যখনই জিজ্ঞাসা করে "কই গো গেলে না ?" তখনই গঙ্গারাম উত্তর করে "হঁা, এই জিনিষ পত্র গুলা কেনা হইলেই যাইব।" জিনিষ পত্র যে বিশেষ কিছু কিনিবার ছিল তাহা নয়, তবে ঐ রকমে যতদিন কাটে। পুনরায় স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলে, আজ অমাবস্যা, কাল অশ্লেষা, ইত্যাদি বলিয়া গঙ্গারাম কাটাইয়া দেয়। কিন্তু পুনঃপুনঃ ওজর আপত্তি যখন আর খাটিল না, তখন শুভদিন দেখিয়া যাত্রা করিবে ঠিক্ হইয়া গেল।

শুভদিন আসিলে, গৃহিণী প্রত্যূষে উঠিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে লাগিল। গঙ্গারামের মনটা অত্যন্ত খারাপ, যতই ছেলে মেয়েদের আদর করে ততই তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে মন কেমন করে। অবশেষে ট্রেণের সময় হইতে লাগিল দেখিয়া, গঙ্গারাম স্নানান্তে আহারে বসিল, খাইতে তেমন ইচ্ছা নাই, কেবল স্ত্রীর অনুরোধে অমনি একরকম আহার করিয়া লইল। স্ত্রীরও মুখটী বিমর্ষ, হাজার হ'ক কখনও ছাড়াছাড়ি হয় নাই, এই প্রথম। কিন্তু কি

করিবে, কর্ত্তব্য কঠোর। গঙ্গারামের সাজ সজ্জা হইল, একখানা গাড়ি ডাকা হইল। গঙ্গারাম স্ত্রীকে বলিল "কেমন, থাক্‌তে পার্‌বে তো? ভাবনা কি? আবার দশ পনের দিন পরে সেখানে বাসা ঠিক্ হলেই তোমাদের নিয়ে যাব? কি বল মন কেমন কর্‌বে না তো?

স্ত্রীর চোক ছল ছল করিতে লাগিল বলিল "মন কেমন করলেই বা কি হ'বে বল, উপায় ত নেই। তা' আমি ক'টা দিন বইত নয় থাক্‌তে পার্‌বো এখন।"

গঙ্গা। উঁ হুঁ, আমার বোধ হয় থাকৃতে পারবে না। এখনই তোমার চোক দিয়ে জল পড়ছে, আমি চলে গেলে না জানি আছড়ে কাঁদ্‌বে। দ্যাখ, এখনও দ্যাখ, থাকৃতে না পার ত বল, আমি না হয় থেকে যাই, কলকেতাতেই না হয় একটা চাকরী দেখে নেওয়া যা'বে। সত্যি কি আর এখানে কারুর চাকরী হয় না? এত লোকের হচ্চে কি করে?"

স্ত্রী। (চোক মুছিয়া) কই আর হ'ল, এত ত চেষ্টা করলে? যা' পেয়েছ তা' আর ছেড়োনা।

এমন সময়ে গাড়োয়ান তার স্বরে বলিয়া উঠিল "কই বাবু, এত দেরি হচ্চে কেন, একঘণ্টা দাঁড়িয়ে রয়েছি, শীগ্‌গির করুন।'

গঙ্গারাম ভিতর হইতে বলিল, "দাঁড়া না ব্যাটা, সোওয়ারী তৈয়ের হ'বে তবে ত, ব্যাটার একটু আর দেরি সয় না।"

স্ত্রী। আর দেরি করে কি হ'বে, আবার ট্রেণ পাবে না।

গঙ্গা। না, আর দেরি নাই, কই পানগুলো একটা ভিজে ন্যাকড়ায় বেঁধে দাও, আর শীগ্‌গির করে যাঁতি খানা নিয়ে এসে গোটাচার স্থপুরি ডুমো করে কেটে দাও।" গঙ্গারামের স্ত্রী তাহাই

করিতে লাগিল, গঙ্গারাম বলিল "কি বল, এখনও ঠিক ক'রে বল থাকতে পারবে কি না ?"

গঙ্গারামের স্ত্রী একটু বিবক্তা হইয়া বলিল "হ্যাঁ গো, পারবো।"

গঙ্গারাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, ইচ্ছা, যদি বলে পারবো না, তবে থাকিয়া যায়। বলিল "আচ্ছা তুমি যেন পারলে; ছেলেরা থাকতে পারবে কি ?"

স্ত্রী। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হ'বে, তা'র পর ভুলে যা'বে।

গঙ্গা। সে কি ? ভুলে যাবে ? বাপকে ভুলে যাবে ? তবে কোন শালা আর চাকরীতে যায়।" এই বলিয়া গঙ্গারাম ধড়া চূড়া খুলিতে আরম্ভ করিল।

স্ত্রী। কর কি ? তুমি পাগল হ'লে নাকি ? সব ঠিক, এখন বল কি না যাব না ? ছেলেরা কি সত্যি তোমায় একেবারে ভুলে যাবে ?

গাড়োয়ান পুনবায় হাঁকিল "কি বাবু, এত দেরি করলে ভাড়া বেশী লাগ্‌বে বলে রাখ্‌লুম।"

স্ত্রী। চল, আর দেরি ক'রোনা, পৌঁছেই চিঠি লিখো।

গঙ্গা। আচ্ছা এক কায কব না, তুমিও না হয় গাড়িতে চল না আমায় ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবে। কেমন রাজি ত ?

স্ত্রীও বিশেষ নারাজ ছিলেন না, আহা এ পর্য্যন্ত একদিনের জন্ম ছাড়াছাড়ি হয় নি। গঙ্গারাম, তাহার স্ত্রী ও সন্তানাদি গাড়ির ভিতরে উঠিল, পিছনে ঝি ও কোচবক্সে গঙ্গারামের শ্যালক উঠিল। ঠিক্ সেই সময়ে রাস্তার কে একজন হাঁচিল। পোড়া লোকদের নাকই বা কি রকম ? ঠিক্ যাত্রার সময় গুড় গুড় করে ? যথা সময়ে হাবড়ার ষ্টেসনে পৌছিল, ট্রেণও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ছাড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই। গঙ্গারাম সন্তানদিগের মুখচুম্বন করিল, স্ত্রীর নিকটে

বিদায় চাহিলে তাহার চোক জলে ভরিয়া গেল, কোন কথাই বলিতে পারিল না, গঙ্গারামও কাঁদিয়া ফেলিল। এদিকে ট্রেণের দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। গাড়োওয়ান বলিতে লাগিল "নামুন না বাবু, আর যে গাড়ী ছাড়্‌তে দেরি নাই। গঙ্গারাম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্ত্রীকে বলিল "কেমন আমি ত বলিছিলুম তুমি থাক্‌তে পারবে না? চল আর কান্নাকাটিতে কায নেই, বাড়ি ফিরে যাই, জানি তুমি থাক্‌তে পারবে না।" এই কথা শেষ হইতে না হইতে তৃতীয় ঘণ্টা পড়িল, ট্রেণ ও আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ হইল। তখন অগত্যা গঙ্গারামকে সপরিবারে গৃহে ফিরিতে হইল, আসিবার কালে বার বার বলিতে লাগিল "জানি তুমি থাক্‌তে পারবে না? আর আজ যে যাওয়া হবে না তাও জানতেম, শোননি ঠিক্ আসবার সময় হাঁচি পড়েছিল? হায়! হাঁচি টিক্‌টিকিই বাঙ্গালীর উন্নতির পথে কণ্টক। গঙ্গারামের আজ পর্য্যন্তও চাকরী জুটিল না। সে এত পঞ্জিকায় শুভদিন দেখিয়া দরখাস্ত দিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না, লোকে তাহাকে চিনিল না, পদে পদে বাধা পড়াতে তা'র প্রতিভার বিকাশ হইল না।

প্রয়াসের রিপোর্টার।

গল্প কি?

হে সন্ন্যাসী! আজ আমাকে বিদায় দিন; আপনার কাছে আমি দু'বৎসর থেকে যা' না শিখেছি, তা' ভগবানের কৃপায় এক মুহূর্ত্তের ঘটনায় আমার শেখা হ'ল। এ আশ্রমে থাক্‌বার আর প্রয়োজন—

আপনি ভ্রূকুটী কর্‌বেন না। হঠাৎ আমার এ রকম কথা

আশ্চর্য্যজনক বটে। তা' যাই হ'ক, আজ আমি যে মহা জিনিষের সন্ধান পেয়েছি, তা' আপনার যোগকঠোর আশ্রমে এতদিনে মেলেনি।

আপনি অবজ্ঞার হাসি হাস্‌ছেন ? হে দেবতা! আর আমি কিছুতেই বিচলিত হচ্চি না। হ'তে পারে আপনি দেবতা—কিম্বা দেবতারও বড ; কিন্তু, এ অধম আজ নিশ্চত বুঝিয়াছে যে, সে নিতান্তই এই পৃথিবীর মানুষ মাত্র ; আর আজ সে মানুষের কাছ থেকেই জান্‌তে পেরেছে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি। আমাকে যে আপনি দয়া করে এতদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন, তা'র জন্য আপনাকে শতবার ধন্যবাদ দি—অথবা সন্ন্যাসীদের আবার ধন্যবাদ ইত্যাদির প্রয়োজন কি ? হে দেব। আমাকে বিদায় দিন।

আমাকে পাগল মনে কচ্চেন ? আপনার মন আপনারই জিনিষ, তা'র উপর আমার কোন হাত নাই ; শুধু পাগল কেন আপনার যা' ইচ্ছা তা ই মনে কর্ত্তে পারেন। কিন্তু সেটা যে আপনারই ভুল, তা'তে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার এই দুর্বিনীত কথায় রাগ কর্‌বেন না ; না হয় আপনাকে আমার জীবনের সব কথাই বলি ; আমার কাহিনী শুনে রাগ কর্ত্তে হয় রাগ্‌বেন, হাস্‌তে হয় হাস্‌বেন।

আপনাকে প্রথম দর্শনে যে পরিচয় দিয়েছিলুম তা' মিথ্যা। আমি গৃহহীন ভিক্ষুক নই—আমার মত ধনী পৃথিবীতে খুব অল্পই আছে। আপনি বিস্মিত হবেন না—আমি এক এক করে' সব বল্‌চি।

আমার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন আমার মা, আমার শৈশবের স্নেহময়ী মা, পৃথিবী থেকে পালালেন। এখন আমি মার মুখও ভুলেছিই, কিন্তু শুধু মার মুখ নয়, তা'র সঙ্গে বাবার মুখও ভুল্‌তে হয়েচে। মার মৃত্যুর দিন কয়েক পরেই, আমার পিতা একদিন রাত্রে

হঠাৎ অদৃশ্য হলেন ; সেই বৃহৎ প্রাসাদে আমার নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে রহিল কেবল যুবক কাকা। কালে তাঁ'রই মুখে শুনেছি আমার বাবা আমার মাকে যেমন ভালবাস্‌তেন, তেমন ভালবাসার কথা নাটক নভেলেও পড়া যায় না। তাই তিনি মা'র মৃত্যুর পর রাজার সুখ ছেড়ে, পুত্র ও ভ্রাতাকে ছেড়ে, তাঁ'র জীবন সম কাব্যপাঠের সুখ ছেড়ে ৩২ বৎসর বয়সে বৈরাগী হলেন !

যদিও আমার পিতা বিপুল বিষয়ের মালিক ছিলেন, তবু তিনি অপর অপর বড়লোকের মত অলস আমোদে দিন কাটাতেন না, সর্ব্বক্ষণ নানা গ্রন্থ পড়িতেন। তিনি কিছু বেশী বয়সে আপনার ইচ্ছামত বিবাহ করেছিলেন, আমার কাকারও অল্পবয়সে বিবাহ দেন নাই। আমার কাকাও একজন খুব পণ্ডিত ছিলেন।

বাবা সন্ন্যাসী হ'বার পর, কাকা মহাশয় আমাকে এমন রমণী-সুলভ স্নেহে যত্নে লালন কর্ত্তে লাগ্‌লেন, যে আমি পিতা মাতার বিরহ কোনরূপে অনুভব কর্ত্তুম না।

আমার যখন বয়স ১২ বৎসর, তখন আমার কাকার বিবাহ হইল। আমার দিনগুলি বেশ সুখে কাট্‌তে লাগ্‌লো। কাকা আর কাকিমার স্নেহ আদরের তুলনা হয় না। তিনি আমাকে বিধিমত লেখা পড়া শিখা'তেন। তিন বৎসর পরে কাকার এক কন্যা হইল। আমি খুকীকে নিয়েই দিন কাটাতুম, শত জন দাসদাসীর একজনকেও কখন তা'কে ক্রোড়ে নিতে হয় নাই। আমাদের তিন জনকার কাছেই সে থাকিত।

হে যোগীবর ! আমাদের সেই স্নেহভরা সংসারের নিবিড় সুখ কিছুমাত্র বুঝিবেন কি ?

হায় ! আমার যখন বয়স ২০ বৎসর, তখন কাকা হঠাৎ শক্ত

পীড়াক্রান্ত হ'লেন। ওঃ সে কি যন্ত্রণা! দারুণ ব্যথায় কাকা মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাচ্ছিলেন—বেদনায় বিকট চীৎকার কচ্ছিলেন। অর্থের অভাব কা'কে বলে, তা' আমরা জানতুম না; দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া। আমাদের রাজ্য দিয়াও যদি কাকাকে বাঁচাতে পারতুম, তাতেও রাজী ছিলুম। কিন্তু রাজত্ব আমাদেরই রইল—কাকা আর আমাদের রইল না—আমার জীবনকে নিষ্পেষিত ক'রে কাকিমাকে অনাথা জীবন্মৃতা করে, খুকীকে আর একটী শিশুপুত্রকে রেখে পরলোকে গেলেন।

তখন আমাদের রাজ সংসারের কি অবস্থা! আমি অন্তঃপুর ছেড়ে খুকীকে নিয়ে পাঠাগারে বসে, দারুণ শোক লঘু কত্তে চেষ্টা কত্তুম, কিন্তু সে তাপদগ্ধ হৃদয় কি আশ্বিনের নিরম্বু মেঘের ক্ষণিক ছায়ায় শীতল হ'বার?

শ্রাদ্ধের পর আমি একদিন গভীর রাত্রে বসিয়া, একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ উল্টা'তে উল্টা'তে, কাকার যে পীড়া হয়েছিল, তারই নাম দেখতে পেলুম। কি ভীষণ! তা'তে লেখা রয়েছে যে, এ রোগের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা; রোগী পলে পলে অনুভব করে, যেন তার হাড় সকল কে মোচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছে! পড়িতে পড়িতে আমার শ্বাস রোধ হ'য়ে এল; ঠিক সেই সময়েই নীরব নিশীথে কাকিমা মর্ম্মভেদী কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। হা! মৃত্যু! তুমি তখন কোথায় ছিলে? আমি দূরে বই ফেলে দিয়ে, সেই মুহূর্ত্তেই উন্মত্তবৎ উঠে দাঁড়ালুম। স্খলিত পদে নিদ্রাতুর দ্বারবানের অজ্ঞাতে ফটক খুলে বাহির হলুম। পিশাচ আমি কাকিমার কথা ভাবলুম না, খুকীকে ভুলে, খোকার শিশুমুখ ভুলে—নিষ্ঠুর আমি গৃহত্যাগ কল্লুম! সেই অবধি তোমার এই আশ্রমে। আমার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে প্রভু!

তার পর, হায় অভাগিনী কাকিমা! হা আমার মা'রও অধিক! তোমাকে কতদিন পরে এই দূর প্রয়াগে দেবমন্দিরে দেখ্‌লুম। কি ধৈর্য্যময়ী মূর্ত্তি! ধিক্, আমি পুরুষ! আমি অভিমানী পণ্ডিত! আমি যে শোকের জ্বালায় সামান্য পতঙ্গের মত পালালুম, তা'র শতগুণ দুর্ব্বিহ শোক অসহায়া নারী কিনা সহজে জয় করিল!

তোমাকেও ধিক্ সন্ন্যাসী! তোমার এ ব্রত বৃথা নয় কি? তোমার সহস্র দিনের উপদেশ রাশি আমার কাকিমার একটী মধুর ভৎর্সনার সঙ্গে সমান নয়।

"মহান্ মনেবি তরে
জ্বালা জ্বলে চরাচরে,
পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই পতঙ্গের প্রায়।"

এ মহান্ শিক্ষা তাঁ'কে কে শিখাইল? ধন্য আমি তাঁ'র পুনর্ব্বার দেখা পেলুম—কি শুভ ধীর স্নেহসরস বাণী!

আমাকে ছেড়ে দাও প্রভু! মা আমার মন্দিরে আমারই জন্য দাঁড়াইয়া। বনে পাহাড়ে আমার আর যোগচর্চ্চা হ'বে না—আমাকে বিদায় করে দাও প্রভু! আমি গৃহে ফিরে যাই।

এ কি দেব! তোমারও চক্ষে জল। জিতেন্দ্রিয় তুমি—দুঃখ শোক বশীভূত করেছ—মোহজাল ছিন্ন করেছ—সে সব কি তবে মিথ্যা?

কি বলিলে? আমার নাম? আমার গৃহের নাম বৈরাগী তুমি কেমন করে' জান্‌লে? তবে কি তুমি আমাকে জান? তুমি কি অন্তর্য্যামী?

কি? আমার পিতা? ক্ষমা কর ক্ষমা কর পিতঃ, বহু অপরাধ করেছি; এমনই করে' আমায় চিরদিন স্নেহ-আলিঙ্গনে রাখ—আর আমাদের ছেড়না পিতঃ!

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

ফুলের সাজি।

ভুল।

এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন,
ভুলে আছি ভুলে থাকি যাবত জীবন।
এ ভুল ভাঙ্গিয়া গেলে
কি লইয়া হেসে খেলে
জীবনের দিন গুলি করিব যাপন?
এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন।

এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন,
সংসার এ ভুলে ভুলি' চলিছে এমন।
এ ভুলে কুসুম ফুটে,
অলি জুটে—বায়ু ছুটে,—
ছড়ায়ে কুসুম বাস মাতায় ভুবন!
এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন।

এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন,
স্থাবর জঙ্গম সব এ ভুলে মগন।
এ ভুলে জগত হাসে
দিবা নিশা পরকাশে,
এ ভুলে গগনে খেলে চন্দ্রমা তপন;
এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন।

এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন;
এ ভুলেতে সর্ব্বজীব ভুলেছে এমন।
এ ভুলে জননী কোলে
ক্ষুদ্র শিশু হাসে দোলে,
এ ভুলে ভুলিয়া মাতা করেন চুম্বন;
এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন।

এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন;
এই ভুল একমাত্র বিশ্বের বন্ধন।
এ ভুল ভাঙ্গিলে পর,
কি লয়ে করিব ঘর—
এ ভুল ভাঙ্গিলে বহা যাবেনা জীবন;
এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন।

এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন।
এ ভুলে ভুলেছি যবে জনম গ্রহণ।
একমাত্র এই ভুল
জীবন তরুর মূল
এ মূল ছিঁড়িলে দেহ হইবে পতন;
এ ভুল ভাঙ্গিতে মোর ক'রনা যতন।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

সে।

প্রথম মুকুল সেটী সাধের লতাতে মোর,
দিনে দিনে বড় হ'ল সুষমার নাহি ওর।
পেলব মধুর দলে ফুটিল ত্রিদিব হাস,
জগৎ ভুলায়ে দেয়, অতি মৃদু স্নিগ্ধ বাস।
ফুলেযেকিভাবআছেকেজানিতআগে তাহা,
সুদূর নিশীথ বাঁশী সম শান্তিময় আহা!
মধুভারে নত সে যে পাতাতে লুকায়ে রয়,
পাতাটী সরায়ে দিতে ছুঁতে তা'রে ভয় হয়,
হাতেযেগো মলাআছে কোরক সেওপ্রকায়,
পরশ কঠিন বড় ব্যথা যদি লাগে তায়?
বৃন্তে ফুটুক ফুল এখনো রয়েছে উষা,
সারাদিন হেরে তারে মিটাবপ্রাণের তৃষা,
এই কথা ঘুম ঘোরে ভাবিতেছি আন্ মনে,
সহসা চাহিয়া দেখি কলিটী যে নাই স্থানে!
শূন্যা লতিকা কাঁপে ছিন্নবৃন্তে ঝরে ধারা
বাতাসে ভাসিছে শুধু সে সুরভি মনোহরা
কত আশা সুখ স্বপ্ন নিমেষে ভাঙ্গিল হায়!
কিযোরছলনাঅহো!কাঁদেপ্রাণসেকোথায়।
কোনপথেগেলেদেখাপাব সে মুকুলে মোর?
সেপথের মাঝেআমি,কুকারিছে আঁখিলোর।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

উচ্ছ্বাস।

কি গান গাহিব আর!
সাধের বীণাটি গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
শুধু রয়েছে তানটি তা'র!
সচির বসন্ত গেল যে চলিয়া
সুদূর মরণ পানে,
শুধু, মৃদু সমীর সোহাগে অধীর
বহিছে কুসুম বনে।
মরমের গান রহিল মরমে
আর গাওয়া হ'লোনা,
আকুল উচ্ছ্বাস অতীতের স্মৃতি
পোড়া প্রাণ হ'তে গেলোনা।

শ্রীলালবিহারি দত্ত।

অন্তিম শয়ন।

প্রাণের অনন্ত গাথা ক্ষীণ কণ্ঠ গীতে
গাহিয়া ফুরাব কবে? পারিব ভুলিতে
অসীম বাসনা কবে সসীম জীবনে?
কবে শান্তি হবে মম অধীর পরাণে?
রবি কর তেজ সম সুতীব্র আবেগ,
হাসির বিজলি মাখা অভিমান মেঘ,
নেত্রহীন স্নেহজ্যোতিঃ কবে কোন্ বেলা,
আঁধার জীবনে আর করিবে না খেলা?
শোক বাষ্প বারি সিক্ত অন্তিম শয়নে,
আবেগ ক্ষণাগ্নি যবে মিশিবে স্বপনে,
স্নেহ প্রেম ভক্তিরূপে হেরিবে যখন,
অদূরে অমৃতসিক্ত পবিত্র চরণ,
তখনি ফুরাবে বুঝি অসীম বাসনা,
প্রাণের অনন্ত গাথা—ভবের ভাবনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার।

তুমি।

সত্য তুমি পূর্ণচন্দ্র হৃদি গগণের,
তোমারি জোছনা রাশি আলো এ মনের
তোমার মাধুরী খেলে সর্ব্বাঙ্গে আমার,
তোমার রূপেতে মুগ্ধ অখিল সংসার,
তোমার সুষমা স্রোতে ত্রিলোক মগন,
তোমারি কিরণে ভরা মোর দুনয়ন,
নয়নের নিদ্রা তুমি, শোণিত শিরার,
হৃদয়ের প্রেম তুমি, প্রণয় পাথার,
অধরের হাসি তুমি বাহুর পরশ,
অবসাদে আশা তুমি নিশার দিবস,
বিরহে মিলন তুমি বিষাদের সুখ,
জীবনের সাথী তুমি, হেরে ভ'র বুক,
আমার আমিত্ব তুমি, সর্ব্বস্ব হিয়ার,
তুমি আমি এক বুঝি ধরার মাঝার।

গিরিজাকুমার—

কবির ভুল।

(১)

কোকিলের কুহুতান কে বলে মধুর?
সাদরে প্রাণেশ যবে, পীযূষ-পূরিত রবে
অভাগিনী শূন্য প্রাণ হৃদয় জুড়ায়,—
তাহার তুলনা ভবে কে জানে মিলিবে কবে?
কবির-যে এত ভুল কে জানিত হায়!

(২)

কলঙ্কী বিধুর বল কিসের গৌরব?
অকলঙ্ক চারু ছবি, রমণী গৌরব রবি,
হৃদাকাশে সদা যা'র ভাসিয়া বেড়ায়;
এ চাঁদের কাছে মোরসকলি আঁধার বোধ,
কবিদের এত ভুল কে জানিত হায়!

(৩)

যে বাসে বাসুক ভাল গজেন্দ্র গমন,
প্রিয়তম কুতূহলে, চলে যবে হেলে দুলে
লোলুপ অতৃপ্ত আঁখি সদা দেখে তায়;
কল্পনায় কা'র চিত, হয় শুধু বিমোহিত,
কবিদের এত ভুল কে জানিত হায়!

(৪)

এই অপার্থিব ধন আর কোথা আছে?
তাঁহার মহিমা গাই, ভাষায় সে কথা নাই,
হেন দেব সদা যা'র বাঁধা আছে ঘরে,
কবির উপমা পারে ভুলাতে কি তা'রে?

শ্রীমতী সুবাসিনী সোম।

আমার যাত্রা।

দিশাহারা আমি একেলা পান্থ,
ঘুরিতে ঘুরিতে হয়েছি ক্লান্ত,
পদে পদে আমি হই পথ ভ্রান্ত,
দেখাও আমারে পথ;
আঁধার সংসারে আশার জ্যোতি,
ক্রমশঃ কমিছে তাহার ভাতি,
আমি শুধু হেথা কি হইবে বাঁধা,—
তোমারই ইচ্ছা মত।

হৃদয়েতে কত উচ্চ বাসনা,
ছিল—এবে দেখি সকল(ই) মলিনা ;
সহিতেছি আমি কত যে যাতনা—
কি আর জানাব প্রভু,
দাও মোরে বল দাও উৎসাহ,
ঢেলে দাও নব জীবন প্রবাহ,
বিপদে কাতর না হই কখন,
সুখেতে চঞ্চল কভু।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিমাদ্রি শিখরে।

(১)

কে তুমি হে যোগীবেশে তুষার মাঝারে,
বিভূতি মেখেছ কায়
অর্দ্ধ চন্দ্র শোভে পায়
শোভিত করেছ অঙ্গ কালফণী হারে
হিমাদ্রি শিখরে বসি ধ্যান কর কারে?

(২)

বিলুণ্ঠিত জটাজাল অনন্ত তুষারে,
তাহে কুলু কুলু ধ্বনি
ফণ্ ফণ্ গর্জ্জে ফণি
ফণী সনে কুলুধ্বনি কিবা ধ্বনি করে
বাণীকরে বীণা যেন মধুর ঝঙ্কারে।

(৩)

সুরধুনী শিরোমণি হয়েছে তোমারি
পাছে সতী তাজে রাগে
শিরে তাই অনুরাগে
লুকায়ে রেখেছ তা'রে জটায় আবরি,
প্রেমের দায়েতে বুঝি সেজেছ ভিখারী'

(৪)

সতীর সতিনী বলে রেখেছ বিরলে
যবে সতী যায় দূরে
আদরে সোহাগ ভরে
অমনি বারেক তরে লও তারে কোলে
তা'তে কি হে ভোলানাথ নারীপ্রাণ ভোলে'

(৫)

শির ত্যজি সুরধুনী অভিমানে গলে
ধায় পূত অশ্রুজলে
তিতিয়া অবনী তলে
প্লাবি ধরা মাধুরীর মধুর হিল্লোলে,
কোটী কণ্ঠে ডাকে নর মাতর্গঙ্গে বলে।

(৬)

লুকাইয়া সুরধুনী জটার ভিতরে,
যদি হাসে মৃদু হাসি
অমনি হে ভয় বাসি
শঙ্কায় নয়নমুদি কহ বুঝি তারে
হেসনা জাহ্নবী—এস, লুকাও অন্তরে।

(৭)

শুনি তব হেন বাণী দুঃখে সুরধুনী
কুলুধ্বনি করি কয়
অন্তর আমার নয়
কেমনে যাইব বল জানিবে সতিনী,
সে বড় বিষম মেয়ে অ'রে আমি চিনি।

(৮)

জানিনা গো কিবা মন্ত্র দেছে তব কাণে
কোথা থেকে যেয়ে এসে
একেবারে কোলে বসে
চেয়ে থাক অনিমিষে তা'র মুখ পানে,
তা বি মনে সতী কিছু মোহ মন্ত্র জানে।

(৯)

তা' না হ'লে অসি লয়ে কালীরূপ ধরে
ভয়ঙ্কর অট্টহাসে
ত্রিভুবন কাঁপে ত্রাসে
সান্ত্বনা করিতে তা'রে যাও বক্ষকরে
লাজহীনা উঠে কিনা তব বক্ষোপরে।

(১০)

ভোলানাথ। তবু তা রে কিছু নাহি বল
সকলি ভুলিয়ে যাও
পুনঃ তা'রে কোল দাও
শিব দুর্গা রূপ ধরে মুখে দুর্গা বল
তা' দেখি আমিও নাথ হই বিচঞ্চল।

(১১)

তা'র প্রেমে যোগী তুমি সংসার বিরাগী,
অহরহ ভাঙ্ খাও
সদা তা'র গুণ গাও
সোহাগে গরবে বুকে দাঁড়ায় সে মাগী
ভোলানাথ তবু তুমি তা'র অনুরাগী।

(১২)

কেমন হৃদয়ে হা'ব বল প্রাণেশ্বর
হৃদয়ের অধীশ্বরী
করেছ কি ত্রিপুরারী?
হৃদয়ে ধরিয়ে সতী হও দিগম্বর
কেমনে তোমার হব বল প্রাণেশ্বর!

(১৩)

তাই নাথ মনোদুঃখে ধাই ধরাপরে
হৃদয়ে মমতা রাশ
তরঙ্গ সাগরে ভাসি
কোলে লয়ে কোটী কোটী পাতকী সন্তানে
দেখাই মুক্তির পথ শান্তি নিকেতনে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষা সঙ্গীত।

রাগিণী মল্লার।

আকাশ ছেয়ে গেছে ঘন তিমিরে;
নিরাশা বহে আসে ধর সমীরে!
আকাশে ঝরে জল, ধরণী সুশীতল,
কাহার বীণা বাজে মৃদু মধুরে!
পাতার ঝর ঝর, ঝরণা ঝর ঝর,
শ্যাম নিকুঞ্জলতা দোলে সুধীরে।
গগনে ডাকে মেঘ, পবনে বাড়ে বেগ,
তমাল তলে ভেক ডাকে গভীরে।
কোমল আঁখি দুটী, স্নিগ্ধ অলস দিঠি
কি যেন আনে মনে তন্দ্রা ভাঙ্গয়ে।
সোহাগে হেসেছিল, আদরে ভেসেছিল,
পরাণে জাগে আজি সেই হাসিরে!
সজল গৃহ কোণ, সজল মাঠ বন,

আকাশে ঘন রোল—প্রাণ শিহরে।
কাল জলদ গায় বিজলি চমকায়,
দূরে কি দেখা যায় ঘন আঁধার
কখন অভিমানে—গভীর অপমানে
যমুনা কাঁদে আজি কাহার তরে
সকল গৃহ কাজ ভুলিয়া গেছি আজ
কেমনে কেটে যাবে সারা রাত্তিরে
গভীর মসীময় ঘন তিমিরে!

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

নলিনীর প্রতি।

সরসী জলের মাঝে সতত বসিয়া,
কেগো তুমি ফুলরাণি, নয়ন রমিয়া?
ছুটিয়া তোমার পাশে,
ভ্রমর ভ্রমরী আসে,
লুটিবারে তব মধু নাচিয়া নাচিয়া,
ঘুরে মরে সারাদিন তোমারে ঘেরিয়া।
চাহিয়া তোমার পানে,
কত স্মৃতি আসে মনে,
আনন্দের রসে মোর মেতে উঠে হিয়া,
শুষ্ক মুখে আসে হাসি তোমা নিরখিয়া।
চাহিয়া কৌমুদি প্রায়,
তব রূপ বারি ধায়,
বিকাশে বিরত ওই—ভুবন বিভিয়া:
বিস্মিত লোচনে তাই, থাকিগো চাহিয়া!
চাহেও মেটেনা আশা,
হৃদয়ের ভালবাসা,
তাই তোমা রাখি হৃদে যতনে ধরিয়া,
প্রতিক্ষণে তাই তোমা থাকিগো চুমিয়া!

শ্রীহরেন্দ্রকুমার মজুমদার।

ধারণাতীত।

(১)

সুদূর অনন্তে আসন বিছায়ে
কে তুমি রয়েছ বসিয়ে?
অযুত বরণে অযুত প্রভায়
উজলিয়া দিক্ নিজ মহিমায়
সুন্দর নীল অসীম গগনে
সুষমা দিয়েছ ছড়ায়ে!
সুদূর অনন্তে আসন বিছায়ে
কে তুমি রয়েছ বসিয়ে!

(২)

বিশ্ব প্রকৃতি তোমার পানেতে
নীরবে রয়েছে চাহিয়া;
রবি শশী তারা গ্রহ অগণন
চিরকাল তারা করিছে ভ্রমণ
তোমারে ঘেরিয়া ঘেরিয়া।
গভীর গরজে বেলা অতিক্রমি
সাগর ধাইছে প্লাবি' তীর ভূমি;
তোমারে দেখিতে হয়ে কুতুহলী
অচল উঠিছে উচ্চে শির তুলি;
হুহুঙ্কার করি মত্ত প্রভঞ্জন
তোমার উদ্দেশে করিছে গমন
তোমারে না পেয়ে শূন্য হৃদয়ে
হতাশে আসিছে ফিরিয়া।

বিশ্বপ্রকৃতি তোমার পানেতে
নীরবে রয়েছে চাহিয়া।

(৩)

জগতের কত নরনারী নিত্য
কহিছে তোমার কাহিনী;
দেশ দেশান্তরে কত শত কবি
বিরচিছে কত নব নব ছবি
গাহিছে কতনা রাগিণী;
বহুকাল ধ'রে কত যোগী ঋষি
কত মতে তোমা ভাবে দিবানিশি,
কত দার্শনিক কত যুক্তি বলে
তোমারে আনিতে চাহে তর্ক স্থলে
তবু না পেয়ে সংশয় জালে
বদ্ধ হতেছে আপনি;
জগতের কত নর নারী নিত্য
কহিছে তোমার কাহিনী।

(৪)

কল্পনা জল্পনা ভাবনা সাধনা
এ সকলে কিছু হবেনা হবেনা
কল্পনাতীত সাধনাতীত ভাবনাতীত
তুমি গো।
বোঝেনা তথাপি হৃদয় আমার
বাধা ঠেলি তাই শত দুর্নিবার
কল্পনার পথে তোমারে খুঁজিতে
পাগলের মত ধায় গো;
তুমি যদি প্রভু করুণা প্রকাশি
প্রেমের কণিকা দাও গো;
মায়া মোহ মদ সব যায় দূরে
ঘুরিতে হয় না আর দ্বিধাভরে
ভব জনমের সার ধন পেয়ে
জীবন সফল হয় গো।

শ্রীকামিনী নাথ রায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পরীক্ষক। তোমার বিবেচনায় আকবর ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে কে অধিক চরিত্রবান সম্রাট ছিলেন?

ছাত্র। এ বিষয়ে আপনার যে মত আমারও তাই।

পরীক্ষক। পূর্ব্বেকার অপেক্ষা ইংরাজদের আমলে আমাদের এত সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির কারণ কি বলিতে পার?

ছাত্র। আমিত বলিতে পারি না, আমার পিতামহ বলেন নবাবদের আমলে তিনি দু'হাতে টাকা লুটতেন, আর আজ কাল আমার কাকা সারাদিন সাহেবের চাকরী করে ত্রিশদিনে ত্রিশটী টাকাও পুরা

পান না। আর আপনি ত কোম্পানির চাকর আপনার অবস্থাও ত তত ভাল নয়; তবে কেমন করে বলি যে ইংরাজের আমলে আমাদের সুখসমৃদ্ধি বাড়্‌ছে?

পরীক্ষক। আচ্ছা বসগে, তোমার ইতিহাসের নম্বর— —5.

* * *

তোমার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর উপর মধ্যমাঙ্গুলি রাখ। টেবিলের উপর একটী মার্ব্বেল রাখিয়া এই দুই অঙ্গুলির দ্বারা মার্ব্বেলটি এদিক ওদিক নাড়িতে থাক, তোমার বোধ হইবে যেন দুইটি আঙ্গুলের মধ্যে দুইটি মার্ব্বেল নড়িতেছে।

* * *

যাহারা ঋণজালে জড়িত সুবিধা হইলেই সহজ উপায়ে ঋণ পরিশোধ করিয়া পরিত্রাণ পায়। আবার অনেকে একটু হাঁটাইয়া খাটাইয়া টাকা পরিশোধ করে।

একব্যক্তি তাহার মহাজনের নিকট ডাকে একপুঁটলী ছেঁড়া ন্যাকড়া পাঠাইয়া দিত এই পার্শ্বেল লইতে মহাজনের ৮০ আনা মাশুল লাগে। খুলিয়া দেখে একখানি ক্ষুদ্র কাগজে লেখা আছে "এই পুঁটলির মধ্যস্থলে আটটি দুআনি আছে আমার ১০৲ টাকা ঋণের মধ্যে একটাকা শোধ গেল।" এইরূপে মাসে মাসে একটি পুঁটলি পাইয়া মহাজনের দশ টাকা শোধ হইল। কিন্তু মাশুলের খরচার জন্য সে আদালতের আশ্রয় লইয়াছিল। খাতক তাহার দশমাসের ছেঁড়া ন্যাকড়ার চতুর্গুণ দাবী করায় মিটিয়া যায়।

আর একব্যক্তির বৃদ্ধ মহাজন প্রতিমাসে তিনক্রোশ পথ হাঁটিয়া ঋণের তাগাদা করিতে আসিত। সে বিরক্ত হইয়া তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে একদিন পঞ্চাশ টাকার পয়সা ভাঙ্গাইয়া ঋণ পরিশোধ

করিল। বৃদ্ধ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সেই পয়সার মোট মাথায় করিয়া তিনক্রোশ পথ হাঁটিতে বাধ্য হইয়াছিল।

আর একজন তাহার ৭৷৮ টাকা ঋণের জন্য মহাজনকে এক মাস কাল অপেক্ষা করিতে বলে। সে অস্বীকার করিয়া নালিশ করিবার ভয় দেখায়। ইহাতে সেইব্যক্তি পরদিবস মহাজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলে যে তোমার টাকা কালই পরিশোধ করিব, আর মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য আমরা একত্রে ভোজন করিব। চর্ব্বচুষ্য ভোজন করাইয়া সে মহাজন বলিল "তোমার ঋণ পরিশোধ হইল, রসগোল্লার মধ্যে একটি হাপ্‌গিনি পুরিয়া তোমায় ঠকাইতে গিয়া ছিলাম কিন্তু অন্য মনস্কে ভুলিয়া গিয়াছি সে রসগোল্লাটি তুমি গিলিয়া ফেলিয়াছ।" বেচারি বাড়ী গিয়া গলায় আঙ্গুল পুরিয়া বমি করিতে করিতে সকল সুখাদ্যের সহিত হাপ্‌গিনি পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিল। সেই অবধি সে নিমন্ত্রণ লইবার আগে ভাবিয়া দেখে তাহার কিছু পাওনা আছে কি না?

* * *

নীতিবাক্য।

"কমল তুলিতে যদি করহ বাসনা
ভাব সহ্য হবে কি না কণ্টক যাতনা।
ইচ্ছা যদি কর, কর মধু আহরণ
ভাব সহ্য হবে কিনা মাক্ষিকা দংশন।

"তারকায় স্নিগ্ধজ্যোতি" "নক্ষত্রের অশ্রুকণা" কবির বড় সাধের সামগ্রী কিন্তু কালে যে তারকার জ্যোতি ম্লান হওয়া দূরের কথা একেবারে নিবিয়া যায় এসংবাদ কবির নিকট বড়ই গদ্যময়। প্রাকৃতিক মাসে মাসে কোন কোন নক্ষত্র একেবারে নিবিয়া যায় আর তাহাদের নয়নগোচর হয় না, ইহার কারণ কি? জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা বলেন

নক্ষত্রগুলি এক একটি সূর্য্য সদৃশ পৃথিবীর ন্যায় জড়পিণ্ড নহে। কাজেই কোন কোনটি রাত্রে দেখা না দিয়া দিবসে কিরণ দেয় এবং উজ্জ্বল সূর্য্য রশ্মিতে অদৃশ্য থাকে। নক্ষত্র একেবারে নিবিয়া যাইবার আর একটা কারণ তাহারা পরস্পরের সংঘর্ষ লাগিয়া অথবা কোন বেগগামী বৃহৎ স্বর্গীয় পদার্থের আঘাতে চূর্ণ হইয়া যায় এই সকল চূর্ণ প্রস্তর অথবা ধাতুখণ্ড শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন গ্রহের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাতে আকর্ষিত হইয়া থাকে। আমাদের পৃথিবীতে উল্কাখণ্ডরূপে এই সকল প্রস্তর বা ধাতুখণ্ড প্রতিবৎসর স্তূপাকারে পড়িয়া থাকে। কবিকল্পনার নীলাম্বরা যামিনীর মণিময় ভূষণ সকলের এই পরিণাম!!! মরমাটি!!! বেশীদিনের কথা নয় Catallus নামে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র এইরূপে মাটি হইয়াছে। আবার Pleiades নামে নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে একটি রত্ন খসিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই নক্ষত্রপুঞ্জে সাতটি রত্ন ছিল অনেকেই জানেন কিন্তু এখন কেবল ছয়টিমাত্র দেখা যায়।

* * *

হীরকের পরীক্ষা। জিহ্বার উপর রাখিলে হীরক কাচ কিম্বা কৃত্রিম প্রস্তরের অপেক্ষা অনেক শীতল বোধ হয়।

* * *

পারিসে শিশুরঞ্জনার্থে খেলনার পুস্তক বাহির হইয়াছে, ইহাতে যে সকল জীবজন্তুর ছবি আঁকা আছে, পুস্তক খানি খুলিয়া একটি সুতা টানিলেই ঐ সকল জীব চক্ষু নাড়ে এবং স্বাভাবিক শব্দ করে।

চাউল চুরির প্রশ্নের উত্তর

২	৫	২	৩	৩	৩	৪	১	৪
৫		৫	৩		৩	১		১
২	৫	২	৩	৩	৩	৪	১	৪

রাম। এই শনিবারের ঘোড়দৌড়ে কি পেলে ?

শ্যাম। (রাগিয়া) সে খপরে তোমার দরকার কি ?

রাম। আহা হেরে গেছ ! বড়ই দুঃখিত হলুম।

*　*　*

ক্রেতা। কাল এই ছাতাটা তোমার দোকান থেকে কিনেই মাথায় দিয়ে বাড়ী গেলুম, আর বৃষ্টির জলে রঙধুয়ে আমার কাপড় কালি হয়ে গেল।

দোকানদার।—দেখি, এটা যে আমাদের পেটেন্ট ডিটেক্‌টিভ ছাতা এ ছাতা যদি কেউ চুরি করে তা'র কাপড় দেখেই তখনই ধ'রে ফেল্‌বেন।

ক্রেতা। (সন্তুষ্ট হইয়া) বটে বটে তবে দাও, জানি তোমরা আমায় ঠকাবে না।

*　*　*

সুইজরলাণ্ডে আজকাল ঘড়ী প্রস্তুত হইতেছে তাহার আর ডাইল কিম্বা কাঁটার দরকার হয় না। অপরাপর গৃহসজ্জার ন্যায় ঘড়ী এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে, একটি বোতাম টিপিলেই ঘড়ীর ভিতরস্থ ফনোগ্রাফ হাঁকিয়া বলিল, "সাড়ে ছয়টা" "তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট" ইত্যাদি।

*　*　*

চীনের মুলুকে টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিলে অপমান করা হয়।

*　*　*

কোনও বিজ্ঞাপন লেখককে মানানসই করিয়া একটি বিজ্ঞাপন ছাপাইতে বলা হইয়াছিল। সে এইরূপ একখানি কাগজ ছাপিয়া আনিল ;—

আত্মোন্নতি-সমিতির
সভ্যগণ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া যে
স্বদেশ সেবায় ব্রতী হইয়াছেন
একতা
তাহার মূল মন্ত্র। লোক নিন্দার ভয়
বা দ্বেষ হিংসা তাহাদের মধ্যে
নাই সুতরাং
সর্ব্বসাধারণে যে উৎসাহ প্রদান করিবে তাহার
আর বিচিত্র কি ? উৎসাহ পাইলে লোক হিতকর
সকল কার্য্যই
সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। স্বদেশবৎসলগণ
তৎপর স্বস্ব দেয় চাঁদা পাঠাইলে কি
দেশের উন্নতি সাধনে
বিশৃঙ্খল হয়।

* * *

অদ্ভুত ধান্যবৃক্ষ—চীনদেশে এক প্রকার ধান্য বৃক্ষ আছে, উহা প্রায় ৫০৫৫ ফিট্ উচ্চ। উহার গোড়া ৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত মোটা হয়। ধান্যের চাউল মন্দ হয় না; অধিকন্তু ইহার ত্বক্ হইতে এক প্রকার সুন্দর, অতি সূক্ষ্ম কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

* * *

নারিকেলমালার উপকারিতা—নারিকেল যে কিরূপ উপকারী সামগ্রী, তাহা সকলেই অবগত আছেন, অতএব নারিকেলের উপকারীতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য। সম্প্রতি নারিকেল-মালার একটী অদ্ভুত গুণ আবিষ্কার হইয়াছে। কিছুদিন গত হইল

কোনও একটী অভিজ্ঞ সাহেব কৃষক তাঁহার অধীন কুলিদিগের মধ্যে নারিকেল মালার ছাই ব্যবহার করাইয়া ওলাউঠার বিস্তৃত মারীভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। মির্জ্জাপুর অঞ্চলে "কলেরার" প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সাহেব প্রত্যেক কুলিদিগকে নারিকেল মালার ছাই প্রত্যহ ব্যবহার করিতে দিতেন; ইহাতে অতি অল্পসময়ের মধ্যে "কলেরার" প্রাদুর্ভাব একেবারেই হ্রাস হইয়া যায় এবং নারিকেলমালার ছাই ব্যবহার করিবার পর হইতে কুলিদিগকে আর উক্ত রোগগ্রস্ত হইতে হয় নাই; যাহা হউক, আজকাল বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে; অতএব যেখানে মারীভয় খুব বেশী, সেখানে নারিকেলমালার ছাই ব্যবহার করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? অবশ্য নারিকেলমালার ছাই অনিষ্টকর পদার্থ নহে, সুতরাং সেবন করিতে কেহই আপত্তি করিবেক না। (কৃষিতত্ত্ব।)

* * *

মনিব অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা মারিয়া কোনও উত্তর না পাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "হ্যাঁরে মেধো, তুই কি ঘরে নেই, না মরে আছিস্?"

ভৃত্য ভিতর হইতে উত্তর করিল "আজ্ঞে দুটোই ভুল, আমি ঘুমুচ্চি।"

সমালোচনা।

সোণার স্বপন। মহাভারত নাট্য-কাব্য প্রণেতা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত, ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত। ইহা যে আধুনিক দর্শক বৃন্দের রুচির অনুরূপ হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য, রঙ্গালয়ে দর্শক বৃন্দের আধিক্যই তাহার প্রমাণ। ইহাতে কয়েকটি

মধুর গীত আছে, নৃত্যও যথেষ্ট আছে। আমরা বিজ্ঞাপন দৃষ্টে প্রথমে মনে করিয়াছিলাম ইহা সেক্ষপীয়রের "A Mid Summer Night's Dream" অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু তাহা নহে, "সোণার স্বপন" প্রফুল্ল বাবুর মৌলিক স্বপন। ইহা আধুনিক থিয়েটারের সম্পূর্ণ অভিনয়োপযোগী হইয়াছে।

প্রকৃতি। এক খানি ছাত্র পরিচালিত ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা। ইহাতে ছাত্রলিখিত ছাত্রগণের পাঠোপযোগী কবিতা ও প্রবন্ধাদি থাকে। আমরা "ছাত্র" নামক আর একখানি ঐ ধরণের ক্ষুদ্র পত্রিকা পাইয়া থাকি। আমরা "ছাত্র," "প্রকৃতি"র উন্নতি কামনা করি।

কুন্তলীন পুরস্কার। ইহাতে পুরস্কার প্রাপ্ত কয়েকটি সুন্দর গল্প আছে। কাগজ ও ছাপা যে অতি উৎকৃষ্ট তাহা বলাই বাহুল্য। এইচ্ বসু মহাশয় সুগন্ধি প্রস্তুত করিয়া এ দেশে স্বাধীন ব্যবসা ও প্রশংসাই উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন, আবার অনেক সাহিত্য সেবীকে এইরূপে পুরস্কার প্রদানে উৎসাহিত করিয়া, ও তাহাদের রচিত গল্পগুলি এরূপ সুন্দর ভাবে ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করায় আরও প্রশংসার্হ হইয়াছেন। সাহিত্য ও স্বাধীন ব্যবসায়ে তাঁহার অনুরাগ অনুকরণীয় ও প্রশংসাযোগ্য।

সাহিত্য-সংহিতা। "সাহিত্য সভার" মাসিক পত্রিকা। ছাপা ও কাগজ উত্তম, লেখাও গবেষণাপূর্ণ। বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য লোকে ইহার লেখক। কতকগুলি প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের উপযুক্ত না হইলেও শিক্ষাপ্রদ ও চিন্তাশীল। সম্পাদকীয় ভারও উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত।

তাজমহল।

প্রবাসী ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা
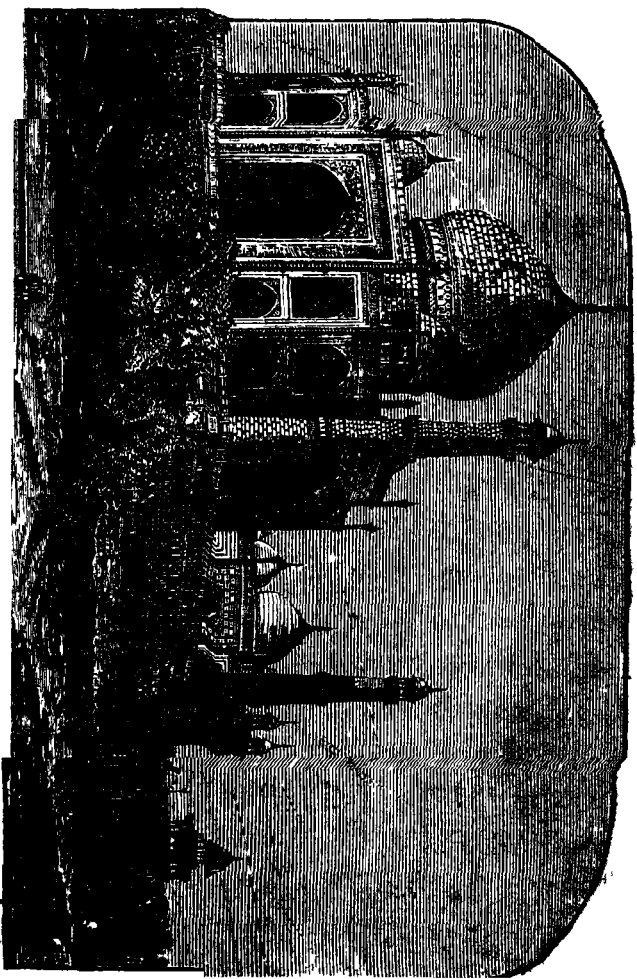
ELM PRESS CALCUTTA
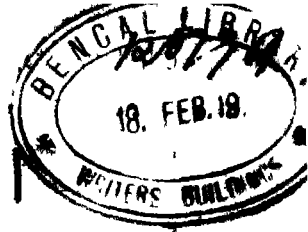
প্রয়াস।

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ।] অক্টোবর, ১৯০০ সাল। [দশম সংখ্যা।

শরতে।

এখনো রয়েছে নিশি, নিস্পন্দ জগত বাসী,
ধরণীর শান্ত কোলে গভীর নিদ্রিত ;
সুনির্ম্মল নীলাকাশে, সুধাকর যায় ভেসে,
সুধাময় কিরণেতে দিক্ বিভাসিত।
অসংখ্য উজ্জ্বল তারা, হইয়ে নিমেষ হারা,
হেরিতেছে প্রকৃতির প্রশান্ত ধেয়ান ;
আধ আলো, আধ ছায়া, শুভ্র মেঘে ঢাকে কায়া,
চন্দ্রমার সুধাহাসি হয়ে আসে ম্লান।
মেঘ মন্দ্র গুরু গুরু, কে এঁকেছে শ্যামভুরু,
সুদূর কাননপ্রান্তে মানসরঞ্জন !
কিরণ কুমারগণে, ছায়া কুমারীর সনে,
খেলা করে কুঞ্জবনে হরষে মগন।
বেগে ধায় সুরধুনী, করি' কল কল ধ্বনি,
সুফেণ তরঙ্গ রঙ্গে তীর প্রক্ষালিত ;

কোথা সে অতলস্পর্শী,   নীল সলিল রাশি,
অনন্ত উদার সিন্ধু ভীম গরজিত।
বিশাল জাহ্নবীবুকে,   পাল ভরে মন সুখে,
ধাইছে স্রোতের মুখে তরণী কোথায়,
স্তিমিত প্রদীপ শিখা,   সুদূরে যেতেছে দেখা,
খসিয়া পড়েছে তারা ভাগিরথী গায।
সঙ্গীত লহরী তুলে,   মাঝি গায় প্রাণ খুলে,
উচ্চকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত করি' দুই কুল,
অধীর হতেছে প্রাণ,   তোমার রচিত গান,
গাও সখে, শুনিবারে পরাণ ব্যাকুল।
এস সখে' দুই জনে,   পশি সুখে উপবনে,
সজল শারদ শোভা শীতল শ্যামল;
জল ভরা পত্রপুটে,   চাঁদের কিরণ ফুটে'
কি অসীম শান্ত জ্যোতিঃ করে ঝলমল।
বস এই কুঞ্জতলে,   মাথা রাখি' তব কোলে,
আবেশ বিহ্বল আঁখি অলস শয়ন;
হেরিব নয়ন ভরে,   পুষ্পময়ী লতিকারে,
কুসুমিত শেফালিরে করে আলিঙ্গন।
লোহিত, গোলাপী, সিত,   ফুলবাসে বিভূষিত,
মরি কি মধুর শোভা মধুর মিলন;
কামিনী আড়ালে থাকি'   মেলিয়া কুসুম আঁখি,
নেহারে সরম ভরে—প্রেমাশ্রু পতন।
বিকশিত কাশ রাশি,   ঢুলায় চামর আসি,
সুখদ সমীর মন্দ মৃদু পরশন,

সিগ্ধবাসে ভরপুর, শেফালিকা ঝুরঝুর,
শ্যামল পাদপছায়া নবদূর্ব্বাসন।
ওই শুন ঝিল্লিদলে, গান গায় ঝাঁপতালে,
ঝিঁঝিট রাগিণী স্বরে তুলিয়া স্থতান ;
তুমি তবে গাও সখা, তোমার সরস লেখা,
—সমুদিত শুক তারা নিশা অবসান।—
বাসনা যেতেছে ছেড়ে, গাও সখে গলা ছেড়ে,
উদাস ভৈরবী স্বরে আমারে শুনাও—
ঘন শ্যাম তরু রাজি, "সরস শরতে আজি,
বিরস কেনরে প্রাণ" ধীরে ধীরে গাও।

শ্রীরসময় লাহা।

—০ঃ০—

বিহারিলাল।

যৌবন রচনাতে।

এই প্রসঙ্গে বিহারিলালের চারি খানি কবিতা পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। পুস্তকগুলির নাম "সঙ্গীত শতক," "বন্ধুবিয়োগ," "নিসর্গ সন্দর্শন" এবং "প্রেম-প্রবাহিণী" কাব্য।

সঙ্গীত শতক।—এই পুস্তকখানি সন ১২৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েকটী গীত বিহারিলালের বাল্যবয়সের রচনা এবং অপরগুলি তাঁহার যৌবনকালে রচিত। এই সঙ্গীতবহুল বঙ্গদেশেও বেলা, যুঁথী, মল্লিকার মৃদু সুবাসের মধ্য হইতে কোন এক অনাঘ্রাতপূর্ব্ব চামেলির স্নিগ্ধ সৌগন্ধের ন্যায়, বিহারি-

লালের গীত গুলি একটু নূতনত্বের, একটু মধুর বিশেষত্বের আভাস দিয়াছিল। এই "সঙ্গীত শতক"এর—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

প্রভৃতি দুই একটী চরণ বঙ্গীয় জনগণের নিকট বিশেষ রূপে পরিচিত, অথচ উহাদের রচয়িতার নাম অনেকেরই অজ্ঞাত। এই গীতগুলিতে বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় প্রেমোচ্ছ্বাস নাই, রামপ্রসাদের ন্যায় ভক্তি কীর্ত্তন নাই, নিধু বাবুর ন্যায় প্রেম-তত্ত্ব বা হরুঠাকুর প্রমুখ কবিওয়ালাদিগের আদিরস ঘটিত কবিত্ব নাই। ইহাদের মধ্যে রামবসুর বিরহ নাই, বিহারি লালের অন্তরঙ্গ যাত্রাগায়কদিগের গীতের প্রতিধ্বনি নাই, এবং দাশুরায়ের পাঁচালীগানের অনুপ্রাস যমকের ছটার বিকীরণেও সেগুলি অনুমাত্র দীপ্ত হয় নাই। সঙ্গীত শতকে এই প্রাচীন বস্তুর কিছুই নাই, অথচ সকলই আছে, কারণ গীতিকবিতার যাহা প্রাণ তাহা আছে। ইহাতে সঙ্গীত আছে, ইহাতে কবিত্বময় ভাব আছে, ইহাতে সরল মধুর ভাষা আছে, এবং সে কবিত্ব, সে ভাব ও ভাষা সমস্তই জাতীয়। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে যে ধরণের সঙ্গীতের আদর হইয়াছে, সেই জাতীয় সঙ্গীত রচনার বিহারিলালই প্রথম কবি ও প্রবর্ত্তক। কবি তাঁহার প্রিয়পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

'সঙ্গীত শতক প্রিয়ে, হলো সমাপন।
তব বিনোদন তরে, ইহার রচন,
বুঝিলে ইহার ভাব, পাইবে আমার ভাব,
প্রেম, ধর্ম্ম, প্রকৃতির হবে উদ্দীপন।

কবি তাঁহার প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায়কে ১২৯৬ সালে লিখিয়াছিলেন—

"১৫ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত আমার মনে যে যে ভাবোদয় হইয়াছিল এবং জীবনে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ "সঙ্গীত শতক"এ বর্ণিত আছে।"

বস্তুতঃই এই গীত কয়েকটী তাঁহার যৌবন হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। এই ক্ষুদ্রপরিসর পুস্তিকায় কবি, প্রেম, ভক্তি, তেজ, অভিমান, ঘৃণা, বিদ্বেষ, রুচি, নীতিশিক্ষা, ধর্ম্মজ্ঞান সমস্তই অল্পকথায় বর্ণন করিয়া তাঁহার অন্তরের একটী সুস্পষ্ট চিত্র আঁকিয়াছেন। পরন্তু এই গীতগুলির আর একটু বিশেষত্ব এই যে, এগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কবি যাহা বলিতেছেন তাহাতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ বা সন্দিগ্ধ ভাব নাই, সকলই তাঁহার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা, মৌখিক বাক্‌-চাতুর্য্যও নহে। কবির মনের উচ্চভাব, তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তর দেখাইবার জন্য, স্নেহ ও প্রেম সম্বন্ধে দুই একটী গান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

স্নেহের সমান ধন আর নাকি হয়!
প্রেমবল, মৈত্রীবল, কিছু কিছু নয়,
নিজ অর্থে নাই আশা,—কি নির্ম্মল ভালবাসা।
স্বর্গেরো অমৃত কিরে হেন সুধাময়?

কবি পাঁচটী গানে (৫০ হইতে ৫৪) মানব প্রেমের যে পবিত্র চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা লালসা কলুষিত প্রণয়গীত বহুল বঙ্গদেশে তৎকালে সম্পূর্ণ অভিনব। কবি বলিতেছেন—

প্রেম প্রেম করে লোকে কে জানে প্রেম কি ধন?
সকলে রূপের করে অনায়াসে সঁপে মন; ইত্যাদি।

আবার—

অন্তর নির্ম্মল কর পাবে প্রেম দরশন,
পবিত্র হৃদয় হয় প্রেমের প্রিয় আসন;
থাকিলে জঞ্জাল তায় প্রেম নাহি দেখা দেয়
মলিন মুকুরে মুখ দেখা যায় কি কখন? ইত্যাদি।

বিহারিলাল বিরহের তীব্র যাতনা দুই একটী গানে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মর্ম্মতলের দারুণ ব্যথা প্রকাশ পায় বটে, অথচ সে বিরহ বেদনায় "অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী"র কথা মনে আসেনা, মাটির ভার সে দুঃখকে স্পর্শ করিবার অবসর পায় না। এই গীতগুলি বিহারিলালের প্রতিভার অভ্রান্ত প্রথম লক্ষণ। তাঁহার প্রতিভা তখন হইতেই দেশীয় কবিগণের পরম্পরাগত প্রথা ভেদ করিয়া নূতন পথে ধাবমান হইবার জন্য উন্মুখ।

গীতিগুলিতে ভাবের বিকাশ কিরূপ মধুর তাহার উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী গান উদ্ধৃত করিলাম। প্রবল বাত্যার অবসানে শান্ত ধরিত্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

নিস্তব্ধ ভুবন হয়েছে এখন।
আর নাই সোঁ সোঁ শব্দ প্রচণ্ড পবন;
হইয়ে উন্মত্ত প্রায়, কি কাণ্ড করেছি হায়,
এই ভেবে যেন কাঁদে, মন্দ সমীরণ।

মলয় পবনকে উদ্দেশ করিয়া কবি গাহিতেছেন—

মরি কি মলয়ানিল ধীরে ধীরে বায়।
শীতল সুধার ধারা এসে লাগে গায়;
সরো তরঙ্গের প'রে পদ্ম টল টল করে,

হাসি হাসি মুখে তা'র হেসে চুমো খায়।
মধুকণা হরে লয়ে জলের শীকর বয়ে,
কাপাইয়ে তীর তরু নেচে নেচে যায়;
এসে আমাদের বাসে আমোদ মাতিয়ে হাসে,
যাইয়ে শোকের পাশে শোক গান গায়।

এইরূপ সরল মধুর কথায় ভাবের মনোরম বিকাশ অধিকাংশ গীতেই পরিলক্ষিত হয়। সাগর বর্ণনা, গিরি বর্ণনা, সন্ধ্যা বর্ণনা, নবঘন দর্শন, চন্দ্রোদয়, অমানিশা, অরুণোদয়, প্রভৃতি বিষয়ক গীতিগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিহারিলাল সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির অন্ধ উপাসক ছিলেন না। বিহারিলালের নিকট প্রকৃতি তরুণ বয়স হইতেই প্রাণময়ী। তিনি বলিয়াছিলেন "প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে।"

স্বর্গীয় বাবু রাজনারায়ণ বসু বহু বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" নামক প্রস্তাবে এই পুস্তকখানির নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"অনেকে এইরূপ আক্ষেপ করেন যে, ধর্ম্ম ও আদিরস ঘটিত গীত (যাহাদের অনেকগুলিই অশ্লীলতা ও অবিশুদ্ধ প্রেমদ্বারা কলুষিত) ব্যতীত বন্ধুত্ব, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালাভাষায় অদ্যাপি গীত রচিত হয় নাই। কিন্তু এ আক্ষেপ অনেক পরিমাণে না হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে অমূলক। * * * কবিবর বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী "সঙ্গীত শতক" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে নানা বিষয়ের সঙ্গীত আছে।"

বন্ধুবিয়োগ।—বন্ধুবিয়োগ, পয়ারছন্দে সরলভাষায় লিখিত একখানি ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য। কাব্যখানি পাঁচটী সর্গে সম্পূর্ণ, কিন্তু পঞ্চম সর্গটী পুস্তকখানি মুদ্রাঙ্কণকালে হারাইয়া যাওয়াতে কেবল চারিটী সর্গ মুদ্রিত হইয়াছিল। পঞ্চম সর্গটীর পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার

করিয়া কবি রাখিয়া গিয়াছেন। কাব্যখানি ১২৬৬ সালে রচিত হয় কিন্তু একাদশ বর্ষ পরে প্রকাশিত হয়। ইহা ক্ষুদ্র আকারে শেলির Adonais, টেনিসনের In Memoriam এর ন্যায় বন্ধুবিয়োগ-জনিত শোক গান। এই কাব্যে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি বা কোনরূপ নূতনত্ব নাই, কিন্তু ইহাতে বিহারিলাল মাতৃভাষাসেবা ও নারীভক্তি বিষয়ে তাঁহার প্রাণের অনেক কথা অকপট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয়, ও রামচন্দ্র নামক চারিজন অভিন্ন-হৃদয় শৈশব সহচর বাল্যসখা ও যৌবন-সুহৃদের এবং কিশোর-বয়স্কা প্রথমাপত্নীর অকাল মরণে ব্যথিত হইয়া কবি নিজ জীবনের অনেক কথা এই কাব্যে বিলাপ-করুণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

নিসর্গ সন্দর্শন।—এই খণ্ডকাব্যখানি ১২৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের ৩য় ও ৪র্থ সর্গ ১২৭০ সালে, ১ম ও ২য় সর্গ ১২৭২ সালে এবং ৫ম সর্গ ১২৭৪ সালে রচিত হয়। নভোমণ্ডল নামক (৪র্থ) সর্গটী ১২৭৬ সালের "অবোধ বন্ধু" পত্রে প্রকাশিত কবির রচিত 'সুরবালা' নামক অসম্পূর্ণ কাব্যের প্রথমাংশ হইতে গৃহীত। এই কাব্যে সন্নিবিষ্ট অধিকাংশ কবিতাই প্রথমে অসংলগ্ন ভাবে অবোধ বন্ধুর ১ম ও ২য় ভাগে প্রকাশিত হয় এবং ঐ কবিতাগুলি একত্রিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া কবি ঐ পত্রের ৩য়ভাগে "নিসর্গ সন্দর্শন কাব্য" নামে পুনর্মুদ্রিত করেন।

নিসর্গ সন্দর্শন কাব্য সপ্ত সর্গে সম্পূর্ণ। এই কাব্যে কবি, ফেণকিরীটি ঊর্ম্মিরাশিময় জলধির অনন্ত বারিপ্রবাহ, বজ্রমুখর তমোগম্ভীর প্রবল ঝটিকাময়ী রজনীর ভীষণ ভ্রুকুটী, বাত্যা-বিধ্বস্ত প্রভাত-ধরণীর শ্রীহীন মুখচ্ছবি, নক্ষত্র-নীহারিকা-

ছায়াপথ-পরিশোভিত নীলোজ্জ্বল নৈশ নভের প্রশান্ত রূপরাশি প্রভৃতি কয়েকটী প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিস্ময়োচ্ছ্বাসময় স্বভাবসুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে স্বদেশের অতীত গৌরব, বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও অধীনতার জন্য বিষাদময় অনুশোচনা আছে। "নভোমণ্ডল" সর্গে, নৈশাকাশের বিশাল সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া, কবি অনন্ত আকাশের সহিত জগদীশ্বরের তুলনা করিয়াছেন—

ঈশ্বরের ন্যায় তুমি সূক্ষ্ম নিরাকার
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ,
ঈশ্বরের ন্যায় সব ঐশ্বর্য্য তোমার,
অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন।

প্রেম-প্রবাহিণী।—পয়ারছন্দে লিখিত একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। ১২৬৭ সালের প্রারম্ভে ইহার অধিকাংশ ভাগ রচিত এবং ১২৭৭ সালে ইহা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের কিয়দংশ ১২৬৫ সালে পূর্ণিমা পত্রে "প্রেম বৈচিত্র্য" নামে প্রকাশিত হয় এবং "পতন" শীর্ষক প্রথম কবিতাটী ১২৭৪ সালের "অবোধ বন্ধু" পত্রে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থখানিতে কবির রচনা ও কবিত্ব শক্তির ক্রমোন্নতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। "বন্ধুবিয়োগ" কাব্যে বিহারিলাল তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট মানব জীবনের ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন, "নিসর্গ সন্দর্শন" কাব্যে তিনি বাহ্য প্রকৃতির কয়েকটী মূর্ত্তির বাহ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রেম-প্রবাহিণীতে কবি মানব মনের কয়েকটী ভাব কবিতায় পরিব্যক্ত

করিয়াছেন। বন্ধুবিয়োগের বর্ণনীয় বিষয় পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, নিসর্গসন্দর্শনের আখ্যান বস্তু সমুদ্র, আকাশ ঝটিকাদি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। প্রেম-প্রবাহিণীর তরঙ্গভঙ্গ প্রেম, বিরাগ, বিষাদ প্রভৃতি অন্তর্জগতের ভাব গুলি লইয়া। নিসর্গসন্দর্শনের ভাষা বন্ধুবিয়োগের ভাষা হইতে অপেক্ষাকৃত পরিমার্জ্জিত কিন্তু প্রেম প্রবাহিণীর শব্দৈশ্বর্য্য, লালিত্য, পারিপাট্য এবং মাধুর্য্য পূর্ব্বোক্ত উভয় পুস্তক হই-তেই শ্রেষ্ঠতর।

বীণাবাদিনীর সুকোমল করবাদিত মোহিনী বীণার অনুকারী হইয়া বিহারিলালের কলকণ্ঠ অদূর ভবিষ্যতে যে "সারদা মঙ্গল" গান গাহিবে, সেই অশ্রুতপূর্ব্ব অতুলনীয় সারদামঙ্গল গানের যেন একটী অস্পষ্ট ক্ষীণতান প্রেম-প্রবাহিণীর কবিতায় ঝঙ্কৃত হইতে শুনা যায়। যে প্রেম ও সৌন্দর্য্য মূর্ত্তি কয়েক বর্ষ পরেই, কবির হৃদয়ে সমুদিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিবে, যাহার অদর্শনে কবি জগৎ ঘনতমসাচ্ছন্ন দেখিবেন, যাহার সহিত মিলনে তিনি সুখস্বর্গে আরোহণ করিবেন, সেই চির দয়িত সারদা-প্রেমের ছায়া মূর্ত্তি দেখিয়াই বিহারিলাল প্রেম প্রবাহিণীতে গাহিয়া-ছিলেন—

> সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,
> এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ;
> প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়,
> তাই তো প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয়।

কোন শোচনীয় ঘটনায় মনুষ্যহৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে

সন্নিহান হইয়া, কবি উদ্ভ্রান্তের ন্যায় প্রেমের প্রকৃত আবাস মন্দির নির্ণয়ের জন্য কত স্থানেই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় সুন্দর পবিত্র ও প্রীতিপ্রদ পদার্থে, পরে কল্পনাবলে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল অনুসন্ধানে বিফল মনোরথ হইয়া, কবির ধ্রুব প্রতীতি হইল যে জগতে যখন জীবন্ত প্রাণী রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই প্রেম জগৎকে ত্যাগ করে নাই—প্রেমই যে বিশ্বের প্রাণ। কবি পুনরায় প্রেমকে ত্রিভুবনে পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু প্রেমের সন্ধান পাইলেন না। কবি হতাশহৃদয়ের দুর্ব্বিষহ ভাবে প্রপীড়িত হইয়া কাতর চীৎকারে প্রেমকে কোথা তুমি দেখা দাও, বলিয়া ডাকিলেন,

অমনি হৃদয় এক আলোকে পূরিত,
মাঝে বিশ্ব বিমোহন রূপ বিরাজিত।
মধুময়, সুধাময়, শান্তি সুখময়,
মূর্ত্তিমান প্রগাঢ় সন্তোষ রসোদয়।

কবি দেখিলেন প্রেমের কিরণে বিশ্ব আলোকিত হইয়াছে, প্রেমের জয় ধ্বনিতে বিপদ সম্পদ প্রভৃতি জগতের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা সমূহ নিশার স্বপ্নের আকার ধারণ করিয়াছে, পাপপ্রবৃত্তি নিচয় অবনত মস্তকে দূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যৌবনসুলভ লালসা উপহসিত হইয়া বেগে অন্তর্হিত হইতেছে। কবি অনুভব করিলেন—

যেন ক্রমে নিবিতেছে লোক কোলাহল,
ললিত বাঁশরী তান উঠিছে কেবল।
মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে,
দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগ ভরে।

প্রাণ যেন উড়িতেছে সেই দিক পানে,
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেই স্থানে।
অহো অহো, আহা আহা একি ভাগ্যোদয়,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দ ময়!

খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় বিশুদ্ধ জাতীয় ভাবে, ও পয়ারছন্দে এরূপ মধুর, পবিত্র, কবিত্বময়, আবেগময়, উচ্ছ্বাস বোধ হয় ইহাই প্রথম ও ইহাই শেষ। কবির গঠিত প্রেমের উন্নত আদর্শ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ৺ ঈশ্বর গুপ্তের প্রবল প্রতাপ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছেন। সুকুমার বয়সের রচনা গুলির মধ্যে "প্রেম প্রবাহিণী" কাব্য খানির স্মৃতি ও মমতা বিহারি লালের হৃদয় হইতে প্রাচীন বয়সেও অপসৃত হয় নাই। প্রেম প্রবাহিণীর কয়েকটী চরণ সারদামঙ্গল কাব্যে স্থান পাইয়াছে।

কবি বিহারিলালের উপরোক্ত যৌবন রচনাগুলিতে জীবিত থাকিবার উপযোগী অস্থিমজ্জা আছে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু সেগুলি যে তাঁহার ভবিষ্যৎ অমর কবিত্ব শক্তির পূর্ব্বাভাস প্রদান করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্গ সুন্দরী।

বিহারিলালের রচনাবলীর মধ্যে এই কাব্যখানি, সাধারণের নিকট অপেক্ষাকৃত পরিচিত। কবির জীবদ্দশায় এই কাব্যখানি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রাপ্ত হয়। কাব্যখানি দশ সর্গে সম্পূর্ণ। সর্গ কয়টীর নাম পর্য্যায়ক্রমে—উপহার, নারীবন্দনা, সুরবালা, চিরপরাধিনী, করুণা সুন্দরী, বিষাদিনী, প্রিয় সখী,

বিরহিণী, প্রিয়তমা এবং অভাগিনী। এই সর্গগুলির মধ্যে "উপহার" সর্গটীর কিয়দংশ (২৯ হইতে শ্লোক) ১২৭৪ সালের "অবোধবন্ধু" পত্রে "প্রিয় সখা" নামে প্রকাশিত হয়। কবির "প্রিয় সখা" অপর কেহ নহেন, তদীয় পরমহিতৈষী পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এবং "বঙ্গসুন্দরী"র উপহার তাঁহারই উদ্দেশে লিখিত একথা বন্ধুত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। "চিরপরাধিনী" সর্গটীও ১২৭৪ সালের "অবোধ বন্ধু"তে "পরাধীনা বঙ্গকন্যা" নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সর্গটীর উৎপত্তি কোন বঙ্গীয় লেখিকার "বঙ্গকন্যা" নামক একটী কবিতা হইতে। কবিতাটী প্রথমে ১২৭৪ সালের "অবোধ বন্ধু"তে প্রকাশিত হয়। পরে ১২৭৮ সালের ঐ পত্রে বিহারিলাল ঐ কবিতাটী নিজ কবিতার টীকা স্বরূপ পুনর্মুদ্রিত করেন।

বঙ্গ সুন্দরীর দ্বিতীয় সংস্করণের সময় এই সর্গ হইতে একটি আপত্তি জনক (রাজভক্তির অভাব সূচক) শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। "করুণা সুন্দরী" সর্গটীও ১২৭৪ সালের "অবোধ বন্ধু"তে প্রথমে প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর ঐ পত্রে কবি "বঙ্গ-সুন্দরী" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র কবিতায় জনৈক পুষ্পচয়নরতা সুন্দরী বঙ্গরমণীর চিত্র আঁকিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই ক্ষুদ্র কবিতাটী হইতেই বিহারিলাল বক্ষ্যমান কাব্যের নাম করণ স্থির করিয়াছিলেন। উপরোক্ত খণ্ড কবিতা সন্নিবেশিত করিয়া, বিহারিলাল, ১২৭৮ সালের "অবোধ বন্ধু"তে বর্ত্তমান আকারে "বঙ্গ সুন্দরী" নামে প্রকাশিত করেন এবং সেই বৎসরই ঐ কাব্য পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়।

১২৭৬ সালের "অবোধ বন্ধু"তে বিহারিলাল "সুরবালা"

নামক একটী অসম্পূর্ণ কাব্যের তিনটী সর্গ প্রকাশিত করেন। ১২৮৬ সালে "বঙ্গ সুন্দরী"র দ্বিতীয় সংস্করণ কালে এই "সুরবালা" কাব্যের অংশ বিশেষ গ্রহণ করিয়া কবি " সুরবালা " নামক একটী নূতন সর্গ সংযোজিত করেন।

"সুরবালা" "অভাগিনী" ও "চিরপরাধিনী" সর্গ সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জীবিত, সেই জন্য রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল না। "প্রিয়তমা" সর্গ কবির নিজ পত্নীরই উদ্দেশ্যে লিখিত. একথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

" উপহার " সর্গটী ব্যতীত, " বঙ্গসুন্দরী " কাব্যখানি, চারি পংক্তির, পর্য্যায়ক্রমে দ্বাদশ ও একাদশ অক্ষরে গ্রথিত ছন্দে রচিত। প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে মিল।

যথা—

আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে
সেহৃদি কানন কুসুমরাশি,
আপনা আপনি আসি থরে থরে
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি।

এই ছন্দটী কবির প্রথম বয়সের বড় প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন যে সংস্কৃত কাব্য (কালিদাসের রঘুবংশ) হইতে তিনি এই ছন্দের বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ছন্দটীর নামকরণ হইয়াছিল "ললিত লতা"ছন্দ।

রবীন্দ্র বাবু এই ছন্দের দোষগুণ উভয়ই প্রদর্শন করিয়াছেন:—

"এ ছন্দ নারী বর্ণনার উপযুক্ত বটে, ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষরের

স্থান নাই" যুক্ত অক্ষরে ছন্দভঙ্গ করে, অথচ "বাঙ্গালার যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য, যুক্ত অক্ষরের উপরই নির্ভর করে।"*

কিন্তু "ললিত লতা" ছন্দের দোল এত চমৎকার, কবি সুললিত ভাষায় ইহাকে এতই শ্রুতিমধুর করিয়াছেন যে, বঙ্গসুন্দরী পাঠের সময় ইহার বিরল যুক্তাক্ষর বা মাত্রাহীনত্ব দোষ অনুভব করা যায় না ; বৈচিত্র্যময় কুসুমকোমল শব্দলালিত্য কর্ণকুহরে অবিরাম মধুবর্ষণ করিতে থাকে। ভাষাদরিদ্র কবির রচনাতে এই ছন্দ সঙ্কীর্ণ বোধ হইতে পারে এবং অসম্পূর্ণ মিলে ও শ্রুতিকঠোর শব্দে, এই দোষটী প্রবল হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু—রবীন্দ্র বাবুর কথায়—

'বিহারিলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমান নির্ঝরের মত সহজ সঙ্গীতে অবিশ্রাম ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত, অক্ষমতা জনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথাও একথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।"*

পরন্তু ললিত লতা ছন্দে যে যুক্তাক্ষরের স্থান নাই একথা সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। বিহারিলাল এই ছন্দে আবশ্যকমত যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিতে ক্রটী করেন নাই, এবং সেরূপ স্থলে ছন্দ ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যেমন—

নবীনা নলিনী কেশ এলাইয়ে,
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ;

---

*সাধনা, ১৩০১ সালের আষাঢ়।

নয়নের পথে ছুলিয়ে ছুলিয়ে,
সোণার প্রতিমে বেড়ায় যেন।

এস্থলে "নন্দিনী" কথাটী নন্-দি-নী এরূপ ৩টী অক্ষর বিভাগ করিয়া পাঠ করা অতি সহজ সাধ্য এবং এরূপ করিলে ছন্দ ভঙ্গ অনুভব করা দূরে থাকুক, ছন্দের ধ্বনিবৈচিত্র্য বা সৌন্দর্য্য, ঐ কথাটীতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তবে যাঁহারা আজ কাল যুক্তাক্ষর গুলিকে দুই বা তিনটী অক্ষর স্বরূপ গণনা করিয়া বঙ্গ কবিতা হইতে যুক্তাক্ষর ও অযুক্তাক্ষরের শব্দপার্থক্য অন্তর্হিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের মত অন্য-রূপ হইতে পারে,—"বিভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।" বিহারিলালের ছন্দ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিলেই হয়। প্রকৃত কবি-গণের রচনায় যেরূপ নূতনত্ব থাকে, ছন্দেও সেইরূপ একটী বিশেষত্ব থাকিবেই। বস্তুতঃই ছন্দের মাত্রা বা অক্ষর যেরূপই হউক, বিহারিলালের ছন্দ, তাঁহার কবিতার অংশীভূত, তাঁহার নিজের সুর স্বভাবজাত ও সুন্দর। অপর কবিগণের পক্ষে উহা অনুকরণীয় কিনা সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে।

"বঙ্গ সুন্দরী"র সুললিত শব্দ সঙ্গীতের মধ্যে যে দুই এক স্থলে কর্কশ বা অশিষ্ট বাক্য স্থান পাইয়াছে, সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এইরূপ শব্দ প্রয়োগ কবির স্বেচ্ছাকৃত। আমরা দেখিতে পাই যেখানে ভাষা কর্কশ বা অপ্রীতিকর, সেখানে ভাবটীও ঘৃণাকর বা অসুখকর। বিহারিলাল যে বিষয়কে ঘৃণা বা অপ্রীতির চক্ষে দেখিতেন, সে বিষয়ের উল্লেখের সময় তাঁহার ভাষাও এরূপ হইয়া আসিয়াছে যাহাতে পাঠকের মনে কবির মনোভাব স্বতঃই প্রতিফলিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ দুইটী খণ্ড কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(১) বুঝি এই পোড়া বিধির বিধিতে,
পিতা মাতা ভয় ধরিয়ে করে!
করেছেন দান সে কাল নিশিতে,
ধাঙড়া ভাঙড়া বেদড়া বরে!

(২) সেই বলে আমি ক্রূর নিয়তির,
কড়া কশাঘাত সহিতে পারি।
ভাঁড়ামি ভীকতা বোঁচা পেত্নীর,
এক কাণা কড়ি নাহিক ধারি।

কঠোর ও কোমল, দ্রুতগামী ও মন্দগতি ভাব প্রকাশের উপযোগী তুল্যরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দপ্রয়োগ কাব্যকলার গুণাবলীর অন্যতম বলিয়া, বিবেচিত হইয়া থাকে এবং সেরূপ ভাবে ধরিলে বিহারিলালের এই অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু ললিতকলায় অসুন্দরের স্থান নাই; অপর লেখকের পক্ষে অপ্রীতিকর যথেচ্ছ ভাষা ব্যবহার মার্জ্জনীয় হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কবির ওরূপ দূষণীয় বাক্য প্রয়োগে কোনও অধিকার নাই। যাহা হউক বিহারিলাল বিভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন; নতুবা তাঁহার স্থায় অসাধারণ শব্দকুশলী কবির নিকট এরূপ বাক্য পরিহার করা বিনায়াসে ও পলকে সাধিত হইতে পারিত। বিহারিলাল অনেক বিষয়ে স্বাধীন মতাবলম্বী ছিলেন, তিনি, "বিনা" "প্রতিমা" প্রভৃতি চলিত শব্দের পরিবর্ত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক "বিনে" "প্রতিমে" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেন, তিনি "মাত্র" না লিখিয়া "মাত্ত" লিখিতেন। এই শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে বিহারিলালের একটী কৌতুকাবহ মতের নমুনা স্বরূপ, ১২৭৬ সালের "অবোধবন্ধু" হইতে "নিসর্গ সন্দর্শন" কাব্যের একটী শ্লোক ও তাঁহার টীকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"হেরিয়া নিসর্গ দেব সংসারের প্রতি,
পবন দুর্দ্দান্ত পুত্র কৃত অত্যাচার,*
দাঁড়ায়ে আছেন যেন হয়ে ভ্রান্তমতি,
নিস্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি বিষণ্ণ বদন।"

যাহা হউক বিহারিলালকে যুবাবয়সের এরূপ অদ্ভুত মত পুনঃ প্রচার করিতে হয় নাই, এবং তাঁহার স্বভাবতঃ অতিমধুর কবিতায় শ্রুতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ এতই বিরল যে তাহা উল্লেখ যোগ্য নহে।

"বঙ্গসুন্দরী" কাব্যের প্রধান দুইটী বিশেষত্ব—দুঃখ অভিব্যক্তি এবং নারীপূজা, পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। বিস্তৃতি ভয়ে কবিতা খণ্ড উদ্ধৃত করিয়া কাব্যের অনন্যসাধারণ শব্দলালিত্য, উন্নতভাব মাধুরী, প্রাণস্পর্শী সরল কারুণ্যময় আবেগ দেখাইতে পারিলাম না। একটী মাত্র গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, গীতটী বড়ই মধুর ও কবিত্বময়:—

কি জানি কি মনে মনে ভেবেছে আমায়।
না দেখিলে মরে প্রাণে দেখিতে না চায়—
তবু কেন দেখিতে না চায়।
আপনি দেখিতে গেলে, কত যেন নিধি মেলে,
আদর করিতে এসে কেঁদে চলে যায়।
কাঁদিয়ে ধরিলে করে, থর থর কলেবরে,
চেয়ে থাকে মুখপানে পাগলের প্রায়।
সহসা চমুকে ওঠে, সভয়ে চৌদিকে ছোটে,
আবার সমুখে এসে কাঁদিয়ে দাঁড়ায়।

---

* "আমরা এই কবিতায় যে মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে যত্ন পাইয়াছি, 'অত্যাচারের' পরিবর্ত্তে 'উৎপীড়ন' শব্দ প্রয়োগ করিলে ঔদার্য্যের হ্রাস হয়, সেই মারাত্মক দোষের পরিহারার্থ মিল দোষ স্বীকার করিলাম।"

ছল ছল দুনয়ন, ম্লান চারু চন্দ্রানন,
আকুল কুন্তল জাল, অঞ্চল লুটায়।
আবার সমুখে নাই; কেবল শুনিতে পাই,
হৃদি ভেদি কণ্ঠধ্বনি ওঠে উভরায়।
সাধে কে সাধিল বাদ। কেন হেন পরমাদ,
কেনরে বেঘোরে মোরা মরি দুজনায়।

"বঙ্গসুন্দরী" পাঠ করিয়া বহুদর্শী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন "আমি এমন মিষ্ট কবিতা আর কোথাও পড়ি নাই", * এবং এই কাব্যে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস পড়িয়া রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন 'আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা।' † যে কাব্যের মনোহারিত্ব ও বিশেষত্ব এরূপ দেদীপ্যমান, যে কাব্যের নারীপূজা গান উদারতায় সার্ব্বভৌমিক, উচ্চাদর্শে কাব্যজগতে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সুধীগণের নিকট সমাদৃত, সে কাব্য যে বঙ্গভাষার চিরগৌরবের সামগ্রী বলিয়া জীবিত থাকিবে, এরূপ আশা বোধ হয় দুরাশা নহে।

ক্রমশঃ।

পঞ্চাননের বিপদ।

পঞ্চানন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর গৃহে ফিরিতেছে, স্ত্রীর নিকট কি কৈফিয়ৎ দিবে তাই ভাবিয়াই আকুল। প্রথমে মনে ঠিক্ করিয়াছিল বলিবে "থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল," কিন্তু পথে আসিতে আসিতে দেখিল থিয়েটার গৃহগুলি বিরহিণী রমণীর ন্যায় নির্জ্জনে অন্ধকারে

---

* সাবিত্রী—সাবিত্রী লাইব্রেরীতে পঠিত বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ।

† সাধনা ১৩০১ আষাঢ়।

বসিয়া কাঁদিতেছে। আজ আর তাহাদের সে বেশভূষা, সে আলোক-মালা, সে হাসি নাই! তখন পঞ্চাননের হঠাৎ মনে হইল সেটা শুক্রবার, থিয়েটরের বার নহে। পঞ্চাননের স্মৃতিশক্তি যে কিছু অল্প ছিল তাহা নহে, তবে আপাততঃ "স্মৃতিশক্তি ডুবেছিল বিস্মৃতির জলে"— (এখানে "বিস্মৃতির জলের" অর্থ ব্রাণ্ডি।) অনেক চিন্তার পর পঞ্চানন স্থির করিল, বলিবে কোনও এক বন্ধু অত্যন্ত পীড়িত, তাহাকে দেখিতে গিয়া এত রাত্রি হইয়াছে। পঞ্চানন যতক্ষণ রাস্তায় হাঁটিতে ছিল, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে বিকৃতস্বরে গান গাহিয়া রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, কিন্তু বাড়ির কাছে আসিয়া একেবারে চুপ। চোরের মত পা টিপিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, শয়নকক্ষের দ্বারে ও জানালার নিকট অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখন স্থির বুঝিল যে স্ত্রী নিদ্রিত তখন আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিল। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলিতেছিল কিন্তু আলো কমান ছিল। সুতরাং কুঁজা হইতে জল গড়াইতে যাইয়া একটা শূন্য কলসীতে পা লাগিয়া কলসী ও পঞ্চানন উভয়েই গড়াইতে লাগিল। চিরপ্রথানুসারে শূন্য কলসী গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং তৎসঙ্গে পঞ্চানন-পত্নীও নিদ্রাভঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। এত সতর্কতা সব বিফল হইল, পঞ্চানন ফাঁফরে পড়িল, একটু রাগও হইল, স্ত্রীকে বলিল "তোমার যেমন কাণ্ড, ঘরের মাঝখানে এক প্রকাণ্ড ঘড়া বসিয়ে রেখেছ, আমি জল গড়া'তে গিয়ে নিজে গড়াচ্ছি।"

স্ত্রী। কেন তোমার চোক দুটো কোথাও রেখে এসেছ নাকি? কোন্ দিকে জল গড়াতে গেছিলে, যে জান্‌লায় কুঁজো থাকে সেদিকে না গিয়ে ঠিক্ উত্তরদিকে গেছিলে তাইত ঘড়ার ঘাড়ে পড়েছ। একেবারে বেহুঁস যে, দিগ্বিদিক জ্ঞান আছে কি? এত করে বলি, তবু ত লজ্জা হয় না? রাত তিনটের কম বাড়ি আসা হয় না?

প। বলি তোমারও ত খুব হুঁস দেখ্‌ছি এই মোটে একটা, তোমার কাছে এরিমধ্যে তিনটে হ'ল। এক বন্ধুর অসুখ করেছে তা'কে দেখ্‌তে গিয়েই ত এত রাত হ'ল, কালও বোধ হয় দেখ্‌তে যেতে হবে, ভারি শক্ত ব্যারাম।" বলা বাহুল্য পঞ্চানন শনিবারের কৈফিয়ৎটা আগে থাক্‌তেই গাড়িয়া রাখিল। "যা'ক্, আর জল চাইনে, বাধা পড়েছে, ঘুমোন যাক্।" এই বলিয়া পঞ্চানন শয়ন করিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইল। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে দারুণ তৃষ্ণায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিতে হইল, কিন্তু কুঁজোর মুখে গেলাস দেখিতে পাইল না। ইতস্ততঃ চাহিয়া আলমারির উপর গেলাস রহিয়াছে দেখিল। উহা জলে পূর্ণ ছিল। পঞ্চানন আবার কষ্ট না করিয়া যেমন এক চুমুক মারিল, অমনি বমি করিয়া ফেলিল, গেলাস দূরে নিক্ষেপ করিল। কি সর্ব্বনাশ! গেলাসে এক নেংটি ইঁদুর ছিল—পঞ্চানন কেমন করিয়া জানিবে? কিন্তু পঞ্চানন ইঁদুরকে ছাড়িল না, যেমনি তাহার মুখ হইতে উহা ভূমে পতিত হইল পঞ্চানন পায়ে উহাকে চাপিয়া ধরিল। পঞ্চাননের স্ত্রীর নিদ্রা, গেলাস পতনের শব্দেই ভাঙ্গিয়াছিল, রুক্ষ স্বরে বলিল "আবার কি, তোমার আজ হ'য়েছে কি বল দেখি?"

প। আরে শীগ্‌গির ঝাঁটা গাছটা নিয়ে এস, এক ব্যাটা নেংটি ধরা পড়েছে, ব্যাটা রোজ সব জিনিষ কেটে পালায়।"

পঞ্চাননের স্ত্রী তাই শুনিয়া ঝাটা বাহির করিল। নেংটির উপর তাহারও রাগ ছিল, কেননা সে তাহার নূতন বালিশ কাটিয়া ছিল।

প। খুব সাবধান, যেন পালায় না, এই বাই আমি পা তুল্‌বো তুমি অমনি, ব্যাটাকে মেরে ফেলো।

এই বলিয়া পঞ্চানন ধীরে ধীরে অতি সাবধানে পা উঠাইল, কিন্তু

ইঁদুর আর নড়ে চড়ে না! পঞ্চাননের স্ত্রী ভাবিল পায়ের চাপেই উহা মরিয়া থাকিবে। ভাল করিয়া দেখিয়া পঞ্চাননের স্ত্রী রাগে গরগর করিতে করিতে ঝাঁটা দূরে ফেলিয়া দিয়া শয়ন করিল। হরি! হরি! ইঁদুর কোথা? পঞ্চাননের স্ত্রী, ছেলের দুধখাবার বোতলের রবারের মুখটা গেলাসের জলে ডুবাইয়া রাখিয়া ছিল তাইত এত গোল!

আর একদিন পঞ্চানন বড় বিপদে পড়িয়াছিল। কার্য্যোপলক্ষে রাত্রি একটার সময় গৃহের বাহিরে আসিয়া নীচের ঘরে বাসনের শব্দ শুনিতে পাইল। অন্ধকারে একজন মনুষ্য বাসন নাড়িতেছে দেখিতে পাইল। কয়েক দিন পূর্ব্বে পঞ্চাননের দু'একখানি বাসন চুরি যায়। সেই চোরেরই যে লোভ ও সাহস বাড়িয়াছে, পঞ্চাননের তাহা বুঝিতে আর বাকি রহিল না। কিন্তু চোরকে ধরিতে তাহার সাহস হইল না, কেননা সে জানিত উহাতে বিলক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা আছে। পঞ্চানন স্ত্রীকে জাগাইবে ভাবিল। কিন্তু তাহাতে দুইটি বাধা আছে, প্রথমতঃ স্ত্রী ভাবিবে পঞ্চানন কাপুরুষ, দ্বিতীয়তঃ হয়ত স্ত্রী চোর আসিয়াছে শুনিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিবে, চোরও পলাইবে। অতএব তাহা না করিয়া পঞ্চানন বাক্সর ভিতর হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া তাহাতে গোটা কয়েক ছর্‌রা পুরিয়া চোরকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িল। সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে "গুড়ুম" শব্দ গগনতল বা আম্রবন কাঁপাইয়া ছিল কি না বলিতে পারি না, তবে পঞ্চাননের স্ত্রীর হিয়া যে কাঁপাইয়া ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেননা সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চোর একদিকে ও অপরদিকে পঞ্চাননের স্ত্রী "ওগো খুন কল্লে গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বন্দুকের শব্দে ও দুই জনের চীৎকারে পাড়ার লোকেরাও জাগিয়া উঠিল, এবং বোঁদের

পাহারাওয়ালা সহ আট দশ জন লোক দরজা ভাঙ্গিয়া পঞ্চাননের বাড়ি প্রবেশ করিল। দেখিল নীচে একজন স্ত্রীলোক আহত হইযা "মেরে ফেল্লে গো, খুন কল্লে গো" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, উপরেও একজন স্ত্রীলোক "ওগো আমায় খুন কল্লে গো" বলিয়া পঞ্চাননের হাত হইতে বন্দুক কাড়িবার চেষ্টা করিতেছে। পাহারাওয়ালা লোকজনের সাহায্যে পঞ্চাননের হাত বাঁধিয়া নীচে যেখানে আহত স্ত্রীলোক পড়িয়াছিল সেইখানে আনিল। আলোকে পঞ্চানন চোরকে চিনিল, সে আর কেহই নহে বাটির নূতন ঝি। পঞ্চানন অবাক্! পাড়ার লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল "কেন তুমি ওকে খুন কল্লে?" পঞ্চানন বলিল "চোর মনে করিয়াছিলাম, এত রাত্রে নীচের ঘরে বাসন নাড়িতেছে শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম নিশ্চয়ই চোর, ওমা!গো যে এত রাত্রে কি মৎলবে বাসন নাড়িতেছিল তা' ত বুঝি না।" ঝি একেবারে খুন হয় নাই, পায়ে অল্প আঘাত লাগিয়া ছিল মাত্র। সে উহা শুনিয়া উত্তর করিল "ওগো সে কি গো, রাত্রি কোথা, ঘড়িতে টং টং ক'রে পাঁচটা বাজ্‌লো শুনে ভোর হয়েছে মনে ক'রে বাসনগুলো মাজতে গেছ্‌লুম গো, আমায় কি হ'লো গো" একজন লোক বলিল "বাছা, তুমি আফিম টাফিম খাও না কি? এখনও দুটো বাজে নি, তুমি পাঁচটা শুন্‌লে কোথা থেকে?" ঠিক্ সেই সময়ে পঞ্চাননের ঘড়িতে টং টং করিয়া ছ'টা বাজিল। ঝি বলিল "ঐ দেখ, ছ'টা বাজ্‌লো।" পঞ্চানন সকলকে বুঝাইয়া বলিল ঘড়িটি খারাপ হইয়া গিয়াছে, ইচ্ছামত বাজিয়া থাকে, মেরামত করিতে দিবার পর হইতে তাহার ঐ রোগ হইয়াছে। তখন পাহারাওয়ালাকে কিছু বক্‌শিস্ দিয়া বিদায় করা হইল, পাড়ার লোকেরাও নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেলে পর, পঞ্চানন সকল অনর্থের মূল ঐ ঘড়িটাকে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

ব্রাহ্মণ জাতি।

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে এই শব্দের বৈয়াকরণিক সংজ্ঞা হইতে কতদূর সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। ব্রহ্মণ্ শব্দ অণ্ প্রত্যয় যোগে ব্রাহ্মণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মণ্ শব্দটীর অর্থ জানিতে পারিলে ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ জানা যায়। কিন্তু এইস্থলে মতদ্বৈধ আছে। এক সম্প্রদায়ের প্রত্নতত্ত্বাবিদ্‌গণ বলেন যে 'ব্রহ্মণ' দিগের অপত্যমাত্রেই ব্রাহ্মণ। অন্য একটী সম্প্রদায়ের মতে "ব্রহ্ম জানাতি" ইতি ব্রহ্ম জানেন বলিয়া ব্রাহ্মণ বলা যায়। এই মত বৈষম্যের বিচার না হইলে ব্রাহ্মণ শব্দের প্রকৃত অর্থ, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলা যায়, আধুনিক সমাজে ব্রাহ্মণের প্রয়োগ করা কিছুই স্থির করা যায় না।

নৈয়ায়িক আচার্য্যদিগের মতে নাম চতুর্ব্বিধ—যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ় ও রূঢ় যৌগিক। এতদ্ভিন্ন লক্ষক ও এক প্রকার নাম আছে। যোগ কিনা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বা অবয়বার্থ অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ অনুসারে যে নাম হয়, তাহাকে যৌগিক কহে। যেমন, পাচক প্রভৃতি। পাচ্ ধাতুর অকণ্ প্রত্যয় যোগে পাচক শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে; পাচ্ ধাতুর অর্থ পাক, প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তা, সুতরাং পাচক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ পাককর্ত্তা। এই প্রকারে ব্রাহ্মণ শব্দও ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্ম শব্দের অর্থ বেদশাস্ত্রে প্রত্যয়ের অর্থ যুক্ত বা অধ্যায়ী সুতরাং বেদাধ্যায়ীকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দটী যদি বাস্তবিক যৌগিক শব্দ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে শূদ্র ব্রাহ্মণ শব্দটী গুণবাচক, বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, জাতিবাচক নহে। সঙ্কেত যুক্ত

নামকে রূঢ় বলে। যে নাম প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত হয় না, সমুদয়ের অর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে রূঢ় শব্দ বলা যায়—যেমন গো প্রভৃতি শব্দ। গম্ধাতু ও ডোস্ প্রত্যয় যোগে গো শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব গো শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গমনকর্ত্তা; কিন্তু গো শব্দটী কেবল গো পশু সম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাহ্মণ শব্দটী রূঢ় বলিয়া গণ্য করিলে, আধুনিক সমাজের ব্রাহ্মণ জাতি-বাচক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। রূঢ় শব্দের সঙ্কেত দুই প্রকার, আজানিক ও আধুনিক। যাহা নিত্য অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা আজানিক এবং যে সকল সঙ্কেত কালবিশেষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আধুনিক যথা ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ শব্দটী প্রথমে যৌগিক শব্দ ছিল; কিন্তু ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তি নিমিত্ত ও প্রবৃত্তি নিমিত্ত অর্থ বিভিন্ন হইয়াছে অর্থাৎ এই শব্দটী এক অর্থে ব্যুৎপন্ন হইয়া অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আর্য্যসমাজের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ঐ সমাজের প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ শব্দটী গুণবাচক শব্দ ছিল অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্রেই ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য হইতেন। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ভারতীয় আর্য্যসমাজের শাখা ইরাণীয়দিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে, ভারতীয় আর্য্যসমাজের চারিটী ব্যবসায়ের নামোল্লেখ আছে * যথা আচার্য্য (ব্রাহ্মণ) রথেষ্টা (ক্ষত্রিয়) বাস্ত্রিয়ং সুয়ং (বৈশ্য) হুয়িতি (শূদ্র); ঐ গ্রন্থে এই চারিটী শ্রেণীকে pishtro (পিষ্ট্রো) অর্থাৎ ব্যবসায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভারতীয় ও ইরাণীয় সমাজ পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে এই চারিটী ব্যবসায় শ্রেণী বর্ত্তমান

* Yasua XIX, 46.

ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাৎকালিক সংস্কৃত গ্রন্থে ঐ শ্রেণীগুলির বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাৎকালিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সূত্রগ্রন্থে ও তৎপশ্চাৎ অন্যান্য গ্রন্থে যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আপস্তম্ব বলিয়াছেন :—

ধর্ম্মাচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণ মাপদ্যেত জাতিপরি বৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং বর্ণমাপদ্যেত জাতিপরিবৃত্তৌ ॥

আজন্ম জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

আজন্ম সকলেই শূদ্র ; যাহাদিগের সংস্কার হইয়াছে তাহারা দ্বিজ ; যাঁহারা বেদপাটী তাঁহারা বিপ্র ; যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রাহ্মণ।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বং আশুগচ্ছতি মান্বয়ঃ ॥ (মনু)

কোনও ব্যক্তি সংস্কার যুক্ত হইয়াও যদি বেদপাঠে অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি সপরিবারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হযেন।

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্মস্বভাবজং ॥ (গীতা)
স্বাধ্যায়েনজপৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যায়াহুতৈঃ ;
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ (মনু)
যোগস্তপো দমো দানং সত্যং শৌচং দয়া শ্রুতম্।
বিদ্যাবিজ্ঞানমাস্তিক্যং এতদ্ ব্রাহ্মণ লক্ষণম্ ॥ (বশিষ্ট)

যদিও এই সকল গ্রন্থ রচনা কালে "ব্রাহ্মণ" শব্দটী জাতি বাচক হইয়াছিল, তথাপি গ্রন্থকারগণ ঐ শব্দের যৌগিক অর্থটী অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। যখন বর্ণ সকল স্থিরীকৃত হইয়া গেল, তাহার পরেও নিরুক্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন :—

"বর্ণো বৃণোতেঃ।" "গুণকর্ম্মাণি চ দৃষ্ট্বা যথা যোগ্যং ত্রিষয়ে যে তে বর্ণাঃ।"

"শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥"

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্" ইত্যাদি।

এই সকল বচন নিতান্ত অপ্রয়োগী বা অসার নহে। কারণ ত্রিবাহু ব্রাহ্মণ হইয়াও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবষ ঐলূষ নামক ঋষি দাসীপুত্র হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে ক্ষত্রিয় বংশীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। (৪র্থ অংশ ১৯ অধ্যায়)।

এই সকল বাক্য হইতে যথেষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণ শব্দটী পূর্ব্বকালে গুণবাচক ছিল বটে, কিন্তু কাল ব্যতিক্রমে ঐ শব্দটী জাতি-বাচক হইয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই জাতিকে সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য কি না? যে সকল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র অদ্যাপি শাস্ত্রের ধূয়া ধরিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, তাঁহারা অশাস্ত্রীয় মিথ্যা কল্পনার আবিষ্কার করিয়া আপনাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন। যাঁহারা শাস্ত্র-বিচারে অনিচ্ছুক হইয়াও সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, তাঁহারা একত্রিত হইয়া সাধুভাষাদ্বারা মূর্খ অজ্ঞা-নান্ধ ব্যক্তিদিগকে সচেতন করুন।

গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সৎপরামর্শ এই যে, তাঁহারা সমাজের উপকারী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া, সমাজের হিতকামনায় প্রকৃষ্টতম ধীশক্তি পরিচালন করিয়া শীর্ষস্থানীয় হইবার চেষ্টা করুন, নচেৎ অমঙ্গল সম্ভাবনা।

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

মতির পত্র।

(১)

আশ্বিনমাস সন্ধ্যাকাল, যে সে সন্ধ্যা নয় যে দিন চিতোরের ভাগ্য-লক্ষ্মী যবনের অঙ্কশায়িনী হইলেন, সেই প্রসিদ্ধ দিবসের পূর্ব্ব সন্ধ্যাকাল, অর্থাৎ ইহা খৃঃ ১৬১৩ অব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর। রাজা গজসিংহ আজমীর সহরের বাহিরে এক সন্ন্যাসীর নির্জ্জন আশ্রমের সম্মুখে ঘোড়া থামাইলেন।

মোগল সম্রাট আকবরসাহ যোধবাইকে বিবাহ করিয়া মাড়বারের রাঠোর বংশের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়াছেন। সেই রাঠোর বংশীয় রাজা গজসিংহ সম্রাট জাহাঙ্গিরের অধীনে একজন সেনাপতি। রাজপুতদিগকে ছলে বলে কৌশলে বশীভূত করিবার মোগল সম্রাট-দিগের একান্ত ইচ্ছা। অনেক প্রধান রাজপুত বংশ মোগলের সহিত ইতিপূর্ব্বেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, অনেক নির্ম্মলকুল আবার খুস্‌রোজের দিনে কলঙ্কিত হইয়াছে। কেবলমাত্র মিবারের প্রতাপ-সিংহ স্বীয় বাহুবলে স্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্যপুত্র রাণা অমর সিংহ পিতৃ আদেশ পালন করিয়া অনেক যুদ্ধে যবন সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছেন। বার বার পরাজিত হইয়া, জাহাঙ্গির এবার তাহার প্রিয়পুত্র সুলতান কুর্ম্মের (পরে ইতি-হাস প্রসিদ্ধ সাহজেহান) অধীনে বিপুলবাহিনী সমবেশ করিয়া রাণার উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই যুদ্ধে রাজা গজসিংহ সম্রাটের অন্যতম সেনাপতি।

আজমীর আজ যবনবাহিনীর পদভরে কম্পিত। আগামী পরশ

দিবস রাজপুত্র রণযাত্রা করিবেন স্থির হইয়াছে ; এইজন্য যবনসেনা-সমুদ্র, উল্লাসে উদ্বেলিত, তাহাদের চীৎকারে গিরিকন্দর প্রতিধ্বনিত।

এই দিন সন্ধ্যার সময় সেনাপতি গজসিংহ অশ্বারোহণে আজমীরের সীমা অতিক্রম করিয়া একাকী পার্ব্বত্যপথে এক নির্জ্জন গুহার সম্মুখে অবরোহণ করিলেন। গজসিংহ প্রৌঢ়বয়স্ক, দৃঢ়কায় এবং সুপুরুষ। রাজোয়ারার পার্ব্বত্যপথসকল তাঁহার বিশেষরূপে পরিচিত ; নতুবা সহরের বাহিরে এমন সময় কে আসিতে সাহস করিতে পারে ? ভাবী যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত না থাকিয়া এমন সময়ে সেনাপতি গজসিংহ এ শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে কি জন্য আসিয়াছেন ?

বহুদিন পূর্ব্বে গজসিংহ এক রাজপুত রমণীর প্রণয়ে পড়িয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। আজ যদি তিনি বিধর্ম্মী যবনের আশ্রয়ে কালাতিপাত না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি এতদিন তাহার সহিত পরিণীত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিতেন। এই রাজপুত রমণীর নাম মতিবাই। আজ অনেকদিনের পর আজমীরে আসিয়া গজসিংহ শুনিলেন—মতিবাই ঘটনাচক্রে আজমীরের সন্নিকটে কোনও সন্ন্যাসীর আশ্রমে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। গজসিংহ সেই যৌবনের সঙ্গিনীর শেষদর্শন লালসায় তাড়াতাড়ি অশ্ব ছুটাইয়া আসিয়াছেন।

বৃক্ষশাখায় অশ্বরজ্জুবন্ধন করিয়া গজসিংহ একটি পর্ব্বত গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠের আলোকে দীর্ঘকায় পক্বকেশ এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া জোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! দীনের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন, আমি সংবাদ পাইলাম আপনার আশ্রমে মতিবাই নাম্নী একটি রমণী এইমাত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে, যদি তাহার সৎকার না

হইয়া থাকে তবে”—গজসিংহ একটি সুদীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া গুহার চারিদিকে চাহিয়া লইলেন—“তবে কি আমি অভাগিনীর শবদেহ একবার নিরীক্ষণ করিতে পারি ?”

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ আগন্তুকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। পরে আকার ও পরিচ্ছদে একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুত দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল “আমি মনে করিয়াছিলাম মতি দীনহীনা কিন্তু এখন যেরূপ দেখিতেছি। তাহাতে আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে। এই বলিয়া একখণ্ড প্রজ্জলিত কাষ্ঠ গজসিংহের হাতে দিয়া সন্ন্যাসী গুহার অভ্যন্তরে অগ্রসর হইল এবং গজসিংহও তাহার ইঙ্গিতে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়াই সন্ন্যাসী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পর্ব্বতের গাত্রে একটি দ্বার দেখাইয়া গজসিংহকে বলিল “যাও বাবা অভাগিনীর শব উহার ভিতরে রক্ষিত আছে।” এই বলিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

অতি সন্তর্পণে গজসিংহ সেই দ্বার দিয়া এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং সম্মুখেই হস্তস্থিত অস্পষ্ট আলোকে দেখিলেন একখানি বল্কল আচ্ছাদিত মতিবাইয়ের অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা পড়িয়া আছে। শবের মুখ অনাচ্ছাদিত থাকায় সেই অস্পষ্ট আলোকে গজসিংহ দেখিলেন যেন মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ খেলা করিতেছে। সেই মুখখানি দেখিয়া গজসিংহের যুগপৎ কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। হস্তস্থিত জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড এইবার নিবিয়া আসিল গজসিংহ হাত বুলাইয়া শবের পার্শ্বস্থিত এক প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলেন।

একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া উঠিল—“মতি এই কি তবে পরিণাম ?” একি। গজু অন্ধকারে যেন তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাসের প্রতিশব্দ শুনিতে পাইলেন, যেন শবদেহ তাঁহার কাতরতায় চঞ্চল হইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

গজ দেহ স্পর্শ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শীতল শবের পরিবর্ত্তে তাঁহার হস্তে উষ্ণ সজীবদেহ ঠেকিল। একি মতি? গজসিংহ আর একটু হইলেই চীৎকার করিয়া উঠিতেন; কিন্তু বীরহৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পরমেশ্বরের দোহাই কে তুমি?" এইবার অন্ধকার ভেদ করিয়া উত্তর আসিল—"আমি কে? আমি মতিকে ভাল বাসিতাম তাই শেষ দেখা করিতে আসিয়াছি, এখানে তোমার আসিবার অধিকার কি?"

গজ। অধিকার তোমারই ন্যায় আমিও মতিকে ভালবাসি।

অপরিচিত। ভালবাস? তুমি ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিলে আজ রাত্রে চোরের ন্যায় এখানে প্রবেশ করিয়া আমার শোকে বাধা দিতে না; তুমি ভালবাস?

গজসিংহ অপরিচিতের স্পর্দ্ধাপূর্ণ উক্তিতে কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন "চোর? বোধ করি তুমি একথার অর্থ জান।"

অপরিচিত ব্যক্তি কর্কশস্বরে বলিল "তা' আর জানি না তুমিই যখন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ? এই কি ভদ্রলোকের ন্যায় কার্য্য, কাপুরুষের ন্যায় অন্ধকারে অপরের—"

গজ। সে কথার বিচার পরে হইবে, কিন্তু পবিত্র শবদেহের সম্মুখে তোমার এরূপ নীচ উক্তিতে বোধ হইতেছে তুমি মতির প্রণয়ের নিতান্ত অযোগ্য পাত্র ছিলে।

অপরিচিত ব্যক্তি এত উত্তেজিত হইয়াও গজসিংহের স্থিরভাব দর্শনে যেন একটু লজ্জিত হইয়াই চুপ করিয়া রহিল। কেবল এই দুই ব্যক্তির নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ গুহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে—অপরিচিত ব্যক্তি যেন কিছু মর্ম্মাহত হইয়া বলিল "আমার ভালবাসার গভীরতা আপনাকে আর কি বুঝাইব। মতিকে

দেখিবার জন্য একদিন আমি মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলাম। আজও এখানে তাহার শেষদর্শনে আসিয়া জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছি—আবও জীবনের অপেক্ষা মূল্যবান আমার বিমল যশে কলঙ্কারোপণ করিতে বসিয়াছি। মহাশয় কি মতির জন্য এতদূর পর্য্যন্ত করিয়াছেন?"

"না" গজসিংহ চিন্তাপূর্ণ বিমর্ষস্বরে শুধু বলিলেন—"না"।

অপরিচিত। যতদিন না মতির জন্য অন্ততঃ আমার সদৃশ বিপদ সম্মুখীন হইবেন, ততদিন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার প্রণয়ে স্পর্দ্ধাকরা কি ভাল দেখায়?

"স্পর্দ্ধা?" গজসিংহ আর স্থিব থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতেছে। বলিলেন "কাহাব সাধ্য প্রবল প্রতাপ জাহাঙ্গীব বাদসাহেব সেনাপতিব প্রতি এরূপ দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করে। আমি এখনি আলো আনাইয়া কাহার অধিক স্পর্দ্ধা পরীক্ষা করিব।"

অপরিচিত ব্যক্তির পরিচ্ছদ একটু বিচলিত হইল। সে বলিল "এখান হইতে একপদ নড়িলে মোগল সেনাপতিব শিব যাইবে।" গজসিংহ দেখিলেন নির্ব্বাণোন্মুখ অঙ্গারের ক্ষীণ রশ্মি অপবিচিতের হস্তস্থিত উন্মুক্ত কৃপাণের উপর পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে।

তিনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর কবিলেন "এইমাত্র তুমি যশে কলঙ্কারোপেব কথা বলিলে, আমি জানি ভীরুর তুল্য কলঙ্ক আর নাই। রাঠোর বীরেরা ওরূপ ভয়প্রদর্শন গ্রাহ্য করে না। এই আমি আলো আনিতে চলিলাম।" বলিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে অসি ধরিয়া গজসিংহ উঠিলেন।

এইবার অপরিচিত ব্যক্তি বলিল "আপনি রাঠোর? আপনাকে ভয় প্রদর্শনে অন্যায় করিয়াছি। আপনি বীর, বীরত্বের দোহাই দিয়া আমি অনুনয় করিতেছি আপনি আলো আনিবার প্রয়াস করিবেন

না, কারণ আমি রাণার একজন বিশ্বস্ত সৈনিক, সকলের অজ্ঞাতে লুকাইয়া মতিকে শেষ দেখা—দেখিতে আসিয়াছি এবং আমার আগমন গুপ্ত রাখাই অভিপ্রেত।" গজসিংহ শুনিতে পাইলেন অপরিচিতের অসি কোষ নিবিষ্ট হইল।

গজসিংহ চমকিত হইলেন। ভাবিলেন রাজপুতবীর যথার্থই প্রণয়ের জন্য যথেষ্ট আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। প্রকাশ্যে বলিলেন "ধন্য আপনার ভালবাসা, আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক আমার দ্বারা আপনি অপদস্থ হইবেন না।"

তা'রপর অপরিচিত সৈনিক হেঁট হইয়া মতির মুখে বারম্বার চুম্বন করিল। পরে উঠিয়া বলিল "আপনার সৌজন্য এবং ধৈর্য্যের জন্য আমার যথেষ্ট ধন্যবাদ জানিবেন। আমি চলিলাম এবং এখনই আলো পাঠাইয়া দিতেছি, তাহা হইলে আপনি এই পত্রখানি পড়িতে পারিবেন। পড়িলেই বুঝিবেন মতিবাইয়ের প্রণয়ে কাহার অধিকার বেশী। সে মৃত্যুর পূর্ব্বে এই খানি আমায় লিখিয়াছিল। এখন বিদায়, অতঃপর আমাদের অন্যত্র সাক্ষাৎ হইবে। এখন আমরা পরস্পরের মর্য্যাদা বুঝিয়াছি, বীরের ন্যায় সম্মুখ সমরে তাহা রক্ষার্থে চেষ্টা করিব "

অপরিচিত ব্যক্তি এই বলিয়া একখানি পত্র গজসিংহের হস্তে দিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল। অল্পক্ষণ পরে সন্ন্যাসী জলন্ত একখণ্ড কাষ্ঠ গজসিংহের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল।

সেই আলোকে গজসিংহ ভাল করিয়া মতিকে দেখিলেন। নিবাত নিষ্কম্প সমুদ্রবৎ মতিবাই যেন প্রশান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে—তাহার মুখে মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার কোন লক্ষণ নাই।

একে একে গজসিংহের কত কথাই মনে হইতে লাগিল। এই মুখ খানি এক সময়ে তাঁহার সর্ব্বস্বধন ছিল। কিন্তু হায় রমণী হৃদয়

চঞ্চলমতি। আবার কোন্ প্রাণে সে আর একজনকে মনে স্থান দিল ? মতির দোষ কি ? গজসিংহ নিজের অবস্থা বিচার কর, অবলার প্রতি দোষ অর্পণ করিবার আগে নিজের চরিত্রের দৃঢ়তার প্রতি লক্ষ্য কর। তুমি কি একদিন মতিকে তাচ্ছল্য করিয়া চলিয়া যাও নাই ? তা'রপর তুমি সম্রাটের জন্য আলোয়ারে যুদ্ধ করিতে গেলে। সেই অবধি কি মতিকে আর মনের কোণে স্থান দিয়াছ ? গজসিংহ নিষ্ঠুর, বুকে হাত দিয়া ভাব দেখি, তা'রপর যৌবনের উদ্দাম লালসার বশবর্ত্তী হইয়া অন্য রমণীর প্রণয় ভিখারী হইয়াছ কি না ? এখন তুমি দেশত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মী যবনের আশ্রয়ে প্রতিপালিত। অবলা রমণীই কি এত দোষ করিয়াছে ?

সে যাহাই হউক মতিবাই কোনপ্রাণে আবার এ রাজপুতকে ভালবাসিল ? গজসিংহ এ চিন্তার কূলকিনারা পাইল না। জগৎ এতই স্বার্থপর, মানব এমনই অন্ধ যে নিজের দোষ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। একবার গজসিংহ ভাবিল, হয়ত রাজপুত তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে মতি নির্দ্দোষ; হঠাৎ তখনি মনে পড়িল। এইমাত্র না সে ভালবাসার উৎকৃষ্ট নিদর্শন মতির শেষপত্র তাঁহার হাতে দিয়া গেল ? আলো নিকটে আনিয়া গজ রাজপুত প্রদত্ত পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন, মতি কি লিখিয়াছে।

একি! গজসিংহ একবারে চম্‌কাইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাতে, একি ? এত মতিবাইএর প্রেমপত্র নহে। গজ একবার দুইবার তিনবার পত্রখানি আগ্রহ সহকারে পড়িলেন। এখানি রাণা অমর-সিংহের স্বাক্ষরিত পত্র—আগামী কল্য প্রাতে রাণার পুত্র কর্ণ রাজপুত সৈন্যসহ মোগলদের আক্রমণ করিবে—তৎসম্বন্ধে রাজপুত সেনানায়ক-গণের প্রতি রাণার আদেশ পত্র।

পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া গজসিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল, তাঁহার শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত ছুটিল। রাণার অভিপ্রায় যুবরাজ কূর্ম্ম বা মোগল শিবিরে কেহই জানেন না। তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত।

গজসিংহের মনে হইল রাজপুত বলিয়াছে—সে রাণার একজন বিশ্বাসী সৈনিক। আর বুঝিতে বাকী রহিল না। সে মতি বাইএর পত্রভ্রমে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে রাণার এই অত্যাবশ্যকীয় [illegible] পত্রখানি দিয়াছে।

গজসিংহ মনে মনে ভাবিলেন এই পত্রস্থ সংবাদ প্রকাশে তাঁহার অধিকার আছে কিনা। গজসিংহের ধমনীতে আর্য্য-শোণিত প্রবাহিত তিনি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে প্রথমে ঘৃণা করিলেন। আবার ভাবিয়া দেখিলেন, যদি তিনি চুপ করিয়া থাকেন, তবে রাণা অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া মোগল সৈন্যকে অনায়াসে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করিবে। সম্রাটের মিবার জয়াশার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও আশা ভরসা মান সম্ভ্রম একেবারে যাইবে। তিনি সম্রাটের আশ্রয়ে প্রতি-পালিত এবং তাঁহার বদান্যতায় পরিপুষ্ট। আর সুলতান কূর্ম্ম অম্বর-দেশীয় রাজপুত বংশোদ্ভব বলিয়া তাঁহার বিশেষ বন্ধু এবং আত্মীয়। কূর্ম্ম এযুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে, তাঁহার মান মর্য্যাদার সীমা থাকিবে না। যাহা হউক বন্ধুর আশু বিপদ এবং আশ্রয়দাতার অনিষ্ট নিবারণই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া গজসিংহ ত্বরিত পদে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুবরাজ কূর্ম্মের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটাইলেন।

গজসিংহ কি কুক্ষণেই তোমার মনে এরূপ যুক্তির উদয় হইল! তোমার জন্যই আজ চিতোরের রক্তধ্বজা শত্রুর কর-কবলিত হইল, তোমার জন্যই গর্ব্বিত প্রতাপসিংহের বংশধরের মস্তক যবনের [illegible]

অবনত হইল ; প্রত্যেক যবনসেবী রাজপুতের আজ আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ হইল।

(২)

রাত প্রায় ১১টা বাজিয়াছে ; আজমীরের দৌলতবাগ অসংখ্য দীপালোকে আলোকিত বহুজনপদ পরিপূর্ণ নগরীর ন্যায় দেখাইতেছে ; মধ্যস্থলে সুরম্য প্রাসাদ চন্দ্রালোকে ধবলাগিরির ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রাসাদের উন্মুক্ত বাতায়ন পথে উজ্জ্বল আলোক দর্শকের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে এবং তন্নির্গত তানলয়যুক্ত সুমধুর গীত বাদ্য নৈশগগনে ভাসিয়া যাইতেছে। আজ সকলেই আনন্দে বিহ্বল, ভাবী যুদ্ধের ভাবনা কাহারও চিত্তে তিলমাত্র স্থান পায় নাই। কেহ স্বপ্নেও ভাবিতেছে না যে, ঠিক্ সেই সময়ে রাজপুত সৈন্যগণ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের শিখরে শিখরে মশাল জ্বালিয়া রণসজ্জা করিতেছে। গর্জসিংহ হাঁপাইতে হাঁপাইতে যুবরাজের রংমহলের দ্বারদেশে পৌঁছিলেন। প্রহরী নতশিরে 'প্রবেশ নিষেধ' আজ্ঞা জানাইল। গর্জ সে কথায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। যুবরাজ রংমহলে রঙ্গে উন্মত্ত। অর্দ্ধ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া দেখা যাইতেছে—কত নীল পীত হরিৎ রঙ্গের বাইজী হাবভাব বিলাস রঙ্গে নৃত্য করিতেছে। তাহাদের বিলোল কটাক্ষ সিরাজী রঞ্জিত হইয়া দর্শকের মন প্রাণ হরণ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিমধুর বাদ্য ও কামিনী কণ্ঠের কোমল গীত কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে।

গর্জসিংহ একজন অনুচরকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া যুবরাজের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন জানাইলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই সুলতান কুর্ম বাহিরে আসিয়া সস্মিত বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন "এতরাত্রে সেনাপতির কি বিশেষ প্রয়োজন? রাণা সন্ধিপত্র পাঠাইয়াছেন নাকি?"

গজসিংহ কোনও উত্তর না করিয়া যুবরাজের হস্তে রাণার আদেশ-পত্র খানি দিয়া বলিলেন—"পড়ুন।" কুর্ম্ম পত্রখানি একবার পড়িয়াই সকল রহস্য অবগত হইলেন; কিন্তু বাহিরে কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া সেনাপতি আজাম খাঁকে ডাকিবার জন্য অনুচরের প্রতি আদেশ করিলেন।

আজীম খাঁ হাজির হইলে যুবরাজ তাহাকে যুদ্ধের কি আয়োজন হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রশ্নের মর্ম্ম না বুঝিয়া কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। যুবরাজ একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তোমার ন্যায় কয়েকজন সেনাপতি থাকিলেই সম্রাটের রাজোয়ারা জয় সুদূর পরাহত হইত।" তারপর তাহাকে নিকটে ডাকিয়া চুপি চুপি কি আদেশ দিয়া বিদায় দিলেন এবং গজসিংহের প্রতি ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তোমার নিকট আর এক ঋণে বদ্ধ হইলাম।"

(৩)

গজসিংহ যখন দৌলতবাগ পরিত্যাগ করিলেন তখন রাত্র একটা বাজিল। অমনি দেখিলেন কালান্তকযমের ন্যায় মোগল সৈন্য কাতারে কাতারে তারাগড় হইতে বাহির হইতেছে।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে মোগল রাজপুতে ভীষণ রণ বাঁধিল। রাণা অমরসিংহ স্বীয়পুত্র কর্ণকে এই যুদ্ধে পাঠাইয়া যবন বিজয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। রাজপুত সৈন্যগণ এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও মোগল সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত এবং যুদ্ধার্থে প্রস্তুত দেখিয়া প্রথম হইতেই ভরসা পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু মোগল সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিয়াও বীরকেশরী রাজপুতদিগকে অনায়াসে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই। বিজয়লক্ষ্মী অনেকক্ষণ উভয়দলের মধ্যে অনিশ্চিত অবস্থায় প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে রাজ-

পুত দেবীকৃপালাভে বঞ্চিত হইল। অদৃষ্টচক্রের নিয়মিত আবর্ত্তনে মোগল রণে জয়ী হইয়া 'আল্লাহো আকবর'রবে দিগন্ত প্রকম্পিত করিল।

গজসিংহ এতক্ষণ পরে একজন রাজপুত অশ্বারোহীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইলেন। বর্শাঘাতে রাজপুত মোগল সৈন্য ধ্বংস করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখীন হইল। গজসিংহ তাহার স্বর শুনিয়াই চিনিলেন অশ্বারোহী পূর্ব্বরাত্রের অপরিচিত রাজপুত। রাজপুত নিকটে আসিয়া বলিল "প্রণয়ে আপনার প্রতিযোগীতায় জয়লাভ করিয়াছি, এখন সম্মুখ সমরেও রাজপুত জয়ের প্রত্যাশা——"কথা শেষ না করিয়াই বর্শা উত্থিত হইল; কিন্তু গজসিংহ বিশেষ দক্ষতার সহিত চকিতের ন্যায় এক আঘাতেই রাজপুতকে ধরাশায়ী করিলেন।

গজসিংহ তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বীরের মস্তক সযত্নে উঠাইলেন, এবং ক্ষতস্থান নিজের উষ্ণীষ দিয়া বাঁধিয়া দিতে গেলেন। রাজপুত হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল এবং অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল "বৃথা চেষ্টা, একটি অনুরোধ—মতির দেহের এখনি সৎকার হইবে সেই সঙ্গে আমারও—" বলিতে বলিতে রাজপুতের প্রাণবায়ু নির্গত হইল। গজসিংহ একবিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু ফেলিয়া রাজপুতবীরের শেষ ইচ্ছা পুরণের উদ্দেশে চলিলেন।

(৪)

কূর্ম্ম এযুদ্ধে জয়ী হইয়াও বিজেতাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করেন নাই। মোগলদিগের চিরানুসরিত প্রথামত কার্য্য করিলে আজ চিতোরে মোগলরাজ্য বিস্তার হইত কি না সন্দেহ। তিনি রাজপুত বংশোদ্ভব সুতরাং তাহাদিগের মনের ভাব জ্ঞাত থাকিয়াই এক কৌশল খাটাইয়া স্বাভিলাষ সিদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তিনি রাণাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহাতে রাজপুত-

কুলের শিরোভূষণের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত তাহা সমস্তই ছিল এবং লিখিত ছিল, যে, যদিও দৈবাণুকুলতায় রাণার বিশ্বস্ত কোন কর্ম্মচারীর ভ্রমবশতঃ তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, তথাপি তিনি চিতোরে আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক নহেন। এমন কি যদি রাণা সহরের বাহিরে কোন স্থানে সম্রাটের সনন্দপত্র গ্রহণ করেন তবে তিনি তখনই সমস্ত মোগল সৈন্য চিতোর হইতে বাহির করিয়া লইবেন, এবং যাহাতে রাজপুতদিগের প্রতি ভবিষ্যতে কোনও অত্যাচার না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অথচ নামমাত্র দীল্লীশ্বরের অধীন থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাণা পূর্ব্ববৎ রাজত্বভোগ করিতে পারিবেন।

বাহুবলে না হউক কুর্ম্মের এই সদাশয়তায় মুগ্ধ হইয়াই রাণা অমরসিংহ যবনের সহিত সখ্যতা স্থাপনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। রাজপুত কুর্ম্মও প্রতিজ্ঞামত সম্রাটের আদেশ আনাইয়া রাণার প্রতি তৎপদোচিত সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।

বুঝিবার ভুল।

(শ্যাম বাবুর পাঠাগার—রাম বাবুর প্রবেশ।)

রাম। কি হচ্চে শ্যামবাবু?

শ্যাম। আসুন রামবাবু আসুন—এই বসে' বসে' খানিকটা ইতিহাস আলোচনা করা যাচ্চে।

রাম। নূতন কিছু ঐতিহাসিকতত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন নাকি?

শ্যাম। না তা' নয় এই একখানা তাম্রফলক পেয়েছি, তাই দেখ্‌ছি এথেকে একটা পুরাতত্ত্বের উন্মেষ হয় কি না?

রাম। আমাদের অত শক্ত মাথা নয় যে পুরাতত্ব বুঝি—আজ-কালকার গদ্য, পদ্যই সব বুঝে উঠ্‌তে পারিনি—তা' পুরাতত্ব।

শ্যাম। কেন আপনার ত গল্প লেখবার ক্ষমতা বেশ আছে; আজ কাল লিখ্‌চেন না কেন?

রাম। আমার কল্পনার জোর আদৌ নাই। কল্পনাকুশলী হ'লে, শব্দের পর শব্দ যোজনা করে, একটা সামান্য ভাবকে ফুলিয়ে, ফেঁপিয়ে, ফাঁপিয়ে ছন্দোবন্ধে একটা অদ্ভুত কীর্ত্তির নিদর্শন রেখে নাম কিনে ফেলতুম্।

শ্যাম। কেন আপনার ছোটগল্প ত বেশ সুখপাঠ্য হয়—আপনি গল্প লিখছেন না কেন?

রাম। লেখার গুণে ভাল হয় কি না বল্‌তে পারি না—তবে সত্য ঘটনা লিখি বলে' ভাল লাগ্‌তে পারে।

শ্যাম। তা' এবার কিছু লিখেছেন নাকি?

রাম। একটা সত্য ঘটনা নিয়ে লিখেছি বটে—কিন্তু কাহিনীর নামকরণ কর্ত্তে পারিনি। আপনি যদি একটা নাম ঠিক্ করে দেন, তা'হলে একবার পড়ে শুনাই।

শ্যাম। তা'র জন্য আর কি? পড়ুন শুনি।

রাম। তবে শুনুন—

"তখন শরৎকাল! সন্ধ্যাসমাগমে বিহঙ্গদিগের মধুর কাকলী মুখরিত দিগন্তের সহিত, অদূরাগত সাগরের জলকল্লোলের মধুর মিলনে এক অপূর্ব্ব রাগিণী প্রকৃতিদেবীর শ্যামকণ্ঠে ছন্দে ছন্দে ধ্বনিত হইতেছিল। নবনীল শারদাকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে সন্ধ্যাতারা সুধা ধবলিত কমনীয় লাবণ্যে একাই গগনতল রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কাহার নিপুণ তুলিকা জানি না—ঠিক্ সেই সময়ে সন্ধ্যাতারার পদতলে

একখানি অনতিদীর্ঘ শুভ্র মেঘখণ্ড বঞ্জিত করিতে ছিল। দেখিতে দেখিতে সেই শুভ্র মেঘখণ্ড যেন একটী মন্থরগামী মরালে পরিণত হইল। মনে হইল যেন সুনীল সরসী উরসে বিকশিত শ্বেত শতদল পরিবেষ্টন করিয়া আনন্দবিহ্বল হৃদয়ে মরাল সন্তরণ দিতেছে। ওদিকে অনন্ত নীল সিন্ধুসলিলরাশির সহিত নিবিড়নীল নিথর আকাশেরসুগভীর মিলন বড় রমণীয়—বড় প্রাণস্পর্শী।”

শ্যাম। তবে না আপনার কল্পনা আসে না। আপনার স্বভাব বর্ণনাত বেশ। কিন্তু ঐ যে ‘তখন’ থেকে আরম্ভ করেছেন, ঐটে কেমন কেমন লাগে। আর ঐ যে মেঘটাকে মরাল করে তুলেছেন,ওটা কেমন নতুন নতুন ঠেক্‌চে। ওটা বদ্‌লালে হয় না ?

রাম। ওটা বদলাবার ত বিশেষ কারণ দেখি না, কেননা ঘটনাটা ঠিক্ ওই রকমেরই ঘটে ছিল—একেবারে স্বাভাবিক। সবটা আগে শুনুন তা'র পর যাহয় বলবেন।

“দিগ্‌বলয়ে অনন্তের এই মধুর মিলন সন্দর্শনে দিগঙ্গনাগণ স্মিতাননে চারিদিক আলোকিত করিয়া তুলিল। অস্পষ্ট আলোক-ছায়ায় অদূরে সৈকতপুলিনে একটী যুগলমূর্ত্তি দেখা যাইতে ছিল—দুই জনের মধ্যে আদৌ চঞ্চলতা ছিল না—দুই জনেই আত্মহারা প্রেমে যেন বিভোর।”

শ্যাম। বাঃ বেশ সুমিষ্ট হয়েছে—বলে যান।

রাম। “তখন পূর্ব্ব গগণের শুভ্র জলদখণ্ডের সহিত আরও কতক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলদখণ্ড মিশিয়া সন্ধ্যাতারার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়া আপনাদের প্রান্তদেশ হিরণ্‌কিরণে বঞ্জিত করিয়া তুলিল। তাহারই পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া পূর্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে বিকশিত হইল।

“ক্রমে জ্যোৎস্নায় দিঙ্মণ্ডল পরিপ্লুত হইয়া গেল। প্রকৃতি যেন

কি এক কুহকিনীর মোহ মন্ত্রে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। তখনও দুইজনে সেই বেলা ভূমির উপরে নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিয়াছে—তাহাদের বাহ্যজ্ঞান যেন একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মিলন যেন যথার্থই প্রাণের মিলন। দূরাগত সঙ্গীত কিন্নরীকণ্ঠের ম্লান প্রতিধ্বনির ন্যায় সেই জ্যোৎস্নালোকে ভাসিয়া ভাসিয়া, নৈশকুসুম গন্ধ বিজড়িত হইয়া স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিতে লাগিল; গীত বড় অস্পষ্ট অথচ কোমল। গীত যেন বলিল—ওগো তোমরা দু'জনে একবার নয়ন মেলিয়া প্রকৃতির এই অভিনব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন কর—এমন দিন আর হইবে না। গীত আরও বলিতে লাগিল—এই মধুর প্রকৃতির কোলে তোমাদের মধুর মিলন আরও মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রাণী যুগলের কিছুতেই চৈতন্য নাই—তাহারা আপনাদের ভাবে আপনারাই বিভোর। নাজানি তাহাদের মিলনে কি অনন্ত সুখ।"

শ্যাম। কৈ নায়ক নায়িকার নাম এখনও উল্লেখ করিলেন না? আর সাগরের তীর না করে ওটা নদী তট করিলেই ভাল হয়।

রাম। সবটা শুনে যা' হয় করিবেন। আমি যেমন দেখেছি তেমনি লিখেছি। নায়ক নায়িকার নাম দিতে হয় দিবেন—বদ্‌লাতে হয় বদ্‌লাবেন—আমার আশা আপনার হাতে পড়লে এ গল্পটার আরও উৎকর্ষ সাধন হবে।

শ্যাম। আচ্ছা পড়ে যান।

রাম। "এদিকে পূর্ণচন্দ্র দর্শনে সাগর-জল আনন্দোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইতে লাগিল। লহরীমালা উচ্ছ্বাসে সৈকত পুলিন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। উত্তালতরঙ্গে প্রণয়ীযুগলের পাদদেশ প্রক্ষালিত হইতে লাগিল। তখনও তাহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। তখনও তাহারা জানিতে পারিল না যে, আর একটা তরঙ্গ আসিলেই তাহাদের

অতল জলে নিমগ্ন হইতে হইবে। সকরুণ স্বরে গীতধ্বনিও এবার যেন বলিয়া উঠিল—বুঝি শেষে অকূল পাথারে প্রণয়ীযুগল ভাসিল—বলিতে বলিতে শান্ত সমীরে সেই স্বর লহরী শান্তিলাভ করিল। ঠিক্ সেই সময়ে বিধিবিডম্বনায় একটী প্রবল তরঙ্গ আসিয়া, হায়, সেই প্রণয়ীযুগল শামুকদুটীকে ভাসাইয়া লইয়া গেল ! !"

শ্যাম। একি একেবারে সমস্ত কৌতূহল মাটি। শেষকালে কিনা শামুক প্রণয়ী।

রাম। এখানে মানুষ প্রণয়ী পাব কোথায়? এই না আপনি সত্যের পক্ষপাতী?

শ্যাম। আরে ছি! ছি! নবকুমার নাই কপালকুণ্ডলা নাই শুধু সমুদ্রতীর আর শামুক!

রাম। আপনারা ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করেন, আর এই সরল সত্য ঘটনায় আপনাদের মন উঠে না? যাহা হউক এর একটা নাম করণ করে দিয়ে ছাপাবার মত করে দিন।

শ্যাম। নাম দিব কি ছাই রোমান্স মাটী নভেল মাটী।

রাম। বুঝিবার ভুল, বুঝিবার ভুল।

(ইতি রামবাবুর প্রস্থান ও অপর দ্বার দিয়া শ্যামবাবুর স্ত্রীর প্রবেশ।)

স্ত্রী। আমিত আর হাসি চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছিলুম না—গল্পটা মাটী হোক্ আর যাই হ'ক হাসিয়েছে বটে। তা' এখন উঠ খাবে চল।

শ্যাম। তুমি পাশের ঘর থেকে সব বুঝ শুনছিলে? বেশ যা'হক।

স্ত্রী। কি করি বল, তোমায় ডাক্‌তে এসে দেখি গল্প পড়া হচ্ছে, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলুম—চল ভাত জুড়িয়ে গেল।

শ্যাম। দাঁড়াও এই তাম্র ফলকটা রেখে যাচ্ছি।

স্ত্রী। দেখি, দেখি ওটা কি? (হাতে লইয়া) এই দেখে তুমি

ইতিহাস লিখ্‌বে, এযে সেই জয়পুরের থালাভাঙ্গা, খোকা নিয়ে খেলা করে। তাই বাছা আজ এ খানা খুঁজে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল। ধন্যি তোমার বিদ্যে।

শ্যাম। আঁ ? এটা খোকার খেলনা ?

স্ত্রী। আমাদের একটু পানের চূণ কম হ'লে, ঝোলে দু'বার করে' ভুলে নুন দিয়ে ফেল্লে, তোমরা গর্ গর্ করে খুন হও, আর এই ভাঙ্গা থালা খানা নিয়ে মিছে মাথা ঘামাচ্ছ। ছি! ছি! তোমাদের যে আগাগোড়াই ভুল—সত্যির ধার দিয়েও চল না। এখন খাবে চল।

শ্যাম। (যাইতে যাইতে) ভাগ্যিস্ রামবাবু জান্‌তে পারেনি।

(ইতি উভয়ের প্রস্থান।)

রিপোর্টারের পত্র।

শরৎকালের বিমল প্রভাতঃ। বেলা ছয়টা বাজিয়াছে। শিয়াল-দহের ষ্টেশন এখনই লোকে লোকারণ্য। সকলেই টিকিট লইয়া নিজের জিনিষপত্র লইয়া প্রস্তুত, কেননা এখনই ট্রেন উপস্থিত হইবে। দেখিতে দেখিতে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল। আর কথাটী নাই যে যা'র কামরায় প্রবেশ করিল। আমরাও পূর্ব্বে টিকিট লইয়া প্রস্তুত ছিলাম সুতরাং শীঘ্রই গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। দেখিতে দেখিতে গাড়ি ছাড়িবার জন্য ঘণ্টা দিল। এক দুই তিন বার ঘণ্টা দিবার পর গাড়ি আস্তে আস্তে চলিল। আমরাও কলিকাতার দুর্গন্ধময় বায়ু পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনার্থ চলিলাম। যে ট্রেনটীতে

আমরা রওনা হইলাম উহার [illegible]নাম "চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস্"। এই ট্রেন অতি শীঘ্র যায় এবং [illegible] স্থানে থামে মাত্র। এরূপ হইবার কারণ এই যে যাহারা চট্টগ্রাম যাইবে [illegible] উহাদের শীঘ্র পদ্মানদীর তটে লইয়া যাওয়া আবশ্যক এবং সে[illegible]ক [illegible] তুলিয়া দেওয়াও আবশ্যক। সে যাহা হউক, আমরা নয়নের প্রীতিপ্রদ হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সমূহ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কোথাও কৃষকগণ শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছে এবং সুপ্রচুর শস্য দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। কোথাও আউস ধান্য সুপক্ক হইয়াছে। কোথাও আমন ধান্য রোপিত হইয়াছে। কোথাও ক্ষেত্রে হলচালনা হইতেছে। কোথাও একখণ্ড জলাভূমি প্রকৃতির দর্পণ স্বরূপ নিজবক্ষে নীলগগণের চিত্র এবং চতুর্দ্দিকস্থিত তাল প্রভৃতি বৃক্ষের প্রতিরূপ প্রতিফলিত করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও শারদশ্রীর চামর স্বরূপ কাশ বিরাজ করিতেছে। কোথাও বা ইক্ষুক্ষেত্র বিদ্যমান। কোথাও কুমুদ কহ্লার শোভিতা পুষ্করিণী, তাহাতে মরালশ্রেণী নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও বা তাম্বুল মণ্ডপ। উহার ছায়ায় কৃষক রমণীরা বসিয়া রবির উত্তাপ হইতে নিজদেহ রক্ষা করিতেছে। অদূরে কোন একটী ক্ষুদ্রনদী রজত রেখার ন্যায় দেখা যাইতেছিল। এইরূপে প্রকৃতির নানা রকমের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা কতদূর আসিয়া পড়িলাম। বারাকপুর ষ্টেসনে একবার গাড়ি থামিয়াছিল মনে হইল। তারপর ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম আটটা বাজে। বুঝিলাম এইবার গন্তব্য স্থানে পঁহুছিব। দেখিতে দেখিতে ট্রেন রাণাঘাটে পঁহুছিল। আমরা নামিলাম। অতঃপর একটী নদী পার হইতে হইবে শুনিলাম। বাল্য-কালাবধি কেবল ভাগীরথীই দেখিয়াছি। অন্য নদী কিরূপ উহার ধারণাই ছিল না। যখন 'চূর্ণী'র তটে আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন মনে

হইল নদীটীর নাম করণ ঠিকই হইয়াছে। কেন না উহা ভাগীরথীর একটী চর্ণিত শাখা মাত্রই বটে। নদী গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত শুকাইয়া যায়, লোকে তখন পদব্রজে উহা পার হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে বর্ষাকাল অতীত হইয়াছে সুতরাং [illegible] এক্ষণে স্ফীতবক্ষ। উহাতে মৃদু চাঞ্চল্যও পরিলক্ষিত হইতেছে। নদী মধুর কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা। এক্ষণে উহা প্রস্থে অনুমান ২০ হাত হইবে। নৌকা করিবা পার হইতে আমাদের অল্পমাত্র সময় লাগিল। অপর পারে আসিয়া আমরা ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলাম। ঘোড়ার গাড়িতে কিছু বিলম্ব হইল। রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর ৪॥ ক্রোশ। কিন্তু যাইতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিল। প্রিয় পাঠক! শিহরিবেন না—কথা ঠিকই বটে। এখানকার রাস্তা সচরাচর ভাল নহে—আর বর্ষার পর বিশেষতঃ স্থানে স্থানে গাড়ীর চাকা এমন বসিয়া যায় যে উহা টানিয়া তুলিতে বিস্তর সময় লাগে। আর গাড়িগুলিও ভাল নহে। ঘোড়াগু পক্ষীরাজ বলিলেই হয়! কেন না পাঁচ সাতবার লগুড়াঘাত করিলেও উহাদের গতির বিভিন্নতা হয় না। অতএব আমরা যে তিন ঘণ্টায় সার্দ্ধ চারিক্রোশ আসিয়াছিলাম উহাতে কিছু মাত্র দোষ দিবার নাই।

শান্তিপুরে প্রকৃতই শান্ত বিরাজ করিতেছে। স্থানটী কোলাহল শূন্য, বন জঙ্গলও নাই। রাস্তার দুই পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র! অনতিদূরে ভাগীরথী শান্তিপুরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। স্থানে স্থানে রম্য কুটীরগুলি দেখিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফল কথা স্থানটী বেশ মনোরম। এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণের বাস অধিক। নানাশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নদীয়া শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন। এখনও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ এইস্থানে দৃষ্ট হয়। বারাণসী প্রভৃতি স্থানের ন্যায় নদীয়া শান্তিপুরও চতুষ্পাঠীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এক্ষণেও

নদীয়ায় শাস্ত্রচর্চ্চা আছে। শান্তিপুরে তন্তুবায়দিগেরও বাস আছে। শান্তিপুরের বস্ত্রের এখনও বেশ আদর আছে। এখনও এমন সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হয় যে সামান্য ভল্লাবাঁশের মধ্যে একখান দশহাত বস্ত্র অক্লেশে বাধা যাইতে পারে। শান্তিপুরের ঘাটে গিয়া আমরা নৌকা-রোহণের আয়োজন করিতে লাগিলাম।

নৌকা মিলিল। নৌকায় চড়িয়া গুপ্তীপাড়ার যাইতে হইবে। গ্রীষ্মকালে জল কম থাকে তখন নৌকার আবশ্যক হয় না। তবে বর্ষাকালে সর্ব্বত্রই জল সে জন্য নৌকার প্রয়োজন। আমাদের 'সাধের তরণী' প্রথমে হেলিতে দুলিতে লগী ঠেলিয়া চলিল। পরে যখন একটু অনুকূল বায়ু বহিল অমনি পাল তুলিয়া ঈষৎ বেগে চলিল। দাঁড়িরা দাঁড় ছাড়িয়া গান ধরিল ঃ—

"আমরা সব ভাই গাঙের মাঝি
গুণটানা কাম্ সার।
আবার মোদের চেয়ে বোকা আছে
টের পেলাম এবার। হুড়ুর হো"

তাদের সেই সঙ্গীত জলের কুলু কুলু শব্দের সহিত মিশিয়া বড়ই মধুর শুনাইতেছিল। আমরা এদিক ওদিক দেখিতেছিলাম। কোথাও তটের হরিদ্বর্ণ তৃণ জলে ডুবিয়া গিয়াছে—দুই একটী "চোরকাঁটা" কেবল মস্তক তুলিয়া আছে। উহারই উপরে দুই একটী ভ্রমর বসিয়া গুন্‌গুন্ করিতেছে। কোথাও বা একটী বন্য চারাগাছ জলে অর্দ্ধ নিমজ্জিত রহিয়াছে। উহার যে অংশ ডুবে নাই উহাতে দুই একটী নিরাশ্রয় সরীসৃপ আশ্রয় লইয়াছে। দূরে মৎস্যজীবীরা একখানি ক্ষিপ্রগতি ডিঙ্গিতে চড়িয়া মৎস্য ধরিতেছে। কোথাও দুই একজন ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছেন—উঁহাদের নিকট হইতে দুই একটী পুষ্প ভাসিয়া নৌকায়

নিকট আসিতেছে। হঠাৎ মস্তকের উপর দিয়া পাখিয়া ঝঙ্কার দিয়া চলিয়া গেল। আমরা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম সূর্য্যদেব মস্তকোপরি আসিয়াছেন। মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে স্নাত হইলেও মৃদুমন্দ, বারিকণাসম্পৃক্ত বায়ুসেবিত হইয়া আমরা অবসন্ন হই নাই। বরং একটু স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। একটী বৎসতর জলপান করিবার জন্য তটে আসিয়াছিল কিন্তু নৌকা দেখিবামাত্র সে দৌড়িয়া পলাইল। দুই একটী শিশু তটে দাঁড়াইয়া আমাদের নৌকার দিকে লক্ষ্য করিয়া কতই আনন্দপ্রকাশ করিতেছিল। আর একখানি কুটীরের গবাক্ষদ্বারে দুইটী উৎসুকনয়ন কাহার প্রতীক্ষায় চাহিয়াছিল। যখন নৌকাখানি কুটীরের নিকট দাঁড়াইল না—দেখিল, তখন গবাক্ষ হইতে নয়নদুটী অপসারিত হইল। দেখিতে দেখিতে জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল। "সামাল সামাল" শব্দে মাঝি নৌকাকে কিনারার নিকট হইতে সরাইতে লাগিল। আমাদের নৌকা একবার হেলিয়াছিল কিন্তু অবিলম্বে সামলাইয়া লইল। অতঃপর নৌকা ঘাটে পহুঁছিল, আমরা নামিলাম।

গুপ্তিপাড়া গ্রামে আসিয়া আমরা দেবমন্দির দর্শনাভিপ্রায়ে চলিলাম। এক্ষণে পল্লীগ্রাম মাত্রেরই দুরবস্থা। এখানে লোকসংখ্যা ও কমিয়াছে। অনেকে দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করায় তাঁহাদের প্রাচীন আবাসভূমি ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া অরণ্যে পরিণত হইতেছে। কত জনশূন্য অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। সে সব দেখিলে মন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। স্থানটী পরিরক্ষণাভাবে ক্রমশঃ জঙ্গলে পরিণত হইতেছে।

অতঃপর আমরা ঐ স্থানের অধিষ্ঠিত দেবতাদর্শন করিবার জন্য চলিলাম। প্রাচীর বেষ্টিত এক প্রকাণ্ড অঙ্গন—তাহাতে কয়েকটী

মন্দির। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরে বৃন্দাবনচন্দ্র ও জগন্নাথদেব। মন্দিরটী সুন্দর—অনেকে বলেন এরূপ মন্দির বঙ্গদেশে বিরল। বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহবিশেষ। সেই দ্বিভুজ, মুরালীধারী, পরিধানে পীতধড়া, শিরে ময়ূরপাখা, বামে চূড়াহেলা, নবঘনশ্যাম মূর্ত্তি। বামে লক্ষ্মী-রূপিণী রাধারাণী বিরাজিতা। বিগ্রহের মুখমণ্ডলে একটী কোমলভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। কথিত আছে একজন দণ্ডী এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি দণ্ডীরাই ইহার সেবায়ৎ। এই দণ্ডীদিগের পদবী "আশ্রম"। প্রথম দণ্ডীর নাম 'শ্রীসত্যদেব সরস্বতী' ছিল। ইনি বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের পার্শ্বেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইনি অতিশয় তেজস্বী, পুণ্যাত্মা ছিলেন। অবশ্য পরবর্ত্তী দণ্ডীরা ইহার ন্যায় কেহই তেজস্বী ছিলেন না।

রামসীতার সুন্দর বিগ্রহমূর্ত্তি স্বতন্ত্রমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। রামের রাজবেশ। বামে জানকীদেবী যথোচিত সজ্জায় সজ্জিতা। পাদদেশে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা হনুমান দণ্ডায়মান। তৃতীয় মন্দিরে গৌর-নিতাই। উভয়ে গৈরিকবসন পরিহিত, বিশ্বজনীন প্রেমে মাতোয়ারা, আত্মহারা হইয়া নাচিতেছেন।

চতুর্থ মন্দিরে কৃষ্ণচন্দ্র। ইনি বৃন্দাবনচন্দ্রের অনুরূপ। ইহার কারণ এইরূপ কথিত হয়:—বিরূপাক্ষ গোস্বামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তন্ত্রমতে সিদ্ধ হন। ভবানীর সাক্ষাৎ লাভ হইলে দেবী এইরূপ বর-দিয়াছিলেন যে, যে কোনও বিগ্রহে 'প্রকৃত দেবতার অধিষ্ঠান না থাকিবে,' উহা তিনি প্রণাম করিলেই 'ফাটিয়া' যাইবে। এই জন্য একটী প্রবাদ বাক্যও প্রথিত আছে যথা—

"কালাপাহাড়ের কাটা,
বিরূপাক্ষের ফাটা।"

কালাপাহাড় যেমন অনেক দেবমূর্ত্তির নাক কাণ কাটিয়া দিয়াছিলেন; বিরূপাক্ষও সেইরূপ প্রণাম করিয়া অনেক দেবমূর্ত্তি ফাটাইয়া ছিলেন।

এক সময়ে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল যে বিরূপাক্ষ বৃন্দাবনচন্দ্র দর্শন করিতে আসিতেছেন। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা দণ্ডী শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। পাছে বিরূপাক্ষ প্রণাম করিলে বিগ্রহ ফাটিয়া যান, এই ভয়ে তিনি উত্তম ভাস্কর আনাইয়া গোপনে বৃন্দাবনচন্দ্রের অনুরূপ 'কৃষ্ণচন্দ্র' বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন। বিরূপাক্ষ যখন দেবতা-দর্শনে আসিলেন তখন দণ্ডী দ্বারে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। বিরূপাক্ষ দ্বার ছাড়িতে বলিলে দণ্ডী বলিলেন "অগ্রে আমাকে প্রণাম কর, পরে দেবতা দর্শন করিও।" বিরূপাক্ষ বলিলেন "আমি প্রণাম করিলে তুমি মরিবে সুতরাং প্রণাম করিয়া ব্রহ্মহত্যা করিতে চাহি না।"

দণ্ডী বলিলেন "আমি ও সকল কথা শুনিতে চাহি না, আমি ব্রাহ্মণ আমাকে প্রণাম করা উচিত।" বিরূপাক্ষ "তথাস্তু" বলিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডীকে প্রণাম করিলেন। দণ্ডী অটল—স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। কেবল ললাটদেশে স্বেদবারি দেখা দিয়াছিল মাত্র। বিরূপাক্ষ উহা দেখিয়া ভাবিলেন 'আমি একবার প্রণাম করিলে প্রস্তর বিগ্রহ ফাটিয়া যায়, আর ইঁহাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলাম ইঁহার কিছুই হইল না। ওঃ ইঁহার কি তেজপুঞ্জ! যখন সেবায়েত এত তেজস্বী তখন ইঁহার উপাস্য দেব সামান্য নহেন! অতএব আর বিগ্রহ দর্শন করিব না।' অনন্তর তিনি প্রস্থান করিলেন। দণ্ডীর ভয় দূর হইল। বৃন্দাবনচন্দ্রেরও রক্ষা হইল। ইহা হইতে বুঝাযায় যে 'রামসীতা' ও 'গৌরনিতাই' বৃন্দাবনচন্দ্রের বহুকাল

পরে স্থাপিত। সমকালবর্ত্তী হইলে বিরূপাক্ষ নিশ্চয়ই দর্শন করিতেন। যাহা হউক—এই প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা বিচার্য্য।

দেবতা দর্শনানন্তর আমরা প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যে পথে গিয়াছিলাম সেই পথেই ফিরিলাম সুতরাং পুনর্ব্বর্ণনা বাহুল্যমাত্র। যথা সময়ে বাটী আসিয়া পহুঁছিলাম।

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত।

ফুলের সাজি।

নিমন্ত্রণ।

হোম, পূজা, যাগ্, ওগো থাক্ থাক,
আজ সেনেদের বিয়ে ;
কত লোক এলো, খেয়ে চ'লে গেলো
পাত্ কুড়াবো কি গিয়ে ?
কত ক'রে ব'লে দিয়েছে গিন্নি,
বাটিভরা যবে দিলে গো সিন্নি,
ও'দের কথা কি করে অমান্যি,
ওরা যজমান সেরা,
কেবলি মোর নহে নেমন্তন্ন,
তোমারেও কর্ত্তা ব'লেছে ভিন্ন,
রেখেছে তোমার মান অক্ষুন্ন
দিয়ে বস্ত্র এক জোড়া।
হোম, পূজা, যাগ্, ওগো থাক্ থাক্,
আজ সেনেদের বিয়ে ;
কত লোক এলো, খেয়ে চলে গেলো,
পাত্ কুড়াবো কি গিয়ে ?

(২)

নেয়ে এসে ভোরে, যত কায সেরে,
হ্যাদেখ প'রেছি বেশ ;
ভালবাস ব'লে, চুই গুছি দিয়ে
বিনায়ে দিয়েছি কেশ।
মল, খাড়ু, পৈঁচে তেঁতুল জলে,
কাল থেকে যাই রেখেছি ফেলে
পাছে পড়িগো দেখ চোক মেলে,
ঠিক না নূতন পারা ?
প'চজন সেথা আসিবে অবশ্য,
ফুলের মুখুটি কুলীন নৈকষ্য,
বিবাহের স্থলে উঠিবে ভাষ্য,
তুমি কি এসব ছাড়া ?
হোম, পূজা, যাগ, ওগো থাক্ থাক্,
আজ সেনেদের বিয়ে ;
কত লোক এলো, খেয়ে চলে গেলো
পাত্ কুড়াবো কি গিয়ে ?

(৩)

জানালার ধারে, পুকুরের পাড়ে,
কত পাত্ হ'লো জমা ;
ভাঁড়, সরা, খুরি, যেলে ঝুড়ি ঝুড়ি,
পুজায় দাও গো ক্ষমা।
অপক্ক রম্ভা, আতপ তণ্ডুল,
গব্যঘৃত আর সৈন্ধব-লুন,
খেয়ে হ'লো কৃশ, শরীর স্থুল,
অরুচির নাহি শেষ ;
ভাগ্যক্রমে যদি মিলেছে 'পত্র,'
কালব্যাজ করা মূর্খতা মাত্র ;
বিনা আহ্বানে যাওত সর্ব্বত্র,
হেথা যেতে যত ক্লেশ ?
হোম, পূজা, যাগ, ওগো থাক্ থাক,
আজ সেনেদের বিয়ে ;
কত লোক এলো, খেয়ে চ'লে গেলো,
পাত্ কুড়াবো কি গিয়ে ?

(৪)

ওরে বোকা ছেলে,—হারু চাষা বলে,
খাস্‌নেবে টোকো দই ,
পেট জোড়া পিলে, গোগ্রাসেতে গিলে,
হবি কি শ্মশান সই ?
খেয়ে যায় অই কিরণ দাদা
তাম্বুল মুখে, উত্তরীয়ে বাঁধা
লুচি অসংখ্য, সন্দেশের গাদা,
ট'লে ট'লে পড়ে ভারে ;
ওমা কোথা যাবো বিয়ান, সই,—
চ'লেছে দেখ লয়ে ক্ষিব, দই ;—
তুমি বল যারে 'ন্যাকা ভৈরবী'
(সেও) হাঁড়ি হাঁড়ি আনে ঘরে।
হোম, পূজা, যাগ, ওগো থাক্ থাক্,
আজ সেনেদের বিয়ে ;
কত লোক এলো, খেয়ে চ'লে গেলো,
পাত্ কুড়াবো কি গিয়ে ?

(৫)

"দেবতায়ে নমঃ" ব্যস্ আজ থাম,
ওঠ গো প্রণাম ক'রে ,
নামাবলি নাও, খুলে গায়ে দাও,
আমি তালা দিই ঘরে।
নূতন গামছা নিয়েছি দেখ,
খুব সাবধানে নিকটে রেখ,
ভোজনের কালে সতর্ক থেক
এতে যেন কিছু জমে ,

সন্দেশ এলে ছেড়োনাকো কভু,
থাকিলে পাতে চেয়ে নিয়ো তবু,
যবে এসোনা, শোন ওগো বাবু।
যেন আধ মণ কমে।

'দেবতায়ে নমঃ,' ব্যস্ আজ থাম,
ওঠগো প্রণাম ক'রে ;
নামাবলি নাও, খুলে গায়ে দাও
আমি তালা দিই ঘরে।

(৬)

এ কি গো হালাতে,   আমার বরাতে,
যত জোটে অনাছিষ্টি ;
বলিলাম যাই,   ফের দেখ ছাই,
পূজায় হ'লো অবিষ্টি।
এমন ত' কোথা শুনিনি কাণে
ইস্তিরির কথা কিছু না মানে ;
মন কি যায় থাক্‌তে এখানে,
চলে যাই নুড়ো জেলে,
আমি হেন মেয়ে তাই গো আছি,
অপরে হ'লে গলে দিত কাছি,
সন্ধ্যা যে হ'লো—ওগো ঠাকুরঝি
চেয়ে দেখ চোক মেলে।
হোম, পূজা, যাগ,   ওগো থাক্ থাক্,
আজ সেনেদের বিয়ে,
কত লোক এলো,   খেয়ে চলে গেলো
পাত্ কুড়াবো কি গিয়ে ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বিদায়।

দূরে—দূরে ছেলে বেলা, শত দূরে হাসি খেলা,
কৈশোরের স্বপ্ন-নিশি এখন হ'য়েছে ভোর,
স্বপনে দেখেছি ভুল, কোথায় সুখের কূল ?
কোন এককালে যেন ছিল কোন শান্তি-ডোর।
কে যেন সস্মিত মুখে, স্বপনে সে দীর্ণ বুকে,
মধুর মুহূর্ত্তে কোন দেছিল আনন্দ রাশি,
সে বুঝি কৈশোর-সাথে, মধুমাসে পূর্ণিমাতে,
যেতে যেতে একদিন পেয়েছিনু স্নেহ-হাসি !
সে বুঝি সকাল বেলা, খেলিতে প্রাণের খেলা
মানে নাই কোন দিন, কোন দিন ঘুম ঘোরে ;
শান্তি-সমীর যেন, কি জানি যে কবে কেন,
পুলকে মরমে পশি' দেছিল সোহাগ মোরে।
কবে সে শ্রবণে নাহি, হৃদয়ের গান গাহি ;
পুষ্ট দেহ কান্তি ল'যে পুলকে ভ্রমিত প্রাণ ;
শুনিতাম রূপকথা, শুনিতাম গল্প গাথা,
নিশীথ-স্বপনে তা'র পশিত কি মোহতান !
দেখিতাম স্বপ্ন—পুরে, সুবর্ণ প্রাসাদে দূরে
দুওরাণী সুওরাণী, নৃপেন্দ্রবিলাসী আর,
মন্ত্রীর ঝিয়ারী কোথা, কোটালের সনে গাঁথা
অবৈধপ্রণয়-ডোরে, কোন কুঞ্জে কোথাকার।
রাজার দুহিতা কোন, করিয়াছে মহাপণ,
করিবে যে মর্ম্মভেদ কঠিন সমস্যা তা'র,
তা'রি গলে রাজবালা, পরাইবে বরমালা ;
এমনি স্বপন ঘোরে দেখিতাম কত আর !
তা'রপর শুন অয়ি, হৃদয়ের প্রেমময়ি !
প্রথম পরশে তুমি করিলে হৃদয় আলা,
অসুখ অশান্তি ল'য়ে অদৃষ্ট-সম্পাত ব'য়ে,
সহিয়াছি তবু তাই জীবনের শত জ্বালা।
যাবে যদি দেবি, আজ, রোদনে বলকি কাষ,
কি ফল পুষিয়ে রাখা মরমের তলে বিষ ?
কি ফল জাগা'য়ে স্নেহ ? অসার দেখিবে কেহ,
মুছে ফেল, মুছে ফেল ! চেয়ে কেন অনিমিষ ?
যা'বে যদি, মায়া গানে আরও আকুল প্রাণে

ছুটায়োনা অনন্তের স্নেহ সুধা রাশি রাশি।
বিষাদে বিদায় নিয়ে, বিদারি' দলিতে হিয়ে
ঘুচায়োনা আর মিছে মলিন মুখের হাসি!
দেখাইয়ে অশ্রুনীর, বিঁধিও না বুকে তীর;
বিদায় প্রসঙ্গে আর কেন এই আকর্ষণ?
আরকোলেরাখি'মাথা,শুনায়োনাশোকগাথা
আরও যাতনা তাপে কাঁদায়োনা প্রাণমন!
যা'বে যদি,নাওনাও,সাথেক'রে নিয়ে যাও
আশিস্—হরষআশা এই নাও,বুকে রাখ;
দাও ব্যথা শোক তাপ, দাও দাওঅনুতাপ
শান্তি পা'বে,অশ্রুটুকু নিয়ে যাও ভুলনাক।

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

মনে পড়ে তা'য়।

আজি বড় মনে পড়ে তা'য়।
স্তবধ যমুনা জল, স্তবধ বনানী স্থল,
স্তবধ, গম্ভীর, সব(ই) হায়।
ফোটায়ে অফুট কলি,নাচায়ে লহরী গুলি,
মৃদু বহে বসন্তের বায়।
নিশবদে,ধীরে ধীরে, আঁখিজল মিশেনীরে,
হৃদি ভাষা ফোটে না'ক তায়।

আজি বড় মনে পড়ে তায়।
অতীতের কথা সব, স্মরণ করিয়া দিয়ে,—
পাপিয়া ডাকিয়া উড়ে যায়।
কিসের অভাবযেন,কি যেন,—কেমন যেন
হৃদয়েতে জাগাইয়া দেয়,।
কি যেন জন্মের মত হারায়েছি, এ জীবনে
ফিরাইয়া পাবনা'ক হায়।
আজ বড় মনে পড়ে তায়।

শ্রীকান্তি চন্দ্র ঘোষ।

উদ্বোধন।

(১)

অয়ি বিশ্বরমে! রূপসী কল্পনে!
জীবন রূপিণি! ললাম অঙ্গনে।
লতা মঞ্জরিতা! মানস-কাননে
ঘুমাইবি কত দিন?
কবে বল্ মোর লো প্রেম মোহিনি!
হৃদি অন্তঃপুর বর বিরাজিনি!
কবি-সীমন্তিনি! চির সুহাসিনী!
আবার ধরিবি বীণ্?
মানস মোহিনি! আলোক বসনা!
ইন্দুনিভাননি! অনন্ত যৌবনা!
চপলা চঞ্চলা! প্রণয়-মগনা!
ঘুমাইবি কত দিন?

(২)

আজি শরতের পূরণিমা চাঁদ,
কুমুদিনী তরে পাতিয়াছে ফাঁদ,
ভাঙ্গিতে তাহার অভিমান বাঁধ,
নাহি কি ঘুমা'তে লাজ?
আজি নিশীথিনী চন্দ্রিকা দুকূলা,
আজি এ ধরণী হরষ-আকুলা,
পূর্ণা স্রোতস্বিনী মধুর কল্লোলা,

ছিছি, ঘুমাইছ আজ?
জোৎস্না অলস্য হেন বিভাবরী,
তটিনী সলিলে প্রমোদ লহরী,
ফুল ভারানতা কেতকী বল্লরী,
নাহি কি ঘুমা'তে লাজ?

(৩)

ওঠগো প্রেয়সি। ষোড়শি! আমার
বাজাইয়া দাও এ বীণার তার
ওঠ প্রেমময়ি! ঘুমায়োনা আর
সঙ্গীতে মাতাও ধরা।

মদির নয়ানে বীণা ধরি' করে,
রাখি' মাথা মোর তব কোর পরে,
এ মধুর রাতে মধুর অধরে
গাও গীতি প্রেমভরা।
অয়ি বিশ্বরমে! রূপসী কল্পনে!
জীবন রূপিণি! ললাম অঙ্গনে!
পূর্ণিমা রাতে অনিন্দ্য আননে
সঙ্গীতে মাতাও ধরা।

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

গল্প নয়।

কৃষক-বালক হাটে যাইতেছিল। তাহার হাতে দুটি পেঁপে;—একটি বড, পাকা; আর একটি ছোট, কাঁচা।

পথের ধারেই থানা। থানার দারগা দেখিলেন,—পেঁপেটি বেশ! দারোগার যোগ্য! দারোগা সাহেব বালকটিকে ডাকিলেন। পেঁপে দু'টির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কৃষক-বালক যূপসন্নিহিত ছাগশিশুর ন্যায় কম্পান্বিতকলেবরে থানায় প্রবেশ করিল।

দারোগা বলিলেন,—"বড় পেঁপেটা আমায় দে।"

বালক কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—"মা বলিয়াছে, এই পেঁপে দুটো বেচিয়া পয়সা লইয়া গেলে আমাদের খাওয়া হইবে। আপনি ছোট পেঁপেটা নিন।"

কিন্তু দারোগারা কখনও ছোট জিনিষে তুষ্ট হন না, বালক তাহা

জানিত না। দারোগা বলিলেন,—"কাঁচা পেঁপে লইয়া কি করিব ? দে বল্‌ছি, বড় পেঁপেটা দে।"

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে কত মিনতি করিল, কিন্তু দারোগার বাক্য বিচলিত হইল না। সজ্জনের বাক্য কবেই বা বিচলিত হয় !

বালক যখন পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল,—"পেঁপেটি দিলে তা'র মা খাইতে পাইবে না",তখন দারগা পাকা পেঁপেটি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"যা, হাটে যা,—কাঁচা পেঁপেটা বেচে যা' পাবি, আমাকে এসে বলিস্। আমিও পাকা পেঁপেটার সেই দাম দেব।"

দারোগা সাহেবের বদান্যতা ও ছোট বড় পেঁপের প্রতি তাঁহার সমজ্ঞানের কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখিনীর সন্তান হাটে চলিল।

৯

কিছু দূরে একজন সাহেব অশ্বারোহণে সেই পথে আসিতেছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বালক কাঁদিছে, তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

বালক মনে করিল, পাকা পেঁপেটি দিয়া এক যমের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি—এবার বুঝি বা কাঁচাটিও যায়। তা' যাক্,এখন প্রাণে বাঁচিলে অনেক পেঁপে বেচিতে পারিব। এখন পলাইয়া রক্ষা পাইলে বাঁচি। সে পথ হইতে মাঠে নামিল ;—সাহেব তাহার অনুসরণ করিলেন। সাহেব যত ডাকেন, সে তত ছুটিয়া পালায়। সাহেব ঘোড়ায় ছিলেন,—সহজে নিকটস্থ হইয়া বালককে বলিলেন,—"ভয় নাই ;—তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

নিরুপায় বালক বলিল,—"দারোগা আমার পাকা বড় পেঁপেটি লইয়াছেন। এই কাঁচা পেঁপেটি বেচিয়া যাহা পাইব, তিনি সেই দাম

দিবেন। তা' কাঁচা ছোট পেঁপেটা বেচিয়া আর কি পাব ? আজ আমরা খেতে পাব না।" সাহেব বলিলেন,—"কাঁচা পেঁপেটা আমাকে দাও।"

বালক তৎক্ষণাৎ পেঁপেটি সাহেবের হাতে দিল ; আর অদৃষ্টকে ধিকার দিতে লাগিল। আগে বড়টি গিয়াছে, এবার শেষ সম্বল ছোট টিও গেল।

সাহেব পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দরিদ্র বালকের হাতে দিলেন ; বলিলেন, "এই তোমার কাঁচা পেঁপের দাম। দারোগার কাছে যাও, এই দাম দেখাও—সে তোমার পাকা পেঁপের দাম দশ টাকা অবশ্য দিবে। চলো!

৩

বিস্মিত স্তম্ভিত বালক কলের পুতুলের মত থানার দিকে চলিল। হাতে সেই দশ টাকার নোটখানি।

থানায় গিয়া দেখে, দারোগা উপবিষ্ট। কৃষাণ-বালক দারোগাকে নোটখানি দেখাইল ; বলিল, "কাঁচা পেঁপেটির এই দাম পেয়েছি।" দারোগা চটিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"মর বেটা—" আর সঙ্গে সঙ্গে যদিও-সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ-তথাপি মধুর রসের মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেও ছাড়িলেন না।

তখন সেই সাহেব থানার হাতায় প্রবেশ করিলেন। দারোগার চক্ষুঃ স্থির। আকাশের ফুলের বাগান, পাতালের কুন্দপন্নগবাহিনী দেখিলেও দারোগা এত বিস্মিত ও ভীত হইত না।

সাহেব বলিলেন, "পেঁপে খাইয়াছ,—দাম দাও। পাকা পেঁপে খাইয়া কাঁচা পেঁপের দাম দিবে বলিয়াছ। উহার দাম দশ টাকা,— বালকে দশটি টাকা দাম দাও।"

দারোগা তটস্থ ; দুই হাতে ভূমি স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যো হুকুম খোদাবন্দ !"

বাক্স খুলিয়া দারোগা দশটি টাকা,—নিজের দশ সের রক্ত—বালকের হাতে দিলেন।

সাহেব বলিলেন, "ছোক্‌রা বাড়ী চলিয়া যাও,"—দারোগাকে বলিলেন, "এমন কর্ম্ম আর করিও না। এবার তোমাকে মাফ্ করিলাম। ফের এমন কাজ করিলে আমি তোমাকে দূর করিয়া দিব—বিট সন্ বেল এমন দারোগা পুলিসে রাখিবে না ; হুঁসিয়ার।"

প্রতিবাসী,

১৮ই অগ্রহায়ণ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শুমা সে তুমি নও? এক ব্রাহ্মণ পল্লীগ্রামে সমস্তদিন পথ হাঁটিয়া বেলা অবসানে এক গোয়ালার বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহকর্ত্রী একাকিনী বাড়িতে ছিল। ব্রাহ্মণ সেই খানে রাত্রি বাসের জন্য দরখাস্ত জানাইলেন গোয়ালানী ব্রাহ্মণ অতিথিকে স্থান দান করিলে সস্তায় স্বর্গলাভ সম্ভব ভাবিয়াই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, কর্ত্তার কোনও ওজর না করিয়াই সম্মতি প্রদান করিল। কিন্তু দরখাস্ত মঞ্জুর করিবার আগে অনাহারে অনাবৃত স্থানে রাত্রিবাস করিতে হইবে, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। এরাত্রে উপায়ান্তর না দেখিয়াই ব্রাহ্মণ অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন।

এদিকে গোপ প্রবরের বাড়ী ফিরিবার সময় হইয়াছে। সে বৈকালিক দুগ্ধ যোগান দিতে গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ দাওয়ার একপার্শ্বে

একখানি চেটাই পাইয়া এই দারুণ শীতে যে আশ্রয় মিলিয়াছে এজন্য তামাক খাইতে খাইতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছে। গোয়ালা এমন সময় আসিয়া স্কন্ধের ভার নামাইয়া দাঁড়াইল। দাওয়ার উপর একজন মানুষকে সবেগে ধূমপান করিতে দেখিয়া রুক্ষস্বরে পতিব্রতা গোয়ালানীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "কেরে ও"? গোয়ালানী আসিয়া এ কথার ব্যাপার বুঝাইয়া দিল। গোয়ালার মেজাজ এই এক কথায় পঞ্চম হইতে ষড়জে নামিয়া আসিল। বাঁক ফেলিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করিল; ব্রাহ্মণও সময়োচিত আশিস্ করিয়া হুঁকা হইতে কলিকাটি খুলিয়া সম্মুখে রাখিলেন। গোপ সেটি উঠাইয়া লইয়া সানন্দে তাম্রকূট ধূম পান করিতে লাগিলেন।

তারপর গোপ হাত পা ধুইয়া গৃহপ্রবেশ করিল। গোপ বধূও প্রথমে বাহিরের দরজার পরে ঘরের দরজার অর্গল বন্ধ করিল।

ব্রাহ্মণ সেই দাওয়ার উপর কাত হইয়া গাত্র বস্ত্রখানি সর্ব্বাঙ্গে মুড়ি মুড়ি দিয়া কোন ক্রমে চক্ষু মুদিত করিয়া রাত্রি যাপনের যোগাড় করিতে লাগিলেন কিন্তু পেট বিষম অবোধ। উদর পরিতৃপ্ত না হইলে সহজে নিদ্রা আসে না।

* * * *

আহারান্তে গোপদম্পতী শয্যায় কম্বাবৃত হইল। গোপপ্রবর সারাদিন পরিশ্রমের পর শয়ন করিয়াই নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু গোয়ালানীর যে ঘুম আসে না। এখন যদি কেহ একটা গল্প বলে তবে না হয় শুনিতে শুনিতে ঘুম আসে। কিন্তু গল্প বলে কে? বামুন ঠাকুর কি গল্প জানে? জিজ্ঞেসই করি না কেন "হাঁগা ঠাকুর ঘুমলে নাকি? একটা কাহিনী বল না। ওঠাকুর, ঠাকুর, একটা কাহিনী বল না শুনি।"

"আ মর মাগি! এতরাত্রে ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট কর্‌ছি, আর ওঁকে একটা কাহিনী বল না কাহিনী বল না" ঠাকুর মনে মনে এই কথা বলিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা কহিলেন না। গোয়ালানী থাকে থাকে আর বলে "ওঠাকুর ঘুমুলে, একটা কাহিনী বল না শুনি।"

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ ভাবিয়া পরে বলিলেন "কি আর কাহিনী বল্‌ব বল, নিজের দুঃখেই মরি।"

গোয়ালানী। (সাগ্রহে) কিসের দুঃখু ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ। এই বাছা সন্ধ্যার পর তোমাদের খীড়কির ঘাটে পাধুতে গিছলুম, আর আমার কোমর থেকে গেঁজে খুলে জলে পড়ে গেল। আহা তা'তে বাম্‌নীর গয়না গড়াবার টাকা ছিল—সবগেল; এখন বাছা সকালে খুঁজে পেলে হয়।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ এক কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ দিল। খানিক পরে গোয়ালানী আবার ডাকিল "ঠাকুর ঘুমুলে কি? ঠাকুরের আর সাড়া নাই, আরও দুই ডাকে যখন গোয়ালানী বুঝিল ঠাকুর নিদ্রিত তখন সে আস্তে আস্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং গামছা পরিয়া পা টিপিয়া খিল খুলিয়া ঘরের বাহির হইল।

সেই দারুণ শীতে সুশীলা গোপবধূ খীড়কীর ঘাটে পঙ্কোদ্ধারে রত; আশা সেই ব্রাহ্মণের কটিস্খলিত মুদ্রাপূর্ণ গেঁজেটি সকাল হইবার পূর্ব্বেই জল হইতে উদ্ধার করিয়া সিন্দুক জাত করে।

এই সময় ছারপোকার দারুণ দংশনে গোপের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে পাশ ফিরিয়া দেখিল বিছানা খালি; তখন মনে পড়িল ঘরের বাহিরে এক ব্রাহ্মণ শুইয়া আছে। ডাকিল "ঠাকুর"। উত্তর নাই, উঠিয়া আর একটু গম্ভীরে ডাকিল "ঠাকুর, গোয়ালানী কোথায়?" ঠাকুর এইবার আধঘুমন্ত আধ জাগ্রত ভাবে বলিলেন "ওমা সে তুমি নও?"

গো। সে কি কথা ঠাকুর। সে আমি নয় কি? গোয়ালানী কোথায় গেল?

ব্রা। কেন, এই যে একজন লোক এসে দরজায় টুক্ টুক্ করে ঘা দিলে আর সে তার সঙ্গে ঐ (উত্তরদিকে নির্দ্দেশ করিয়া) বাঁশ বাগানের দিকে হন্‌হনিয়ে চলে গেল। আমি মনে করি তুমি। ওমা সে তুমি নও?

গোপের মনে অনেক দিনের একটু ক্ষীণ সন্দেহের কিনারা হইল ভাবিয়া এক লগুড হস্তে ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট দিকে ছুটিল।

গোয়ালানী এদিকে পাঁক ঘাটিয়া হায়রাণ হইল। গেঁজে মিলিল না। শেষে হতাশ হইয়া হাতপা ধুইয়া ঘরে আসিল। হাতবুলাইয়া দেখিল শয্যা শূন্য। ভাবিল, গোপ বহির্দ্দেশে গিয়াছে। কিন্তু অনেকক্ষণ হইল ফিরিতেছে না দেখিয়া নিদ্রিত ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঘোষের পো কোথায় গেল।" ব্রাহ্মণ কৃত্রিম নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এই যে ঘোষের পো একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে ঐ দক্ষিণের বাগানের দিকে গেল" আরও বলিলেন—"মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়, তোমার চেয়ে একটু ফর্শা। অন্ধকারে আমি মনে করলুম তুমিই বুঝি। ওমা! সে তুমি নও?"

ওমা! ঠাকুর বলে কিগো? তবেত মিন্‌সের হাড়ে হাড়ে নষ্টামি। এইবার গোয়ালানী বীরাঙ্গনা বেশে গাছকোমর বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি দক্ষিণের বাগানের ভিতর ছুটিল।

এখন একজন উত্তরে লাঠিঘাড়ে ও আর একজন দক্ষিণে ঝাঁটা হস্তে গিয়াছে শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। এইবার সুসময় বুঝিয়া ব্রাহ্মণ গা ঝাড়াদিয়া উঠিলেন এবং প্রথমে সদর দরজায় ও পরে ঘরের দরজায় খিল দিলেন। তারপর ভাঁড়ের ক্ষীর ও শিকে হইতে

উপকরণ সংগ্রহ হইয়া ব্রাহ্মণের ছিটে বেড়ার দেহ বোঝাই করিতে বেশী সময় লাগিল না। আহারান্তে আতিথেয়তার জন্য যাহাতে গোপদম্পতীর অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটে সেই আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে শয়ন করিলেন। এবার আর নিদ্রাব ব্যাঘাত হয় নাই।

* * *

পিতা পুত্রকে চিঠি লিখিতেছে, "তোমার শিক্ষক আমায় লিখিয়াছেন যে তুমি এখন আদৌ লেখাপড়ায় মন দাও না। সুতরাং তুমি একটি আস্ত গাধা,

তোমার পিতা, শ্রী বা——"

* * *

"হাঁহে, হবি, তোমার কাছে চুবট আছে?"

"না হে না।"

"একটা পয়সা আছে?"

"গেল সপ্তাহে ছিল।"

দৃশ্য—নদীর ধারেই গাগলাগাবদ শ্যাম বাবু নিবিষ্ট চিত্তে মাছ ধরতেছেন ও এক পাগল তাহা দেখিতেছে।

পাগল, "কি হচ্চে ও খানে?"

শ্যাম বাবু, "মাছ ধরিতেছি।"

পাগল, "একটাও ধরেছ?"

শ্যাম বাবু, "না।"

পাগল, "কতক্ষণ এমন করে বসে আছো?"

শ্যাম বাবু, "প্রায় ৪ ঘণ্টা।"

পাগল, "আরে এই বাড়ীর ভিতর এস, এস।"

***

হরিহর বহুদিন যত্ন করিয়া একখানি ছবি আঁকিয়া তাঁহার বন্ধুকে দেখাইতে আনেন। বন্ধু দেখিয়া আগ্রহে বলিলেন, "আহাহা, কি সুন্দর ছবি! ছবি খানি ঠিক্ স্বভাবিক হইয়াছে বনের ভিতর দূরে সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন কি সুন্দর; মরি মরি।" হরিহর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ সূর্য্যাস্তের ছবি নয়, আমার পিতামহের চেহারা।"

***

গোপীনাথ বাবুর বয়স চল্লিশের কিছু উপর। তাঁহার বিবাহ ও বিশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। একদিন তিনি আহার করিতে করিতে তাঁহার ভার্য্যাকে গত দিবসের কোন এক কথার প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমার এতদিনে বোধ হইতেছে যে—"

তাঁহার ভার্য্যা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তবু ভাল যে এতদিন পরে তোমার কিছু কিছু বোধ হইতেছে। সর্ব্বরক্ষা, আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার এজীবনে আর বোধ উদয় হইবে না।"

***

বিবিধপ্রশ্ন।—শিক্ষক। অনন্ত কাহাকে বলে?

১ম ছাত্র। অনন্ত—অনন্ত, মনে প'ড়ে প'ড়ে পড়্ছে না, আমি জান্তুম মহাশয় ভুলে গেছি।

শিক্ষক। হায়! হায়! জগতে একজন মাত্র অনন্ত কাহাকে বলে জানিত, কিন্তু সে ভুলিয়াগিয়াছে!!!

শিক্ষক। আমাদের জীবন ধারণের জন্য কোন্ জীব দুগ্ধ প্রদান করে?

২য় ছাত্র। গোয়ালা।

শিক্ষক। এতাবৎ জগতে চতুষ্পদ জীবেরা দুগ্ধ প্রদান করিত। কিন্তু একজনের মতে দ্বিপদেরাও এখন দুগ্ধ দেয়।

শিক্ষক। "মাতৃভাষার" কথা আমরা সকলেই বলি কিন্তু কেহ "পিতৃভাষা" বলে না কেন?

৩য় ছাত্র। মাতার কথার উপর পিতার কথা খাটে না বলিয়া।

শিক্ষক। এতক্ষণের পর একটি যথার্থ উত্তর পাইলাম।

* * *

ত্রুটিস্বীকার।—কোনও সংবাদ পত্রে একবার জন্ম মৃত্যুর তালিকা প্রকাশিত হয় নাই। ইহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিয়া সম্পাদক এইরূপ লিখিয়াছেন:—"এবার স্থানাভাব প্রযুক্ত আমাদের জন্ম মৃত্যু বিবাহ স্থগিত রহিল। পাঠকবর্গ এই ত্রুটির জন্য মাপ করিবেন।"

গোয়ালিয়ার ।

প্রয়াস ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ।

ELM PRESS CALCUTTA

প্রয়াস।

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩০০ সাল। [একাদশ সংখ্যা।

"ভেবোনা আমার চিত সতত চপল!"

[Moore এর "Oh! think not my spirits are always as Light"]

ভেবো না আমার চিত্ত সতত চপল,
এমনি বেদনা-হীন, এখন যেমন,
এ নিশির স্ফূর্ত্তি ভাতি এ হাসি তরল,
ভেবো না প্রভাতে পুনঃ ভাতিবে আনন।
না, না! এ জীবন-মরু শুধু কষ্টময়,
প্রমোদ কুসুম হেথা ফোটে কদাচন,
হায়! যে হৃদয়ে ফুল আশু বিকশয়,
নিশ্চয় কণ্টক তাহে বিঁধে অনুক্ষণ!
হোক্!—আন' সুধাপাত্র ক্ষণসুখকর,
অশ্রু এবে রঙ্গে হের প্রমোদ সুহাসে,
করুণার হাসি মুখে বহে অশ্রুধর,
এই ভাল! বেশী দুঃখ যেন নাহি আসে।

হ'ত এ জীবন-সূত্র অসিত-বরণ,
যদি না মিশিত তাহে সৌহার্দ্দ্য প্রণয়;
কি ফল জীবনে তবে, মঙ্গল মরণ,—
যখন ভুলিব শুভ সুখ এ উভয়।
কিন্তু হায়! প্রেম যা'র সরল, বিমল,
ভাঙ্গে সে স্বপন, পরে কাঁদে প্রাণ তা'র;
সখিত্বে সুষুপ্ত যা'র চিত্ত অবিচল,
সেই সুখী, যে না পায় ঘাত বঞ্চনার!

হোক্!—দাও সুধাপাত্র। সত্য যতদিন
রবে নয়নাম্বু প্রাণে, এ প্রার্থনা মোর,
প্রেম-রবি অস্তে যেন যৌবনে নবীন;
শোভয়ে সৌহার্দ্দা-শশী জীবনের ভোর।

শ্রীসু——

ব্রাহ্মণ।

—:-++-:—

আমি পুরোহিত ?
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে।
* * *
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতে খানা
তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলষ !

রবীন্দ্র।

"Do any kind of work" said Rabbi Akiba to his disciples, "even to the skinning of carcases on the highways, and say not as an excuse I am a priest.

আর্য্যসমাজের প্রৌঢ়াবস্থায় মন্ত্র সম্বলিত যজ্ঞাদি পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাজ্ঞিকগণ ঐ সকল মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় মন্ত্র সকলের অর্থ বিকৃতির জন্য কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এই গ্রন্থ গুলি ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ নামে অভিহিত। আর্য্যসমাজের কতকগুলি প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক সমাজ বদ্ধ হইয়া এই কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। সুতরাং এই কার্য্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিমাত্রই তৎকালে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন।

ব্রাহ্মণ সন্তানেরা পিতৃবর্গের নিকট যথাযথরূপে বৈদিকমন্ত্রাদি ও বেদোক্ত যজ্ঞাদি শিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়েন ও কালক্রমে কতকগুলি বংশ বহুকালাবধি এই কার্য্যে ব্রতী থাকায় এই বংশগুলি একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণজাতি নামে অভিহিত হয়েন।

মন্ত্রজ্ঞ [illegible] মাত্রে [illegible] তৎকালে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন স্মৃতিই তাহার প্রমাণ :—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাত্তবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

এই জাতির আবির্ভাব ধর্ম্মজীবনজাতি মাত্রেরই ইতিহাসে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। যীহুদিগের ইতিহাসেও এই প্রকার একটী জাতির আবির্ভাব ও রাজকীয় ব্যাপারে আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেলের পূর্ব্বাংশ অর্থাৎ Old Testament নামক গ্রন্থে ইহারা "সোফেরিম" নামে অভিহিত হয়েন। New Testament নামক গ্রন্থে ইহারা grammateis, nomikoi, nomodidaskaloi অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ, পণ্ডিত প্রবর ও সভ্য ইত্যাদি নামে সম্মানিত হয়েন। যীহুদিগের মতে মুসা নামক মহর্ষির সময় এই জাতির আবির্ভাব হয়। ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, যীহুদিগের প্রবাসকালে এই বর্ণের উৎপত্তি হয়। আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণ জাতির আবির্ভাব কোন্ সময় হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারিত করা সুকঠিন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্থির বলা যায় যে, বৈদিক সমাজের ঐহিক আধিপত্য বিস্তার ও পারমার্থিক অবনতি, ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তির একটী মূল কারণ। প্রাচীন ঋষিদিগের ধর্ম্মে যাগযজ্ঞবাহুল্য ছিল না, কেবলমাত্র শৈশবাবস্থায় সরলতা, উদারতা, প্রেম ও ভক্তির লক্ষণ সকল বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক চক্রে পড়িয়া আর্য্য সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল, এবং তাঁহাদিগকে ধর্ম্মব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইল। আত্মীয় ধন সামগ্রী শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইল; ক্রমশঃ শত্রুর পর শত্রু নিহত করিয়া তাঁহারা বিপুল রাজ্যের অধিকারী হইলেন। এই সময়ে কার্য্যের বিভাগ আবশ্যক হইয়া উঠে সুতরাং

সরল নিরীহ মন্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ জাতির উপর বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মচর্চ্চার ভার ন্যস্ত হইল।

ব্রাহ্মণজাতির আবির্ভাবের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত অন্যান্য জাতির সহিত তাঁহাদিগের আদান প্রদান ছিল; কিন্তু কালক্রমে বৈদিক মন্ত্রাদি প্রাচীনতর হইল, যাগযজ্ঞাদি অভ্যস্ত থাকায় ব্রাহ্মণজাতির মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয়। তাঁহারা অধ্যাপনা ও যাগযজ্ঞাদি সমাধার জন্য অর্থ স্বীকার করিতেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মান শীঘ্র লোপ হয় নাই। রাজা তাঁহাদিগকে সভায় নিমন্ত্রণ করিতেন, সামাজিক ব্যাপার মাত্রেই তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা চলিতে লাগিল, তাঁহারা দেখিলেন ব্রাহ্মণ সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু সংখ্যাধিক্য বশতঃ জাতি গৌরব লোপ পাইবে, এই আশঙ্কায় অন্য জাতীয় ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। চঞ্চল প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কখনই এই অবস্থা স্বীকার করিতে সম্মত হযেন না। কিন্তু এই অবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল সুতরাং অন্য বর্ণের ব্যক্তিগণ কদাচিৎ এই জাতিভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেন এবং মন্ত্রাদি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিলে, তাঁহাদিগেরও ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত করা হইত। ব্রাহ্মণগণ কোন মন্ত্রাদি বা বৈদিক নিয়মের ধুয়া না ধরিয়া বলে সকলকে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের এই প্রতাপের মূল কোথায়? রাজা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ব্রাহ্মণজাতিকে উৎসন্ন দিতে পারিতেন; কিন্তু আর্য্য রাজা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রাখিলেন তাঁহাদিগের পদ অচল রহিল। ব্রাহ্মণগণ যদিও দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু ধার্ম্মিক ধনাঢ্যদিগের উপঢৌকনে পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতেন এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের বদান্যতায় ব্রাহ্মণগণ

এই অবস্থায় আরূঢ় হয়েন। শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বশিষ্ঠ সুপণ্ডিত ও ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার জীবিত কালে রাজা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণজাতি ভুক্ত হইবার চেষ্টা করেন ও বশিষ্ঠের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়। বিশ্বামিত্র মহর্ষিপদে অভিষিক্ত হইলেন বটে কিন্তু ব্রাহ্মণজাতিভুক্ত হইলেন না। ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে বিচার করিলেন, ব্রাহ্মণজাতির সম্মান বর্দ্ধন করিলেন।

আদিম ব্রাহ্মণগণ বৈদিক নিয়মাবলীতে সন্তুষ্টচিত্ত না হইয়া অনেক ক্রিয়া কলাপাদি আবিষ্কার ও রচনা করিলেন। ক্রমে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত আর্য্যজীবন সংস্কার দীক্ষা মন্ত্র ধর্ম্মাচরণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সমাজ ধর্ম্মজীবন ছিল সুতরাং বৈদিক ভিত্তির উপর স্থাপিত ক্রিয়া মাত্রেই সমাজের চিত্তরঞ্জন করিত ও সকলেই সে সকল সাদরে গ্রহণ করিতেন। ক্রমে ব্রাহ্মণজাতির সবলতা তেজ ও বুদ্ধি লোপপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে মহর্ষি মনু সমাজের ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত "মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র" নামক গ্রন্থ রচিত করেন। এই গ্রন্থ এক্ষণে "মনুসংহিতা" নামে প্রচলিত। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে ব্রাহ্মণগণ তৎকালে রাজকীয় সভার সভ্য ছিলেন ও ধর্ম্মপ্রণয়নের কর্ত্তা ছিলেন। এই সম্মান ইঁহাদের উপর অর্পিত হওয়ার কারণ অতি সহজেই বোধগম্য হয়। বৈদিক গ্রন্থাদি ইঁহারা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, ইঁহারাই সে সকলের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম ছিলেন সুতরাং রাজসকাশে বিচারালয়ে মন্ত্রগৃহে সর্ব্বঘটেই ইঁহাদিগের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। বৈদিক সূত্র সকল অতি প্রাচীন কালে সঙ্কলিত হয়; কিন্তু সমাজ উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল, অনেক অভিনব পদার্থে জীবনের সারল্য নষ্ট হইল। নূতন জীবনের ধর্ম্ম, ব্যবস্থা সূত্রাদিতে ছিল না, কিন্তু সমাজের আশা, জীবন যতই অভ্যুন্নত হউক না কেন, সকল বিষয়ই প্রাচীন ধর্ম্ম বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইবে,

বৈদিক মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্রে, নবজীবনের ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে। এই স্থলে ব্রাহ্মণগণ কিছু বিপদগ্রস্থ হইলেন। তাঁহাদিগের প্রতি সামাজিক বিশ্বাস, সমাজের প্রতি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিষয়ে আন্দোলিত হইয়া যথাসাধ্য সূত্রাদি হইতে তাঁহারা নবজীবনের আশা মিটাইতে লাগিলেন। কিন্তু আশা মিটাইতে তাঁহারা নূতন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়েন নাই, কেবল বৈদিক সূত্র ব্রাহ্মণাদির অর্থবাদ করিয়া অভিনব শাস্ত্র শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমে এই অর্থবাদ করিতে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মতদ্বৈধ হয় এবং বেদান্ত ও মীমাংসা গ্রন্থের উৎপত্তি হইল।

মানবজাতি মহাকাল পূজার সহিত পুরাকালের পূজা করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে আর্য্য হিন্দুজাতি সে বিষয় বিশেষ পটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ প্রাচীন জাতি, ও ব্রাহ্মণ যদি প্রাচীন শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেবসম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। কালক্রমে মনুও প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইলেন ও মানব ধর্ম্মশাস্ত্রও শ্রুতির মধ্যে গণিত হইল। মনুসংহিতা শ্রুতি ও মাননীয় হইলে, অন্যান্য পণ্ডিতেরা স্ব স্ব পাণ্ডিত্য প্রকাশার্থ অন্যান্য গ্রন্থ সংক্ষিপ্তাকারে রচনা করিয়া, শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সময় পর্য্যন্ত যীহু ও হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ইতিহাস মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু স্বজাতীয় রাজত্ব লোপ হইবার পর, উভয়ের ইতিহাস ভিন্ন গতি অবলম্বন করে। কিছু কাল পরে বিজাতীয় আক্রমণে হিন্দুরাজত্ব লুপ্তপ্রায় হয়। তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণের গৌরবও বিলুপ্ত হয়। যীহুদিগের স্বাধীনতা ধ্বংস হইবার পরও যীহুদিগের ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ scribeগণ বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েন। মুসলমান রাজত্ব ধ্বংস হইবার পর বিজেতার অনুগ্রহে মুসলমান কাজীগণ বিচারাসনে বসিয়া আধিপত্য

বিস্তার করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুরাজত্ব পতনের পর ব্রাহ্মণগণ একেবারে নির্ব্বীর্য্য মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। তাহার কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যায়, বৌদ্ধশাসন কালে পুরাকালের ক্ষত্রিয় রাজা—রাজা রহিলেন, ক্ষত্রিয় বিচারপতির পদও অটুট রহিল। ব্রাহ্মণজাতির তেজ, চন্দ্রিমার তেজের ন্যায় সূর্য্য হইতে তেজ আধান করিয়া বিতরণ করেন কিন্তু সূর্য্যরূপী ক্ষত্রিয়গণ যখন অস্তমনস্ক হইলেন,তখন ব্রাহ্মণজাতি একেবারে মৃতপ্রায় হইল। যাহাই হউক কালক্রমে পুরাবৃত্ত পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে। যে কারণে ব্রাহ্মণজাতির উৎপত্তি হয়, সেই কারণে বৌদ্ধগণের মধ্যে একটী জাতির উৎপত্তি হওয়ায় ব্রাহ্মণজাতির উৎসেদ আরম্ভ হয়। বৈদিক সমাজের উন্নতিকালে ব্রাহ্মণ জাতি মধ্যে কতকগুলি পরিষদ্ ছিল। এই সকল পরিষদে ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিচার পূর্ব্বক নবজীবনের উপযোগী ক্রিয়াকলাপাদি ও শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতেন। যীহুজাতির মধ্যেও এই পরিষদের অনুরূপ একটী সভা ছিল, তাহাকে যীহুভাষায় Synagague বলা যায়। যীহু সভায় রাজকীয় ব্যাপারও পর্য্যালোচিত হইত কিন্তু আর্য্য পরিষদে রাজকার্য্য বা রাজনীতি পর্য্যালোচিত হইত কি না তাহা আমরা স্থির বলিতে পারি না। যাহাই হউক, পরিষদ সকল বহুকাল আধিপত্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু যীহুসভার প্রতাপ আজি পর্য্যন্ত যীহুজাতির ক্রিয়াকলাপে লক্ষিত হয়।

ব্রাহ্মণজাতির এতদ্ব্যতিরিক্ত একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, তাঁহারা কখনও তাহাতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। প্রাচীন বৈদিক কালাবধি ব্রাহ্মণগণ শিষ্যগণকে স্বগৃহে রাখিয়া বৈদিক শাস্ত্র ও যজ্ঞাদি শিক্ষা দিতেন। এই প্রথা তাঁহারা অদ্যাবধি চালাইয়াছেন এবং সে জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি। কিন্তু

হিন্দুসমাজের পতন অবধি ব্রাহ্মণজাতি পদচ্যুত হইয়া, আলস্যে ও দারিদ্র্যে কালযাপন করিতে লাগিলেন, চিরকাল ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া পতনাভিমুখে পূর্ব্বগৌরবস্মৃতিতে অভিমানী হইয়া অন্য সকল বিদ্যা তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন ; সমাজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া অর্থপ্রয়াসী হইয়া পূর্ব্ব-সমাজের সংস্কার সকল জলাঞ্জলি দিলেন সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের সহিত সমাজের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিল না। সমাজ পরিবর্ত্তনশীল ; কিন্তু মোহান্ধ ব্রাহ্মণগণ যথাস্থানে অবস্থিত রহিলেন। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের উপযোগী বুদ্ধিকৌশল তাঁহাদিগের ছিল না ; তাঁহারা নবজীবন অবহেলা করিলেন, নবজীবনের আশা ভরসার সহিত সহানুভূতি করিলেন না। সুতরাং প্রকৃতিকোপে পড়িয়া অদ্যাবধি দারিদ্র্য যন্ত্রণায় পীড়িত হইতেছেন। পণ্ডিতগণ অদ্যাবধি যে শাস্ত্র চর্চ্চা করেন, সেই শাস্ত্রেই প্রকৃতিকোপের ফল সুচারুরূপে প্রদর্শিত আছে। কিন্তু অদ্যাবধি ব্রাহ্মণগণের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না—সেই কোপের ফল যথাযথ ভোগ করিতে হইবে।

স্বপ্ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুণ্যসলিলা ভাগিরথী নদী সৈকতে বসিয়া আছি ; সুরধুনীর কলকলশব্দ আমার কর্ণে মধুবর্ষণ করিতেছে ; সলিলস্পর্শ জনিত সুশীতল সমীরণ বনরাজি মন্দ মন্দ কম্পিত করিয়া এবং কুসুমসৌরভে সুবাসিত হইয়া আমার মন ও প্রাণ পুলকিত করিতেছে ; সূর্য্য ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে চলিয়া পড়িয়াছে ; অদূরস্থ পর্ব্বতমালা তাম্রমূর্ত্তি—সূর্য্যানুরাগে রঞ্জিত হইয়া অতি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে ;

শরতকালীন শুভ্র মেঘ সকল পর্ব্বতমালার শিখরপ্রদেশে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন শৈলমালার মস্তকে শ্বেত ছত্র ধৃত হইয়াছে; পর্ব্বতবক্ষস্থ বৃক্ষসকল বায়ুভরে কম্পিত হইয়া পর্ব্বতকে যেন চামরব্যজন করিতেছে; বিহঙ্গগণ মধুরস্বরে গান করিয়া পর্ব্বতের স্তুতি করিতেছে।

এই সকল শোভা দর্শন করিতেছি এবং সেই সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টি-কর্ত্তার মহিমার বিষয় চিন্তা করিতেছি এমন সময় আমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রাদেবী আমাকে হঠাৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এই অবস্থায় আমি এক অদ্ভুৎ স্বপ্নদর্শন করিলাম।

আমার বোধ হইল যেন চতুর্দ্দিক এক স্বর্গীয় আভায় রঞ্জিত হইল এবং তৎপরে স্বর্গীয় মধুর স্বরে কে যেন বলিল "বৎস, সম্মুখে যে পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিতেছ উহার নাম কার্য্যক্ষেত্র। যে ওই পর্ব্বতের শিখরে উঠিতে পারিবে সেই ধন্য; তোমার কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, যাও, বৎস, ওই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর, করিলে কৃতকার্য্য হইবে।"

তৎপরে ধীরে ধীরে সে স্বর্গীয় আভা নিভিয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিলাম; একবার পর্ব্বতের দিকে দৃক্‌পাৎ করিলাম; ওঃ! কি উচ্চ! মস্তক যেন গগনমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে! মনে করিলাম আরোহণ করা দুঃসাধ্য; আবার সেই আশ্বাসবাণী মনে পড়িল; নূতন বল হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল; প্রতিজ্ঞা করিলাম, "আরোহণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

এইরূপে নববলে বলীয়ান অসীম উৎসাহে উৎসাহিত এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং শীঘ্রই পর্ব্বততলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বত পদতলে আসিয়া যে শোভা তাহাতে দেখিলাম আমার মন ও প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল। শত শত নির্ঝরিণী গভীরঝঙ্কারে অতি উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইতেছে; ইহার সলিলসকল নিম্নে পতিত হইয়া কোমলমালায় পরিণত হইয়া কি মনোমুগ্ধকর শোভাই প্রকাশ করিতেছে। নির্ঝরিণীর জলকণার উপর অস্তগামী অংশুমালীর কিরণরশ্মি পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন শত সহস্র মুক্তারাশি একত্রিত হইয়া পর্ব্বত হইতে পতিত হইতেছে; কোনও স্থান নবশৈবালাচ্ছাদিত হইয়া হরিদ্বর্ণ দেখাইতেছে; কোনও স্থান বা নির্ম্মল সলিলাচ্ছাদিত হইয়া শুভ্র দেখাইতেছে; আবার সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়াতে কোনও স্থান স্বর্ণবর্ণ দেখাইতেছে; অদূরে ভাগিরথী শুভ্র সূত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে এবং তাহার কলকলধ্বনি অস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইতেছে।

এই সকল প্রাকৃতিক শোভা একমনে নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় জনৈক পুরুষ আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন "এই স্থানের নাম 'শৈশবকাল'। আমি এই স্থানে বাস করি; আমার নাম 'সরলতা'; আমার এক সহচর আছে তাহার নাম 'পবিত্রতা'; যে ব্যক্তি এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে,আমরা তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকি; আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, সেইকাল পর্য্যন্ত তাহারা এইস্থানে অবস্থান করে; তৎপরে এই "কার্য্যক্ষেত্র" নামক পর্ব্বত আরোহণ করিয়া থাকে। আইস আমাদের আশ্রমে অবস্থান কর, তৎপরে পর্ব্বত আরোহণ করিও।"

এইরূপে আমন্ত্রিত হইয়া আমি তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিলাম। যে কয়দিন সে আশ্রমে ছিলাম বড়ই সুখে ছিলাম।

'পবিত্রতা' এবং সরলতার সহিত চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া বেড়াইতাম।

এইরূপে নির্দ্দিষ্টকাল অববাহিত হইলে পর্ব্বতারোহণ করিবার জন্য সেই আশ্রয় পরিত্যাগ করিলাম এবং নবোদ্যমে "কার্য্যক্ষেত্র" পর্ব্বতারোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিয়দ্দূর উঠিয়া দেখি পর্ব্বতের উপর এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর! এক সঙ্কীর্ণ পথ সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়া গিয়াছে; আমি সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। তখন সূর্য্যদেব উদিত হইয়া আপন কিরণজাল চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতেছেন। প্রান্তরের চারি দিক ধূ ধূ করিতেছে; মাঝে মাঝে পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল স্বীয় স্বীয় মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বৃক্ষের লেশমাত্র নাই।

ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেব প্রখর হইতে প্রখরতর হইতে লাগিল; প্রথমে অল্প অল্প কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলাম; কিন্তু অবশেষে ভূমি অতিশয় উষ্ণ হওয়াতে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তথাপি দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; পদযুগল দগ্ধ হইতে লাগিল তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। পরমেশ্বরের কি বিচিত্র মহিমা! যখন সকল কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া, পদদ্বয় দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, আর অর্দ্ধ মাইল অগ্রসর হইলাম,—দেখিলাম আমি প্রান্তরের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তখন তপনদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন। সম্মুখে এক সুন্দর সরোবর। হংসাদি জলচর পক্ষীসকল প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সরোবরোপরি বিচরণ করিতেছে; নয়ন মনোমুগ্ধকর কমল সকল অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইয়া নিজ নিজ সৌন্দর্য্যরাশি বিস্তার

করিতেছে ; সবদীস্নাত স্নিগ্ধ সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। আমি সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইলাম, হৃদয়ে নূতন বল আসিয়া উপস্থিত হইল, দেহ স্নিগ্ধ হইয়া গেল ; আমি সেই সরোবর তটে উপবেশন পূর্ব্বক একবার করুণাময়ের নামোচ্চারণ করিলাম। তৎপরে ভাবিতে লাগিলাম "আমি এ কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ? এই প্রান্তর এবং সরোবরের নামই বা কি ? এই প্রান্তর অতিক্রম করা নিতান্ত—"

আমার ভাবনায় বাধা পড়িল ; চাহিয়া দেখি এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে বক্ষ স্ফীত এবং মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান। পরিচয়ে জানিলাম, ইহার নাম "অহঙ্কার।"

"অহঙ্কার" বলিল—"তুমি সামান্য মানব নহ ; এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করা অতি দুরূহ ব্যাপার ; যখন তুমি এই প্রান্তর অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছ, তখন তোমার পর্ব্বত আরোহণ করা তত কঠিন হইবে না। আমার সহিত আইস। পর্ব্বতশিখরারোহণ করিবার পথ দেখাইয়া দিই।"

এইরূপে আমি "অহঙ্কারের" সহিত পর্ব্বতপথ দর্শন করিতে চলিলাম। 'অহঙ্কার' অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল, আমি তাহার পশ্চাৎ চতুর্দ্দিক পর্ব্বতের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। হঠাৎ—এ কি ! সম্মুখে এক বৃহৎ গহ্বর, তাহার ভিতর পতিত হইলাম। তার পর অহ-ঙ্কারকে আর দেখিতে পাইলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমি অন্ধকারময় গহ্বরে পতিত ; চারিদিকে অন্ধকার উপর হইতে কেবল ঝিটমিট করিয়া একটু আলো আসিতেছে ; এত অন্ধকার

যে পার্শ্বের বস্তু দেখিতে পাইতেছি না ; যে দিকে চাই সেই দিকেই অন্ধকার—কেবলই অন্ধকার ; ভয়ানক ভয় হইল ; কিসের ভয় জানি না ; ভূতের ভয় ? না, কিন্তু তবুও যেন মনে হইতে লাগিল কে যেন হাত ছানি দিয়া ডাকিতেছে ; সভয়ে অন্যদিকে চাহিলাম—বোধ হইল যেন দুটা চোক জল জল করিয়া কে আমার দিকে চাহিয়া আছে ; সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তবুও নিস্তার নাই—বোধ হইল কে যেন খড়্গাহস্তে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ; কাঁপিয়া উঠিলাম—ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলাম—তার পর কি হইল জানি না।

যখন একটু একটু জ্ঞান হইল, বোধ হইল যেন কে বড় মধুর স্বরে ডাকিল, "বৎস, ভয় নাই ; চক্ষু খুলিলাম—আহা ! কি দেখিলাম ? সরলতার প্রতিমূর্ত্তি—করুণার আধার—স্নেহের পারাবার—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি আমার সম্মুখে ; শোক তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা, সব বিস্মৃত হইয়া দেবীর পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। দেবী বলিলেন "বৎস তোমাকে আমিই এই কার্য্যক্ষেত্র পর্ব্বতে আসিতে বলিয়াছিলাম ; আমার নাম জননী, এই প্রান্তরের নাম 'সহিষ্ণুতা' ওই সরোবরের নাম 'সহিষ্ণুতার পুরস্কার' ; আর এই গহ্বরের নাম "অহঙ্কারাশ্রম" কারণ 'অহঙ্কার' এই স্থানে বাস করিয়া থাকে ; যে ব্যক্তি অহঙ্কারের অনুসরণবর্ত্তী হয় অহঙ্কার তাহাকে এই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক এই গহ্বরের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখে। বৎস ! এই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে নানা বাধা বিঘ্ন আছে ; যদি তুমি প্রকৃত পথ অনুসরণ করিতে পার, তবে অনায়াসে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারিবে। বৎস, আমি তোমাকে সততই রক্ষা করিব ; তোমার কোন ভয় নাই।"

স্নেহময়ী জননীদেবী এই আশ্বাস বাক্য প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেবী চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার আশ্বাসবাণী আমার কর্ণকুহরে এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে ; পূর্ব্বে আমার যে দৃঢ়তা ছিল তাহার চতুর্গুণ দৃঢ়তা আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, এক অতি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ আমার পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। ভাবিতেছি কি করিয়া আরোহণ করিব এমন সময় মৃদু মৃদু মলয়ানিল বহিতে লাগিল, সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল ; মনে হইল যেন সমগ্র পর্ব্বত এক স্বর্গীয় আভায় রঞ্জিত হইল ; তৎপরে কে জলদ গম্ভীর স্বরে বলিল "বৎস, আইস তোমাকে পথ প্রদর্শন করিতেছি।"

আমি দেখিলাম এক প্রতিভাশালী মহাপুরুষ আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ; বোধ হইল যেন কোন দেবতা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া আসিয়াছেন।

আমি সষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলাম ; মহাপুরুষ বলিলেন "আমার সহিত আইস আমি তোমাকে পথপ্রদর্শন করিতেছি।"

আমরা পর্ব্বতশৃঙ্গ পার্শ্বে উপস্থিত হইলে মহাপুরুষ পর্ব্বতপৃষ্ঠে তিন বার করাঘাত করিলেন ; হরি ! হরি ! একি ! পর্ব্বতপৃষ্ঠে অমনি এক অদৃশ্য দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল ; তৎসঙ্গে সঙ্গে "এইবার তুমি প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ; আমার নাম "জনক" জানিও, এই বলিয়া মহাপুরুষও অন্তর্দ্ধান হইলেন। "জননী দেবী" আমাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত করিলেন ; আমাকে স্নেহ-দৃঢ়কারে অহঙ্কারের গহ্বর হইতে রক্ষা করিলেন ; তৎপরে "জনক-দেব" আমাকে "কার্য্যক্ষেত্র" পর্ব্বতের প্রকৃত পথে আনয়ন করিলেন।

তাঁহাদের করুণার বিষয় স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতাবেগে আপ্লুত হইল।

আমি প্রথমে "কার্য্যক্ষেত্রে" প্রবেশ করিলাম; মনে বড়ই আনন্দ হইল।

প্রথম প্রবেশ করিয়াই দেখি দুই দিকে দুইটি পথ গিয়াছে; এক-দিকে একটি সুন্দর রাজপথ; সেই রাজপথে অসংখ্য লোক চলিয়াছে; পালে পালে লোক সকল সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; চারি দিকে গণ্ডগোল—ঠেলাঠেলি।

আর এক দিকে এক অতি নির্জ্জন সংকীর্ণ উঁচুনীচু কাঁচা পথ; কচিৎ এক আধ জন সেই পথে গমন করিতেছে। আমি ভাবিলাম আমি দরিদ্র মানব; আমার এ রাজপথের আবশ্যক নাই; এত সুখ আমার অদৃষ্টে নাই; আমি এই সংকীর্ণ পথই অবলম্বন করি।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি সেই সংকীর্ণ পথাভিমুখে গমন করিলাম; নিকটে গিয়া দেখি পথের পার্শ্বে লেখা রহিয়াছে "ধর্ম্মপথ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অমিতভেজে অতুল সাহসভরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম পথ ততই প্রশস্ত এবং সমতল হইতে লাগিল।

কিছুদূর যাইতে না যাইতে দেখি এক ব্যক্তি বিষন্নবদনে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে; নিকটে আসিলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল "আমার নাম "কাপুরুষ"; আমি এই "কার্য্যক্ষেত্র" নামক পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিবার জন্য এতদূর আসিয়াছিলাম; কিন্তু এখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি; তুমি একটু অগ্রসর হইলে এক অতি

ভীষণ দৃশ্য দেখিতে পাইবে ;—শত শত দৈত্যাকৃতি নর নানা অস্ত্র হস্তে এক অতি উচ্চ প্রাচীর রক্ষা করিতেছে ; দেখিলাম সেই দ্বার ভিন্ন অগ্রসর হইবার আর উপায় নাই ; কি সর্ব্বনাশের কথা !! সেই দৈত্য সকলকে পরাভব করিয়া অগ্রসর ? অসম্ভব ! অসম্ভব ! তাই আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।" এই বলিয়া "কাপুরুষ" প্রস্থান করিল।

কাপুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি কিছু মাত্র ভীত হইলাম না ; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ; দুই তিন মাইল অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, আমার সম্মুখে সুদূর এক অতি উচ্চ প্রাচীর; প্রাচীরের মধ্যভাগে এক তোরণ দ্বার; সেই তোরণদ্বারোপরি দৈত্যগণ পাদচারণ করিতেছে।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছি, প্রাচীর তখনও দূরে অবস্থিত—এমন সময় এক অতি মনোহর দৃশ্য দর্শন করিলাম—শত শত অপ্সরাগণ শ্রেণীবদ্ধা হইয়া দণ্ডায়মানা ; প্রত্যেকের হস্তেই যুদ্ধোপকরণ ; মধ্যস্থলে জননীদেবী ; জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতির প্রভাবে আমার নয়নযুগল ঝলসিয়া গেল ; আমি তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দেবী বলিলেন "বৎস, জনকদেবের প্রভা বলেই তুমি এস্থানে আসিতে পারিয়াছ ; কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগণ তোমার অগ্রসর হইবার পথ রোধ করিয়া রহিয়াছে ; তাই জনকদেব তোমার জন্য এই সকল যুদ্ধোপকরণ পাঠাইয়া দিয়াছেন ; তোমার প্রতি তাঁহার অতুল করুণা তাঁহারই আদেশে আমি এ স্থলে আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছি; বৎস! ঐ সকল রিপুর সহিত সংগ্রামের জন্য এই বর্ম্ম পরিধান কর, ইহার নাম "মনের দৃঢ়তা"; ঐ "ন্যায়" নামক অসি গ্রহণ কর; এই শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ কর, ইহার নাম "ক্ষমা"; ঐ চর্ম্ম বক্ষে গ্রহণ কর উহার নাম "সংযমতা।"

দেবীর বাক্য সমাপ্ত হইলে অপ্সরাগণ আমাকে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত করিতে লাগিল; কেহ আমার মস্তকে শিরস্ত্রাণ পরাইতে লাগিল, কেহ কেহ আমার শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত করিতে লাগিল; কেহবা শিরস্ত্রাণে কিরীট বসাইতে লাগিল।

এইরূপে আমার বেশভূষা সমাপ্ত হইলে অপ্সরাগণ সহ জননীদেবী অদৃশ্যা হইলেন। আমিও যোদ্ধৃবেশে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং শীঘ্রই প্রাচীরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রাচীরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় বোধ হইল যেন আমার চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া আসিতেছে—অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল—আমার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিল—সম্মুখে চাহিয়া দেখি প্রাচীর তোরণ-দ্বার, দৈত্য সকলই একে একে অদৃশ্য হইতেছে—তার পর? বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম আমি এক অদ্ভুত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ফুল! ফুল! চতুর্দ্দিকেই ফুল—শ্বেত, পীত, লোহিত নানাজাতীয় ফুল—স্বর্গীয়সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত; শ্রেণীর পর শ্রেণী—অবিশ্রান্ত কুসুমবৃক্ষশ্রেণী; এ কি ইন্দ্রের কানন? বিদ্যুৎবরণপক্ষধারী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিসকল কুসুমবাসে সমস্ত শরীর আবৃত—মস্তকে কুসুম—

গলদেশে কুসুমমালা—হস্তে কুসুম বলয়—হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে সকলে আমায় বেষ্টন করিল; মধুর কণ্ঠস্বরে আমার হৃদয় নাচাইয়া বলিল "আইস"; ভক্তিভরে আমি সে আদেশ পালন করিলাম।

দুইধারে কুসুম শ্রেণী—তাহার মধ্য দিয়া চলিয়াছি; বিহঙ্গসকল কুসুমাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সুমধুরস্বরে গান করিতেছে; তটিনী ভীমগর্জ্জনে ধাবিত হইতেছে; বাধাবিহীন স্রোতের ভীষণ অশনি-নিপাতসদৃশ নিনাদ তটিনীর রৌপ্যবর্ণে পরিণত জলরাশির মহিমা প্রচার করিতেছে; বীচিমালা পর্ব্বতাকার ধারণ করত বজ্রাস্ত্র নির্গত গোলার ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে তীরে ভীষণভাবে আঘাত করিতেছে; সে ভীষণ অথচ সুন্দর দৃশ্য—সে হৃদয়োন্মাদনকারিণী দৃশ্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য একবার দণ্ডায়মান হইলাম; কিন্তু কর্ণে বাজিল "আইস।" আমি পুনরায় অগ্রসর হইলাম।

ক্রমে বৃক্ষশ্রেণী নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল; পক্ষীর সুমধুরগীত একেবারে থামিয়া গেল; অদূরস্থ তটিনীর তর তর কল কল শব্দ বায়ুতে বিলীন হইয়া গেল; চতুর্দ্দিকস্থ আলোক হীনপ্রভ হইয়া আসিল; তৎপরে সবিস্ময়ে দেখিলাম এক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আলোকমালা চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইতেছে; আলোক মণ্ডল ক্রমে ক্রমে অক্ষরাকৃতি ধারণ করিল; বড় বড় জলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে;—

"কার্য্যক্ষেত্রে আমাদিগের প্রকৃত পথপ্রদর্শক জনক ও জননী।"

সে আলোকমালা সহসা অদৃশ্য হইল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে এক দেবোপম মূর্ত্তি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন "তুমি কার্য্যক্ষেত্রের সীমায় উপস্থিত হইয়াছ, আইস তোমাকে এই অভিনব স্থানের পরিচয় প্রদান করি; আমার পশ্চাদনুসরণ কর।"

নবম পরিচ্ছেদ।

দেব বলিলেন, "এই স্থানে অমর মহাত্মারা বাস করেন; যে সকল মহাত্মা কার্য্যক্ষেত্রের সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই পর্ব্বতের শিখরে অধিরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই স্থানে বাস করেন। তাঁহারা কেবল নিজে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা নহে—অপরের জন্য পথ সরল করিয়াছেন। যে দ্বার দ্বারা জনকদেব প্রথমে তোমাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করান, সেই দ্বার অনেক কষ্টে অনেক যত্নে অনেক আত্মত্যাগ স্বীকারের পর ইঁহারাই আবিষ্কার করিয়াছেন; যে বর্ম্ম, যে অসিপ্রভাবে তুমি দৈত্য এবং প্রাচীর অনায়াসে অতিক্রম করিলে, সে বর্ম্ম, সে অসির বিষয় কে জানিত? ইঁহারাই প্রথমে প্রদর্শন করেন যে, সে বর্ম্ম সে অসি ধারণ করিলে, অসংখ্য দৈত্যও তোমাকে রোধ করিতে পারিবে না। সম্মুখে নিরীক্ষণ কর, তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করিলাম—"তদ্দ্বারা কি দেখিতেছ?"

*　　*　　*　　*　　*

অগাধ জলরাশি—কুল নাই কিনারা নাই। আদি নাই অন্ত নাই যতদূর দৃষ্টি চলে কেবলই জলরাশি; সেই জলরাশি মাঝে অসংখ্য নর নিমগ্ন হইতেছে—সহসা সেই জলরাশি ভেদ করিয়া এক অতি অপূর্ব্ব পুণ্যময় মূর্ত্তি উত্থিত হইল। তার পর এক করুণাপূর্ণ মধুর স্বর শ্রবণ করিলাম—"পিতঃ! ইহাদিগকে এই পাপসাগর হইতে উদ্ধার কর—ইহাদিগের পাপ আমি স্বয়ং গ্রহণ করিলাম।" তার পর সেই জলরাশি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে দেখিলাম, এবং তৎসঙ্গেই—সহস্র সহস্র লোকের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অস্ফুট চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল।

দেব বলিলেন "ইনি যিশুখ্রীষ্ট।"

* * * * *

ভীষণ মরুভূমি সেই মরুভূমি মাঝে এক উচ্চ সিংহাসন; তাহার উপর এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি বিরাজমান; সম্মুখে শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা দণ্ডায়মান; মহাপুরুষ বজ্র গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন "তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছি; তোমারা আজ যে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছ—যাও অন্য দেশে সে আলোক বিস্তার কর।" তার পর দিব্যচক্ষে দেখিলাম সেই সকল যোদ্ধা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল—দলে দলে সেই মরুভূমি অতিক্রম করিল; অত্যুচ্চ পর্ব্বত, গভীর সমুদ্র, কেহই সে প্রচণ্ডবেগ রোধ করিতে পারিল না—দেশে দেশে তাহাদিগের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

দেব বলিলেন—এই মহাপুরুষের নাম "মহম্মদ।"

* * * * *

কি ভীষণ—কি লোমহর্ষক দৃশ্য! আগুণ! আগুণ! প্রচণ্ড শিখা সকল সর্পাকার ধারণ করত ভীষণভাবে আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছে; সহস্র সহস্র লোক সেই অগ্নি মাঝে দগ্ধ হইতেছে—তাহাদিগের সেই কাতর সকরুণ স্বর আমার মর্ম্মস্থল ভেদ করিল।

সহসা ধীরে অতি ধীরে এক স্বর্গীয় স্বর উত্থিত হইল—তৎসঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠোত্থিত সে কাতরোক্তি নিস্তব্ধ হইল।

প্রকৃতি নীরব—নিস্তব্ধ; আকুল প্রাণে, বিস্ফারিতলোচনে করযোড়ে একবার সেই সকল অনলস্থ লোক উর্দ্ধদিকে নয়ননিক্ষেপ করিল—ক্ষণকালের জন্য সব জ্বালা বিস্মৃত হইল—তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে আমারও ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া আসিল—উদ্ভ্রান্ত প্রাণে সে সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিলাম।

স্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল - ক্রমে ক্রমে সপ্তমে উঠিল,—

বায়ু ভেদ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল; ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার দিয়া সেই স্থান কাঁপাইয়া তুলিল। তৎপরে সবিস্ময়ে দেখিলাম আকাশ-মার্গে বীণাহস্তে এক তেজোময় পুরুষ। দেখিতে দেখিতে সেই অগ্নিও নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

দেব বলিলেন "ইনি শ্রীকৃষ্ণ; এই বীণা ভাগবত গীতা—মানব যখন সংসাররূপ আগুণে দগ্ধ হয়, তখন ইঁহার শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা সেই অগ্নিতে শান্তিপূর্ণ জল নিক্ষেপ করে।

* * * *

জনক বলিল—বৎস! এই যেসকল মহাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিলে, ইঁহারাই এই কর্ম্মক্ষেত্রের পথ-আবিষ্কারক, আমরা কেবল পথ-প্রদর্শক; কিন্তু যাহারা আমাদিগের বাক্য অবহেলা করিয়া স্বয়ং এ পথে অগ্রসর হয়, তাহারা কখনই কৃতকার্য্য হয় না—মানবের প্রধান আবশ্যক "জনক জননীর প্রতি ভক্তি।" সহসা একে একে সে সকল দৃশ্য আমার চক্ষুর অদৃশ্য হইল—তারপর দেখিলাম আমার সম্মুখে আমার সেই করুণার আধার তেজপুঞ্জকলেবর জনক জননী।

* * *

সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইল—হরি হরি! একি আমি কোথায়? চক্ষু মার্জ্জন করিয়া দেখিলাম সেই ভাগিরথী তটেই একাকী শয়ন করিয়া আছি।

শ্রীঅনাদিপ্রসাদ দাস।

বিহারিলাল।

উপান্ত রচনাবলীতে।

"সারদামঙ্গল" রচিত হইবার পরবর্ত্তীকালে বিহারিলাল যে সকল কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, এ প্রবন্ধে সেই রচনাবলীর অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিচয় প্রদত্ত হইল। "মায়াদেবী" "দেবরাণী" ও "ধূমকেতু" নামক তিনটী কবিতা, "প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যা—নিশীথ ও নিশান্ত সঙ্গীত" পঞ্চাত্মক (বিহারিলালের নব প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সম্পাদক কর্ত্তৃক "শরৎকাল" নামে অভিহিত) একখানি খণ্ড কাব্য, "বাউল বিংশতি" আখ্যায়িত একখানি গীতিপুস্তক, "সাধের আসন" নামক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়তন একখানি খণ্ডকাব্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী কবিতা ও গান এই কালের রচনা।

"মায়াদেবী", "দেবরাণী," এবং প্রভাত মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সঙ্গীতত্রয় ১২৮৯ সালের "ভারতী" পত্রে প্রথমে প্রকাশিত হয়; "ধূমকেতু" কবিতাটী ঐ সালের রচনা এবং নিশীথ ও নিশান্ত সঙ্গীতদ্বয়ও সম্ভবতঃ ঐ বৎসরে বা তৎপূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। শেষোক্ত তিনটী কবিতা গতবর্ষে "প্রয়াসে" প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি রচনার সময় বিহারিলালের চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত কবিত্ব শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার শারীরিক ব্যাধি তখন সবে দেখা দিয়াছে, এবং তন্নিবন্ধন মানসিক অবসাদের কচিৎ-আভাস পাওয়া যায়।

শরৎকাল। এই রচনাগুলির মধ্যে "শরৎকাল" অভিহিত কাব্যের অন্তর্নিবিষ্ট প্রভাত, মধ্যাহ্ন প্রভৃতি সঙ্গীত পাঁচটীর ন্যায় ললিত মধুর কবিতা অন্য কোন বঙ্গীয় কবির কাব্যে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

"প্রভাত সঙ্গীত"টী কবির একটী শিশুকন্যার প্রতি সোহাগ-গীতি। মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ও নিশীথ সঙ্গীত তিনটী সাময়িক স্বভাব শোভা বর্ণনাত্মক—স্থানে স্থানে কবির আত্মপ্রকাশও আছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতটী কবির বিষাদপ্রবণতার পরিচায়ক এবং ইহার শেষ পংক্তিতে কবি, দৈহিক অসুস্থতা নিবন্ধন তদীয় কল্পনাশক্তি দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে এই বিশ্বাসের আভাস দিয়াছেন—

ও কে গো কাতর স্বরে আন্‌ মনে গান করে
একাকিনী বিষাদিনী চেয়ে নদীপানে।
ওরো কি আমারি মত হৃদিবাঞ্ছা বজ্রাহত!
ফোটেনা কুসুম আর সাধের বাগানে!

"নিশান্ত সঙ্গীত"টী একটী অতি মধুর ও মোলায়েম প্রভাতী গান; সুখসুপ্তিমগ্না প্রিয়তমাকে জাগরিত করিবার মানসে উষাকালে গীত;—কি সুমিষ্ট ছাঁদেই কবি গাহিয়াছেন—

উঠ প্রেয়সী আমার

* * ০

ওই চাঁদ অস্তে যায় বিহঙ্গ ললিত গায়
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান,
হিমেল্‌ হিমেল্‌ বায়, হিমে চুল ভিজে যায়,
শিশির মুকুতা জালে ভিজেছে বয়ান!
উঠ প্রেয়সী আমার, মেল নলিন নয়ান!

এই সঙ্গীত কয়টীর মধ্যে যে সকল প্রকৃতি বর্ণনা আছে, সে গুলি যেমন সুন্দর তেমনি স্বভাবশুদ্ধ। এ স্থলে রৌদ্রতপ্ত ধরার মধ্যাহ্ন-কালীন রূপবর্ণনাটী উদ্ধৃত করিলাম—

চরাচর ব্যাপী অনন্ত আকাশে প্রখর তপন ভায়,
দিগদিগন্তর উদাস মুরতি উদার স্ফুরতি পায়।

বিমল নীল নিথর শূন্য, শূন্য—শূন্য—শূন্য—অগম শূন্য ;
দূর—অতিদূর দু'পাখা ছড়িয়ে শকুন ভাসিয়ে যায়।
শুভ শুভ্র অভ্ররাজি ধবলা শিখরী সাজি
চলিয়াছে ধীরে ধীরে না জানি কোথায়!
নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম, নতমুখে ফুল ফল,
নতমুখী লতা নেতিয়ে পড়েছে স্তবধ সরসী জল ;
শান্ত সকরব, শান্ত অরণ্যানী মূকবিহঙ্গম, মূচ পশু প্রাণী,
ঘুঘুঘু-ঘুঘুঘু কাতরা কপোতী করুণা করিয়া গায়।
স্তবধ নগর, স্তবধ ভূধর, স্তব্ধ হ'য়ে আছে উদার সাগর,
ধুধু মরুস্থলী, বিহ্বল হরিণী চমকি চমকি চায়।
স্তবধ ভুবন, স্তবধ গগন, প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত! একটুও নাহি বায়!
বিরাম দায়িনী কোথা নিশীথিনী স্নিগ্ধ-চন্দ্র-তারা নক্ষত্র-মালিনী
মহা-মহেশ্বর-করুণা-রূপিণী মোহিনী মায়ার প্রায়!
ল'য়ে এস সেই মেদুর সমীর, ঝুরু ঝুরু ঝুরু, মধুর অধীর,
স্নেহ আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন জুড়াব তাপিত কায়!

"ধূমকেতু।" কবিতাটী বঙ্গীয় ১২৮৯ সালের ১২ই আশ্বিন পূর্ণিমা রজনীতে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট উদ্‌ভ্রান্তগতি জ্যোতির্ম্ময় গগনবিহারিটীকে অবলোকন করিয়া লিখিত। ইহাতে কুসংস্কারাপন্ন স্বার্থপর নৃশংস সংগ্রামপ্রিয় মানবের উপর সুতীব্র অথচ খেদময় ভৎর্সনা আছে।

"দেবরাণী।" শান্তি সুষমার একটী ধ্যান। কবিতাটী বঙ্গসুন্দরীর ছন্দে—কবির "ললিতলতা" ছন্দে—রচিত। কলিযুগে দেবতাগণ সকলেই আবেশ সুখে, স্বপ্নভোলে, সদয়াজননী দেবরাণীর অভয়কোলে নিদ্রাগত, কেবলমাত্র দেবরাণীই পবিত্র স্বর্গভূমি লাবণ্যকিরণে

উজ্জলিত করিয়া জাগ্রতা। কবি সেই দয়াময়ী বিশ্বপালয়িত্রীর আবাস-নিকেতনের শান্ত সৌন্দর্য্য বর্ণন ও তাঁহার মহিমা গান করিয়াছেন।

"মায়াদেবী।" কবিতাটীর বিশেষত্ব জাজ্বল্যমান। এরূপ উদ্দাম অথচ মধুর কবিস্বপ্নময় উচ্ছ্বাস, এরূপ অনন্য সাধারণ কবিত্ব-সৌরভ-সমাকুল, তন্ময়তাময়ী, চিত্তরঞ্জিনী কবিতা, যে কোন ভাষায় লিখিত হইত, সেই ভাষারই গৌরব সাধন করিত। এরূপ কবিতা বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব সামগ্রী এবং ইহা চিরদিন এদেশীয় গীতি কবিতায় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন রাখিবে ও "সারদামঙ্গল"এর সহযোগিনী হইয়া কবি বিহারিলালের নাম বঙ্গীয় কাব্যসংসারে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই কবিতাটির প্রথম তিনটি শ্লোক, কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রচনা। এক ঘনঘটাচ্ছন্ন, অশনিমুখর, দামিনীচকিত দিনে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের সময়, অবিনাশ বাবু ঐ শ্লোক তিনটী ও আর দুই একটী শ্লোক রচনা করিয়া কবিতার উপসংহারের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বিহারিলাল নিকটে আসিয়া, তাঁহার রচনাটী দেখিতে চাহিলেন এবং উহা পাঠান্তে পুত্রকে বলিলেন "তুমি ইহার শেষ রাখিতে পারিবে না, আমাকে দাও।" অবিনাশবাবু হৃষ্টচিত্তে সম্মত হইলেন এবং বিহারিলাল, অবিনাশ বাবুর রচিত শ্লোকগুলির মধ্যে প্রথম তিনটী গ্রহণ করিয়া ঐ কবিতাকে দ্বাত্রিংশ শ্লোকাত্মক কবিতায় পরিণত করিলেন। "মায়াদেবী"র প্রত্যেক শ্লোকে শব্দলালিত্য ও ভাবমাধুরী দেদীপ্যমান, কিন্তু এ কবিতার স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিলে ইহার অনুপম বিশেষত্ব, কবিস্বপ্নের চরম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে না।

"বাউল বিংশতি।" কুড়িটী বিচিত্র সঙ্গীত। বঙ্গদেশে বাউল সঙ্গীতের অভাব নাই, এবং বৈষ্ণব, শাক্ত ও অন্যান্য বহুতর ক্ষুদ্র

বৃহৎ সাম্প্রদায়িক কবিগণের ধর্ম্মতত্ত্ব, ভগবৎপ্রেমতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব ইত্যাদি নানাবিধ আধ্যাত্ম সঙ্গীতের সংখ্যা এই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদেশে এত অধিক, যে সঙ্গীত সম্বন্ধে "বিচিত্র" কথাটা ব্যবহার করার একটী কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। এ সঙ্গীত-গুলি 'বিচিত্র' এই অর্থে যে, ইহাতে কয়েকটী বিচিত্র ও অশান্তিপ্রদ মতের অবতারণা আছে যাহা বঙ্গদেশীয় সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে দার্শনিকতা আছে, নাস্তিকতার আভাস আছে. ইহাতে জগদীশ্বরের অপার প্রেমের উপর সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে—অথচ এই সকল কঠোর মতগুলির অভিব্যক্তি অতি মধুর, সুন্দর ও অনন্য সাধারণ বিশেষত্বপূর্ণ। যাঁহারা বলেন কবিতায় দার্শনিকতার স্থান নাই—দর্শন কঠিন, কবিতা কোমল—তাঁহাদের একবার এই কবিতাগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি, দেখিতে পাইবেন কঠোর বস্তু, প্রকৃত শিল্পির হস্তে পড়িলে কত মধুরে পরিণত হইতে পারে। এই গীত-গুলির কয়েকটী পংক্তি পরবর্ত্তী কবিগণের কবিতা ও গানে সন্নিবিষ্ট হইয়া, বঙ্গীয় পাঠকের পরিচিত হইয়াছে এবং বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেছে। এই পুস্তক খানির কিয়দংশ প্রথমে "কল্পনা" নামক (অধুনা বিলুপ্ত) পত্রিকায় ১২৯৪ সালে প্রকাশিত হয়; সম্প্রতি কবির গ্রন্থাবলীতে সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম গানটীতে কবির দুঃখপ্রবণ হৃদয়ের জন্য আত্ম অনুযোগ; ২য়টীতে জগতের সুখদুঃখময় বৈষম্য-বৈচিত্র্যের কথা ও মানবের উদারতা ও পরার্থপরতার অভাবের কথা; ৩য়টীতে, আত্ম ভর্ৎসনা—

সরল পশু, সরল শিশু, সরলা নারী,
কতই সবাই ভালবাসে, সবাই আমারি,
আমি সেই ভালবাসা পেতে পটু, ফিরে দিতে জানিনে।

নূতন রূপের রাশি প্রাণের হাসি হাসে যুবতী,
মনের কুতূহলে কৌতুকিনী মধুর মূরতি,
তায় মায়ের মতন আদরকোরে নয়ন ভোরে হেরিনে।
জ্যোৎস্নায় তরুলতা মনের কথা কতই ক'য়ে যায়,
বাতাসে হেলে দুলে বাহুতুলে আলিঙ্গন চায়;
আমি, কাতান্ তুলে কাট্‌তে দাঁড়াই, সাধের সোহাগ মানিনে,
তাদের সাধের সোহাগ মানিনে।

৪র্থ গানটিতে প্রেমের মানুষের এবং ৫মটীতে প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ। অবশিষ্ট গীতগুলিতে বিশ্বস্রষ্টার, শুভসুন্দরত্ব, প্রেম ও করুণাময়ত্ব, এমনকি অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বিশ্বাসের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব। কখনও সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

ঘোর, ওলট পালট হচ্ছে কেবল, রচ্ছে সর্ব্বনাশ,
গোল, চাকার মতন মহাচক্র বোঁ বোঁ কোরে ঘোরে আপনি,
এর, কোনটা গোড়া কোন্‌টা আগা?

কখনও মরণের পরপারের বিভীষিকাময় চিন্তা কবিকে ভয়ার্ত্ত করিয়াছে—

চারি দিকে ধূঁয়ার আকার, সমুখে বিষম ব্যাপার,
কোথায় পালাব এবার, কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা,
আমার কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা?

কভু বা বিশ্বাস আসিয়া মধুর আশ্বাস দিয়াছে—

প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই!
আর প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাই।
হইব না পথ-হারা, ওই জ্বলে শুক তারা
দূর—অতিদূর—বাঁশরী শুনিতে পাই।

কভুবা প্রত্যক্ষ দর্শন কবিকে পুলক-পরিপ্লুত করিয়াছে—

এ কি আলোয় আলো ! কোথায় গেল জটিল কুটিল আঁধার
আহা আলোর মাঝে কি বিরাজে রসময়ী মাধুরী আমার !

কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনেও কবির মনে তৃপ্তি নাই, কবি সেই সুন্দর মূর্ত্তিকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য ব্যাকুল, অথচ মূর্ত্তি ধরা দেয় না—

এ চাঁদ কোথায় পেলে !
বল এ চাঁদ কোথায় পেলে !
ত্রিভুবন আলো কোরে পদ্মফুলে খেলা করে সোণার ছেলে।
এ কি মুখের ভাতি, চোকের জ্যোতি ! চার্দ্দিকেতে চায়,
বিশ্ব চরাচর কি একতর শীহরিয়া যায় ;
কেবল তোমার কোলেই সকল সোহাগ, হেসে মুখ ফিরায় আমি নিতে গেলে।

আবার বিরহ, অধীরতা ও উৎকণ্ঠা—

আর বাঁচিনে !
সে বিনে আর বাঁচিনে !
আমি যে কুল বালা, একি জ্বালা, জ্বল্‌তে হল রাত্রি দিনে।
আমার দিবানিশি প্রাণ উদাসী, কাঁদিয়ে আকুল,
সে জন ডুমুরের ফুল ;
দেখি, তার রূপ রাশি, মধুর হাসি,
জানিনে কোথায় থেকে বাজায় বীণে।

* * *

সে যে ধরা দিলেও যায় না ধরা, কি করিগো
আমি যে কি করিব জানিনে !

পরে অভিমান পুনরায় সন্দেহে পরিণত হইয়াছে—কবি সংশয়ের উৎকট তাড়নায় গাহিয়াছেন—

থাকি বিশ্ব চরাচরে ডাকি মহা মহেশ্বরে,
সে কি আমার ধ্বনি করেনা শ্রবণ—
কাতর হৃদয়-ধ্বনি করে না শ্রবণ ?

আবার বিশ্বাস কোমল কণ্ঠে মানভঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে উত্তর দিয়াছে—

অয়ি মানময়ী ! অভিমানে মনের ব্যথা মনে রেখনা !
ডাক প্রাণ ভোরে পাবে তারে, দেবে দেখা, আপনি
পড়বে ধরা তোমার সেই রসের সাগর ত্রিতাপহারী।

শেষে তাহাই হইয়াছে—কবি শান্ত হৃদয়ে পরমানন্দে গাহিয়াছেন—

বস নাথ হৃদাসনে,
তোমার তরে নানা ফুলে কত সাধে সাজায়েছি স্বযতনে।
আজি ফিরে এল আমার সেই শুভক্ষণ
কার্ এ সম্মুখে বিভাসিত প্রভাময় প্রফুল্ল আনন
আমার প্রাণের মতন, ধ্যানের মতন, মনের সাধের মতন
কারে দেখি যেন স্বপন !

কবির সরল ও উন্মুক্ত প্রাণে, অন্তরের প্রবল আকাঙ্ক্ষা—কোমলতম ভাবগুলি লইয়া লুকোচুরী ভাল লাগিত না, আধ্যাত্মিক গূঢ় রহস্যবাদীরা যে পথে চলেন, কবি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথে বিচরণ করিতেন, তাই এত সন্দেহ ও অভিমান। শেষ গানটীতে কবির মনের কথা একত্রে এবং সুস্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে, সেই গানটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

এ কেমন ভালবাসা !
বল কোন্ ভাবেতে, মন ভুলাতে, দেখা দিয়ে ছলতে আসা।

অধরে উদার হাসি সুধারাশি হরে অভিমান,
নয়নে বাজে বীণা মধুরতানে আলসে অবশ করে প্রাণ,
জগতে রূপ ধরে না, চোক্ ফেরে না, মেটেনা প্রাণের পিয়াসা।
এস হে নয়নজলে চরণ ধুয়াই হৃদয়ে দাঁড়াও,
তুমি তো আমারে বেশ বুঝতে পার, আপনারে বুঝিতে না দাও,
আহা কেন বুঝিতে না দাও।
এ কেমন ঢাকাঢাকি লুকোচুরি, প্রাণের পিরীতি তো নয় তামাসা।
ভূত ভেবে ভেবে অবোধ শিশু অভিভূত হয়,
তার মনের রকম মূর্ত্তি ধরে সমুখে ভূত দাঁড়াইয়া রয়,
দেখে মনের ছবি আকাশ পটে আঁত্কে ওঠে
ভয়েতে আঁত্কে ওঠে কি দুর্দ্দশা।
মনের ছবি ছাড়া যদি তুমি স্বয়ং কিছু হও,
আমারে কৃপা ক'রে, আপনারে স্পষ্ট কোরে বুঝাইয়া দাও,
খোলা ভালবাসা ভালবাসি, ধাঁধার পিরীত—
সখা হে ধাঁধার পিরীত্ সর্ব্বনাশা—!
যদি তুমি আমি এক আত্মা আর কিছুই নাই,
কেনা চরাচরে আপনারে ভালবাসে ভাই।
কেন অন্যজনে প্রাণ না দিলে পূর্ণ হয় না প্রেমের আশা?
দ্বন্দ্বে কি পরমানন্দ, কি মহান্ উদার উল্লাস।
জগতে নরনারী অবতরি আহা কি প্রেম করেছে প্রকাশ!
তাঁদের নয়নে অমৃত লীলা, মুখের প্রভা চন্দ্র হাসা
প্রেমিকের নয়নে অমৃত লীলা মুখের প্রভা চন্দ্রহাসা।

সাধের আসন্। এই খণ্ড কাব্য খানির উৎপত্তি, কবি কাউ-পারের "টাস্ক্" কাব্যের ন্যায় কোন কাব্যকলানুরাগিণী রমণীবন্ধুর আদেশে বা সাদর অনুরোধে। কাব্যের নামকরণ সম্বন্ধে কবির নিজের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার 'সারদা মঙ্গল' পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারি মাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম— 'সাধের আসন।' সাধের আসনে অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনিয়া 'সারদা মঙ্গল' হইতে এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?

প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধের উত্তর চাহেন। আমিও উত্তর লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি, এবং বাটীতে আসিয়া তিনটী শ্লোক লিখি। কিছু দিন গত হইল উত্তর লিখিবার কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে! এই ক্ষুদ্র খণ্ড-কাব্যের উপহৃত আসনের নামে নাম রাহল—সাধের আসন।"

সাধের আসন দশম সর্গে সমাপ্ত। সর্গগুলির নাম যথাক্রমে— মাধুরী, গোধূলি ও নিশীথে, প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা, নন্দন-কানন, অমরাবতীর প্রবেশ পথ, কে তুমি, মায়া, শশিকলা স্থির সৌদামিনী ও বীণা, আসনদাত্রী দেবী এবং পতিব্রতা। প্রথম তিনটী সর্গ প্রথমে "মালঞ্চ" নামক একখানি, অধুনা বিলুপ্ত, মাসিক পত্রে, প্রকাশিত হয়, ও পরে কবি কর্ত্তৃক ন্যূনাধিক পরিমাণে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। অবশিষ্ট সর্গগুলি কবির জীবিতকালে মুদ্রিত হয় নাই এবং এত দিন অপ্রকাশিত ছিল। ঐ সর্গগুলি কবির জীবনসায়াহ্নে, অসুস্থতার সময় রচিত হয় এবং কবি সেগুলিকে সংশোধন বা পরিমার্জ্জন করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই। বিহারিলাল কোন রচনাই মনোমত সংস্কৃত না করিয়া প্রকাশ করিতেন না, সুতরাং সাধের আসন কাব্যের উপর সমালোচনার তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আমরা সঙ্কোচ অনুভব

করি। এই কাব্য খানি আকারে বিহারিলালের অন্যান্য সমস্ত কাব্য হইতে বৃহত্তর, কিন্তু এই কাব্যে সারদামঙ্গলের ন্যায় যোগমত্ততা—একাগ্রতা নাই, ইহার ভাষা কবির স্বভাবজ গুণে, মধুময়ী হইলেও, ইহাতে, সারদামঙ্গলের, শব্দৈশ্বর্য্য ভাব ও বাক্যের ঘন সংহতি নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে 'সারদামঙ্গল' দ্বিতীয় সংস্করণের সময়, কবি ঐ কাব্য হইতে যে সমস্ত বাক্য ও চরণ পরিহার করিয়াছিলেন, সেই পরিত্যক্ত চরণগুলির উপাদানে একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতে পারিত ;—কিন্তু সাধের আসন কাব্যের ভাব ও বাক্য যোজনা যে সেই পরিমাণে সুনির্ব্বাচিত ও ঘন সন্নিবিষ্ট এরূপ বলা যায় না। পরন্তু এই কাব্যের কয়েকটী সর্গে প্রধানতঃ ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্গে কোনও ব্যক্তি ও পরিবারগত রহস্য অন্তর্নিহিত থাকাতে, এই কাব্যের বিমল কবিত্বরসাস্বাদন পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু বিহারিলালের ন্যায় শ্রেষ্ঠ কবির, কবিত্ব শক্তির অনুপাতে সম্যক্ তৃপ্তিপ্রদ না হইলেও, অপরাপর কবিদিগের রচনার সহিত তুলনা করিলে, সাধের আসন কাব্যে প্রশংসা ও সমাদর করিবার প্রচুর বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়।

"নিশীথে" কবিতাটীর ন্যায় জননীস্মৃতিবিহ্বল সরল কারুণ্যময়ী কবিতা দেশীয় কাব্য সাহিত্যে অতি কষ্টে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। "আসনদাত্রী দেবী" কবিতাটীরও অধিকাংশ স্থল ঐরূপ আন্তরিকতাময় ও প্রাণস্পর্শী। গীত রচনায় বিহারিলালের যে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, সাধের আসন কাব্যে সন্নিবিষ্ট গীত গুলি, বিহারিলালের সেই বিশেষত্ব

উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শন করে। "গোধুলী" ও "প্রভাত" কবিতাদ্বয় স্বভাব শোভা বর্ণনাত্মক। "গোধুলী" কবিতাটী যথার্থই জাহ্নবীতট-বাসিনী এই মহানগরলক্ষ্মী প্রকৃতি সুন্দরীর সুশান্ত মধুর, সান্ধ্যছবি প্রতিবিম্বিত করিয়াছে,—পড়িলে বোধ হয় যেন—

গঙ্গা বহে কুলু কুলু যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু
ধীরে ধীরে দোলে তরী ধীরে ধীরে বেয়ে যায়,
মাঝিরা নিমগ্ন মনে মধুর পুরবী গায়।

"প্রভাত" গানটী সুরভিশীকরবাহী মধুর উষা সমীরণের ন্যায় মনকে আনন্দ স্নিগ্ধ করে। প্রকৃতই যেন পাঠকের নয়ন পথে—

সহর্ষ কেতকী কুঞ্জ, প্রফুল্ল চম্পক পুঞ্জ
সোণার কদম্বসব বনে রোমাঞ্চিত কায়।
উল্লাসে মাঠের কোলে তৃণের তরঙ্গ দোলে,
কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায়।

"মাধুরী" কবিতাটী বঙ্গদেশীয় কবির সীমাহীন সৌন্দর্য্য কল্পনার একটী অনুপম নিদর্শন। "মালঞ্চ"পত্রে প্রকাশিত কবিতাটীতে সপ্তদশ হইতে অষ্টবিংশতি শ্লোক কয়টী ছিল না। এই পরিবর্দ্ধিত অংশ স্বতন্ত্র কবিতায় স্থান পাইলেই ভাল হইত, ইহাতে মাধুরী ধ্যানের একাগ্রতা যেন বিনষ্ট করিয়াছে। প্রথম প্রকাশিত অপরিবর্দ্ধিত কবিতাটীই অধিকতর সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। সত্য-শুভ-সুন্দরের প্রতি এরূপ আবেগময় তন্ময় উচ্ছ্বাস বাঙ্গালায় আর কোন কবির কাব্যে পাঠ করি নাই। বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রিত ঐক্যতানময় সৌন্দর্য্য বিকাশের এরূপ ললিত মধুর ধ্যান বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে ইহা অপূর্ব্ব। কবি বহিরি-ন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং অন্তরেন্দ্রিয় বোধ্য যাবতীয় পদার্থে সুন্দরের মঙ্গলময় বিস্তার, বিরাট প্রকাশ দেখিয়াছিলেন। বসন্তের কুসুমিত তরুলতায়,

ইন্দ্রধনুর শোভনবর্ণরাগে, শারদনভের মেদুর মেঘমালায়, ঘুমন্ত শিশুর স্বপ্নহাস্যে, ভোরের শান্তোজ্জ্বল শুকতারায়, স্নাতদেহা বিগলিত কেশপাশ পতিসোহাগিনী যুবতীসতীর আনন্দহসিত অধরে, ফেনিল তরঙ্গময় অম্বুরাশির শুভ্রহাস্যে, ভক্তজনের ইষ্টমূর্ত্তি-দর্শনোৎফুল্ল আননে, যাবতীয় প্রাণী মিথুনের সুখবিহ্বল মূর্ত্তিতে, মানবদ্বন্দ্বের মূর্ত্তিমান প্রেমানন্দে, জনকজননী দারাসুতা সখাগণের স্নেহভক্তি প্রেম প্রীতিরসের উদার উচ্ছ্বাসে, জলেস্থলে, অন্তরীক্ষে, অনিলানলে, নিত্যলয় সৃষ্টির অজ্ঞেয় রহস্যলীলায়, সর্ব্বত্রে সর্ব্বভূতে, সুন্দরের অনন্ত বিস্তার চিন্ময় বিকাশ দেখিয়া কবি বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গাহিয়াছেন—

কোটি কোটি সূর্য্য তারা জ্বলন্ত অনল পারা,
পূর্ণ-তৃণ-তরু প্রাণী মনোহরা ধরাখানি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরে কি মিলন পরস্পরে !
কি যেন মহান গীতি বাজিতেছে সমস্বরে ॥
চাহি এ সৌন্দর্য্য পানে, কি যেন উদয় প্রাণে !
কে যেন কতই রূপে একা লীলাখেলা করে !

* ০ ০

উদার উদার দৃশ্য এই যে বিচিত্র বিশ্ব,
পরিপূর্ণ প্রেম-স্নেহ কাহার বিনোদ গেহ !
কাহার করুণা রসে আর্দ্র দিন যামিনী !
কিনি এর অধিষ্ঠাত্রী অপরূপ রূপিণী !
আকাশ পাতাল ভূমি সকলি কেবল তুমি।
এক করে বরাভয়,—বিশ্বের নিয়তোদয়,
নিয়ত প্রলয় হয় অন্য করতলে।
দশদিকে পায় স্ফূর্ত্তি, তোমার মহান্ মূর্ত্তি,
অনাদি অনন্তকাল লোটে পদতলে।

প্রত্যক্ষে বিরাজমান্, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ;
কবির যোগীর ধ্যান, ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব মনের তুমি উদার সুষমা।

'সাধের আসন' কাব্যের স্থলে স্থলে "সারদামঙ্গল", "বাউল বিংশতি", "শরৎকাল" প্রভৃতি, কবির পূর্ব্ববর্ত্তী রচনার অংশবিশেষ পুনরুক্ত হইয়াছে। এটা বিহারিলালের একটী বিশেষত্ব। বিহারিলাল অধিকাংশ রচনাতেই তাঁহার পুরাতন কবিতা হইতে কোনও না কোন প্রিয় চরণ বা শ্লোক বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া সুন্দর ভাবে মিলাইয়া দিতেন ও এইরূপে সেগুলির নিত্য নূতনত্ব সম্পাদন করিতেন।

ক্রমশঃ।

শৈল।

১

অমানিশার ভীষণ দুর্ভেদ্য অন্ধকার সমস্ত জগৎ আপনার বিশাল উদরে পুরিয়া ফেলিয়াছে। নীল আকাশপটে অসংখ্য তারকারাজি বহুদূরস্থিত দীপবাতির ন্যায় টিপি টিপি জ্বলিতেছে। বিশাল বৃক্ষাবলী সমন্বিত অরণ্যানীচয় সেই অমানিশার অন্ধকারকে ঘনতর করিয়া পথিকের মনে যেন ভীতি সঞ্চার করিতেছে।

দুই পার্শ্বে এইরূপ বিটপীশ্রেণী সমন্বিত বিস্তৃত পথ ধরিয়া আপন মনে বিষাদ গীতি গাহিতে গাহিতে চলিতেছি। বিষাদের কারণ এফ, এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। আপনারা বলিতে পারেন তাহাতে এত বিরাগের কারণ কি ? তোমার ন্যায় অবস্থা তো

অনেকেরই হইয়াছে;—তাহারা তো তোমার মত অমাবস্যার দ্বিপ্রহর নিশিযোগে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতেছে না। তাহার উত্তর এই যে বরাবরই মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভাল রকমেই পাশ হইব। দ্বিগুণ উৎসাহে 'বি, এ' পড়িব। পিতামাতার মনে কত আহ্লাদ হইবে। সেই আশায় নিরাশ হইল্যম, এই আমার বিরাগের কারণ।

কারণ আরও একটু ছিল। সে টুকু পাঠক মহাশয় অল্পে অল্পে জানিতে পারিবেন। সেই সময়ে আমার মনে হইয়াছিল "শৈলর কাছে মুখ দেখাব কি করে? সরলা বালিকার আশা ভঙ্গ করিয়া তাহাকে চিরদুঃখ সাগরে ভাসাইলাম। যখন সে বলিবে আমার এত আশা, সব ভেঙ্গে গেল? এজগতে কি আমাদের মিলন হইবে না? তখন—তাহাকে কি বলিয়া উত্তর দিব? তখন কোন্ প্রাণে তাহার কোমল হৃদয়ের সুখ-আশা ভাঙ্গিয়া তাহার প্রাণে ব্যথা দিব?"

বলিতে পারেন—"সেতো শুনিবেই! তবে কেন তোমার এত ভয়?" তাহার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি, আবার দিতেছি, এপোড়ামুখ তাহাকে দেখাইব কিরূপে? তাই গভীর রজনী-যোগে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছি।—ইহাতে কি দোষ আছে?

২

আমার নাম অমরনাথ দেবশর্ম্মা, উপাধি চট্টোপাধ্যায়। আমি আমার পিতামাতার একমাত্র পুত্র। সুতরাং একটু আদুরে! তবে তাহাতে আমার লেখাপড়ার কোন ক্ষতি এপর্য্যন্ত কখনও হয় নাই। শৈলদের বাটী আমাদের বাটীসংলগ্ন বাগানের পার্শ্বে। সেই বাগানে শৈল রোজ ফুল তুলিতে আসিত। ছোট ছোট গাছের ফুলগুলি সে নিজেই তুলিত, বড় বড় গাছের ফুলগুলি তাহার বাল্যবন্ধু "অমরদাদা" পাড়িয়া দিত।

শৈল রোজ আমাদের বাটীতে আসিত। প্রায়ই আমার সঙ্গে আমাদের বাটীতে আহার করিত। সর্ব্বদা আমরা দুজনে একত্রে খেলিতাম।

শৈল আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট, সে আমাকে "অমরদাদা" বলিয়া ডাকিত, আমিও তাহাকে নানাবিধ কবিতাময় নামে সজ্জিত করিতাম। যথা, শৈ, শৈলি, শিবলি, ইত্যাদি সে কিন্তু তাহাতে কখন অসন্তুষ্ট হইত না; বরং আনন্দে গলিয়া যাইত।

একদিবস আমরা দুজনে পুত্তলিকার বিবাহ দিতেছিলাম, আমি বরের পাল্কী কাঁধে করিয়া লইলাম। শৈল কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া আসিল। আমি বিবাহের মন্ত্র পড়িলাম। শৈল হলুদিল ও শাঁক বাজাইল। শেষে ইংরাজী বাজনার নকলে আমি মুখে বাজনা বাজাইলাম। শৈলের বড় আমোদ, ইংরাজী বাজনা বাজাইয়া বিবাহ হইল। পরে কি জানি কেন আমার মনে হইল বিয়ের সময় তো মালা বদল করিতে হয়। শৈলকে বলাতে সে দুই ছড়া বেলের মালা গাঁথিল। দু'জনে দুই গাছি মালা লইলাম, কিন্তু পুত্তলিকা বরবধূকে যে মালা পরাইতে হইবে একথা ভুলিলাম। মাল্যসৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধচিত্তে কি ভাবিয়া উভয়ে উভয়ের গলদেশে পরাইয়া দিলাম। নির্ব্বোধ বালক বালিকা—অজ্ঞানে ছেলে খেলা করিলাম—তাহার পরে, ভবিষ্যতের তমসাবৃত দৃশ্যপটে কি অঙ্কিত আছে তাহা কি ভাবিলাম?

সেইদিন সন্ধ্যাকালে শৈলর মাতার সহিত মাতৃদেবীর অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটী কথা স্বপ্নের ন্যায় আজও মানসাকাশে উদিত হয়। তাঁহারা বলিতেছিলেন "উহারাতো নিজে নিজে বিবাহ করিল। এক্ষণে কর্ত্তাদের মত লইয়া উহাদের সম্বন্ধ বজায় রাখিতে হইবে।

৩

এক্ষণে বোধ হয় আমার বিরাগের কারণ অনেকটা বুঝিতে পারি-লেন। কিন্তু কারণ আরও একটু ছিল। তাহা এইবেলা প্রকাশ করাই যুক্তি-সঙ্গত।

একদিন প্রাতঃকালে পাঠে নিযুক্ত আছি। তখন আমি প্রবেশিকা প্রথম শ্রেণীতে পড়িতাম। এমন সময়ে শৈলর পঞ্চমবর্ষীয় ভ্রাতা আসিয়া বলিল—"অমরদাদা! আমাদের বাড়ী একবার এস, বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন। দিদির সঙ্গে বে দেবে।"

বালকের কথায় হাসি আসিল—ভাবিলাম, এ আবার কি খেলা? কিন্তু তবুও যেন মনের ভিতর এক অভূতপূর্ব্ব বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। আমার যাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বালক আমার হাত ধরিয়া টানা টানি আরম্ভ করিল। এমন সময়ে ঝি আসিয়া বলিল—"দাদা-বাবু! ওবাড়ীর ছোটকর্ত্তা তোমায় ডাক্‌ছেন, শীঘ্র এস।"

বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে বালকের সঙ্গে গমন করিলাম। মন সন্দেহ দোলায় ছুলিতে লাগিল।

৪

শৈলদের বাড়ী যাইলাম, দেখিলাম শৈলের পূজনীয়া মাতৃদেবী পালঙ্কোপরি শায়িত স্বামীর পদসেবা করিতেছেন। আমি প্রবেশ করিয়া উভয়ের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলাম—কেন ডাকিয়াছেন তাহা যেন কিছুই জানি না। তাঁহারা উভয়ে আদর করিয়া আমাকে সেখানে বসাইলেন।

একথা সে কথার পর শৈলের মাতা উঠিয়া গেলেন। আমি বুঝি-

লাম এইবার জলখাবারের পালা। কারণ উক্তরূপ অভ্যর্থনা প্রায়ই অদৃষ্টে ঘটিত।

কি করি প্রায়ই খেয়ে থাকি; সুতরাং আজও বিনা আপত্তিতে নিয়ম পালন করিতে হইল। আমার কিন্তু আজ বড়ই লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। আর আয়োজনও কিছু নূতন রকমের বলিয়া বোধ হইল।

যাহা হউক আহারান্তে পুনর্বার কর্ত্তার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলাম। বুঝিতে পারিলাম, খাওয়ান তো এতক্ষণ হইল—এইবার পরীক্ষা। শৈলর পিতা বলিলেন—"দেখ অমর! আপন সন্তানের অপেক্ষা তোমায় ভালবাসি। তোমার মত নম্র, বিনয়ী বালক কখনও দেখি নাই। দেখ, শৈল"——আমার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—"শৈল আমার বড় আদরের মেয়ে। তাহাকে আমি পুত্রাধিক ভালবাসি। আমার ইচ্ছা যে সর্ব্বদাই তাহাকে কাছে করিয়া রাখি। এই জন্য মনন করিয়াছি তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিব। কিন্তু একটী কথা আছে। যতদিন পর্য্যন্ত না এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার ততদিন পর্য্যন্ত হইবে না। অতএব মনোযোগ দিয়া পড়িতে থাক।"

শৈলর সহিত বিবাহের কথা শুনিয়া বড়ই লজ্জাবোধ হইল। লজ্জায় জড়সড় হইয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া গেলাম—ভাবিলাম "এ আবার কি খেলা?" হৃদয় যেন একটু অস্থিরও হইল।

৫

যাহা হউক সেই অবধি প্রাণপণে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। সেই ভীষণ পরিশ্রম সহ্য হইল না—কাল ম্যালেরিয়া শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া দিল। ভাবিলাম পরীক্ষা দিব না। কিন্তু মাতৃ অনুরোধে

বাধ্য হইয়া পরীক্ষা দিতে হইল। অসুস্থ শরীরে কিছুই পড়িতে পারি-নাই, 'পাস' হইব না নিশ্চিত; কিন্তু, কি জানি কিরূপে আমার অদৃষ্টগুণেই বলিতে হইবে—প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। লোকে বড়ই আশ্চর্য্য হইল।

পরে কলিকাতায় কোন একটী কলেজে এফ, এ, অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। প্রথমবৎসর ম্যালেরিয়ায় একরূপ কাটিয়া গেল। তিনমাস একেবারে কলেজেই যাইতে পারি নাই। দ্বিতীয় বৎসর স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইল। ইংরাজী সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয় একরূপ তৈয়ার হইল। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই অঙ্কশাস্ত্রের সহিত বিশেষ সদ্ভাব না থাকায় উক্ত বিষয় পরীক্ষার উপযোগী প্রস্তুত করিতে পারিলাম না।

কিন্তু পরীক্ষা দিলাম। ফল পাঠকবর্গ জানিয়াছেন, সমষ্টিতে দ্বিতীয় বিভাগের নম্বর থাকিয়াও গণিতে অকৃতকার্য্য হইলাম। দুঃখটা কিরূপ একবার অনুভব করুন দেখি। এক্ষণে বুঝিলেন কেন সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলাম?

৬

পদব্রজে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। আসিয়া আমাদের গণিত শিক্ষক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন।

কিন্তু হৃদয় প্রবোধ মানিল না। যে অশান্তির অন্ধকার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে—তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় দেখিলাম না। তেজ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, দারুণ ভবিষ্য পট সবই অদৃশ্য। প্রলুব্ধ আশার মোহিনী প্রভায় হৃদয় আলোকিত করিতে পারিল না। সুতরাং বলুন দেখি আর কি পড়িতে ভাল লাগে?

তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া দেখিলাম খবরের কাগজ বিক্রয় হইতেছে। একখানি ক্রয় করিলাম। বিজ্ঞাপন স্তম্ভে কয়েকটী ছত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

"অমর, বাবা! বুঝেছি আমার জন্যই তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছ! বাবা! আমার মতিভ্রম হইয়াছিল সুতরাং আমি ক্ষমার যোগ্য। তুমি যত শীঘ্র পার ফিরিয়া আসিবে। আসিবা মাত্র——সহিত তোমার বিবাহ দিব, তোমার পিতামাতা কাঁদিয়া আকুল।—বিষাদে ম্রিয়মান। আমরাও শোকে কাতর। অতএব বাটী আসিতে বিলম্ব করিও না।"

শ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা—

৭

বিজ্ঞাপনদৃষ্টে বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইলাম। ভাবিলাম, যাই না কেন? আমি কি নিষ্ঠুর! পিতামাতার একমাত্র সন্তান; তাঁহারা আমার জন্য কাঁদিয়া আকুল। জীবন সত্বেও জীবন হারা হইয়া আছেন। বাল্যবন্ধু, স্নেহশীলা, ভালবাসার আধার শৈল আমার জন্য ক্রন্দন করিতেছে। পিতামাতার মনে কষ্ট দিয়া ভালবাসার বস্তু সরলা-কুমারীকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া যাওয়া কি কর্ত্তব্য কার্য্য হইল? ইহাতে কি জগদীশ্বর আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন? ওঃ আমি কি ভীষণ পাপী! পিতামাতা আমার জন্য শয্যাশায়ী মৃতপ্রায়। আমি কি না সামান্য কারণে গৃহত্যাগী হইলাম! নরকেও আমার স্থান হইবে না। এই ভাবিয়া মনে করিলাম গৃহে ফিরিয়া যাই।

শিয়ালদহ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। টিকিট ক্রয় করিবার উদ্যোগ করিতেছি—এমন সময় মনে হইল, কোথায় যাইতেছি? গৃহে আর আমার স্থান নাই। যে গৃহে আনন্দপ্রতিম ছিলাম, সেই গৃহে এক্ষণে সদাই লজ্জায় সঙ্কুচিত থাকিতে হইবে। আমার কীর্ত্তি—আমার বাক

হার সকলেই জানিল। স্ত্রীলোকের জন্য জনক জননী—পরিত্যাগ করিতেছি—উঃ কি লজ্জা! কাহাকেও এ পাপ মুখ আর দেখাইব না। বাটী ফিরিব না। এই সময়ে পলায়ন করি। সন্ধানে লোক নিশ্চয়ই ফিরিতেছে। এই ক্ষণেই সন্ধান পাইলে ধরিয়া লইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া দ্রুত গতিতে হাওড়া ষ্টেসনে আসিলাম।

৮

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। এলাহাবাদের টিকিট ক্রয় করিয়া প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিলাম এমন সময়ে সম্মুখে দেখিলাম পিতা। আমায় দেখিবামাত্র চীৎকার ক্রন্দনে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইল এবং নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু বুদ্ধিমান পিতৃদেব কাহাকেও কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। আমাকে বাধ্য হইয়া বাটী আসিতে হইল। কিন্তু কি এক দুশ্চিন্তা আসিয়া মন আকুল করিয়া তুলিল। শৈলকে দেখিতে পাইব তাহাতে যেন মনে প্রফুল্লতা আসিল না। বামচক্ষু অনবরত স্পন্দিত হইতে লাগিল। মনে বড় ভয় হইল। বাটী—সেই সুখের গৃহে, যেখানে যাইয়া স্নেহময়ী মাতা, আদরের শৈল—সকলকেই দেখিব—সেই বাটী যাইতে মন উতলা হইল কেন? অজানিত অমঙ্গল সূচকচিহ্ন দর্শনে প্রাণ যেন খালি খালি বোধ হইতে লাগিল।

৯

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইলে বাটী আসিলাম। পাড়ায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সেই রাত্রে সকলেই দেখিতে আসিল। সকলেরই মনে আনন্দ। পিতামাতা আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত উপদেশের, কত আপার মধুর মোহিনী কথায় মন ভুলাইতে লাগি-

লেন। কিন্তু মনে শান্তি আসিল না। চন্দ্র বাবুদের বাটীরতো কেহ আসেন নাই। মনে অশান্তির বৃদ্ধি হইল।

আলাপনান্তর বন্ধুবর্গকে বিদায় দিলাম, কেবল থাকিলেন আমার জ্ঞাতি সম্পর্কে এক দাদা। তিনিই আমার প্রাণের বন্ধু—যদিও বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তথাপি আমার প্রকৃত বন্ধু।

সকলে চলিয়া যাইলে পর শৈলের কথা সুধাইলাম। তিনি একটু বিকৃত স্বরে বলিলেন—"তাহারা ঘুমিয়েছে তাই বোধ হয় আসতে পারে নি।" প্রাণ চমকিয়া উঠিল। "আপনি আসিতে পারিলেন কিন্তু যাহার এক দরজায় বাটী তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। দাদা সত্য করিয়া বলুন—আপনার মুখ বিষণ্ণ কেন? কিছু লুকাইবেন না; সব সত্য করিয়া বলুন।"

যখন কোন ক্রমেই ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে সমস্ত বলিলেন। স্থির ভাবে সব শুনিলাম, ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে সত্যসত্যই তাহা ঘটিল। স্থির ভাবে শুনিলাম,—স্থির ভাবে বসিয়া রহিলাম। মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা কিছুই স্মরণ হয় না। যখন সংজ্ঞালাভ করিলাম তখন দেখিলাম মা ও দাদা নিকটে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন।

মনে হইল কেন একেবারে মরিলাম না? মরিয়া বাঁচিলাম কেন? *শৈল আমার জন্য গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসিনী? তবে আমি কাহার আশায়* গৃহে ফিরিলাম?

১০

পঞ্চমবর্ষ অতীত হইয়াছে। পৃথিবীতে কত কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার জীবন নাটকে নূতন আর এক অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।

আমি এক্ষণে বিবাহিত। আপনারা ভাবিবেন "আমি কৃতঘ্ন

মহাপাপী—হাঁ আমি তাহাই বটে। কারণ প্রাণের শৈলকে ছাড়িয়া আমার মরণই মঙ্গল ছিল। কিন্তু মরিতে তো পারিলাম না। জগদীশ্বর মরিতে দিলেন না। পিতামাতা বিবাহ দিলেন, ইহাতে যদি আমার দোষ বিবেচনা করেন তাহা হইলে আমি দোষী।

সম্প্রতি আমার সহধর্ম্মিণীর কথা কিছু বলিব। তাহারও নাম শৈল। আমার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত কিম্বা সত্য সত্যই তাহার এই নাম তাহা জানি না। শৈল সর্ব্বদা আমার তুষ্টি সাধনার্থ যত্ন করিত। সকল বিষয়ে আমায় চক্ষে চক্ষে রাখিয়া দিত। মাঝে মাঝে মনে হইত এই কি সেই? সেইরূপ মধুমাখা কথা, সেইরূপ সলজ্জ মৃদু চাহনি, সেইরূপ ভালবাসা। এ শৈল কি সেই শৈল! ভাবিতাম "শৈল" দেবী,—এশৈলও দেবী। কোন প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম না। কেবল ভাবিতাম এই কি সেই?

পূর্ণিমা-রজনী—প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, স্বীয় কক্ষে বসিয়া একমনে চিন্তা করিতেছি। সম্মুখস্থ জানালা দিয়া চন্দ্ররশ্মি প্রবেশ করিয়া শয্যোপরি ও গাত্রে সুধাধারা ঢালিয়া দিতেছে। বৃক্ষপত্রগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ মাখিয়া ঈষৎ দুলিতেছে ও কাঁপিতেছে। রজনীদেবী হীরক মুক্তা-খচিত নীলবসন পরিধান করিয়া হীরকহারে দেহসজ্জা করিয়াছেন—বক্ষস্থলে কৌস্তভমণি সুবিমল স্নিগ্ধ কিরণছটায় হারের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নীলাকাশ নির্ব্বাক আনন্দে উৎফুল্ল। প্রকৃতি দেবী অনির্ব্বচনীয় ও অবর্ণনীয় হাস্যময়ী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পবনদেব যেন ভীত;—প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি বিনাশে সাহসী হইতেছেন না। কেবল চোরের মত লুকাইয়া, আড়ালে থাকিয়া এক একবার নবীন বল্লরী শোভিত বৃক্ষ গুলিকে চুম্বন করিতেছেন—তাহাতে

ঈষৎ শব্দ—অমনি আবার অপরাধীর ন্যায় ত্রস্তে সর্‌সর্‌ রবে পত্র মধ্যে লুকাইতেছেন—তাহাতেও একটু শব্দ।

একমনে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি। অলঙ্কার বিভূষিতা হাস্যময়ী রজনীর প্রফুল্ল আনন শোভা বিষাদভরা প্রাণে এক অতি অপূর্ব্ব নূতন ভাবের উদয় করিয়া দিল। যেন এক অপরিচিত অভূতপূর্ব্ব ভাবে হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠিল। যেন আপনহারা হইয়া বসিয়া রহিলাম।

এই ভাবে প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যে যে কতক্ষণ বিভোর হইয়া ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল, একটী নিশাচর পক্ষী বিকট চীৎকার করিতে করিতে নদী পারে উড়িয়া গেল। কঠোর স্বরে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

আমাদের বাটীর পশ্চিম ধারে কলনাদিনী কঙ্কণা বহমানা ছিল। পরক্ষণেই নদীর অপর তীর হইতে নৈশ গগন প্রকম্পিত করিয়া সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল। সুপ্তা প্রকৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই অপ্সরানিন্দিত বীণা-ধ্বনি-তুল্য সঙ্গীত লহরী নাচিয়া নাচিয়া তারকামণ্ডলী পরিবেষ্টিত অনন্ত আকাশ পথে উত্থিত হইতে লাগিল।—

"মন কেমনে নিবারি,
যতনে যাতনা বাড়ে কেমনে ভুলিতে পারি।"

কি যেন কি মনে পড়িয়া গেল। বহুদিনের সুষুপ্ত স্মৃতি পুনরায় হৃদয়ে জাগরিত হইল।

দ্রুতপদে ছাদের উপর উঠিলাম। আহা! কি দৃশ্য! জ্যোৎস্না রাত্রে নদী-শোভার তুল্য শোভা বুঝি জগতে আর নাই। মৃদুবাতাসে তরঙ্গনিচয় দুলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। চন্দ্রিকাস্নাত হইয়া এ উহার

গায় ঢলিয়া পড়িতেছে। যেন পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য্য গরিমা শ্রেষ্ঠত্বে সপ্রমাণার্থ পরস্পর দ্বন্দ্ব করিতেছে।

পুনরায় শুনিলাম,—

"যতনে যাতনা বাড়ে কেমনে ভুলিতে পারি।"

সেই স্বরসুধাউৎসমূল নিরূপণার্থে চাহিলাম—আহাহা! কি সুন্দর! জীবনে কখন এমন দৃশ্য দেখি নাই। সেই চন্দ্রকর প্রস্ফুট—অনন্ত আকাশ তলে কি দেখিলাম! পরপারে এক রমণী মূর্ত্তি! শ্বেত বসনা একবার নদীপানে আর একবার চন্দ্রপানে চাহিতেছে। আলুলায়িত কেশদাম মৃদু পবন হিল্লোলে বক্ষে, পৃষ্ঠে এবং অংসোপরি পতিত হইয়াছে। কিয়দংশ কপোল দেশে ন্যস্ত। রমণীর বর্ণ যেন সেই পূর্ণ-চন্দ্র-চমক অপেক্ষাও সুন্দর, স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল! বুঝিলাম রমণী অসামান্যা সুন্দরী!—বীনা পুনরায় বাজিল। অস্থির চিত্তে শুনিলাম,—

"বাসনা বারি বিরাগে মলিন বদন মনে জাগে"

সেই বিদায়, সেই মলিন বদন, সেই নবযৌবনের অস্ফুট-স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। শুনিলাম—

"বাসনা বারিবিরাগে মলিন বদন মনে জাগে
অনুরাগে গাল সোহাগে
ছিঁড়িতে নারিল ডুবি কি করি মন যে তারি।"

নির্নিমেষ লোচনে গায়িকার অপূর্ব্ব মনোহারিণী রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে লাগিলাম, রমণী এক, দুই, তিন, চারি এইরূপে কতবার গানটি গাহিল, আমি শুনিলাম, জগৎ সংসার ভুলিলাম।

---

* শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'মলিনা বিকাশ" হইতে উদ্ধৃত।

১২

পুনরায়—"বাসনা বারি বিরাগে মলিন বদন মনে জাগে।"

এবার জ্ঞান হইল। অতীত-স্মৃতি নবভাবে হৃদয়ে উদয় হইল। অসাড় হৃদয়ে দ্বিগুণ বল পাইলাম। সবেগে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলাম—"শৈল। প্রাণের শৈল। দাঁড়াও! একটিবার আমার কথা শুন। আর আমি পলাইব না। শৈ, আমার বাল্যসাথী! আমাকে ফেলে যেও না! তোমায় ভুলি নাই হৃদয় তোমার! শৈল, দাঁড়াও।"

বলিতে বলিতে দ্রুতপদবিক্ষেপে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নদীগর্ভে ঝাঁপ দিতে যাইব এমন সময়ে মাথা ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। চেতনা হরণকালে স্বপ্নের ন্যায় শুনিলাম—"শৈল তোমারই! কিন্তু ইহকালে নয় অনন্ত সমীপে অনন্তকাল আমি তোমারই হইব।"

পরে স্বপ্নের ন্যায় যেন শুনিলাম—

"যতনে যাতনা বাড়ে কেমনে ভুলিতে পারি।"

চেতনা হইলে পর দেখিলাম যে স্বীয় কক্ষে আমার স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শুইয়া আছি। ভার্য্যা বাতাস করিতেছে, মাতা বিষণ্ণবদনে পার্শ্বে উপবিষ্ট, হেমদাদা অদূরে বিষণ্ণ ও চিন্তিত ভাবে বসিয়া আছেন। প্রথমে আশ্চর্য্য হইলাম। কিছুই মনে হইল না। জিজ্ঞাসা করায় কথা কহিতে নিষেধ করিল। তখন যেন আবার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—"নাথ! শৈল তোমারই।"

আবার শুনিলাম—"যতনে যাতনা বাড়ে কেমনে ভুলিতে পারি!" পুনর্ব্বার চৈতন্য হারাইলাম।

১৩

একমাস ক্রমাগত চিকিৎসায় গুণবতী-স্ত্রী ও হেমদাদার অদম্য

পরিশ্রমে ও যত্নে সারিয়া উঠিলাম। কিন্তু তখনও মাঝে মাঝে যেন হৃদয়ে জাগিত——

"যতনে যাতনা বাড়ে কেমনে ভুলিতে পারি।"

একদিন বিষণ্ণবদনে বসিয়াছি, হেমদাদা আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"অমর তোর ও ভাব হলো কেন বল দেখি ?"

"কি ভাব ?"—আর কিছুই বলিতে পারিলাম না। দরদর অশ্রুধারা মর্ম্ম কথা ব্যাখ্যা করিয়া দিল। তিনি বলিলেন—"দেখ ভাই শৈল তোমার মায়া ছেড়েছে,—সে দেবী।—পাছে তাহাকে পাইয়া স্ত্রী ত্যাগ কর এই ভয়ে সে পলায়ন করিয়াছে। তাহার জন্য কাঁদিও না। সে আত্মসংযমের চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। বিশেষতঃ সে তোমার পত্নী নহে, তোমার তাহাতে অধিকার নাই। তোমার স্ত্রী অতীব সুশীলা ও সচ্চরিত্রা ; সতী নারীর মনোবেদনা দিও না। তাহাকে ভাল বাসিয়া ধর্ম্ম রক্ষা কর।" ইত্যাদি নানা প্রকার নীতি বাক্য আমাকে বুঝাইলেন।

মনে হইল বাস্তবিকই তো আমি পাপী। সতীর মনে বেদনা দিয়াছি। অসঙ্গত দ্রব্য লাভে লালসাকে প্রধাবিত করিয়াছি। জগদীশ্বর, ক্ষমা করুন, মনে বল দিন! এইবার হইতে সাবধান হইব। আর শৈলকে মনে করিব না,—তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব।"

এইরূপ ভাবিয়া মনস্থির করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। অসাধ্যসাধনে চেষ্টিত হইলাম। পাষাণে—অঙ্কিত মূর্ত্তি ধৌত করিতে উদ্যত হইলাম। দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম কি ?

এখনও মনে হয়,—সেই পূর্ণিমারজনী, সেই নদীতীর, সেই মর্ম্মভেদী সঙ্গীত।—

"যতনে যাতনা বাড়ে কেমনে ভুলিতে পারি।"

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যুতের ভয়।

(মার্ক টোয়েন হইতে)

মি: ম্যাক উইলিয়ম্, বলিতে লাগিলেন "লোক বিদ্যুতের ভয়ে যেরূপ ভীত হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। যদিও কখন কখন কুকুর ও কদাচিৎ দুই একজন পুরুষ মানুষকে বিদ্যুতের ভয়ে ভীত হইতে দেখা যায়, তবুও স্ত্রীলোকেই ইহাকে বেশী ভয় করে। স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ সয়তানের ও কখন কখন নেংটি ইদুরের সামনে নির্ভয়ে যাইতে পারে, কিন্তু বিদ্যুৎ দেখিলেই একেবারে কাবু হইয়া পড়ে। সে সময়ে তাহাদের দুর্দশা দেখিলে হাস্যও পায় এবং দুঃখও হয়। আমি এক রাত্রিতে 'মটিমার, মটিমার' শব্দে জাগরিত হই, ও অতি কষ্টে ঘুম ভাঙ্গাইয়া শুনিতে পাই যে, আমার স্ত্রী কাতর স্বরে আমায় ডাকিতে-ছেন। তখন আমাদের দুজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল—

'ইভি, তুমি কি ডাকিতেছিলে? কি হইয়াছে? তুমি কোথায়?'

'আমি জুতা ও আলো রাখিবার ছোট ঘরে। এই ঝড় বৃষ্টির রাত্রিতে তোমার ওখানে শুইয়া ওরূপ ঘুমাইতে লজ্জা করে না।'

'লোক ঘুমাইলে কিরূপে লজ্জিত হইতে পারে? ঘুমাইলে কি লজ্জা থাকে যে লোকে লজ্জিত হইবে?'

'তুমি বেশ জান, মটিমার, তুমি কখন লজ্জিত হও না'; সেই সময়ে আমি স্ত্রীর ক্রন্দন সংবরণের শব্দ শুনিতে পাইলাম ও সেই শব্দ শুনি-য়াই আমি কড়া উত্তর না দিয়া বলিলাম, 'আমি বড় দুঃখিত হইলাম; এরূপ ব্যবহার ইচ্ছা করিয়া করি নাই। ফিরে এস, ইভি, আর—'

'মটিমার'

'কি হইয়াছে?'

'তুমি এখনও বিছানায় আছ, না কি ?'

'নিশ্চয়ই, কেন তা'তে—'

'শীঘ্র বিছানার বাহির হও। তুমি তোমার নিজের জন্য যদিও সাবধান না হও, আমার আর ছেলেদের জন্যও সাবধান হওয়া তোমার উচিত।'

'কিন্তু, ইভি, আমি—

'আমার সঙ্গে এখন তর্ক করিও না, মর্টিমার। তুমি নিজেও বেশ জান, আর সমস্ত বইতেও আছে যে ঝড়বৃষ্টির সময় বিছানার মত বিপদজনক স্থান আর নাই তুমি কেবল তর্ক করিবার জন্য জীবন নষ্ট করিবে।'

'কি আপদ, আমি এখন বিছানায় নাই। আমি—

(এই সময়ে বিদ্যুতের আলোয়, বজ্রাঘাতের শব্দ ও স্ত্রীর ভীত-ব্যঞ্জকস্বরে আমার কথা ফুরাইল না।)

'দেখ, কিরূপ পরিণাম হইল দেখ। এরূপ সময়ে তুমি শপথ করিলে কিরূপে, মর্টিমার ?'

'আমি শপথ করি নাই আর এ আমার কথা কওয়ারও ফল নয়। ইভি, তুমি বেশ জান—অন্ততঃ তোমার জানা উচিত—যে আমি কথা না কহিলেও ঠিক্ এইরূপ হইত। আকাশ যখন বিদ্যুতে ভরা থাকে—'

'বেশ, তর্ক কর, তর্ক কর; কেবল তর্কেই পটু; কর, কর, তর্ক কর। তুমি বেশ জান যে এখানে একটিও লোহার শিখ নাই, আর তোমার স্ত্রী ও ছেলেরা পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছে। এ কথা জেনে শুনেও তুমি কি করে ওরকম কথা বল ? আবার কি করিতেছ ? দেশেলাই জ্বালিতেছ ? মর্টিমার, তুমি পাগল না কি ?'

'ভাল জ্বালা বটে, আলো জ্বালাতে ক্ষতি কি ? এই ঘরটিত ঠিক্ নরকের মত অন্ধকার। আর—'

'নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, শীঘ্র নিবিয়ে দাও। তুমি দেখছি আমাদের সকলকেই মারবে। তুমি বেশ জেন আলো বিদ্যুৎকে যেমন আকর্ষণ করে, এমন আর কোন জিনিষই করে না (গুড়-গুড়-ড়--র্‌-কডর-ড়-র্‌) ঐ শোন। কি করেছ দেখ।'

'কি দেখিব, কি করেছি ? আলো বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু আলো কখন বিদ্যুৎ জন্মায় না। এবারেও—

'লজ্জাও করে না। মৃত্যু আমাদের নিকট, আর এসময় তুমি এইরকম কথা কইচ। যদি তোমার—মটিমার'

'কেন ?'

'তুমি কি আজ উপাসনা করে ছিলে ?'

'না, আমি করিব মনে করেছিলাম, কিন্তু ১২ × ১৩ কত হয় তাই হিসাব করিতে—'

(গুড—ড়ুড়—ড়ুড—কড—ড়—র্‌—চড়াৎ)

'হায়, হায়, হায়, আর আমাদের রক্ষা নাই। এরূপ সময়ে তুমি উপাসনা করিতে ভুলিলে, মটিমার।'

'কিন্তু তখন 'এরূপ সময়' ছিল না। আকাশে একটুকুও মেঘ ছিল না ; আর আমি কি করে জানিব যে ঝড় বৃষ্টি হ'বে। এত প্রায় হয়, এ নিয়ে তোমার গোল করা বড় অন্যায়। চার বৎসর আগে যখন আমি উপাসনা না করায় ভূমিকম্প হয়, তখন থেকে আজ অবধি আমি একদিনও উপাসনা করিতে ভুলি নাই।'

'মটিমার, কি বল্‌ছ ? তুমি কি জরের কথা ভুলিয়া গেলে ?'

'তুমি জরের কথা প্রায় বল। তোমার বড় অন্যায়। একথা না

বলে' তুমি কোন কথা কইতে পার না। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু যদি তুমি ফের—'

(গ্রুম—গ্রুম—কড়র—ড়- -র—গুম্—গুম্—দুম্)

'হায়, হায়, হায়। বজ্রাঘাত বাড়ীতেই পড়েছে। আজ রাত্রিতেই আমাদের শেষ হ'বে। আমরা মারাগেলে মটিমার যদি তুমি কখন এইসব কড়া কথা ভাব, যদি কখন তোমার মনে পড়ে—মটিমার।'

'আঃ, আবার কি ?'

'তোমার কথায় বোধ হয়—মটিমার, তুমি কি সত্যই আগুণ রাখ-বার জায়গার (fire-place) সামনে ?'

'হাঁ, সেই দোষই এখন করেছি।'

'শীঘ্র সরে এস। তুমি আমাদের সকলকেই মারবে দেখছি। তুমি কি জান না যে খোলা চিম্নি যেমন বিদ্যুৎ আকর্ষণ করে সেরূপ আর কিছুই করে না। এখন আবার কোথায় গেলে ?'

'জানালার সাম্নে।'

'তুমি কি পাগল ? সরে যাও, সরে যাও। কোলের ছেলেরা অবধি জানে যে ঝড়ের সময় জানালার মত বিপদ জনক স্থান আর নাই। আর তুমি, বুড়, ছেলের বাপ হয়েও ওখানে গেলে। হায়, আজ দেখ্‌ছি মারা যেতে হ'বে। এখন—মটিমার'

'কেন ? কি কর্‌ব ?'

'ওকে খস্ খস্ করছে ?'

'আমি'

'কি করচ ?'

'আমার ইজেরের উপরদিক কোন্‌টা তাই ঠিক্ কর্‌ছি।'

'শীঘ্র ওসব দূরে ফেল। পশম ও বনাতের মত বিদ্যুৎ আকর্ষনীয়

জিনিষ আর নাই জানিয়াও, যখন তুমি এই সব পরিতেছ, তখন আমার বিশ্বাস যে তুমি ইচ্ছা করিয়াই জীবন বিনষ্ট করিতে চাও। আমাদের জীবন ত সর্ব্বদাই স্বাভাবিক বিপদে পরিপূর্ণ; তা'র উপর তুমি আবার ইচ্ছা করিয়া বিপদ বাড়াও। আবার গান গাইছ? কি ভাবছ?'

'কেন গান গাইতে ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি কি? আমি তোমাকে শত সহস্রবার বলেছি যে গানে আকাশে বিদ্যুৎ সঞ্চারণে বাধা দেয় আর—মটিমার দরজা খোলা হচ্চে কি জন্যে?'

'কেন তাতেই বা ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি মৃত্যু আর কি। দরজা খুলিলেই বাতাস ঢোকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ঢোকে একথা সকলেই জানে। বন্ধকর; আরও চেপে বন্ধকর। এ সময়ে তোমার মত পাগলের সঙ্গে থাকা কি ভয়ানক! মটিমার আবার ওখানে কি করিতেছ?'

'কিছু না, কেবল জলের কল খুলিতেছি। ঘরটা ভয়ানক গরম; আমি মাথাটা আর মুখ খানা ভিজুতে চাই।'

'তোমার নিশ্চয়ই বুদ্ধিলোপ হয়েচে দেখ্‌চি। যদি বিদ্যুৎ অন্য জিনিষে একবার লাগে, তবে জলে পঞ্চাশ বার লাগে। কল বন্ধ কর বল্‌চি। হায়! আমাদের আর কেউ বাঁচ্‌তে পারবে না। আমার বোধ হয়—মটিমার ওটা কি পড়্‌ল?'

'ও একখানা ছবি।'

'তুমি বুঝি দেয়ালের কাছে গেছ। দেয়ালের মত আর কিছুই বিদ্যুৎ আকর্ষণ করিতে পারে না। সরে এস, আবার শপথ কচ্চ! তোমার পরিবারে এরূপ বিপদের সময় তুমি কি করে শপথ কর? আমি যে তোমায় পালকের বিছানার কথা বলিয়াছিলাম তা'র কি হল?'

'সে ভুলিয়া গিয়াছি।'

'ভুলেগেছি! তা ভুল বৈবৈকি! আজ যদি সে বিছানা ঘরের মাঝখানে পাতা থাকৃত, তবে আমরা সকলেই নিরাপদ হতেম। শীঘ্র তুমি আমার কাছে এস।'

আমি তখন সেই ঘরের ভিতর যাইলাম। কিন্তু ঘরটি নিতান্ত ছোট ও বন্ধ থাকাতে দু'জনে থাকিতে বড কষ্ট হইল। আমি বাহিরে আসিলাম, কিন্তু গৃহিণী বলিলেন—

'তোমার রক্ষার জন্য কিছু করিতে হইবে। আমার টেবিলের উপর হইতে সেই জাবম্যান বই খানা আর বাতি ও দেশেলাই দাও। কিন্তু ঘরের ভিতর আলো জালিও না।'

আমি সেই ঘোর অন্ধকারে কয়েকটা ফুলদানি ও অন্যান্য আসবাব ভাঙ্গিয়া বই, বাতি ও দেশেলাই গৃহিণীকে দিলাম। তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পড়িতে লাগিলেন ও আমিও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পাইলাম।

'মটিমার ও কিসের শব্দ?'

'ওটা বিড়াল।'

'বিড়াল। ওটাকে শীঘ্র ধরে' হাত ধোবার জায়গায় পুরে রাখ। বিড়ালগুলা কেবল বিদ্যুতে ভরা। কি সর্ব্বনাশ।'

আমি আবার কান্নার শব্দ শুনিলাম। তাহা না হইলে আমি একপাও নড়িতাম না।

যাহা হউক আমি অনেক টেবিল ও চেয়ার উল্টাইয়া ও কিঞ্চিৎ শারীরিক আঘাত পাইয়া বিড়ালটীকে ঘরে পুরিলাম। কিন্তু আমি ২০০৲ টাকার জিনিষ ভাঙ্গিলাম। তারপর গৃহিণী বলিতে লাগিলেন;—

'মটিমার এই বয়ে লেখা আছে যে ঘরের মাঝে চেয়ারে দাঁড়ানই সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু দাঁড়াইবার আগে চেয়ার খান অপরিচালক (nonconductor) দিয়ে রক্ষা (insulate) করিতে হইবে অর্থাৎ ৪টা কাঁচের গেলাসের উপর চেয়ারের ৪টা পা রাখিতে হইবে (ককড়্‌—কঁড়্‌—ড়র—ব্যাং—গুম্‌—গুড়ুম্‌) ঐ শোন। শীঘ্র কর, মটিমার, শীঘ্র কর।

আমি তখনও সমস্ত কাঁচের গেলাস ভাঙ্গিয়া ৪টা গেলাস সংগ্রহ করিয়া চেয়ারের ৪টি পায়া ৪টি গ্লাসের উপর রাখিয়া স্থির ভাবে উপদেশ অপেক্ষায় রহিলাম।

'মটিমার, ইহার মানে কি ? Wahrend evies Gwellers &c. আমরা কি ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য আমাদের নিকটে রাখিব না—দূরে রাখিব ?

'দেখ, ইভি. এখানটা একটু গোলমেলে আছে আমি ঠিক্‌ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে আমরা ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য আমাদের অতি নিকটে রাখিব।'

'আমারও তাই বোধ হয়, কারণ তাহা হইতে আমাদের চারিদিকে ঐ জিনিষগুলা শিকের কায করিবে। তুমি শীঘ্র তোমার পিতলের টুপি পর।'

আমি অগত্যা সেই গরমে সেই বৃহৎ ভারি টুপি পরিলাম। তখন গৃহিণী আবার বলিতে লাগিলেন ;—

'মটিমার, তোমার শরীরের মধ্যভাগ এইবার রক্ষাকরা উচিত। তুমি তোমার পিতলের কোমর বন্দ ও তলোয়ার পর।'

'এখন তোমার পায়ের দিক বাঁচান উচিত। মটিমার তুমি এইবার spurs পর।'

আমি নিঃশব্দে আদেশ প্রতিপালন করিলাম ও যতদূর পারিলাম মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিলাম।

'মটিমার ইহার অর্থ কি ? Das lanten ist' &c. ঝড় বৃষ্টির সময় তোমাকে ঘণ্টা বাজান উচিত কি না ?' *

'আমার বোধ হয় ইভি, ঘণ্টা বাজান উচিত। আর প্রতি কথার মানে করিতে গেলেও—'

'সে থাক্। আর দেরী করিও না, মটিমার দালানে আমাদের বড় ঘণ্টা আছে। শীঘ্র সেইটা নিয়ে ওই চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া খুব জোরে বাজাও। আর, এইবার আমরা রক্ষা পাইলাম ; এযাত্রা আমরা বাঁচিয়া যাইব, মটিমার।'

কাযে কাযেই আমি সেই চেয়ারে উঠিয়া যথাসাধ্য জোরে ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলাম। ৮।৯ মিনিট পরেই আমার জানালার বাহিরের ফাঁক হইতে ভিতরে আলো প্রবেশ করিল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হইল— 'কি হইয়াছে ? কি ব্যাপার ? শীঘ্র দরজা খোল।'

জানালার বাহিরের লোকেরা আমার রাত্রির পোষাকের উপর যুদ্ধের সাজসরঞ্জম অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল।

আমি তখন ঘণ্টা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে নামিয়া বলিলাম, 'কিছুই নয় ; পাছে আমাদের বাড়ীতে বজ্রাঘাত হয় এই ভয়ে আমি বিদ্যুৎ তাড়াইতে ছিলাম। আজিকার রাত্রি কি ভয়ানক— কেবল ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত আর বৃষ্টি।'

'ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, বৃষ্টি ! মিঃ ম্যাকউইলিয়মস্, তুমি পাগল হইয়াছ নাকি ? আজি অতি পরিষ্কার রাত্রি।'

আমি তখন জানালা খুলিয়া দেখিয়া এত আশ্চর্য্য হইলাম যে কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। অবশেষে বলিলাম, 'সে কি ? আমিত কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি জানালার ভিতর হইতে বিদ্যুতের আলো ও বজ্রের শব্দ ঠিক্ শুনিয়াছি।' আমার কথা শেষ

না হইতে হইতে, প্রাণ ভরিয়া হাসিবার জন্য একটি [illegible] করিয়া সমাগত ভদ্রলোকেরা মাটিতে শুইতে লাগিল—[illegible] দুইজন দম্ আটকাইয়া মারাগেল। জীবিতদের মধ্যে একজন বলিল, 'তুমি যদি কিছু আগে জানালা খুলিতে! তুমি বিদ্যুৎ দেখ নাই, বজ্রাঘাতও শোন নাই। কেবল কামানের আলো দেখিয়াছ ও শব্দ শুনিয়াছ। অনেক রাত্রিতে গারফিল্ড্ প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইয়াছেন এই খবর আসে সেই জন্য এইসব আড়ম্বর।'

এই বলিয়া তাহারা হাস্য করিতে করিতে চলিয়া গেল। এতরকম বাঁচিবার উপায় সত্বেও লোকে যে কিরূপে বজ্রাঘাতে মরে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

শ্রীসতীন্দ্র নাথ সরকার।

ফুলের সাজি।

অতৃপ্ত পিয়াস।

মরুপ্রায় ছিল যবে হৃদয় আমার,
না বহিত প্রেম নীর সেখানে তখন,
পিপাসার তীব্রজ্বালা ছিলনা কখন,
হৃদয় তখন ছিল সুখের আধার।

সেই সুধানীরে এবে ল'য়ে কত আশা
রয়েছি ডুবিয়ে। হায় সদা ঢেউগুলি,
নাচিছে খেলিছে রঙ্গে গায়ে ঢ'লি ঢ'লি;
তবু না মিটাতে পারি সে ঘোর পিপাসা।

যদি না মিটাতে পা'র অন্তরের সাধ,
কি কারণে হে বিধাত, প্রলোভন এত;
দিয়েছ সমুখে মোরে দহিতে সতত?
কেন ভেঙ্গেদেব তবে অমৃতের বাঁধ।

সহেনা সহেনা আর দারুণ যাতনা,
তৃষায় ফাটিছে হিয়া, মিটেনা বাসনা।

শ্রীহরিহর শেঠ।
চন্দন নগর।

একটু।

একটু উষার আলো একটু মধুর হাসি,
একটু অতীত স্মৃতি একটু বিষাদ বাশি।
একটু নবীন প্রেমে একটু বিরহ ছায়া;
একটু নয়ন যুগে একটু মোহিনী মায়া।
একটু সে প্রণয়েতে একটুকু প্রতিদান;
একটু জীবন হবে একটুতে অবসান।

বিদায়ের পূর্ব্ব।

মিছে ব্যথা চেপেরাখা এই দেখা-শেষ দেখা,
দেখে আসি তায়।
মিটেনাত কভু আশ, শুধু অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস,
কথায় কথায়।
কিবে তা'র মর্ম্মব্যথা, কত সাধি বলে না তা
একি বিড়ম্বনা?
গালে হাতখানি রেখে অধোমুখে চেয়ে থাকে
কেবল ভাবনা।
যবে কাছেযাই—দেখি অশ্রুপূর্ণ দুটি আঁখি,
ম্লান মুখ খানি,
এলোথেলো কেশপাশ, অযতনে চারুবাস,
লোটায় ধরণী।
যাই, কেঁদে ফিরে আসি মিছে ভাল বাসাবাসি
মিছার প্রণয়:
বক্ষব্যথা স'য়ে স'য়ে আশার আশ্বাসে র'য়ে,
কিবা ফলোদয়।

সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি রাতদিন র'য় যদি,
কোথা তবে সুখ?
শুষ্কহাসি আলিঙ্গন কোথা তা'য় তৃপ্ত মন,
পুড়ে যায় বুক।
মিছে আর চোকোচোকি মিছে মনরাখারাখি
তুষানলে জ্বলা,—
পরাণের দ্বিপ্রহরে কাঁদাইলে বালিকারে,
একি প্রেম-খেলা?
প্রভাত বিহঙ্গ মত পূর্ব্বে ছিনু সুখে কত,
মোহিনী মায়ায—
বাঁধিয়ে প্রণয়পাশে কাঁদায় সে কোন দোষে
বুঝিনাত তায়।
বুঝে আর ফল নাই, আশার ভরসা নাই,
কোট গেছে ডুবি:
যদি প্রেমে উপেক্ষিল, প্রাণ কেন নাহি গেল
কেন কেঁদে মরি।
তা'র স্মৃতি তা'র গান, তা'র নাম তা'র ধ্যান
কেন তবে আর?
মরু-মরীচিকা পিছে ঘুরে ঘুরে মরা মিছে,
যন্ত্রণাই সার।
আর-মিছেব্যথাচেপেরাখা এইদেখা শেষদেখা
দেখে আসি তায়।
মুছে নয়নের জল হৃদয়েতে বাঁধি বল,
লইতে বিদায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস,
মহিষাদল।

ভুলে।

মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে!
সে যে—মৃণালে কমল ফুল অগাধ জলে,
তা'তে যে মোহিনী রেখা,
কি জানি কি ভাব মাখা,
কেমন আকুল ভাবে হৃদি উথলে।
মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে!

(২)

মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে!
সে যে—আড়ালে বিমল চাঁদ আকাশ কোলে।
পরাণ শিহরি উঠে,
কি জানি কি ভাব ছুটে,
পাছে সে কলঙ্ক রেখা দেখে সকলে:
মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে!

(৩)

মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে।
সে যে—কোকিল কূজন বসি গাছের ডালে,
সে তানে কি মধু মাখা,
অমৃতে গরল ঢাকা,
বিমল হইয়া তাহা হৃদয়ে ঢালে,
মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে!

(৪)

মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে!
সে যে—তটিনী মুকুতা ভরা নিজ সলিলে;
পাছে সে নাগর তরে,
আপনা ভুলিয়া মরে,
জোয়ারে বহিয়া যায় কূলে অকূলে,
মজিনু তাহায় কেন আপনা ভুলে।

শ্রীরজলাল রায়,
কাঁথি।

কুঞ্জমণি।

গভীর আঁধার ময় কানন ভূমি
বিচরে বিপিনচর বিপদ-খনি
গোপনের ভাব কথি, বারেক জাগালে স্মৃতি
ভীতির উদয় চিতে, কাঁপে পরাণী,
গভীর আঁধারময় কানন ভূমি।

(২)

গভীর আঁধারময় কানন ভূমি,
বিপদ সঙ্কুল হেন তবু বাখানি।
কুসুম কোমল কায় সুবাসে মলয় বায়
নেহারি লাবণ্যতায় আকুল প্রাণী
আঁধার ভেদিয়া উঠে সুষমাখানি।

(৩)

গভীর আঁধারময় কানন ভূমি,
আলোকিত করিয়াছে মূরতি খানি!
রূপের ছটায় যা'র কানন আবাস তা'র
অন্তরে উজলে যথা আকর খানি
রাখিয়া হৃদয়ে ধরি উজল মণি।

(৪)

গভীর আঁধারময় কানন ভূমি,
ভাতিছে আভায় তা'র আবাস খানি

যেমন সাঁজের দীপে আঁধার পলায় কূপে
সীমা তা'র যেথা নাই দীপভিখানি
আসে যায়, লয় রয় সেটী যখনি।

(৫)

গভীর আঁধারময় কানন ভূমি
মধুরতা পায় ধরি মাধুরী খানি
হইলে অভাব তা'র ঘোর হয় অন্ধকার
মরমে বিধঁয়ে গেল হেরে তখনি
গভীর আঁধারে হায় আকুল প্রাণী,

(৬)

গভীর আঁধারময় কানন ভূমি
সুচারু চিকণ বেশ লভি সে মণি
স্বভাবে অভাবে যা'র হের আলোক আঁধার
চাকার আকারে ফিরে, রূপের খনি
তেঁই নাম কহি তা'র কুঞ্জমণি।

(৭)

সংসার আঁধারময় কানন ভূমি
চয়ে কত বনচর আপদ খনি
সুবাসিত ফোটা ফুল সুষমার নাহি তুল
লাবণ্য কোমল কায় তাহে রমণী
সংসার-বিপিনে ফুল কুঞ্জমণি।

শ্রীনীরদকান্ত মাইতি।

তুমি।

অয়ি শ্রীবনালোক দায়িনি!
ক্লিষ্ট, জর্জ্জরিত, বিষাদ জাগরিত
জীবনে সুষুপ্তিরূপিণি!
গভীর তমসা আকুল মম জীবনে
নিশীথ প্রলয়ে ক্ষুব্ধ অম্বুধী সনে
বিহীন শান্তি মম মনে ঘন গর্জ্জনে
মম চন্দ্রালোক রূপিণি!
তুহিন সম্পাত শীত কম্পিত চিতে
ফুল আকুল বাসিত বিতান থাপিতে,
সুপ্ত কোকিল রূপী মম হৃদি গীতে
তুমি গো মলয়া রূপিণি!
পাপ ভার ক্লান্ত হৃদি—তমসা ব্যাপিত,
অনুতপ্ত, পূর্ব্বস্মৃতি বিষে জর্জ্জরিত
হেন চিতে তুমি মম পুণ্য শান্তি গীত
তুমি গো সান্ত্বনা রূপিণি!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।

কেন চাহ দেখিতে আমায়?

১

কেন গো আকুল সখে, দেখিতে আমায়
দূরে আছি, স্মৃতি তবু ভুলিনি তোমায়
জলদে, চপলা-ছবি
হেরিয়া কেন গো কবি,
গাহিছ বিষাদ-মাখা-গীত কবিতায়,—
কেন সে বারিধি-কূলে,
আপন অস্তিত্ব ভুলে,
বসে'থাক দিবা নিশি, আমারি আশায়?

২

নিশাতে তারকাচয়,
গগনে ফুটিয়া রয়,

দূর হ'তে মরি আহা কেমন দেখায়;—
দূর হ'তে রবি শশী,
সাগর-তরঙ্গে পশি'
মরি কি মাধুরী রাশি জগতে বিলায়!

৩

উদ্যানে কুসুম গুলি,
চাহে যদি মুখ তুলি;
দূর হ'তে বায় ভুলি' ভ্রমর,আশায়;—
দূর হ'তে সবি ভাল,
দূরে যদি অগ্নি জ্বাল,
অমনি সে স্নিগ্ধ আলো লাগে আসি গায়।

৪

তোমাতে আমাতে ভাই,
অধিক দূরতা নাই,
এক(ই)কপোতাক্ষ নদ উভয়েতে ধায়;
সোণার প্রকৃতি-রাণী,
তুলি দিব্য মুখ খানি,
তোমার আমার পানে এক(ই)ভাবে চায়।

৫

নীরবে চপলা-খেলা,
সাগরে শশীর মেলা,
তোমার আমার চোকে এক(ই)দেখায়,
একই তরঙ্গ কুল,
করি সুখে 'কুল কুল'
মানস-মোহন-গীতি উভয়ে শুনায়।

৬

থাক, সখে, সুখে থাক,
অভাগারে কেন ডাক,—
ব্যথিত মানস যা'র অসার চিন্তায়;—
দরিদ্রের ভগ্নালয়,
যাহার সুখের হয়;
দিবানিশিঅশ্রু যা'র বয়ান ভিজায়,—
কেন চাহ দেখিতে তাহায়?

শ্রীঅটল বিহারী দাস,

বারুই পাড়া।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পার্লামেণ্টের সাধারণ সভায় এবার যাঁহারা নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কত জন কোন ব্যবসাবলম্বী নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল;—

ব্যাঙ্কার ও ফাইন্যান্সিয়ার	২২
ব্যারিষ্টার	১১৬

মদ্য ব্যবসায়ী	২৩
সিভিল ও মাইনিং এন্‌জিনিয়ার	৪
কয়লার খনির সত্বাধিকারী ও কয়লা ব্যবসায়ী ..	১৭
কূটনীতিজ্ঞ ও রাজকর্ম্মচারী	১৭
ভূসম্পত্তির এজেণ্ট	১
কৃষিব্যবসায়ী	১৫
ভূম্যধিকারী	৩৫
লৌহ ব্যবসায়ী	১৮
শ্রমজীবিদিগের প্রতিনিধি	১১
শিল্পি ও তন্তুবায় . ..	৫২
ডাক্তার	৯
বণিক্	৪৪
বর্ত্তমান ও ভুক্ত মন্ত্রী ...	৪০
সংবাদ পত্রের সত্বাধিকারী ও সম্পাদক ...	৩৫
লর্ডদিগের ভ্রাতা ও পুত্র	৩১
মুদ্রাকর ও পুস্তকবিক্রেতা	৪
রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর ও এঞ্জিনিয়ার	৬
জাহাজ নির্ম্মাণকারী ও সত্বাধিকারী	১৮
সলিসিটার	২৪
কোম্পানির কাগজ প্রভৃতির দালাল	৭
দোকানদার ও ব্যবসাদার	১৩
শিক্ষক ও অধ্যাপক	১৩
মোট—	৬০৪

এতদ্ব্যতীত সৈনিকবিভাগের ৬৩ জন সভ্য আছেন।

দুই সমান। একব্যক্তি বাইসিকল চড়িয়া যাইতে যাইতে একজন পথিকের ঘাড়ের উপর পড়ে। উভয়েই টেরা। বাইসিকল আরোহী ক্রুদ্ধস্বরে পথিককে বলিল "তুমি কি রকম লোক হে, যে দিকে যাও সে দিকে চাও না কেন ?" পথিক উত্তর করিল "তুমিই বা কি রকম লোক, যে দিকে চাও সে দিকে যাও না কেন ?"

* * *

নূতন আবিষ্কার। শিক্ষক। বিজ্ঞানের কি অমানুষিক ক্ষমতা। সম্প্রতি মার্কিণে এডিসন এমন একটি দ্রব্যের আবিষ্কার করিয়াছেন যে তাহার সম্মুখে জোরে কথা কহিলে উহা বিকট শব্দে জ্বলিয়া উঠে। ডিনামাইট, কড্‌ডাইট, লিডাইট প্রভৃতি ইট সকল ইহার নিকট হার মানিয়াছে।

বিজ্ঞানাসক্ত বালক। আমার বোধ হয় তাহাতে মানুষের কাণের মস্‌লা আছে। এই ধরুণ না কেন আপনার কাণের কাছে আমি যদি চুপি চুপি কোনও কথা বলি আপনি বিকট শব্দে জ্বলিয়া উঠেন।

* * *

কাগজ হইতে অনেক রকম জিনিষ প্রস্তুত হইতে শুনা যায়। কিন্তু সম্প্রতি স্নানের পরেই পরিবার জন্য ব্লটিং কাগজের পোষক তৈয়ার হইতেছে। ইহাতে তোয়ালে ব্যবহার করিতে হয় না এবং স্নানান্তে শৈত্য লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

* * *

ওবাড়ির গিন্নী। হাঁগা বড়-বৌ আজকাল নিজে রান্নাকর এ'তে কি খরচ কম পড়ে ?

বড়-বৌ। তা' পড়ে বৈকি ; রাঁধুনির হাতে উনি যে রকম খেতেন এখন তা'র অর্দ্ধেক খান।

* * *

চোরের কৌশল। জর্ম্মণদেশে বিবিবেশে কোন চোর ট্রেণ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই একটি কামরায় উঠিল,সে কামরায় একটি পুরুষ বা কোন যুগল আরোহী আছেন। বিবির হাতে একগোছা সুন্দর গোলাপ ফুল। গাড়ী ছাড়িলেই বিবির হাত হইতে দুই একটি গোলাপ হঠাৎ পড়িয়াগেল। উপস্থিত পুরুষটি ভদ্রতার খাতিরে স্মিতমুখে সেটি কুড়াইয়া দিলেন। বিবি তাঁহাকে গোলাপটি প্রদান করিলেন এবং নিজে উঠিয়া যদি অপর কোন মহিলা থাকেন তাঁহারও বুকে পিন্ করিয়া দিলেন। গোলাপের আঘ্রাণে আরোহীগণ ২।১০ মিনিটের জন্য নিদ্রাভিভূতের ন্যায় অজ্ঞান থাকেন। জাগিয়া দেখেন গোলাপী বিবির সহিত টাকাকড়িও অন্তর্দ্ধান হইয়াছে।

***

আদর্শ উকিল। ডাকাত—যা' কিছু আছে সব দাও, নয় ত জান্ যা'বে।

উকিল। এই নাও, আমার যা' কিছু আছে সব দিলুম।

ডাকাত। বেশ, বেশ, এখন সবে পড়।

উকিল। তা' যাচ্ছি, তবে একটা কথা আছে। যদি তুমি এর জন্য ধরা পড়, তবে তোমায় বাঁচাবার জন্য আমায় উকিল দিও।

***

পুত্র স্কুল হইতে আসিয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, আমাদের শিক্ষক বলিয়াছেন যে মানুষের পূর্ব্বপুরুষেরা বাঁদর ছিল।" পিতা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আরে গাধা, তোর পূর্ব্বপুরুষেরা বাঁদর হইতে পারে, কিন্তু আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কখনই বাঁদর ছিলেন না।"

এটক্।

প্রয়াস ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

ELM PRESS, CALCUTTA

প্রয়াস।

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ।] ডিসেম্বর, ১৯০০ সাল। [দ্বাদশ সংখ্যা।

৺ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতা।

কাল।

বৎসর গেল, বর্ষ এল, তুমিত এলে না।
স্থির করিয়াছ কি তবে আর দেখা দিবে না?
মনে ছিল নিজ গুণে ক্রমে হইবে সদয়,
অথবা সকল ক্লেশ দূর করিবে সময়।
কোনটাইত হইল না, একি বিষম দায়!
চিরকাল কি কাঁদিতে হ'বে করি' হায় হায়'
সেটা কি কথা? কাল ভূতে করে সকল নাশ,
দিন যত যাইতেছে, বাড়িতেছে মম ত্রাস।

চিন্তা।

বিমুগ্ধ করিয়া তুমি হয়েছ বিমুখ,
আর কি দিবে না তুমি তব সঙ্গ সুখ?
দিবানিশি তুমি চিন্তা, তুমি জ্ঞান, ধ্যান,
সব কাজে, সব ক্ষণে, তুমিই প্রধান।
সর্ব্বোপরি, তবে কেন অগ্রসর নও?
সুমুখ হইয়া কেনই দুর্ম্মুখ হও?
এতদিন দেবধ্যানে হয় পরিত্রাণ,
তোমার কুহকে পড়ে যাইতেছে মান।
তোমাতেই জাত সব সুখ ও অসুখ,
তব নিয়ম যে দেখি এক মাত্র দুঃখ।
একগুণ দিয়া তুমি লও গুণ শত,
তব চিন্তা সর্ব্বগ্রাসী, আর দিব কত?
চিন্তামণি শান্তিকরে সকল কুগ্রহ,
বর্ষগতে হবে কি শেষ তব নিগ্রহ?
সময়ে যদ্যপি না হইল প্রতিকার,
এ সকল ভাবনা কেবল অপকার।

ইতিহাসের একপৃষ্ঠা।

অপুত্রক দিল্লীর সম্রাট অনঙ্গপাল যখন তাঁহার দৌহিত্র ক্রূরপ্রকৃতি রাঠোর বংশীয় নৃপতি জয়চাঁদকে বঞ্চিত করিয়া অপর দৌহিত্র অষ্টম বর্ষীয় শিশু পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন জয়চাঁদের ঈর্ষানল ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। হইবারই কথা, কারণ উভয়েই মাতামহের স্নেহ, যত্ন, ধন ইত্যাদির সমান অধিকারী। জয়চাঁদ মাতামহের এইরূপ পক্ষপাতিতা দেখিয়া মনে মনে বড়ই অপমান বোধ করিলেন, এবং দারুণ বিদ্বেষ বশতঃ পৃথ্বীরাজের অনিষ্ট চেষ্টায় আপন জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই বিদ্বেষ বহ্নিতে ভারতের যে সুখশান্তি ভস্মীভূত হইয়াছে, ইহা হইতে ভারতের যে সর্ব্বনাশ সাধন হইয়াছে, হিন্দুর যে গৌরব রবি অনন্ত কালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে, অধিক কি ভারতের যে স্বাধীনতা ধ্বজা চিরদিনের জন্য অবনত হইয়াছে সেই বিষয় এই কয়েক পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইবে।

দিল্লী ও আজমীরাধিপতি পৃথ্বীরাজ পিতামহের বিশাল রাজ্য পাইয়া সর্ব্বোত্তম উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল নৃপতিই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন কিন্তু জয়চাঁদ তাহা স্বীকার করিলেন না, তিনি ঈর্ষা ও অহঙ্কার বশতঃ আপনাকেই সর্ব্বত্র সম্রাট জনেশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। প্রতাপান্বিত পৃথ্বীরাজ কনোজপতি জয়চাঁদের নীচতা দর্শন করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, তিনি সকলি উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে ছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাহা তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

জয়চাঁদ যখন শুনিলেন মুন্দয়ের পুরহর রাজকন্যার সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তখন তিনি বহুবিধ প্ররোচনায়

দ্বারা পুরীহর নৃপতির মনে পৃথ্বীরাজের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিলেন এবং নৃপতি সে সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। এতদিন ধীর পৃথ্বীরাজ যাহা উপেক্ষা করিতেছিলেন এখন তাহাই ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইতে লাগিল। জয়চাঁদের ঈদৃশ ব্যবহারে তিনি বিশেষ ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে উচিত প্রতিশোধের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দিল্লীর সম্রাট সামান্য কনোজপতির নিকট অবমানিত হইয়া অবশেষে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। অবিলম্বেই পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের প্রতিকূলে সমর যাত্রা করিলেন। এদিকে পুরীহর নৃপতি ও আনহল বারাপত্তনের রাজা জয়চাঁদের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল; অবশেষে বীরকেশরী পৃথ্বীরাজ সমরে জয়লাভ করিলেন। জয়চাঁদ দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তাঁহার অহঙ্কারপূর্ণ হৃদয়ে অহঙ্কারের কিছুই সামঞ্জস্য হইল না। তিনি যেন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া সম্রাট উপাধি লাভের আশায় এক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। আর বোধ হয় পৃথ্বীরাজ ও তদীয় ভগ্নীপতি সমরসিংহকে অবমানিত করাও এই যজ্ঞানুষ্ঠানের অপর একটি কারণ।

সে সময়ে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ বহু যুদ্ধাদিতে জয়লাভ করিয়া অবশেষে রাজসূয় যজ্ঞ করিতেন। এই যজ্ঞ করিলেই তিনি সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। এই যজ্ঞে নৃপতিগণের উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। জয়চাঁদ যাবতীয় নৃপতিবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করিলেন কেবল পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহকে করিলেন না। যথা সময়ে সকলেই অধিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে জয়চাঁদ এই যজ্ঞে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহকে আহ্বান না করিয়া তাঁহাদের উভয়েরই দুইটী কনকনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ সভাস্থলের দ্বারে

পার্শ্বে স্থাপিত করাইয়া ছিলেন এবং মূর্ত্তিদ্বয়ের ললাট দেশে উভয়েরই নাম লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যথা সময়ে যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। জয়চাঁদ তাঁহার কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বরের নিমিত্ত উপস্থিত নৃপতিগণকে কয়েকদিবস কনোজে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। সকলই কনোজরাজের অনুরোধে কতিপয় দিবস কনোজে অবস্থান করিলেন। স্বয়ম্বরের দিন উপস্থিত হইল, সংযুক্তা একে একে সভাস্থলে উপস্থিত সমস্ত রাজগণের নিকট নীতা হইলেন, কিন্তু কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবার উপযুক্ত বোধ করিলেন না। পরিশেষে রাজকন্যা পৃথ্বীরাজের সেই হৈম প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। সভাস্থ নৃপতিগণই নিরাশায় বিষণ্ণ হইলেও রাজকন্যার এতাদৃশ পিতৃবৈরির স্বর্ণমূর্ত্তির কণ্ঠে মাল্য প্রদান দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। রাজা জয়চাঁদ কন্যার একপ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজে বিশেষ অপমানিত বোধ করিয়া কন্যাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। উপযুক্ত কন্যা নীরবে তখন সকলি সহ্য করিল। বিধাতার কটাক্ষ যাহার অদৃষ্টোপরি নিপতিত সামান্য মনুষ্য তাহার কি করিতে পারে।

মঞ্জুক্তার অদৃষ্টে আছে পৃথ্বীরাজকে সে পতিরূপে পাইবে কে তাহা খণ্ডন করিবে। পৃথ্বীরাজ যথাকালে জয়চাঁদের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান, সভাস্থলে তাঁহার ও সমরসিংহের হৈম প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন, পরে রাজকুমারীর স্বয়ম্বর এবং তাঁহার সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির কণ্ঠদেশে মঞ্জুক্তার মাল্যদান সকলই শ্রবণ করিলেন। কনোজরাজ তনয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছে বুঝিয়া সম্রাট পৃথ্বীরাজ সত্বর কনোজপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা প্রচার করিলেন। এবং অবিলম্বে সসৈন্যে জয়চাঁদের বিরুদ্ধে রণযাত্রা

করিলেন। জয়চাঁদ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন; পৃথ্বীরাজ মঞ্জুক্তাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। জয়চাঁদের বিদ্বেষ ও ক্রোধানল শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু দর্প অনেক পরিমাণে চূর্ণ হইল।

কুটিল প্রকৃতি লোকের স্বভাব পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। উরগগণ মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াও দংশন করিতে বিমুখ হয় না। জয়চাঁদ দুইবার পৃথ্বীরাজ কর্তৃক বিজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াও পুনরায় তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে অস্ত্রধারণ করিল। দিল্লীশ্বরের মঞ্জুক্তা লাভের কিছুকাল পরে নগরকোট প্রদেশের কোন এক অংশে ভূমি গর্ভে সপ্তক্রোড় পরিমিত স্বর্ণমুদ্রার আবিষ্কার হয়। সম্রাট্ তাহা গ্রহণ করিবার জন্য বাসনা করেন। জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের উক্ত মুদ্রা গ্রহণে বিঘ্নোৎপাদনার্থে পত্তন রাজের সহিত সাহাবুদ্দীন মামুদঘোরীর সহায়তা গ্রহণ করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; পৃথ্বীরাজ বিজ্ঞ ও পরাক্রান্ত বীর চিতোর অধিপতি সমর সিংহের সাহায্যে শত্রুগণকে পরাস্ত করিলেন এবং তাহার সেনাপতিকে বন্দী করিলেন। পরে সেই বহুসংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা হস্তগত করিয়া সমর সিংহের পরামর্শ মতে তিনি আপন সৈন্যগণকে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

পৃথ্বীরাজ কতিপয় বৎসর সামরিক জীবন অতিবাহিত করিয়া একে একে অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর, কিছুকাল কনোজ রাজকন্যা নবীনা মহিষী মঞ্জুক্তার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া স্বভাবতঃই রাজ্য কার্য্যে কিছু উদাসীন হইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া মুশলমানেরা ভারত আক্রমণ করিল। সমরসিংহ এই কাল সময়েও পৃথ্বীরাজের সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি তদীয় কনিষ্ঠ পুত্রের হস্তে চিতোর সমর্পণ পূর্ব্বক সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করিলেন।

ভারতের অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছিল, কে রক্ষা করিবে। বীরশ্রেষ্ঠ সমরসিংহের, অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে, তাহার অলৌকিক বাহুবল এবারে মুশলমানদিগের নিকট পরাজিত হইল। কাগ্গার নদীতীরে তিনদিন মহাসংগ্রামের পর পৃথ্বীরাজ মুশলমান করে বন্দী হইলেন। আর সমরসিংহ অসংখ্যক শত্রুসেনা নিধন করিয়া ত্রয়োদশ সহস্র সেন বহুসংখ্যক সামন্তগণ ও নিজ তনয় কল্যাণের সহ নদীতীরে শ্যামল রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার সাধের চিতোরে আর ফিরিতে হইল না।

অন্তর বিচ্ছেদোৎপন্ন কুরু পাণ্ডবের মহা সমরানল যে ভূমে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, আজি সেই ভূমে সেই গৃহ বিচ্ছেদে ভারতের সুখরবির শেষ ম্লান কিরণ যামিনীর অন্ধকারে চিরদিনের জন্য মিশাইয়া গেল। এ বিষাদ সর্ব্বরীর বুঝি আর অন্ত নাই। পাপাত্মা জয়চাঁদের আহ্বানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুশলমানগণ আসিয়া ভারতে যে অমৃতের স্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল আজি সেই অমৃত লাভের আশায় আসিয়া আর্য্যলক্ষ্মীর বিশ্রামভূমি, পাণ্ডবগণের লীলাক্ষেত্র, আর্য্যবীরগণের বিজয়স্তম্ভ-স্বরূপ সেই দিল্লী মহানগরী মুসলমানগণ অধিকার করিল। মুশলমান অধিকারের ভিত্তি দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

সাধ্বী রাজপুত রমণী চিতোর রাজমহিষী পৃথা যখন প্রিয়তম পতির মৃত্যু ও প্রাণের সহোদর পৃথ্বীরাজ শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলেন, অচিরে চিতাগ্নি মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পতি সকাশে গমন করিলেন।

শ্রীহরিহর শেঠ।

দাম্পত্য প্রণয়।

"Wives are the loves of wise mens wisdom."——Swedenborg.
"Chaste and looking up to God as the fountain of tenderness andjoy;
Quiet, yet flowing deep, as the Rhine among rivers;
Lasting, and knowing not change—it walke the with
Truth and sincerity,"—Tupper

দাম্পত্য প্রণয় কাহাকে বলে? যুবককে কি বুঝাইতে হইবে? কিম্বা এ ভাবটী বুঝাইবার নহে? যিনি বুঝিয়াছেন তিনি আনন্দলাভ করিয়াছেন, সেই পরমানন্দ একবার আস্বাদন করিলে মন প্রাণ বিশুদ্ধ হইয়া জীবের সকল অভাব দূর হইয়া যায়। কোন কি উপায় নাই যাহা দ্বারা সকলে এই ভাবটী সমভাবে আয়ত্ত করিতে পারে? আজি কলিযুগের অন্ধকারে কি দীনহীন মুমূর্ষু গৃহস্থের জীবন আলোকিত হইবে না? পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন এই জগতে সুখ কাহার? ধন, মান, গৌরব, অহংকারে কে কোথায় শান্তি পাইয়াছে? কিন্তু দেখুন, দুইটী পবিত্র প্রাণ প্রেমে ভাসিতে ভাসিতে দরিদ্র কুটীরে সন্তান সন্ততি লইয়া সংসারাশ্রম পালন করিতেছেন--বালিকাটীর অর্দ্ধ স্ফুটিত অঙ্গুলি সুকোমল চম্পক কলিকাকে লজ্জা দিতেছে অভাব তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই; তাঁহারা কি বিধাতার অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন না? তাঁহারা বিধাতার ঐশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ ও ঘৃণিত বোধে তাহার অন্বেষণ ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে লক্ষ্মী বিরাজমানা, ও চত্বরে জ্ঞানভাণ্ডার শান্তস্বরূপ তেজস্বী ভগবান্ নারায়ণ সন্তান সন্ততিকে ভগবদ্ভক্তি শিখাইতেছেন—নিষ্কাম সংসারাশ্রমে দীক্ষিত করিতেছেন; এই পবিত্র গভীর শান্তি, প্রেম হইতে উদ্ভূত হয়। ভগবদ্ভক্তি হইতে প্রেম উদ্ভূত হয়। সাম্যজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তির প্রধান ফল। সাম্যজ্ঞান হইলে জীবের প্রতি কার্য্যাকার্য্য বুঝিতে পারা যায় ও সত্যাসত্য সকল বস্তুর সারমর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। প্রেম উপলব্ধি করিতে হইলে সাম্যজ্ঞান প্রধান আবশ্যক।

প্রকৃতপক্ষে দাম্পত্য প্রণয়কেই বিবাহ বলা যায়। সামাজিক বিবাহ একটী সামাজিক রীতি মাত্র, তাহার সত্যাসত্যের জন্য সমাজ দায়ী। প্রেমিক তাহার দ্বারা বাধ্য নহেন। কিন্তু সমাজ যদি প্রেমি-কের নিকট একটী সদুপদেশ গ্রহণ করেন, তাহাতে সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল। প্রেমিক বিবাহ করেন, কিন্তু সে চর্ম্মাবৃত রক্তমাংসের বিবাহ নহে—দুইটী জলন্ত জীবন্ত পদার্থের সম্মিলন বা পূর্ণরূপে মিলন। এই মিলনের পর দুইটীকে বিভিন্ন করা যায় না; এই মিলনের পর বিচ্ছেদ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই। প্রেমিক অনন্ত আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকেন ও কেবল অদ্বিতীয় প্রেমই অনুভব করিতে থাকেন।

প্রেমিক স্ত্রী বা পুরুষ; উভয়েই সমপ্রকৃতি কিন্তু জাতি প্রভেদ বশতঃ ইঁহাদিগের প্রেম লক্ষণেরও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। সুকোমল অবোধ মমতার নাম স্ত্রী ও জ্যোতির্ম্ময় প্রচণ্ডপ্রতাপ বিচার ধর্ম্মের নাম পুরুষ। সুকোমল স্ত্রীরূপ পুষ্পকলিকা প্রচণ্ড-সূর্য্যকিরণ ব্যতিরেকে প্রস্ফুটিত হয় না ও সুকোমল স্ত্রীরূপ পুষ্পকদল ব্যতিরেকে প্রচণ্ড প্রতাপে পুরুষস্বরূপ সূর্য্যরশ্মি ও অসহ্য হইয়া উঠেন। এই দম্পতীর সহবাস হইতে অর্থাৎ দয়া ও ধর্ম্ম একত্রীভূত হইলে সংসারে আনন্দের সীমা থাকে না। স্ত্রী দয়া, পুরুষ ধর্ম্ম; এই দয়া ও ধর্ম্মের বিবাহ হইতেই দাম্পত্য প্রণয়ের উৎপত্তি হয়। এই দুইটী না থাকিলে দাম্পত্য প্রণয় ঘটিতে পারে না। যে পুরুষ স্ত্রীজাতির রূপলালসায় উন্মত্ত যে পুরুষ স্ত্রীজাতির রক্তমাংস সংশ্লিষ্ট চর্ম্মাবৃত দেহ ভিন্ন কোন গুণই দেখিতে পান না কিম্বা সেই সেই উপভোগ করিয়া আত্মাকে সুখী গণ্য করেন,—তাঁহার জন্য প্রেমমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে চিত্ত মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ রাখিতে হয়। মনোবৃত্তিগুলিকে বুদ্ধি দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া পরিষ্কৃত

করিলেও পূর্ণরূপে শান্ত ভক্তভাব ধারণ করিলে, প্রেমমন্দিরে সুখস্বচ্ছন্দ ও আয়াস উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সত্য ভগবদ্‌ভক্তি থাকিলে প্রেম অবশ্যম্ভাবী। ভগবদ্‌ভক্তি না থাকিলে দাম্পত্য প্রণয় অসম্ভব। পূর্ণ ভক্তি থাকিলে হৃদয় প্রেমপূর্ণ হয়; পার্থিব ও নৈসর্গিক সকল বস্তুতেই ভগবদ্‌ভক্তের প্রেম উথলিত হয়। ভগবদ্‌ভক্তি অসম্পূর্ণ থাকিলে, প্রেমও অসম্পূর্ণ থাকে। সুতরাং প্রেম ও ধর্ম্ম এতদুভয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ। জাতীয় ধর্ম্ম যে প্রকার জাতীয় প্রেমাসক্তি বা লক্ষণ সকল তদনুরূপ হইবে। জাতীয় ধর্ম্ম বিশুদ্ধ হইলে, জাতীয় প্রেম ও তৎসম্বন্ধীয় সংস্কার সকল বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইবে। পরমাত্মা সম্বন্ধে জাতীয় জ্ঞানের উপর, ধর্ম্মের পবিত্রতা নির্ভর করে। পরমাত্মা সম্বন্ধে জাতীয় জ্ঞান জড়ভাবাপন্ন হইলে ধর্ম্মও জড়ভাবাপন্ন হয়, সে জাতির অন্যান্য চিন্তাও জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সে জাতির দাম্পত্য প্রণয় গভীর শান্তভাবাপন্ন নহে। মানব জাতির ইতিহাস হইতে এবিষয় প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও জাতির অতি শৈশবাবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষ মধ্যে পৈশাচ ও আসুর প্রবৃত্তি প্রবল থাকে। সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ ভগবদ্‌জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত মনের চাঞ্চল্য দূর হইয়া যায়। মানবজাতি ধীর ও শান্তভাব অবলম্বন করেন। সকল জাতির অসভ্যাবস্থায় স্বার্থপরতা প্রবল থাকে। পুরুষাকার বলবান্ মনুষ্য স্ত্রীজাতিকে পীড়ন করিয়া থাকেন। ও যথেচ্ছাচারে স্বার্থ উদ্ধারে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ সেই স্বার্থপরতা নষ্ট হইয়া পুরুষজাতি উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করেন এবং স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর ব্যবহার ও উন্নত ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। মনোবৃত্তি সকল এই প্রকারে বিশুদ্ধ হইলে, পরমাত্ম-

জ্ঞানও বিশুদ্ধ হয়, এবং সকল বিষয়ের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিবার ক্ষমতা জন্মায়। এই অবস্থায় উপনীত হইলে পর মানবজাতি দর্শন শাস্ত্রে অধিকারী হয়েন এবং বিশুদ্ধ প্রেমাস্বাদনের উপযোগী হয়েন। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে বিচার ক্ষমতার অভাব বশতঃ মানব-জাতি অসার পদার্থকে সার ও সত্য বলিয়া জ্ঞান করেন স্ত্রী দেহকে স্ত্রীত্বের সার বলিয়া গণ্য করেন সুতরাং তদবস্থ জাতির বিশুদ্ধপ্রেম অসম্ভব। এতদবস্থায় দুইটী শরীরের সম্মিলনই প্রেমের চরমোৎকর্ষ বলিয়া জ্ঞান হয়, দুইটী দেহ বিচ্ছেদ সহিতে অক্ষম দুইটী অদর্শনে যন্ত্রনা ও দর্শনে নৈসর্গিক সুখ বলিয়া বিবেচনা হয়। আমরা এই অবস্থাকে সাধু নীতির চরম সীমা বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। সামান্য দুইটী দেহের আকর্ষণ ও সন্নিধানে যে প্রেমের বিশেষ উপাদান, *সে প্রেম অতি স্বল্পকালস্থায়ী হইয়া থাকে। এই প্রেমের দৃষ্টান্ত* সাহিত্যে ও কাব্যে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেমকে আমরা প্রেমপদবাচ্য করিতে লজ্জা বোধ করি। এরূপ প্রেমের দৃষ্টান্ত দিবারাত্র নয়ন গোচর হইতেছে সে গুলিকে নীচ পাশব বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করি। কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত রাজা বলিয়াই কি অসৎকে সৎপদার্থ বিবেচনা করিব—কিম্বা কালিদাস মহাকবি বলিয়াই জঘন্য পাশব বৃত্তিকে পবিত্র জ্ঞান করিব? প্রেমের দৃষ্টান্ত অতি বিরল সুতরাং সে বিষয় কবির কল্পনাও বিরল। বীর পস্থুমাস ও কোমলাঙ্গী আইমোজেনের প্রেম কতকটা পবিত্র বলিয়া বোধ হয় কিন্তু যে গভীর শান্তিপূর্ণ প্রেমের কথা আমরা বলিতেছি তাহার দৃষ্টান্ত কবির কল্পনায় পাওয়া যায় না। হিন্দুর শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু জীবনে বিরল নল ও দময়ন্তী, লক্ষ্মী ও নারায়ণ, সীতা ও রাম, চন্দ্র ও রোহিণী, সাবিত্রী ও সত্যবান্—এইসকল দৃষ্টান্ত হিন্দুর শ্রুতি-

গোচর হয় বটে কিন্তু সে সকলের তথ্য আমরা অনুসন্ধান করি না। সাবিত্রী ও সত্যবানের বিচ্ছেদ হইলে পর, যমরাজ সাবিত্রী সন্নিধানে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম গ্রহণ করিলে হিন্দু ঋষির প্রেমকল্পনা উপলব্ধি করা যায়। যমরাজ সাবিত্রী সকাশে জগৎব্রহ্মাণ্ডের নশ্বরতা প্রতিপাদন করিয়া, দাম্পত্য প্রণয় ও ভগবদ্ভক্তির সম্পূর্ণ ঐক্যতা প্রতিপাদন করেন। এই দুইটী এক পদার্থ বলিয়াই হিন্দুস্ত্রী স্বামীকে ভগবদ্জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।

প্রেম সংসারে সার; দীন অসহায়ের সামগ্রী; আত্মজ্ঞান যুক্ত প্রেমিকের কোনও দুঃখক্লেশ নাই কিন্তু আত্মজ্ঞান বিহীন হইলে কষ্টের সীমা থাকে না। সকল বস্তুই কষ্টদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয় অনেক সুখভোগের পরই বিষময় ফল সকল বৃদ্ধি পায়। আত্মজ্ঞান বিহীন হইলে প্রেমস্বভাব নষ্ট হইয়া পাশব আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও সংসার ক্লেশ পূর্ণ ও দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। এই মোহান্ধপূর্ণ অবস্থায় পুরুষ-জাতির মধ্যে ঈর্ষাদ্বেষ প্রবল থাকে ও এতৎকালে যে প্রকার সামাজ বিবাহ প্রণালী প্রচলিত থাকে তাহাকে আসুর বিবাহ বলা যায়। এতদবস্থ সমাজে পরস্ত্রীহরণ কামাচার ইত্যাদি অসদাচার বলিয়া গণ্য নহে। কিন্তু সদসদ্ বিবেকী সভ্যজাতির প্রেম এতদপেক্ষা উন্নত ভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক কারণ প্রেমচরিত্র উন্নত ভাবাপন্ন হইলে মানবের অন্যান্য স্বভাব ও সংস্কারগুলি তদ্ভাবাপন্ন হইবে। সুতরাং সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, প্রেম বা দাম্পত্য প্রণয় পবিত্র ও বিশুদ্ধ করা উচিত। যে জাতির স্বভাব প্রেমিক নহে সে জাতি কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারে না এবং সেই জাতির প্রেমনীতি অপবিত্র ও মলিন হইলেই অবনতির সূত্রপাত হইবে। বিশুদ্ধ প্রেম অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিলে, মানব তেজস্বী ও বলবান্ হয়েন। তৎ-

ফলে লক্ষ্মীদেবী সহজেই করগ্রস্ত হয়েন ও সরস্বতী দেবী অনায়াসেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন এই প্রেমই প্রাচীন কিমিয়া বিদ্যার আল্‌কা হেষ্ট এই প্রেমেই কিমীয়া বিদ্যার অধিকারীগণকে চিরায়ু দান করিয়ে থাকেন এই প্রেমের সাহায্যে তাঁহারা সামান্য বস্তুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারেন। এই মহামূল্য রতন কি সংসারের অতি উপাদেয় বস্তু নহে?

অধিকার তত্ত্ব।

আজি কালি বঙ্গীয়সমাজে অনধিকার চর্চ্চার স্রোত কিছু অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হইতেছে। অতএব এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সকল মানব সমান শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। সময়, কর্ম্ম ও ঘটনা সাপেক্ষেও আবার সকলের শক্তি সমান পরিণতি লাভ করে না। অতএব শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিভিন্নতা মানবে অবশ্যম্ভাবী। বলা বাহুল্য, হিন্দুশাস্ত্রমতে, এরূপ পার্থক্য মানবের কর্ম্মফলে আরোপিত হইতে পারে। সে কথা যাউক;—সমাজে সবল ও দুর্ব্বল, বুদ্ধিমান ও নির্ব্বোধ হৃদয়বান ও হৃদয়বিহীন মানব সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তির এইরূপ তারতম্যানুসারে মানবের কার্য্যেরও তারতম্য দেখিতে পাই। কেহবা শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত অতি সামান্য শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সাধনেও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও পরিক্লান্ত—আবার কেহবা অসুরবলে বলীয়ান হইয়া পর্ব্বত বিদারণেও সক্ষম, কেহ বা জগতের সামান্যতম ব্যাপারের রহস্যোদ্ভেদে অসমর্থ, আবার কেহবা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে অনন্ত নক্ষত্র সুরক্ষিত জগতের তথ্য অবগত হইয়া জ্ঞানমন্দিরে প্রবেশ করিতে ব্যগ্র;

কেহ বা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজনের দুঃখও হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না,—আবার কেহবা বিশ্বপ্রসারিণী সম বেদনায় প্রশান্ত হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডকে হৃদয়ে স্থান দেন; কাহারও নিকট এই বিশ্বমণ্ডল অর্থশূন্য কর্ম্মবিহীন জড়পিণ্ড, আবার কাহারও নিকট কল্পনার লীলানিকেতন, সৌন্দর্য্য হরণের নন্দনকানন ও ভাব তরঙ্গোচ্ছ্বাসিত, রত্নগর্ভ মহাসাগর। এইরূপ শক্তিভেদে মানবের কর্ম্মভেদ হইয়া থাকে। দুর্ব্বল, সবলের কর্ম্ম করিতে পারে না; নির্ব্বোধ বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করিতে অক্ষম; হৃদয়হীনের দ্বারা হৃদয়বানের কর্ম্ম সাধন হয় না। করিতে চেষ্টা করিলেই যে বিফল প্রযত্ন হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহার যতটুকু শক্তি, অর্থাৎ যে কার্য্য করিতে যাহার যতটুকু অধিকার, তাহার সেই কার্য্যই করা উচিৎ। স্বীয় অধিকার ছাড়াইয়া গেলেই পদে পদে অবমাননা, লাঞ্ছনা ও নিরাশা।

এই অধিকার তত্ত্ববোধ বড়ই কঠিন। ইহা বুঝিতে হইলে, মানবকে নিজের শক্তির পরীক্ষা করিতে হইবে। করণীয় কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিতে হইবে; এবং দেখিতে হইবে, স্বকীয় শক্তি সেই কার্য্যসাধনে সক্ষম কি না। কিন্তু আত্মপরীক্ষা বড়ই কঠিন। অভিমান ও অহঙ্কার আমাদের বৃত্তিগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। আমরা সেই জন্য বৃত্তিগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পাই না। জগতের মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যে অনেক কার্য্যে বিফলপ্রযত্ন হইয়া অধঃপতিত হইয়াছেন, সে কেবল অধিকার বোধ না থাকায়। আলেক্জাণ্ডারের অশ্রুপাত, হানিবালের পরাজয়, ও নেপোলিয়ানের কারাবাস প্রভৃতি এই কারণেই ঘটিয়াছিল।

ইহা গেল জড়জগৎ ও মানসিক জগতের কথা। ইহাছাড়া প্রকৃতি

আধ্যাত্মিক জগৎ আছে। সে জগতেও অধিকারী অনধিকারী ভেদ আছে। সে জগতেও অনধিকার চর্চায় অধঃপাত, পরাজয় ও মৃত্যু, সবই আছে। ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে সকলে পাবে না। যাহার যে পরিমিত আত্মোন্নতি হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে অধিকারী। শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধান অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান অধিকতর দুরূহ। সুতরাং এ সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্মভাবে অধিকার অনধিকার ভেদ করিতে হইবে। বালককে ন্যায়শাস্ত্রের জটিলমর্ম্ম বুঝাইতে হইলে যেমন 'ক' 'খ' হইতে আরম্ভ করিয়া উপদেশ পরম্পরা দ্বারা তাহাকে উক্ত শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণের অধিকারী করিতে হইবে, একেবারেই তাহার নিকট ন্যায়ের পুঁথি খুলিলে চলিবে না, তদ্রূপ মানবকে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইতে হইলে একেবারে তাহাকে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ" বলিলে কি ফল হইবে? অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে তাহাকে জ্ঞানমন্দিরের সোপানাবলী অতিক্রান্ত করাইয়া অবশেষে তাহার সমক্ষে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে। আধ্যাত্মিকতার অধিকার ভেদ আর্য্য ঋষিগণ ভিন্ন অপর কেহ অনুধাবন করিতে পারে নাই। তাই হিন্দু-সমাজে "গুণকর্ম্ম বিভাগে" ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ বিভাগ, তাই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিভাগ, তাই তেত্রিশ কোটী দেবতার কল্পনা, এবং ষষ্ঠীপূজা হইতে পরমব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা। অপর কোন ধর্ম্মে এমন সুনিয়ম নাই,—ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইবার এমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে এফ্ এ পড়িতে দিবে না, অথচ আবাল বৃদ্ধ বনিতাকেই নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা করিতে দিবে, ইহা বড়ই বিসদৃশ। এই নিমিত্ত প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে না; এই নিমিত্তই সমাজে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোত বহিতেছে; এই নিমিত্তই সমাজ ধর্ম্মহীন হইতেছে।

ইহা হইল সাধারণ কথা। এখন বিশেষ কথার আলোচনা করা যাউক। শারীরিক শক্তির অধিকার বোধ সকলেরই আছে; কেন না, এ বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করিলে হাতে হাতে ফল পাইতে হয়। অনেক পশুরও এ জ্ঞান আছে।

বুদ্ধির অধিকার বোধ অনেকেরই নাই। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি কতটুকু এবং সেই বিদ্যাবুদ্ধিতে কি পরিমাণ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, এ বোধ অল্পলোকেরই আছে। বিদ্যার ভান, বুদ্ধির ভান, কবিত্বের ভান, আজি কালি বড় অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহাতে সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। সাহিত্যের বাজারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই এবিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। দেখিবেন, অধিকাংশ জিনিষই গিল্টী। খাঁটী মাল আজি কালি পাওয়া দুর্লভ। আর যেখানে সস্তায় গিল্টী জিনিষের বিক্রয় হয়, সেখানে খাঁটী জিনিষের কাটতি হইতে পারে না। বঙ্গীয় সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তক, সংবাদপত্র, ও সাময়িক পত্র নিতান্ত অসার,— প্রায় সমস্তগুলিই মৌলিকতা বর্জ্জিত। অবশ্য ভাষার শৈশবাবস্থায় ইংরাজীর নিকট অনেক ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আর কেন, চিরদিন ভিক্ষা করা নীচের কার্য্য। এখন নিজের কিছু পুঁজি করা উচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারগণের দায়িত্ব বোধ ও অধিকার বোধ না থাকায়, এই শোচনীয় কুফলের উৎপত্তি হইয়াছে। শুদ্ধই হউক, বা অশুদ্ধই হউক, যিনি দু'কলম বাঙ্গলা লিখিতে পারেন, তিনিই গ্রন্থের পসরা মাথায় লইয়া সাহিত্যের বাজারে দেখা দিতেছেন। যিনি ইংরাজী ইতিহাসের অনুবাদ করিতে পারেন তিনি ঐতিহাসিক; যিনি কোনরূপে শেষ অক্ষরের মিল রাখিয়া ছন্দ লিখিতে পারেন, তিনিই কবি; আর যিনি শেষ অক্ষরের মিল রাখিতে পারেন না, অর্থাৎ যিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে

কবিতা রচনা করিতে পারেন, তিনি ত মিল্টন!" এরূপ অনধিকার চর্চ্চার ফল এই হইয়াছে যে, প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তি পুস্তক প্রণয়নে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। অসার সাহিত্যে বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ, সার গ্রন্থের স্থান হইবে কোথায়? গ্রন্থকার হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কোনও বিষয়ে কোনও পুস্তক লিখিতে হইলে, সে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহাতে বহুদিন, বহু পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায় চাই। ইংরাজী শিক্ষিত পাঠক জানেন, মিল্টন "Paradise Lost" লিখিবার জন্য প্রথম হইতে প্রস্তুত হইতেছিলেন, অবশেষে বার্দ্ধক্যে অন্ধ হইয়া, সেই অমূল্য অমর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ও এই দুর্দ্দশা। পত্র সম্পাদক হইবার জন্য কাহাকেও কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় না। হাতে দু'টাকা জমিলেই, আর কোন কাজকর্ম্ম না থাকিলেই, লোকে আজি কালি সম্পাদক হইয়া দাঁড়াইতেছে। কাজেই উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র দেশের হিতসাধনের জন্য—ব্যবসার জন্য নহে—বা অক্ষমের অনধিকার চর্চ্চার প্রশ্রয় দিবার জন্য নহে। ইংলণ্ডে সংবাদ পত্রসমূহে তথাকার রাজনীতির পরিচালনা করে, সাধারণ মত গঠিত করে। কিন্তু বাঙ্গালার সংবাদপত্রগুলির কি শোচনীয় দশা! প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তি পত্র সম্পাদক নাই বলিয়াই এই দুর্দ্দশা,—তাহার আর সন্দেহ নাই।

অনধিকারচর্চ্চা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। ধর্ম্মের সহিত হিন্দুসমাজ জড়িত। সুতরাং আধ্যাত্মিক বিষয়েও অনধিকারচর্চ্চা প্রবল ভাবে চলিতেছে। যাহার কোনও পুরুষেই কস্মিন্‌কালেও বেদ অধ্যয়ন করে নাই, সে আজ দুই পাতা সংস্কৃত

পড়িয়া বেদের গূঢ়মর্ম্ম উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইতেছে। সংস্কৃত বোধ থাকিলেই শাস্ত্রের অর্থ বোধগম্য হয় না। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ অনধিকারীকে পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রপাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অধিকারী ভেদে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বিভাগ, কিন্তু আজি কালি শূদ্রও ব্রাহ্মণের সহিত সকল বিষয়ে সমান অধিকার দাবী করিতেছে। কিন্তু কোন শূদ্রই অনধিকারচর্চ্চা করিয়া আশানুরূপ ফল পাইতেছে না। এখনও প্রকৃত শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণ; এখনও ব্রাহ্মণ বিদ্যাগৌরবে ও বুদ্ধি প্রাখর্য্যে অপরাপর বর্ণের শীর্ষস্থানীয়। অপরাপর জাতির অনধিকার চর্চ্চায় কোনও সুফল হইতেছে না। কেবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতেছে মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম বিভাগ আর নাই। এখন অনেকেই ব্রহ্মচর্য্যা না করিবাই ব্রহ্মজ্ঞানী, কেহবা ভূমিষ্ঠ হইয়াই সন্ন্যাসী। ইহা বড়ই বিড়ম্বনা বলিতে হইবে। সমাজে ও ধর্ম্মে এইরূপ অনধিকার চর্চ্চার জন্য ইউরোপীয় সভ্যতা দায়ী। ইউরোপীয় সমাজ ও ধর্ম্মে অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই। আমরা না বুঝিয়া তাহারই অনুকরণ করিতেছি। দুঃখের বিষয় দোষের অনুকরণে বাঙ্গালী যেমন কৃতী, গুণের অনুকরণে তেমন নহে। এখনও চৈতন্য হইলে সবদিক রক্ষা হয়। আত্মাভিমান পরিত্যাগ কর, অহঙ্কার বিসর্জ্জন দাও, নিজের ক্ষমতা ভাল করিয়া বুঝ, অনধিকারচর্চ্চা করিও না,—অধিকারীকে আসর ছাড়িয়া দাও—দেখিবে সকলকার্য্যেই সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইতেছে।

শ্রীধীরাজকৃষ্ণ সোম।

চন্দ্র।

সূর্য্য—যেরূপ দিবাভাগে তাহার কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করে ও উত্তাপিত করে, সেইরূপ নিশীথে চন্দ্রমার রৌপ্যসদৃশ শুভ্র উজ্জ্বল শীতল রশ্মি বসুন্ধরার অন্ধকার নাশ করে।

চন্দ্রের মাধুরী সকল কবিরই প্রশংসনীয়। চন্দ্র দেখিলে দুঃখীর দুঃখ হ্রাস হয় ও সুখীর সুখ বৃদ্ধি হয়। চন্দ্রের সৌন্দর্যের সহিত অন্য কোন স্বাভাবিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। চন্দ্র চিরদিন দেখিয়াও কখনও পুরাতন হয় না। কেবল চন্দ্রাভাবে রজনীতে নক্ষত্রতারকাখচিত নভমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন হয়।

চন্দ্র যখন অস্তমিত কিম্বা উদিত হয় তখন একটু বড় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা বস্তুতঃ নহে। পাহাড় হইতে দেখিলে, উদয় ও অস্তের সময় চন্দ্র নিকটে বলিয়া ভ্রম হয়। চন্দ্র পৃথিবী হইতে প্রায় ২৩৮০০০ দুই শত আটত্রিশ হাজার মাইল দূরে। আমরা সচারাচার চন্দ্রকে যেরূপ ভাবে দেখিতে পাই বস্তুতঃ কিন্তু উহা ঠিক সেরূপ নহে। চন্দ্র একটি শুভ্র উজ্জ্বল থালার ন্যায় প্রতীয়মান হয় কিন্তু উহা বর্ত্তুলাকার একটি কমলা লেবুর ন্যায় পদার্থ। চন্দ্র নক্ষত্রগণ অপেক্ষা অনেক ছোট হইয়াও আমাদিগের অপেক্ষাকৃত নিকটে বলিয়া বৃহৎ বোধ হয়। চন্দ্র সকল গ্রহ, উপগ্রহ অপেক্ষা আমাদিগের নিকটবর্ত্তী।

চন্দ্র পৃথিবীর সহিত তুলনায় অনেক ছোট। প্রায় উনপঞ্চাশটি চন্দ্র একত্র করিলে আমাদিগের পৃথিবীর সমান হয়। চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল।

চন্দ্র আমাদিগের একটি উপগ্রহ মাত্র। পৃথিবী ও অন্য গ্রহগণ

যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমন করে তেমন চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে।

আলোক :—সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রের নিজের আলোক নাই। সূর্য্য হইতে ইহা আলোক গ্রহণ করে। সূর্য্যালোক চন্দ্রের আলোক অপেক্ষা প্রায় ৫ ১২ লক্ষগুণ তীব্র।

বাহ্যিক আকার ও গঠন :—চন্দ্র দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে তাহার কোন অংশ অন্য অংশ হইতে অধিকতর সমুজ্জ্বল ও কোন কোন স্থলে কৃষ্ণবর্ণ রেখা সমূহ লক্ষিত হয়। এগুলিকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলে। ভাল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বুঝাযায় যে এই সকল কৃষ্ণবর্ণ স্থল সমতল ভূমি ও উজ্জ্বল স্থানগুলি পর্ব্বতশ্রেণী। আরও জানা যায় যে পূর্ব্বে চন্দ্রে পৃথিবীর ন্যায় সমুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ আগ্নেয় পর্ব্বত ছিল, এখন যেখানে সমতল ভূমি দেখা যায় পূর্ব্বে সেখানে সমুদ্র ছিল। ইহা ব্যতীত উচ্চগিরি শিখর ও আশ্চর্য্যরকম বড় বড় গুহা ও পর্ব্বত-কন্দর আছে।

চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল :—ইহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে চন্দ্রের উপর কোন প্রকার বায়বীয় পদার্থ নাই ; আর যদিও থাকে তাহা হইলে অত্যন্ত পাতলা আচ্ছাদন আছে। কারণ চন্দ্রে মেঘ দেখা যায় না, ও কোন তারা চন্দ্রের ছায়ায় আবৃত হইলে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হীত হয়। কিন্তু চন্দ্রে একেবারে যদি বায়ুমণ্ডল না থাকিত তাহা হইলে যত ইহা ঠাণ্ডা হইত ইহা বস্তুতঃ তত ঠাণ্ডা নহে।

এখন চন্দ্রে জল নাই। অতএব কোন প্রাণী জীবন ধারণ করিতে পারে না।

আমাদিগের চন্দ্র একটি, কিন্তু অনেক গ্রহের দুই চারিটির ও বেশী চন্দ্র আছে। মঙ্গলের দুইটি, বৃহস্পতির পাঁচটি, শনির আটটি, নেপচুনের একটি ও ইউরেনাসের চারিটি চন্দ্র।

চন্দ্রের গতি :—চন্দ্র পৃথিবীকে অধিশ্রয় করিয়া বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করে। চন্দ্রের পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিতে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা (নাক্ষত্রিক দিন) লাগে। কিন্তু এক পূর্ণিমা কিম্বা অমাবস্যা হইতে পর পূর্ণিমা কিম্বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত সৌর ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা সময় (মুখ্যচান্দ্র মাস)।

চন্দ্রমার্গ ও রবিমার্গের মধ্যে ব্যবধান পাঁচ অংশ এবং যে দুইটি বিন্দুতে চন্দ্রমার্গ রবিমার্গকে কর্ত্তন করিয়াছে সেই দুইটি বিন্দুকে রাহু ও কেতু কহে। চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহগণের ন্যায় মেরুদণ্ডের চতুরপার্শ্বে আবর্ত্তন করে। কিন্তু চন্দ্রের আবর্ত্তন ও প্রদক্ষিণ কাল এক বলিয়া আমরা চন্দ্রের একদিকই দেখিতে পাই অর্থাৎ চন্দ্র অক্ষদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের অক্ষদণ্ডের অবনতির নিমিত্ত কখন উত্তর কখন দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থান দেখা যায়, ইহাকে libration in latitude বলে।

যদিও চন্দ্রের আবর্ত্তন ও প্রদক্ষিণ কাল সমান তথাপি যখন চন্দ্র দ্রুতগতিতে গমন করে তখন চন্দ্রের পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম ধার অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে libration in longitued বলে। পৃথিবীর গতির নিমিত্ত দর্শকের স্থান পরিবর্ত্তন হওয়ায় দৈনিক libration হয়।

চন্দ্রমার্গ :—একটি গাড়ীর চাকার spoke এ সংলগ্ন পেনসিল দেয়ালে যেরূপ রেখা অঙ্কন করিবে, চন্দ্রমার্গ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে সেইরূপ পথে পরিভ্রমণ করে।

আমরা শীতকালে যখন দিন ছোট ও রাত্রি বড় তখন বেশী

ঊনবিংশ বৎসর অন্তর চন্দ্র, সূর্য্য কোন তারার সম্বন্ধে একস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেই জন্য ১৯ বৎসরের অগ্রের কোন পঞ্জিকা

ও এখন কার পঞ্জিকা এক রকম। ইহাকে Mytonic Cycle কহে।

চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি :—অমাবস্থার সময় চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে থাকে সুতরাং সূর্য্য চন্দ্রের যে দিক্ আলোকিত করিতেছে তাহার পশ্চাৎদিকে আমরা থাকি বলিয়া চন্দ্রকে দেখিতে পাই না।

চতুর্থী, পঞ্চমীর সময় চন্দ্রের সামান্য অংশ পশ্চিম গগনে দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তমী কিম্বা অষ্টমীর রাত্রে আমরা অর্দ্ধ চন্দ্র দেখিতে পাই। তখন চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে ব্যবধান এক সমকোণ। আরও দুই চারিদিন পরে আমরা চন্দ্রকে প্রায় পূর্ণাবস্থায় দেখিতে পাই। অমাবস্থার পঞ্চদশ দিবস পরে যখন পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থিতি করে, তখন চন্দ্রের আলোকিত অংশের সমস্তখানি আমরা দেখিতে পাই, তখনই পূর্ণচন্দ্র দেখা যায়।

পূর্ণচন্দ্রের পর কলার হ্রাস আরম্ভ হয় এবং ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায় চন্দ্রকলার নানাপ্রকার অবস্থা লক্ষিত হয়।

গ্রহণ :—দুই প্রকার, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণের বিষয় আপাততঃ বক্তব্য।

যখন পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থিতি করে এবং এক সমতলে থাকে (সম্মুখ সংযোগ কালে), অর্থাৎ পূর্ণিমার সময় যদি চন্দ্র পাতে কিম্বা উহার নিকটে থাকে তাহা হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। গ্রহণ দুই প্রকার হইতে পারে, সম্পূর্ণ ও আংশিক। যখন চন্দ্রের সমস্ত অংশই ভূচ্ছায়ায় প্রবেশ করে তখন পূর্ণ গ্রহণ হয়, আর যখন চন্দ্রের অংশ মাত্র ভূচ্ছায়ায় প্রবেশ করে তখন আংশিক গ্রহণ হয়। কিন্তু চন্দ্রাভীষচ্ছায়ায় প্রবেশ করিলে গ্রহণ হয় না, কেবল চন্দ্রের উজ্জ্বলতার হ্রাস হয়।

চন্দ্রগ্রহণ প্রায় পৃথিবীর সকল স্থানে দেখা যায় কিন্তু সূর্য্যগ্রহণ অল্পস্থান ব্যাপী হয়।

চন্দ্র যখন প্রথম ভূচ্ছায়াকে স্পর্শ করে তখন হইতে যতক্ষণ চন্দ্র ভূচ্ছায়াকে অতিক্রম না করে সেই পর্য্যন্ত গ্রহণ থাকে।

কিন্তু অনেক সময় চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হয় না কারণ সূর্য্যের বিকীর্ণিত রশ্মি চন্দ্রে পড়ে এবং তাহাকে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করে। কিন্তু ১৫৪২, ১৭৬১ ও ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের গ্রহণে চন্দ্র একেবারে দেখা যায় নাই। গ্রহণ প্রায় দুই ঘণ্টা কাল হইতে পারে।

চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার ভাঁটা হয়। বৎসরে দুইটি অপেক্ষা অল্প সূর্য্যগ্রহণ হইতে পারে না ও সাতটি অপেক্ষা অধিক গ্রহণ হইতে পারে না; চারিটি কিম্বা পাঁচটি সূর্য্যগ্রহণ ও তিনটি বা দুইটি চন্দ্রগ্রহণ।

গ্রহণের উৎপত্তি বিষয়ে অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে নানাপ্রকার আশ্চর্য্যরকম ভ্রমসঙ্কুল ধারণা আছে। অনেক জাতীয় বিশ্বাস আছে যে ইহা অমঙ্গল সূচক ও কোন অসাধারণ কারণ দ্বারা সংঘটিত হয়।

বিহারিলাল।

সারদামঙ্গলে।*

কবি বিহারিলালের শ্রেষ্ঠকাব্য "সারদমঙ্গল"এর সূচনা ১২৭৭ সনাব্দের বাসন্তী পঞ্চমী উপলক্ষে। দশবর্ষ পরে † কবি তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ রঙ্গপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু রায়কে লিখিয়াছিলেন;—

"মৈত্রী বিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতী বিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সংগীত রচনা করি। সর্ব্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা

---

*এই প্রবন্ধ পরিবর্দ্ধিত আকারে চৈতন্য লাইব্রেরী সভায় পঠিত হয়। ৭ই এপ্রিল, ১৯০০।

† সন ১২৮৮ সাল, ৪ঠা কার্ত্তিক।

হইতে, চতুর্থ কবিতা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলাম। সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্ত্তি রচনানন্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা অন্তঃকরণে কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে এই বিষাদময়ী মূর্ত্তির সহিত বিরহিত মৈত্রী প্রীতির ম্লান করুণা মূর্ত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।"

ইহাতে জানা যায় সারদামঙ্গল রচনার প্রারম্ভ সময়ে কবির অন্তরে কোনরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রচনা আরম্ভ হইলে একটী উদ্দেশ্য গৌণভাবে কবির মনে উদিত হয়, সেটী বাগ্দেবীর পূজার দিন তদীয় চরণকমলে ভক্তি ও প্রীতি উপহার সমর্পণ। এই উদ্দেশ্যে কবি প্রথমে ৭টী ভক্তি কুসুমাত্মক শ্লোক রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন। কিন্তু এই সপ্তশ্লোক কবিতার ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁহার হৃদয়ের অনেক কথা অব্যক্ত রহিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিতে লাগিল এবং শ্লোকের পর শ্লোক সংযোজিত হইয়া, ক্রমে সেই ক্ষুদ্র কবিতা একখানি অনতিবিস্তৃত পুস্তকের আকার ধারণ করিল। কবি তদীয় বন্ধু ও প্রকাশক বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে উৎকৃষ্ট কাগজ ক্রয় করাইলেন এবং পুস্তক খানির মুদ্রাঙ্কন যাহাতে অনিন্দ্যনীয় হয় তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও কবির ধ্যানের সকল অংশ গানে পর্য্যবশিত হয় নাই। বিহারিলাল বুঝিয়াছিলেন, কবির ধ্যান কত মহান এবং মানবের ভাষা কত সংকীর্ণ। তিনি বুঝিয়াছিলেন অসীম কল্পনাকে সসীম বাক্যে পরিণত করিতে হইলে ভাষার সুনির্ব্বাচন আবশ্যক, নতুবা চিত্র অসম্পূর্ণ অপরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। তিনি কাব্যের ভাষা সর্ব্বাংশে

মনঃপূত না হইলে পুস্তক প্রকাশ করিবার মানস পরিহার করিলেন। মাসের পর মাস অতীত হইল, পুস্তক মুদ্রিত হইল না, কাগজ কীটদষ্ট ও মলিন হইয়া নষ্ট হইয়া গেল। পরে ১২৮১ সালের আর্য্যদর্শন পত্রে কবি তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রথমে সাধারণ্যে প্রকাশিত করিলেন এবং পাঁচ বৎসর পরে ১২৮৬ সালে উহাকে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন। সারদামঙ্গলের ভাষার কারুকার্য্য রচনায় যে কালক্ষেপ হইয়াছিল ঐ কাব্য পাঠে তাহার পরিমাণ পাওয়া যায় না, মনে হয় কোন এক দৈব মুহূর্ত্তে উহা রচিত হইয়াছে, কারণ বিহারিলাল কমনীয় শিল্পের একটী শ্রেষ্ঠ নিয়ম* অবলম্বনে কার্য্য করিতেন, তিনি যত্ন ও শ্রমের লক্ষণ যত্ন ও শ্রমে বিলুপ্ত করিয়াছেন।

"সারদামঙ্গল"এর অসাধারণ কবিত্ব কাব্যরসজ্ঞ ও কবিগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল, বিহারিলাল তাঁহাদের নিকট হইতে ব্যক্তিগত আদর সম্মান ও উপাসনা যথেষ্ট পাইয়াছিলেন, বঙ্গের অনেক উদীয়মান ও অনুগত কবি তাঁহাকে গুরু সম্বোধন করিয়াছিলেন ও শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট সারদামঙ্গলের কবি সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হয়েন নাই। কবির জীবিতকালে সাতটী মাত্র প্রকাশ্যভাবে প্রশংসাবাদের কথা আমরা অবগত আছি। ১মটী তৃতীয় বর্ষের ভারতী পত্রে, ২য়টী ইং ১৮৮০।১ সালের বঙ্গরাজ্য শাসন বিবরণীতে, † ৩য়টা কলিকাতা রিবিউ পত্রে, ৪র্থ টী ৺ রাজ-

---

* "Work should efface footsteps of work" Mr. Whistler (a celebrated modern painter)

† "*Sarada Mangala* is a lyrical effusion of a kind which marks its author Babu Bihari Lala Chakrabarti as one of the best of Bengali poets." Report on the Administration of Bengal 1880-81, page 457.

নারায়ণ বসু মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়, একটী পরলোক-
গত কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণা" পত্রিকায়, ৬ষ্টটী পণ্ডিতবর হর প্রসাদ
শাস্ত্রী মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে সাবিত্রী লাইব্রেরীতে পঠিত বক্তৃতায়
এবং ৭মটী প্রথম বর্ষের সাহিত্য পত্রে, প্রকাশিত হয়। এই প্রশংসা-
বাদের দুইটী ব্যতীত অপরগুলি কবির শ্রুতিগোচর হইয়াছিল বলিয়া
বোধ হয় না। কবির মৃত্যুর পর, ১৩০১ সালে বঙ্গের প্রায় সমস্ত
মাসিক পত্রে সারদামঙ্গলের জয়ধ্বনি বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু
সে ধ্বনিও কাব্যরসজ্ঞ দিগের,—রবীন্দ্র বাবু, সুকবি অক্ষয়কুমার
বড়াল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি
কবির গুণগ্রাহী ও ভক্তবৃন্দের কণ্ঠহইতে সে ধ্বনি বিনির্গত হইয়াছিল;
বঙ্গীয় জনসাধারণ সে স্তুতিধ্বনিতে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া বোধ
হয় না। কবি নিজে বুঝিয়াছিলেন যে সারদামঙ্গল সাধারণ পাঠকের
নিকট আদর পায় নাই এবং তিনি ঐ পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিবার
প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই। সারদামঙ্গল বিংশতি বর্ষ প্রথম
সংস্করণের অজ্ঞাত বাস করিতেছিল।

সারদামঙ্গল কাব্য যে কি কারণে সাধারণ পাঠকের প্রীতি ও
সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ
করিয়াছি। সারদামঙ্গল নাটকোচিত ঘটনা মূলক কাব্য নহে।
সারদামঙ্গল কৌতূহল উদ্রিক্ত করে না, ইহাতে ঔপন্যাসিকত্ব নাই,
চরিত্র সৃষ্টি নাই, বীররসের অবতারনা, রণঘোষণার ভেরীনিনাদ নাই।
যে কাব্যে এই সকল মুখরোচক ও হৃদয়গ্রাহী উপকরণের অভাব
সে কাব্য যে সর্ব্বসাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে এরূপ আশা করা যায়
না। "মেঘনাদ বধ" "বৃত্র সংহার" বা "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যের
আকর্ষণী শক্তি পাঠক মাত্রেই কিছু না কিছু অনুভব করেন; কিন্তু

কবিত্ব রসাস্বাদ করিতে অসমর্থ তিনি গল্পে আকৃষ্ট হয়েন, বক্তৃতার গুরুগম্ভীর আবৃত্তি করেন।

যে আলেখ্য ফলকে উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশে মোহন নরনারী বা ভীষণ শ্বাপদ মূর্ত্তি, সুরম্য প্রসাদ বা ভগ্নদুর্গ, নগনদী তরুলতা সমাকীর্ণ প্রকৃতির নয়নাভিরাম শোভা বা তিমির ঝঞ্ঝাময় ভ্রুকুটী রঞ্জিত থাকে সে আলেখ্যের দিকে দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যে চিত্রপটে কেবলমাত্র নির্মেঘ আকাশতলে সাগরের সচঞ্চল নীলাম্বুরাশি বা বিস্তীর্ণ প্রান্তরোপরি বিমলনভে কয়েক খণ্ড বর্ণবৈচিত্র্যময় মেঘের খেলা অঙ্কিত থাকে সে চিত্রের দিকে কয়জন দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবা থাকে? আকাশ ও বারিধির সঙ্গমসীমায় বা মেঘখণ্ডের প্রান্তদেশে চিত্রকর অমর তুলিকার কোমলতম স্পর্শে স্বপ্নসুন্দর অনুজ্জ্বল বর্ণরাগে যে দূরদূরান্তর হইতে দিব্যালোকের অস্তিত্বের আভাস দিতেছে তাহা কেবল শিক্ষিত কলারসিক সৌন্দর্য্যদর্শী ভাবুক দর্শকের নয়ন পথে পড়িবে। চিত্র-রাজ্যে শেষোক্ত আলেখ্য যে শ্রেণীর কাব্য জগতে "সারদামঙ্গল" সেই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। সারদামঙ্গল বুঝিতে হইলে একটু ভাবুকত্বের প্রয়োজন সুতরাং সারদামঙ্গলের পাঠক সংখ্যার একটী সীমা আছে। আবার এই কাব্যানুরাগী ভাবুকগণের মধ্যে সকলেই যে সারদামঙ্গলের কবিত্ব সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিবেন এরূপ বোধ হয় না। অনেকে সঙ্গীত ভাল বাসেন, কিন্তু তাঁহাদের কর্ণে সেতারী বীণ্‌কারের মিড় মোচড়াদি কারুকার্য্য প্রবেশ করে না, তাঁহারা গানের 'কর্ত্তব' বুঝেন না; একই কথার পৌনপুনিক ভাবে-সুরলয়ে আবৃত্তি তাঁহাদের অন্তরে বিরক্তি উৎপাদন করে, প্রত্যেক বারই যে গায়ক কোমলাদপি কোমল সুরবৈচিত্র্য মূর্চ্ছনা উৎপাদন করিতেছে, বীণের একটী পরতে অঙ্গুলি

রাখিয়াই যে বীণ্‌কার সুরের সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিভিন্ন ভঙ্গীধ্বনিত করিতেছে, ইহা বক্ষ্যমান সঙ্গীতরসজ্ঞ অনুভব করেন না। তুল্যরূপ কারণে কোন কোন কবিতানুরাগীর অন্তরে সারদামঙ্গল বৈচিত্র্যবিহীন—'একঘেয়ে' বলিয়া বোধ হয়।

কেহ বা বলেন সারদামঙ্গল কাব্যে পুণ্যের জয়, পাপের শাস্তি; প্রভৃতি কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষা নাই, সারদামঙ্গল স্বাধীনতালিপ্সা স্বদেশহিতৈষীতা প্রভৃতি কোন মহৎবাসনা উদ্দীপিত করে না সুতরাং সারদামঙ্গল পাঠে ফল কি? ইত্যাকার প্রশ্ন উত্থাপিত করা, আর শিশিরস্নাত বালার্ক কিরণ-মণ্ডিত শ্যামল-কুঞ্জশোভন সদ্যবিকশিত সুরভি গোলাপ দর্শনে আমাদের উদরপূর্ত্তি হয় না সুতরাং তাহাতে লাভ কি,—এইরূপ তর্কের অবতারণা করা তুল্যমূল্য বলিয়া বোধ হয়। সমালোচকগণ বিস্মৃত হয়েন যে কাব্য প্রসাধণ কলার অধীভূক্ত। প্রসাধণ কলার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, যে সুন্দর সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন, যে সুন্দর সম্বন্ধে দেশ কাল ভেদে মানবের মত পার্থক্য নাই, যে সুন্দর মানবের সঙ্কীর্ণ রুচি বা নীতির সীমাবদ্ধ হইয়া উপভোগ্য করিতে হয় না সেই চিরসুন্দরের অগণ্য বিকাশের কোন একটীকে মানবের শ্রুতি বা দৃষ্টি বা অন্তর গোচর করিতে পারিলেই ললিত কলার চরমোদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়; সুন্দরের অনুভূতি মানব মনে মহত্ত্ব আনিয়া দেয়,—কবি, গায়ক, চিত্রকর বা ভাস্করের নিকট অপর কোন শিক্ষা প্রত্যাশা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এ সত্য সাধারণ পাঠকে হৃদয়ঙ্গম করেন না।

এই সকল কারণে সারদামঙ্গল কাব্যের গুণগ্রাহীদিগের সংখ্যা অতি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। সারদামঙ্গল যে কখন সর্ব্বসাধারণের—অরসিকের নিকটও আদৃত হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে

সারদামঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সময়ের তুলনায় বর্ত্তমান কাল ঐ কাব্য পরিচিত ও আদৃত হইবার পক্ষে কিছু অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। সে সময়ে বীররসের আদর কিছু বেশী ছিল, পারগ অপারগ সকল কবিই তখন মহাকাব্য লিখিতে প্রয়াসী হইতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গীতি কবিতার আদর বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং সেই কবিতায় অন্যরস অপেক্ষা করুণরসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

"সারদামঙ্গল"এর একটী বিশেষত্ব পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে ইহা এই কাব্যের ভাষার সূক্ষ্ম সুকুমার শিল্প নৈপুণ্য। শব্দকুশলী কবির বাক্য যোজনা এতই শ্রুতিমধুর, এতই উপযোগী, ভাবের সহিত স্বরের এতই সুললিত সংমিশ্রণ ও তন্ময়তা, যে সারদামঙ্গল কাব্যের কোনস্থলে শব্দ পরিবর্ত্তনে উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এই মধুর শব্দ বিন্যাসের সহিত কমনীয় ছন্দের চারু দোলে গায়ক কবি তাহার কবিতায় একপ সঙ্গীতধারা ঢালিয়াছেন, যাহা বঙ্গীয় কাব্য জগতে অতুলনীয় এবং বোধ হয় অনুকরণাতীত। কোন স্থলে কবির দেববীণা, কুসুমকোমলাঙ্গুলির মোলায়েম স্পর্শে, বেহাগের আবেশময়ী স্বরলহরী লীলায় তনু অলসিত করে। যেন মধুর চন্দ্রমাশালিনী রজনীতে—

ভাগিরথী বুকে ভাসি ভাসি সুখে
চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর।
আলু থালু কেশ, আলু থালু বেশ,
ঘুমায় কামিনী রূপসী রুচির।

আবার কখনও সেই স্বভাবকোমল অঙ্গুলি, তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির বিভীষিকাময় ভ্রুকুঞ্চনে সন্ত্রস্ত হইয়া অশনি কঠোর আঘাতে বীণার সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলিকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে—

"ভাবিতে পারিনে আর ! অন্ধকার অন্ধকার,
ঝটিকার ঘূর্ণী ঘোরে মাথার ভিতর ,
তরঙ্গিয়া রক্তরাশি নাকে মুখে চোকে আসি,
বেগে যেন ভেঙে ফেলে , ধর ধর ধর ;—"

স্বরমালার সমস্ত পরতই কবির আয়ত্তাধীন রচনার সকল রহস্য-ভঙ্গীই কবির সুপরিজ্ঞাত এবং অভিধানের বিশাল পরিভাষা কবির লেখনী অগ্রে। সারদামঙ্গলে যে মুরলীমধুর সঙ্গীতময়, সুশ্লিষ্ট শব্দাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা কবির উক্ত ক্ষমতার প্রকৃষ্টরূপে পরিচয় দান করে। এই কাব্য হইতে শ্রুতিকঠোর শব্দ যেরূপ নিপুণ নির্ব্বাচনে পরিত্যক্ত হইয়াছে সেইরূপ শব্দের গ্রাম্যতা দোষও স্থান পায় নাই।

সারদামঙ্গলের কতকগুলি বাক্য, গ্রাম্য অভিধানান্তর্গত বলিয়া প্রথম পাঠের সময় পাঠকের বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহা বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষা, ঐসকল শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ দ্বিতীয় শব্দে বঙ্গভাষায় নাই। উহারা কবির প্রতিভায় পরিচায়ক এবং কাব্যের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক। অন্তর্দাহের তীব্র যাতনায় অধীর হইয়া কবি বলিয়াছেন—

"পাঁজর ঝাঁঝর মোর দাঁড়াই কোথায়।"

খরতর রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে পিপাসা কাতর হইয়া।

এবং "ধুঁকিয়ে হরিণগুলি চলে ধীরে ধীরে।"

"নিঝুম নীরব সব গিরি তরু লতা।"

দাবানলের দিগদাহে।

"দিগঙ্গনাগণ যেন আতঙ্কে আড়ষ্ট হেন।"

কবি বলিয়াছেন—

"এত যে যন্ত্রণা জ্বালা, অবমান অবহেলা,
তবু কেন প্রাণ টানে, কি করি, কি করি"

উপরোক্ত পংক্তিগুলিতে "ঝাঁঝর" "ধুঁকিয়ে" "নিঝুম" "আড়ষ্ট" "ও টানে" কথাগুলির উপযোগীতা দেখিবেন।

বিহারিলাল বাল্যকাল হইতে অর্থ ও স্বরের একত্ব বোধক(onomatopoetic) শব্দ ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন। সারদামঙ্গলেও দুই এক স্থলে ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—

"বোঁ বোঁ বোঁবোঁ চর্কী লোটে" ইত্যাদি।

কেহ কেহ বলেন ইহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য হানি করা হইয়াছে; সুবিজ্ঞ সমালোচক John Morley, কবিতায় এরূপ শব্দ ব্যবহারকে কবির অশোভন খেয়াল (grotesque caprices) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।* বিহারিলাল বলিতেন যে ঐ সকল স্থলে অন্য বাক্য প্রয়োগ করিলে ভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিত এবং কবির স্বপক্ষ মতাবলম্বী লোকেরও অভাব নাই। পরন্তু ঐরূপ বাক্যের প্রয়োগও সারদামঙ্গলে এত অল্পই আছে যে তাহা উল্লেখ যোগ্য নহে।

সারদামঙ্গলে শব্দ যোজনার আর একটী গুণ সাধারণ পাঠকের ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটী ছন্দের মিল। কাব্যের মধ্যে একটীও অধম শ্রেণার মিল নাই এবং মিলের অনুরোধে কোথাও ভাব প্রতিহত হইয়া কবির ভাষা দৈন্য প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

সারদামঙ্গল কাব্য প্রকৃতি বর্ণনা বহুল নহে। বিহারিলাল স্বভাবের সহিত চিরজীবন অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত থাকিয়া তাহার খুটিনাটি বর্ণনায় বিশেষত্ব লাভ করেন নাই এবং তিনি জড়জগতের সমস্ত পদার্থই

* On "the Ring and the Book"—J Morley's Studies in Literature.

প্রাণময় ভাবিতেন এরূপ বোধ হয় না! কিন্তু বিহারিলাল প্রকৃতির প্রিয় ও হৃদয়বান উপাসক ছিলেন। সঙ্গীতশতক আলোচনায় সময় একথার উল্লেখ করিয়াছি। সারদামঙ্গল কাব্যের স্থলে স্থলে এই উক্তির সমর্থন করে। কোনও সমালোচক সারদামঙ্গলের হিমালয় বর্ণনার সহিত বায়রণের অ্যাল্‌পস্ (Alps) বর্ণনার তুলনা করিয়াছেন এবং কেহবা বিহারিলালের হিমালয় বর্ণনা কালিদাসের হিমালয় বর্ণনা হইতে উৎকৃষ্টতর বিবেচনা করেন। তুলনা না করিয়া, একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে বিহারিলাল সুনিপুণ তুলিকার কয়েকটী মাত্র রেখা পাতে, তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গ মহাকার শৈলসম্রাটের যে বিশাল গম্ভীর আলেখ্য পাঠকের কল্পনা চক্ষে আনয়ন করিয়াছেন তাহার সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টী পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃতির বিরাট অঙ্গ বর্ণনায় বিহারিলাল জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সহিত একাসন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত কিনা।

অসীম নীবব নয়, ও—ই গিরি হিমালয়!
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি!
ব্যেপে দিগ্ দিগন্তর, তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।
বিশ্ব যেন ফেলে পাছে কি এক দাঁড়ায়ে আছে!
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার।
কি এক মহান্ মূর্ত্তি কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার।
পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম, তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে;
সমুখে সাগরাম্বরা ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

সারদামঙ্গল কাব্যে যে কয়টী গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে সে গুলি অতি সুন্দর অতি মধুর। শেষ গানটী ইতিপূর্ব্বে কবির পত্নী প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছি, এস্থলে নির্ব্বাচন না করিয়া প্রথম গানটী উদ্ধৃত করিলাম—

উপহার।

নয়ন-অমৃত রাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন জুড়ান ধন, হৃদি ফুল হার!
মধুর মুরতি তব ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোরে,
এজনমে ভুলিতেরে পারিবনা আর।
তবুও ভুলিতে হবে, কি লয়ে পরাণ রবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারেবার
কুসুম কানন মন কেনরে বিজন বন,
এমন পুর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার!
হে চন্দ্রমা কার দুঃখে, কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে!
অয়ি দিগঙ্গনে কেন কর হাহাকার।
হয়তো হলনা দেখা, এ লেখাই শেষ লেখা,
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি স্নেহ উপহার,
ধর ধর স্নেহ উপহার!

এই উপহার কাহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই কথা অবগত হইবার জন্ত অনেকে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, কিন্তু সে রহস্য উদ্ঘাটিত হইবার এখনও সময় আসে নাই। তবে একটী সাধারণ ভ্রম নিরাকরণের জন্য এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে উপহারটী কবি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশ্যে লিখেন নাই।

সারদামঙ্গল করুণরসপ্রধান কাব্য। করুণরসের অভিব্যক্তিতে বিহারিলাল অধুনাতন কালের বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া কাব্যরসজ্ঞদিগের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বিহারিলালকে "দুঃখের কবি" উপাধি দিয়াছিলেন। সারদামঙ্গলের পত্রে পত্রে কবির এই বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে। বিহারিলাল জীবনে বড়ই অকপট ও স্পষ্টভাষী ছিলেন, তিনি মনে যাহা ভাবিতেন মুখে ঠিক্ তাহাই বলিতেন। সুতরাং তাঁহার কথা লোকের প্রাণে গিয়া লাগিত। বিহারিলালের রচনাও তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ। তাঁহার বেদনাময় গীতোচ্ছ্বাস অন্তরের অন্তস্তল হইতে উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার তপ্তশ্বাস আমাদের মর্ম্মতলে যাইয়া আঘাত করে।

কাব্যের ভাষা ভাব ও ছন্দ একই শক্তির বিকাশ—অভেদাত্মা হইলেও সময়ে সময়ে সেগুলি স্বতন্ত্র ভাবে পাঠকের তৃপ্তি সম্পাদন করে সুতরাং সেগুলি বিভিন্নভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। এইরূপ বিশ্লেষিত ভাবে ধরিলে, প্রাগুক্ত বিষয়গুলি সারদামঙ্গল কাব্যের বাহ্য অবয়বের কথা, অঙ্গরাগের কথা; কিন্তু এই কাব্যের আভ্যন্তরীণ বস্তুর, তাহার প্রাণের কথা কি করিয়া বলিব, সে সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় প্রকাশ করা যায় না। সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে কাব্যকলানুরাগী পাঠকের একটু সাধনার আবশ্যক; যে সাধনার বলে কবি অনন্তপথবিস্তীর্ণ স্বর্গ-সীমন্ত দেশোন্নত সোপানের উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই সাধনার সহস্রাংশের একাংশ হইলেই হইবে; সেই সোপানের প্রথম স্তরটী অতিক্রম করিলেই হইবে। একবার কর্ম্মকাণ্ডময় বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্দিকে দৃষ্টি সন্নিবেশিত করিয়া, কবির প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া কাব্য

খানি পাঠ করিবেন, তাহা হইলে পাঠকের হস্তে কবি সোণার কাটি অর্পণ করিবেন, দেখিবেন সুপ্ত রাজপুত্র রাজকন্যা সঞ্জীবিত হইয়াছে, পরীরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত। কিন্তু বৈয়াকবণিকের, আলঙ্কারিকেব পৃথিবীর আয়সনিগড়াবদ্ধ সঙ্কীর্ণপ্রাণ সমালোচকেব তুলাদণ্ডে সৌন্দর্য্য মাপিতে প্রয়াস পাইলেই পাঠক কবির প্রদত্ত সোণাব কাটিটী হারাইবেন, দেখিবেন, সারদামঙ্গল একখানি সুমিষ্ট কবিতা পুস্তক মাত্র, একজন উন্মত্তের প্রলাপ বুঝিবা।

কেহ যেন না মনে করেন বিহারিলালের রচনা শেলি, কীট্‌স্ প্রভৃতি কবিগণের কোন কোন কবিতাব ন্যায় স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, সেইজন্য দুরূহ। সত্য বটে বিহরিলালের কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস শতমুখে, নানা ভঙ্গিতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও তাঁহার ভাব নিজ ভাবে প্রপীড়িত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয নাই, কোথাও তাঁহাব কল্পনারাজ্যেব প্রধান মূর্ত্তিকে অনুচরবর্গ জনতাকোলাহলে নিষ্পেষিত করে নাই, কোথাও একটী ভাবের অসময়ে প্রাবল্য হেতু অন্যটীর অকাল মৃত্যু ঘটে নাই। সুতবাং কবিতাকাননেব ঘন কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রদেশে বিপর্য্যস্ত হইবাব আশঙ্কা বিহারিলালের কাব্যে নাই। যিনি একবার কবির প্রাণে প্রাণ ঢালিবেন, কবি তাঁহাকে হস্ত ধারণ করিয়া সাদরে পথ প্রদর্শন করিবেন, পথভ্রান্ত হইবার কোন আশঙ্কাই তাঁহার থাকিবে না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শ্রেণীর কবিবা বৈচিত্র্যময় মানব চরিত্রের আলেখ্য প্রদর্শন করিয়া জগৎকে বিমোহিত করিয়াছেন, অথবা ঘটনাবহুল বিরাট কল্পনাময় মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া জগতীতলে অমরত্বলাভ করিয়াছেন, বিহারিলাল সে শ্রেণীর কবি নহেন। কিন্তু আর এক শ্রেণীর কবি আছেন, যাঁহাদের গায়ক কবি বলে। পাপিয়া

কেয়েলার বসন্তপ্রভাতী গানের মত, ইহাদের স্বভাবজ গান জগৎকে মাতাইয়া তোলে, সে গান মর্ত্তলোক ছাড়িয়া মানবকে স্বর্গের উর্দ্ধতম দেশে লইয়া যায়, সে গানে মলিন মৃত্তিকার—পৃথিবীর কথা নাই, তাহা কঠিন স্পর্শ সহে না। ঘটনা বা চরিত্র সৃষ্টি, উপদেশ বা উত্তেজনা গদ্যে হইতে পারে, কিন্তু গায়ক কবিদিগের গান কবিতা ভিন্ন আর কিছুতে হয় না। জগতের সেই গায়ক কবিদিগের মধ্যে বিহারিলাল একজন অগ্রগণ্য। কবির যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মার্কিন সমালোচক এমার্সন্, * মহাকবি মিল্টনকে, এমন কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের কবিগুরু হোমারকেও হৃদয়াসনে বসাইতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিলেন, সারদামঙ্গলের কবি বিহারিলাল সেই সুউচ্চাদর্শের অন্তর্ভূত হইবার প্রকৃষ্টরূপে উপযুক্ত। বিহারিলালের কবিতা সংক্রামক তন্ময়তাময়ী, ঐন্দ্রজালিক শক্তিশালিনী, অপার আনন্দাবেশ সঞ্চারিণী।

বাল্যকাল হইতে যে ধ্যানযোগ শিক্ষা করিবার জন্য বিহারিলাল ব্যাকুল হইয়াছিলেন, যে স্বপ্নশক্তি, তাঁহারই বলিয়া প্রতিরজনীর অন্ধকার কবিকে আশ্বাস দিতেছিল, সেই যোগ, সেই শক্তি সারদা-মঙ্গল রচনার সময় কবির আয়ত্বাধীন হইযাছিল। এতদিন কে যেন তাঁহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ডাকিতেছিল, কি যেন সুস্বর তাঁহার কর্ণে বাজিতে ছিল, তিনি কি যেন একটী ছায়াময়ী সৌন্দর্য্যমূর্ত্তির পশ্চাতে ছুটিতে ছিলেন। সে মূর্ত্তিও চঞ্চল পদে আলেয়ার ন্যায়

---

* "Neither could I aid myself to fix the idea of the poet, by reading now and then in Chamer's collection of five centuries of English poets. These are wits more thar poets, though there have been poets among them. But when we adhere to the ideal of the poet, we have our difficulties even with Milton and Homer. Milton is too literary and Homer too literal and historical."...Emersion's essay on Poet.

কবিকে ধরা দেয় নাই। কবি অপদেবতাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় অস্থির হইয়াছিলেন ; এবং তাঁহার মনের আকুলতা কতই কবিতারূপে বিজনে আঁধারে তাঁহার মুখ হইতে নিসৃতঃ হইতেছিল, তিনি কতকি পরিচিত, সাধারণ কথাও বলিতে ছিলেন। এইরূপ সাধারণ কথা বলিতে বলিতে, পরিচিত গান গাহিতে গাহিতে কবি একদিন এমন কথা বলিয়া ফেলিলেন যাহা মৌলিক এবং যাহার সৌন্দর্য্যে কবি নিজেই আত্মহারা হইলেন, এমন গান গাহিলেন যাহার অমিয় রাগিণী গায়ক ও শ্রোতা উভয়কেই মুগ্ধ করিল। বিহারিলালের নিজের কথায়, তখন—

কবির প্রাণেতে পশি, আচম্বিতে কে রূপসী,
বীণা করে খেলা করে হসিত বয়ানে,
অলস অপাঙ্গে চায় কবি নিজে মোহ যায়,
জগৎ জাগিয়া উঠে এক মাত্র গানে।

"সারদামঙ্গল" বিহারিলালের সেই গান !

বিহারিলাল "সারদামঙ্গল" কাব্যকে সঙ্গীত বলিতেন। বস্তুতঃই সারদামঙ্গল সঙ্গীত, মধুময়, রহস্যময়, অনন্ত সুষমাময় সঙ্গীত। মানব মনের উপর প্রকৃত সঙ্গীতের যে আধিপত্য সারদামঙ্গলেরও তাই। গান যেমন কি এক অনির্ব্বচনীয় অতল গভীর ভাষায় আমাদের প্রাণ মন উদ্বেলিত করে, এবং অসীমের প্রান্তদেশে লইয়া গিয়া ক্ষণেকের জন্য আমাদিগকে তাঁহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করায়, সারদামঙ্গলও ঠিক্ সেইরূপ করে। সারদামঙ্গলের কেবল মাত্র ভাষা গানের নহে, ইহার কল্পনা, ইহার অভিব্যক্তি ইহার অস্থিমজ্জা, ইহার প্রাণ সমস্তই সঙ্গীতময়। কার্লাইল বলিয়াছিলেন "দান্তের দিভাইনা কমিডিয়া একটী প্রকৃত সঙ্গীত", এবং আরও বলিয়াছিলেন "ইহাপেক্ষা দান্তের উচ্চতর

প্রশংসা আর কিছু হইতে পারে না।" কবিতা এবং গান উভয়ে অভেদাত্মা, যাহা গীত নামের অযোগ্য তাহা "রসাত্মক বাক্য" হইলেও কবিতাই নহে। বিহারিলালের "সারদামঙ্গল"ও সঙ্গীত, সঙ্গীতময় জীবনের একটী অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস, সুস্বরময় আত্মার একটী অনিরুদ্ধ অভিব্যক্তি। গান যত কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহান্ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই অর্থে সারদামঙ্গল একটী গান। ইহাপেক্ষা উচ্চতর প্রশংসা সারদামঙ্গলের নাই, এবং কোন কবিতারই হইতে পারে না।

সারদামঙ্গলে কবি সারদার আরাধনা করিয়াছেন। সারদা আর্য্য ঋষিগণের বীণাপানি, ইনি পাশ্চাত্য কবিদিগের Muse, ইনি কাব্যজননী, সঙ্গীতকলা মূর্ত্তিমতী। বাল্মীকি, হোমার, মিল্টন, মধুসূদন, সকল কবিগণই ইঁহার প্রসাদ লাভ করিবার জন্য আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাগ্দেবী অর্চ্চনা নিজ নিজ কবিত্ব স্ফূর্ত্তির জন্য— কোন মহাকাব্য রচনায় সহায়তা লাভের জন্য, কিন্তু বিহারিলালের আরাধনা বাগ্দেবীর সহায়তা লাভের জন্য নহে, মূর্ত্তিমতী তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য, অন্তরের অন্তরতমদেশে তাঁহাকে রাজরাজেশ্বরী রূপে অধিষ্ঠান করাইবার জন্য। বিহারিলালের সারদা কেবলমাত্র কবিতা ও সঙ্গীত কলা সৃষ্টিদাত্রী নহেন, ইনি বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্য ও প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি ইনি জগন্মাতা। সারদাকে বিহারিলাল প্রথমে কবিগণের চিরন্তন প্রথামত মাতৃভাবে ডাকিয়াছেন, পরে কাব্যগুরুদিগের আয়স শৃঙ্খল খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, কখন ভগ্নী, কখন বা কন্যা, এবং পরিশেষে প্রণয়িণী ভাবে আহ্বান করিয়াছেন এবং প্রসন্নময়ী প্রেমময়ী রূপেই ভক্তের হৃদয়াসন অধিকার করিয়াছিলেন। বিহারিলাল ভক্তি ছড়িয়া প্রেমকে অবলম্বন করিয়াছিলেন—ভালই করিয়াছিলেন। ভক্তি দূরের বস্তু প্রেম নিকটের। "বিহারিলাল

আরাধ্যাকে মস্তক হইতে নামাইয়া হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন—ভালই করিয়াছিলেন—প্রকৃত সাধকের, প্রকৃত প্রেমিকের পরিচয় দিয়াছিলেন। বিহারিলাল আরাধ্য বস্তুকে স্ত্রীমূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন ; ঠিক্‌ই দেখিয়াছিলেন। যদি জগতের কোন পদার্থে শিবসুন্দরের ছায়া একাধারে প্রতিফলিত থাকে তাহা প্রেম-করুণা-সুষমা-কোমলতাময়ী রমণী মূর্ত্তিতে। বিহারিলাল সুন্দরের উপাসনা করিয়াছিলেন। সুন্দর হইতে মহান্ জগতে আর কি আছে তাহা জানি না—সকল শুভ সুন্দরের অন্তর্ভূত। *কোন পাশ্চাত্য মহামনীষী বলিয়াছিলেন সুন্দরই* জগতের আদি কারণ, সুন্দর হইতে বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি। বিহারিলাল সুন্দরকে ভজনা করিয়া জগজ্জননীকে দেখিয়াছিলেন জগদ্ধাত্রীকে পাইয়াছিলেন। বিহারিলালের প্রেমপূজা লালসা বিরহিত,অতি উদার অতি মহান্, অতি পবিত্র। বিহারিলালের উপদেশ—সুন্দরের ধ্যান কর সুন্দরে প্রেম ন্যস্ত কর এবং সেই মহাপ্রেমে জীবন উৎসর্গ কর—আত্ম প্রসাদ লাভ করিবে—অপার্থিব সুখ—পরমানন্দ পাইবে—কৃতার্থ হইবে। সারদামঙ্গল গৌণ ভাবে আমাদিগকে এই শিক্ষা দান করে।

সারদামঙ্গল কাব্য পঞ্চসর্গে সম্পূর্ণ। ইহা আখ্যান বস্তু সমন্বিত কাব্য নহে, সারদারচরণে অর্পিত ভক্তি কুসুম সমষ্টি। সুতরাং সারদামঙ্গলকে একটী ঘটনা শৃঙ্খলাবদ্ধ কাব্য মনে না করিয়া একই উদ্দেশ্যে রচিত ভিন্ন ভিন্ন কবিতা স্বরূপ পাঠ করিতে হইবে। কবিতাগুলির মধ্যে সংযোগ আছে, একই সাগর উরসে সম্মিলিত বিভিন্ন স্রোতস্বিনীর মধ্যে যেরূপ সংযোগ, সেইরূপ। এবং এই কাব্যে কবির চিন্তালহরীমালা প্রভাত স্বপ্নের মত এরূপ বিচিত্র ভাবে উত্থান পতন প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহাদের সীমা নির্দ্দেশ করা সহজ সাধ্য নহে। সারদার সহিত কবির সাক্ষাৎ ও প্রণয়, বিচ্ছেদ ও মিলনের কথা,

কবির প্রেম ভক্তি, স্নেহ প্রীতি, আশা নৈরাশ্য, হর্ষ বিষাদ, সন্দেহ অভিমান, যাতনা সাধনা, অধীরতা অতৃপ্তি, সন্তোষ আনন্দ প্রভৃতি শত কথা এক অপূর্ব্ব, ছায়াময় সূত্রে গ্রথিত।

এই মহা সঙ্গীতের উন্মাদনা, উচ্ছ্বাস বঙ্গীয় সাধারণ শ্রোতার স্থূল কর্ণপটহ বিকম্পিত করিতে পারে নাই। ইহাতে কবির কোন ভক্ত সমালোচক সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"ভালই হইয়াছে এমন কোমলাদপি কোমল উদার সৌন্দর্য্যময় কবিতা যে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের রচনার স্বাদ ভোলা নিষ্ঠুর হস্তে নিকৃষ্ট অনুকরণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহাতে ভালই হইয়াছে।"*

শ্রদ্ধাস্পদ সমালোচকের এই উক্তির সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। বিহারিলালের কবিতার আদর হউক—আদর হইলেই অনুকরণ অবশ্যম্ভাবী। নিকৃষ্ট অনুকরণ বাঞ্ছনীয় না হইলেও বিহারিলালের কবিতা আদৃত হওয়া অধিকতর প্রার্থনীয়।

রবীন্দ্রবাবুর হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় এই মধুময় কাব্যের আলোচনা শেষ করিলাম। কবির মৃত্যুরপর বঙ্গীয় ১৩০১ সালে, "সাধনা"পত্রে, তিনি লিখিয়াছিলেন—

"যিনি জীবন রঙ্গভূমির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দর্শক মণ্ডলীর স্তুতিধ্বনির অতীত ছিলেন, তিনি আজ মৃত্যুর যবনিকান্তরালে অপসৃত হইয়া সাধারণের বিদায় সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলেন না, কিন্তু একথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শতসহস্র রচনা যখন বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সারদামঙ্গল তখন লোক স্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং কবি বিহারিলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।"

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

---

* শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, নব্যভারত, ১৩০১,৪র্থ সংখ্যা।

কর্ণাটে কালিদাস।

প্রবাদ এই যে মহাকবি কালিদাস নানাদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা কর্ণাট দেশে উপস্থিত হন। কর্ণাটাধিপতি বিদ্যোৎসাহিতা ও শৌর্য্যাদিগুণে তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কালিদাস নৃপতির সহিত সাক্ষাৎকার লাভের জন্য রাজসভার পণ্ডিত বল্লণ কবির নিকট উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিলেন যে 'আমি জনৈক পণ্ডিত। বিদ্যোৎসাহী কর্ণাটাধিপতির প্রসাদ লাভার্থ বহুদূর হইতে আসিয়াছি।' বল্লণ বলিলেন 'তুমি কিরূপ শ্লোক রচনা করিতে পার, উহার পরিচয় দাও। নতুবা তোমাকে কিরূপে রাজসমীপে লইয়া যাইব?' কালিদাস জানিতেন যে বল্লণ কবি যদি উহার শ্রেষ্ঠ কবিত্বের পরিচয় পান তাহা হইলে স্বপদচ্যুতি ভয়ে কখনই উঁহাকে রাজসমীপে লইয়া যাইবেন না। সেই জন্য তিনি একটী নিকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়া বল্লণ কবিকে শুনাইলেন যথা:—

"উত্তিষ্ঠো তিষ্ঠ ভো রাজন্ মুখং প্রক্ষালয়স্ব টঃ।
রৌতি তে নগরে কুক্ক চ বৈ তু হি চ বৈ তু হি॥"

প্রভাত হইয়াছে। কুক্কুট ডাকিতেছে। হে রাজন্! আপনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালন করুন।

[পাঠক দেখিবেন যে এই শ্লোকটী কবিত্বশূন্য। পাদ পূরণ বিষয়েও নিকৃষ্ট। প্রথম চরণের শেষে ট অক্ষরটী কুক্ক শব্দের পরে বসিবে। এইরূপে কুক্কুট শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। চ, বৈ, তু, হি কয়েকটী অব্যয় শব্দ পাদ পূরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।]

বল্লণ কবি দেখিলেন যে ইঁহাকে রাজসমীপে লইয়া গেলে কোনও

ভয় নাই। ইহার কবিত্ব অতি নিকৃষ্ট। আরও উক্ত কবিতাটি ইহার নিজের রচিত কি না জানিবার জন্য ইহার প্রত্যুৎপন্নমতি কিরূপ দেখিবার জন্য একটী শ্লোক রচনা করিতে বলিলেন। এইরূপ কথোপকথন যখন হইতেছিল সেই সময়ে মাঠে একটী বলদ চরিতে-ছিল। কবি (কালিদাস) উহা দেখিয়া একটী শ্লোক তৎক্ষণাৎ রচনা করিলেন যথাঃ—

"গৌরপত্যাং বলীবর্দ্দ ঘাসমত্তি মুখেন স্য।
লাঙ্গুলং বিদ্যতে ত খুরঞ্চাপি চ বর্ত্ততে॥"

বলদ মাঠে ঘাস খাইতেছে। ইহার লাঙ্গুল আছে ও পদে খুর আছে।

[পাঠক দেখিবেন দ্বিতীয় চরণের ত প্রথম চরণের 'স্য'-উভয়ে মিলিয়া 'তস্য' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই শ্লোকটী ও রচনা বিষয়ে নিকৃষ্ট।] এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বল্লণ কবি উঁহাকে রাজসভায় লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। যথা সময়ে উভয়ে রাজসভায় উপস্থিত হইলে পর বল্লণ যথোচিত বিধানানুসারে নৃপতিকে বলিলেন "রাজন্! অভ্যুদয়োইস্ত"। রাজন্! তোমার অভ্যুদয় হউক। কর্ণাটাধিপতি বলিলেন "বল্লণকরে হস্তে কিমাস্তে তব"। কবিবর! তোমার হস্তে কি রহিয়াছে?

বল্লণ।	"শ্লোকোইয়ং"।	"এইটী শ্লোক"।
কর্ণাট।	'কস্য কবেঃ'।	'কোন কবির শ্লোক'?
বল্লণ।	"অমুষ্য কৃতিনঃ"।	'এই কৃতবিদ্য ব্যক্তির'।
কর্ণাট।	"তৎ পঠ্যতাং"।	'পাঠ কর'।

কবি কালিদাস বল্লণের হস্ত হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক (উত্তিষ্ঠ ইতি) কাড়িয়া লইলেন ও বল্লণ কবিকে পশ্চাতে রাখিয়া রাজার সম্মুখে

উপস্থিত হইয়া "পঠ্যতে" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন।• এবং নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন।

"কিন্ত্বাসামরবিন্দ সুন্দরদৃশাং দ্রাক্‌চামরান্দোলনাৎ।
উদ্বেলদ্‌ভুজবল্লীকঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাং॥"

আপনার পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীগণ চামরহস্তে আপনাকে ঘন ঘন ব্যজন করিতেছে। তজ্জন্য উঁহাদের হস্তস্থিত কঙ্কণের মধুর রুণু রুণু শব্দ হইতেছে। উহা কিছুক্ষণ নিবারণ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করুন। (কেননা ওরূপ শব্দ করিলে আমার শ্লোকগুলি আপনি শুনিতে পাইবেন না)। ব্যজনকারিণীগণ নিস্তব্ধ হইলে পর কবি (কালিদাস) ক্রমে ক্রমে চারিটী শ্লোক রাজাকে শুনাইলেন। যথা :—

প্রথম শ্লোক।

"শ্রীমন্নাথ তবাননে ভগবতী বানী নরীনৃত্যতে।
তাং দৃষ্ট্বা কমলাসমাগতবতী লোলাপি বদ্ধা গুণৈঃ॥
কীর্ত্তিশ্চন্দ্র-কবীন্দ্র—কুন্দ কুমুদ-ক্ষীরোদ-নীরোপমা।
ত্রাসাদম্বুনিধিং বিলঙ্ঘ্য ভবতো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥"

প্রভো! আপনার মুখপদ্মে ভগবতী সরস্বতী সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। উঁহাকে দেখিয়া লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চল হইলেও আপনার গুণে বদ্ধা হইয়াছেন। আর আপনার কীর্ত্তি, চন্দ্র, ঐরাবত, কুন্দপুষ্প, কুমুদ, ক্ষীরোদসাগর, প্রভৃতি শুভ্র উপমেয় বস্তুর সহিত উপমিত হইবার ভয়ে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পর পারে গিয়াছে এখনও

• পাঠক দেখিবেন এ প্রশ্নোত্তরটী ও পদ্যে রচিত।
"রাজন্‌ অভ্যুদয়োঽস্তু কল্পণকরে হস্তে কিমাস্তে তব।
শ্লোকাঃ কস্যকবে বয়ুষ্য ভবতোঽমুম্‌ পঠ্যতাং পঠ্যতে॥"

বিশ্রাম করে নাই। (আপনার নিষ্কলঙ্ক যশঃ সৌরভ সমুদ্রের পর পারেও বিস্তৃত হইয়াছে)।

কর্ণাটাধিপতি এই শ্লোক শুনিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। কবি দ্বিতীয় শ্লোক আরম্ভ করিলেন। যথা :—

"শ্রীমন্নাথ তবার্জ্জিতোজ্জ্বল যশঃ—সংশুদ্ধমুক্তাবলী।
মাদাস্যৈব বিধি বিধিৎসু বিধাতুরমলং হরাং ত্বদীয়ৈর্গুণৈঃ॥
নীরন্ধ্রা মপিতাং বিলোক্য সহসা নান্তং গুণানামপি।
উৎপিৎসু র্গগণান্তবে সমকিবৎ তান্তে তড়িৎতারকাঃ॥"

প্রভো! আপনার যশঃ বিশুদ্ধমুক্তাপংক্তি সদৃশ। একদা বিধাতা আপনার বিশুদ্ধ গুণরাশির একটী হার নির্ম্মাণ করিবার মানসে গুণসমূহ সংকলন করিতেছিলেন। ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ছিদ্র না পাওয়াতে এবং গুণের অন্ত না পাইয়া ক্ষুণ্নমনে বিধাতা উহাদিগকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন। উহাই নভোমণ্ডলে তড়িৎ ও তারকা-রাজিতে পরিণত হইল।

কর্ণাটাধিপতি এই শ্লোক শুনিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। কবি তৃতীয় শ্লোক আরম্ভ করিলেন। যথা :—

"শ্রীমন্নাথ ভবদ্‌যশোবিটপিনঃ খে তারকাঃ কোরকা।
স্তেষামেকতকঃ পুরা বিকসিতো যঃ পূর্ণিমাচন্দ্রমাঃ॥
তেনৈতন্মকরন্দ সুন্দর-সুধাস্যন্দৈ র্জগন্মণ্ডিতং।
শেষেষেষু সর্ব্বেষেষু বিকস্বরেষু ভবিতা কীদৃঙ্ ন জানীমহে॥"

প্রভো! আপনার যশোরূপ বৃক্ষের তারকাগুলিই মুকুলস্বরূপ। পূর্ব্বকালে উহাদের মধ্যে একটী প্রস্ফুটিত হইয়া 'পূর্ণচন্দ্র' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং সুধা বিকীরণ করতঃ জগৎকে পরিতৃপ্ত ও স্নিগ্ধ রশ্মিদ্বারা জগতের শোভা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু সকল

মুকুলগুলি বিকশিত হইলে যে জগতের কিরূপ শোভা হইবে তাহা আমি জানি না।

রাজা এই শ্লোক শুনিয়া পুনশ্চ মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

কবি চতুর্থ শ্লোক আবম্ভ করিলেন। যথা :—

"কীর্ত্তি-স্বর্গতরঙ্গিনীভিরভিতো বৈকুণ্ঠমাপ্লাবিতং।
ক্ষীরোদোঽপি ভবৎপ্রতাপদহন জ্বালাতিকস্তাপিতঃ॥
ইত্যেবং দয়িতাযুগেন হরিণা ত্বং যাচিতঃ স্বাশ্রয়ং।
হৃৎপদ্মং ভবনে, প্রিয়ে স্বভবনং কণ্ঠং গিরে দত্তবান্॥"

আপনার কীর্ত্তি স্বর্গতরঙ্গিণী অলকনন্দা কর্ত্তৃকও ব্যাহত না হইয়া বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। আর ক্ষীরোদসমুদ্র ও আপনার প্রতাপতাপে তাপিত হইয়াছে। সুতরাং ক্ষীরোদশায়ী শ্রীহরি অনন্যোপায় হইয়া উভয় স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আপনার নিকট আশ্রয় চাহিলেন। আপনিও সানন্দে শ্রীহরিকে হৃদ্‌পদ্মে, লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে এবং সরস্বতীকে স্বীয় কণ্ঠে স্থান দিয়াছেন। চতুর্থ শ্লোক শুনিয়া কর্ণাটাধিপতি কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বনে রহিলেন, পরে এইরূপ উত্তর দিলেন :—বিজ্ঞবর। আপনার প্রথম শ্লোক শ্রবণ করিয়াই সানন্দে আপনাকে আমার রাজ্যে একদিক্ দান করিয়াছি। দ্বিতীয় শ্লোক শুনিয়া আপনাকে রাজ্যের দ্বিতীয় দিক্ দান করিয়াছি। তৃতীয় শ্লোক শুনিয়া আপনাকে রাজ্যের তৃতীয় দিক্ দান করিয়াছি। আর এই চতুর্থ শ্লোক শুনিয়া আপনাকে আমার রাজ্যের চতুর্থ দিক্ দান করিলাম। সুতরাং সমুদয় রাজ্যই আপনাকে দান করিয়াছি। এক্ষণে এই চিন্তা করিতেছি যে যদি আপনি পুনর্ব্বার শ্লোক আবৃত্তি করেন তবে আপনাকে আর কি পুরস্কার দিব। কবি প্রত্যুত্তরে বলিলেন "মহারাজ! আপনি আমার শ্লোক শুনিয়া যে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন

ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার—আমি অন্য পুরস্কার চাহি না। রাজ্যধন লইয়া আমি কি করিব? মহারাজ অধিকতর প্রীত হইয়া কবিকে আত্মপরিচয় দিতে বলিলেন। কালিদাস প্রথমে আত্মপরিচয় দেন নাই, কিন্তু মহারাজের একান্ত অনুরোধে পরে আত্মপরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর এইরূপ কথিত আছে যে উভয়ের গুণে উভয়েই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই ত গেল রাজসভার ঘটনা।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহারাজ যখন রাজ্ঞীকে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কথা বলেন তখন রাজ্ঞী এইরূপ উত্তর দিলেন :—

"একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপর।
স্তেসর্ব্বে কবয় স্ত্রিলোকগুরব স্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে॥
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্য পদ্য বচনৈশ্চেত শ্চমৎকুর্ব্বতে।
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দদামি (দধামি) বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া॥"

পদ্মযোনি ব্রহ্মা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ও বাল্মীকি এই তিন জন মাত্র কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং ইঁহারাই ত্রিভুবনের পূজার্হ। ইঁহারা ভিন্ন অপর যদি কেহ পদ্য গদ্য রচনা দ্বারা বিস্ময় উৎপাদনে সমর্থ হয়, তবে উহাদের মস্তকে কর্ণাটরাজ্ঞী আমি বামপদ প্রদান করি। কালিদাস এইরূপ স্পর্দ্ধাব্যঞ্জক শ্লোকের বিষয় যখন অবগত হইলেন তখন তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন উক্ত শ্লোকের ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন তখন উঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইয়াছিল। শ্লোকটীর ভিন্ন পাঠ ও অর্থ এইরূপ—"অহং কর্ণাটরাজপ্রিয়া মূর্দ্ধ্নি তেষাং বামচরণং দধামি।" আমি উঁহাদের (কবিগণের) বামপদ মস্তকে ধারণ করি (উঁহাদের নিকট নতশির হই)।

[পাঠক এই শ্লোকে স্ত্রীলোকের রচনা কৌশল দেখিবেন।]

অনন্তর কালিদাস যথাসময়ে কর্ণাটাধিপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর হৃষ্টমনে উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কর্ণাটাধিপতির ধনরাজ্যাদি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। বিদায় কালে এই শ্লোকটী উচ্চারণ করেন। যথা:—

"ন যাচে গজালিং নবা বাজি রাজীং
ন বিত্তেষু চিত্তং কদাচিন্মমৈব।
ইয়ং সুস্তনী নবাঙ্গী কৃশাঙ্গী দৃগঙ্গী করোতু॥

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত।

ফুলের সাজি।

বাঁশী।

শোন্ বাঁশরীর তান—ত্যজ্ লাজ অভিমান
চললো কাননে :
নিকুঞ্জে এসেছে কালা,ছুটে চল্ গোপবালা,
হেরি শ্যামধনে।
ওই শোন রাধা, তোর নামে সাধা,
শ্যামেরি বাঁশরী বাজিছে,
তিমির-দুকূলা, লহরী আকুলা,
যমুনা অকূলা বহিছে,
শারি বুকে শুক, লুকাইয়া মুখ,
আবেশ-বিহ্বল কূজিছে
শ্যাম বন ভূমে, বিকচ কুসুমে,
শ্যামেরে ধরণী পূজিছে ,
ওই দেখ্, নীপমূলে, দেখ্ তমালের তলে
প্রসূনের রাজি,
ভর প্রীতি প্রেমে, সোহাগে সরমে
সুষমার সাজি ,
নবীন নীরদে রচা চারু কেশ ভার,
ফুলে ফুলে সাজাইয়া দে সই রাধার,
কনক কঙ্কণে সাজা বাহু সুকুমার,
চরণে মঞ্জীর মালা করুক ঝঙ্কার ;
শ্যাম নামে আঁকা, অলকা তিলকা
লিখে দেলো ভালে,
নাচুক সারিকা শুক, মুখরিত
নূপুরের তালে ;
শ্যাম মধুকরে, রাধিকা কমলে,
দেলো সই ধরি,
বাজুক্ বাঁশরী, 'রাধা !' রাধা '' করি
আসুক্ শ্রীহরি।

—গিরিজাকুমার—

কে ?

আঁধার জীবন পথে, ক্লান্ত চলেছিনু একা,
পিছিল বন্ধুর পথ,আলোর পাইনে দেখা
কে তুমি পুলকময়ি, আলো বিলাইতে এলে,
হৃদিভার হরি' লয়ে, পথের সঙ্গিনী হ'লে ?
চল কি গো জানা পথে,ফুল বিছাইয়ে তায়,
আশার মোহন হাসি,আনত আননে ভায়।
বাঁকা পথে শত কাঁটা, বিঁধে তব পায় পায়,
নীরব বেদন ধার, নিমেষে শুকায়ে যায়।
গগনে কি ঘনঘোর ! কবকা পড়িছে মাথে,
আলোযেনিবিয়া যায়,কেমনেযাইগোসাথে ?
ওই যে করুণ দীপ, পুনঃ জ্বলে দুনয়নে,
মেঘ মুক্ত তারা সম,শান্তি হাসে শুভাননে !
কি মধুর মৃদু হাসি, পাথেয় লয়েছ সাথে,
অনন্ত প্রীতির ছবি,অনিমিখে সদা দেখি।
ফুল্লাধরে সুধা ক্ষরে, বিমল মদির অতি,
তোমারে সুন্দর তর,হেরিতেছি নিতিনিতি।
সমুখে দুস্তর পথ, ডরিনা তাহাতে আর,
স্মরণ তুমি যে সাথে, ফিরিতেছ অনিবার।
কে তুমি করুণা প্রেম সহিষ্ণুতা মূর্ত্তিমতী,
জীবনের ধ্রুবতারা,অমরার শান্ত জ্যোতিঃ।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

প্রভাতে।

প্রত্যহ প্রভাতে উঠে নয়নে আমার,
জেগে উঠে ঈশ্বরের করুণার পারা,
নীল গিরি শির পরে গগণ মাঝার,
তরুণ তপন জ্যোতি কিরণের ধারা।
প্রতি প্রাতে হেরি ওই শ্যামল পল্লবে
মুখ রেখে অর্দ্ধ স্ফুট গোলাপের দল।
সেই রাঙা আভা টুকু হৃদয়েতে রেখে
মুহূর্ত্তে ও ভুলে যাই যাতনা সকল।
মনে হয় এ নিখিল নহে ছলনার,
বিমল আনন্দ শুধু মেঘ ছায়া হীন।
শুকাবে না ওই মুখ ফুল কলিকার
এমনি রবির আলো রবে চিরদিন।
অজানিত কি বিশ্বাস উঠেরে জাগিয়া,
নিখিল সৌন্দর্য্যে যেন ভরে যায় হিয়া।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

নদীর উপর জল।

('মুর' হইতে।)

নদীর উপর জল জ্বলিছে কিরণে,
নিম্নে অন্ধকারে স্রোত বহে অনুক্ষণে।
উজলিতে পারে হাসি তেমনি আনন,
ছুটিছে মরণ পানে হৃদয় যখন !

একটী শোকের স্মৃতি, এক বেদনার,
আনন্দে বিষাদে সম পড়ে ছায়া যার ;
ম্লানতর, শুভ্রতর, নাহি যা'র চেয়ে,
সুখে শান্তি, দুঃখে জ্বালা নাহি যা'কে পেয়ে,

সে আমার গেছে চ'লে।

সে আমার গেছে চ'লে, হৃদয়ের অন্তস্থলে
যে অনল জ্বলিতেছে কি আর বলিব হায়!
ভাষাতে নাহিক কথা প্রকাশিতে মনব্যথা
অন্তরে জ্বলিয়ে মরি তবু প্রাণ নাহি যায়।
বলিতে আমার যেই ছিল ভবে যদি সেই,
ছেড়েগে'ল অভাগারে;ভাসায়ে দুঃখেরনীরে
তবে আর কেবা মোরে প্রাণপণ যত্ন ক'রে
তুলি দুঃখ-নীর হ'তে বসাবে সুখের তীরে।
কেনরে নিঠুর বিধি দিয়া সে অমূল্য নিধি
কেড়ে নিলি এবে তুইকাঁদায়েএঅভাগারে,
তাই যদি মনে ছিল, তবে কেন বৃথা বল,
দিয়াছিলিসেই নিধি মিছে দুদিনের তরে!
নিয়ে চল সেই স্থানে যথায় প্রাণের প্রাণে
রেখেছ অশেষ সুখে, অতীব যতন করি,
আপনা ভুলিয়ে মরি! যুগ যুগান্তর ধরি,
ত্রিদিবের প্রীতি ছবি হেরি সে নয়ন ভরি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দে।

বন বালিকা।

অরুণ রঞ্জিত রাগে, হেমবাসে ঊষা জাগে,
কলকণ্ঠে বিহঙ্গম, গাইছে মধুর।
ফুটন্ত' কুসুমগুলি, চায় যেন আঁখি মেলি,
কনক কিরীট, পরি উঠে বিভাকর।
কাঞ্চন বরণে ঊষা, ধরি নব বেশ ভূষা,
সাজাইয়া পুষ্পাঞ্জলি, বিবিধ প্রসূনে।
হেম ঘটে ঢালিবারি, মঙ্গল আরতি করি,
বিভুর বন্দনাগীতি, গায় ফুল্ল প্রাণে।
মেঘমুক্ত নীলাকাশে, শুভ্র মেঘ মালা ভাসে
আধ আলো আধো ছায়া কত মনোহর।
হেম রবিকর মাখি, প্রকৃতি খুলিছে আঁখি
কাননে পুরিত কিবা মধুপঝঙ্কার।
কনক কিরণ হারে, নীহারের কণা ঝরে,
ধীরে ধীরে বহে মন্দ প্রভাত সমীর।
প্রকৃতিসৌন্দর্য্যরাশি,গিয়াছে কোথায় মিশি
অমর সৌন্দর্য্যে বালা আহা কি সুন্দর।
বিধাতা নির্জ্জন ধ্যানে, সুগঠিত ফুল্লাননে,
কিবা সরলতা মাখা প্রফুল্ল অধর,
কপোলে কুঞ্চিত কেশ, সুবঙ্কিম গণ্ডদেশ,
প্রস্ফুট গোলাপ কোথা এত মনোহর?
বনফুল আভরণ, মলিন বনবসন,
যেন বনদেবী বনে স্থির মূর্ত্তিমতী।
গায় বনবীণা করে, যথা শ্বেতদল পরে,
ষড়রাগে, শ্বেতাম্বরা মধুরে ভারতী।
কিম্বা মন্দাকিনী তীরে,মন্দার কুসুম হারে,
বীণাকরে ত্রিদিবের, বাজ রাজেন্দ্রাণী।
অতুল সৌন্দর্য্য রাশি, যেনবা ত্রিদিব বাসী
চিরমুক্ত—পিঞ্জরের বন বিহঙ্গিনী।
করুণার প্রস্রবণ, বিলোল দুটী নয়ন,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণশর আছে কিবা তায়?
হৃদয় অমৃতে ভরা, ব্যথিত আপন হারা,
বিরহীর বিরহের অশ্রু মুছে যায়।
এ স্বার্থের ভালবাসা,অতৃপ্তি, ঘৃণা, লালসা
নিরাশার স্বার্থভরা, দুঃখ অভিমান।
নাহি সে সরল প্রাণে, করুণা মাখা নয়নে
পার্থিব প্রেমের নাহি চায় প্রতিদান।

অপার্থিব ভালবাসা বিমল সৌন্দর্য্য তৃষা,
নন্দন সুখের আশা, কোথা এ সংসারে ?
হৃদয়ের উচ্চ আশা, স্বার্থশূন্য ভালবাসা
কোথা প্রতিভাত হায় অতৃপ্ত আননে ?
এ পার্থিব সুখ চাব ভধু হেথা হাহাকার
বিরক্তি, ভ্রূকুটি, ঘৃণা, কলঙ্কের রাশি।
হিংসা দ্বেষ অভিমান, স্বার্থ প্রবঞ্চনা ভাণ
রূপের মাধুরী শুধু অধরের হাস।
নন্দন কুসুম যেই, তাহার সৌরভ কই,
রূপের মাধুরী আছে যদি ছিঃ ছিঃ প্রাণে,
বনফুল তবু ভাল, যেথা থাকে কত আলো
সৌন্দর্য্যের কথা নাই সৌরভ কে জানে,
সাধ হয় দু'টী প্রাণে, বসি হেন নিরজনে,
গাই প্রেমভরা, কত করুণার গীতি।
কেন আর এ পিঞ্জরে, কত অশ্রুকণা ঝরে,
অমর বাঞ্ছিত যথা মোহন মুরতি।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কাণ কোথায়।—অধ্যাপক প্রাণীতত্ত্বের আলোচনা কালে ছাত্রবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ গঙ্গাফড়িংএর কাণ কোথায়, ইহা অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এখনও স্থির করিতে পারেন নাই—পরম পিতা পরমেশ্বরের সৃষ্টিরহস্য কি অলৌকিক! ইহাদের শ্রবণশক্তি পদে!! আশ্চর্য্য হইও না, একটী সহজ পরীক্ষা দ্বারা ইহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। একটি গঙ্গাফড়িং টেবিলের উপর রাখিয়া টেবিলে শব্দ কর। সে শব্দ শুনিয়া লাফাইয়া পলাইবে। কিন্তু তাহার—পাগুলি কাটিয়া ফেল এবং পুনরায় ঐরূপ শব্দ করিতে থাক, দেখিবে সে শব্দ শুনিতে পাইবে না কাযেই লাফাইবে না।"

***

সম্পাদকের অনুতাপ—এক কবি কোন পত্র সম্পাদকের নিকট একটি ক্ষুদ্র কবিতা পাঠাইয়াদেন। ইহার ফুটনোটে লেখাছিল "উল্‌টাইয়া পড়িবেন"। সম্পাদক কবিতাটি এই বলিয়া ফেরৎ দিলেন "আপনার ফুটনোট অনুযায়ী কবিতা উল্‌টা পড়িয়া ইহার ভিতর কিছুই পাইলাম না"। কবি লিখিলেন "আপনার ন্যায় মূর্খ, কবির মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম। ফুটনোটে কিছু পাইলেন না, কিন্তু পরপৃষ্ঠার নোটে দশটাকা পাইতেন।" বলা বাহুল্য একখানি নোটের পৃষ্ঠায় কবিতা লিখিত ছিল।

***

বাবু। পরামাণিক একটু জল আন ক্ষৌরি হওয়া যাক্।

পরামাণিক। আজ্ঞে জলের দরকার নাই।

বাবু। সে কি হে, জল না হলে কামাবে কেমন ক'রে?

পরামাণিক। হুজুর চোকের জলেই এখন ভেসে যাবে, শেষে কি টিপ্‌সামলাতে পার্‌বোনা!

***

রোগী বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, গৃহিণী পদসেবা করিতেছেন। ছোট ছেলে পাশে বসিয়া আছে। রোগী তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া অতি কাতর স্বরে বলিল—"একটু জল দাওত মা"। ছোট ছেলেটি শুনিয়া বলিল "বাবা, তুমি আমার মাকে মা বল্‌ছ যে?"

রোগী। জ্বরের সময় কিছু জ্ঞান আছে কিরে ভাই!!

***

প্রাচীন রোমে একএকটী ভোজে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যায়িত হইয়াগিয়াছে। সহস্রাধিক লোক নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে সুদূরদেশ হইতে আনীত অপরাপর সুখাদ্যের সহিত, ময়ূরের জিহ্বা বা বুলবুল পাখীর জিহ্বা বাটী বাটী ভোজন করান। তৎকালীন ধনিগণের নিত্যকার্য্য ছিল।

***

সেদিন একজন উকিলবাবু গঙ্গাস্নানে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। স্নানের সময় একটি বৃহৎ হাঙ্গর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। এক নিমেষের জন্য হাঙ্গরের চক্ষুর দিকে উকিলবাবুর দৃষ্টি পড়িয়াছিল, ইহাতে হাঙ্গরটি লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করে।

***

"আচ্ছা, শরৎ এখন তোমার সহিত কথা কয় না কেন? আগেত তোমাদের বেশ বন্ধুত্ব ছিল।"

"তা' ছিল বটে, যখন আমরা অবিবাহিত ছিলাম। কিন্তু তিনি এখন বিবাহিত।"

"তা'তে আর কি এসে যায়?"

"আজ্ঞে আসল কথাটা—তাঁহার বিবাহের সময় আমি একখানা ভাল বই উপহার দিয়াছিলাম। সেই অবধি আর তিনি আমার সহিত কথা কন না।"

"বই খানা কি ?"

Paradise Lost.—"স্বর্গচ্যুতি"

***

বালক। আমায় দু পয়সার বেড়ির তেল দাওত। আর পার ওজনে বম দিও!

মুদি। কম দোবো কেন ?

বালক। ডাক্তার বাবু ব'লেছেন আমাকে দু'পয়সার অইল খেতে হ'বে।

***

তিন বন্ধু সেক্সপীর পড়িতেছিলেন। হ্যাম্‌লেট্ পড়িতে নিম্নলিখিত লাইনটিব বাঙ্গালায় তর্জ্জমা কবিতে চেষ্টা কবিয় ফল হইল—"To be or not to be that is the question.

১ম। "হবে কিম্বা নাহি হবে এই হব প্রশ্ন।"

২য়। *"প্রশ্ন হ'তে পাবে কি পারে না।"*

৩য়। "যাব কি যাব না মিছে এ ভাব না" ইতি ভাবঃ।

***

মোটা। আমি একটা কবিতা লিখিয়াছি কিন্তু ছাপা ক'রে বল দেখি ? দশবাবজন পত্রসম্পাদকের নিকট এটি ছিলাম কিন্তু সকলেই ফেরৎ দিয়াছে।

বোগা। একটা সহজ উপায় আমি বলে দিই শোন। কবিতাটি লিখে একখানা খা'ম পুরে পকেটে রেখে আত্মহত্যা ক'রে ফেল। দেখবে পরদিন সব কাগজে উহা প্রকাশিত হ'য়েছে।

***

মনিব। দেখ্ রাখালে, এমাসে তুই এত গেলাস বাসন ভেঙ্গেছিস্ যে তা'র দাম তোর মাহিনা ছাপিয়ে উঠল। আবার যদি কিছু ভাঙ্গিস কি করব্ ঠিক্ করতে পারছি না।

চাকর। আমিও তাই ভাবছি মহাশয়। আমার মাহিনে না বাড়ালে দেখছি আর কোনও উপায় নাই!

***

আমরা রাণাঘাট ভিক্টোরিয়া কেমিকেল ওয়ার্কস্ হইতে কএকখানি ঔষধের তালিকা পুস্তিকা ও প্রশংসা পত্র পাইয়াছি। তদ্দৃষ্টে জ্ঞাত হইলাম যে উক্ত ঔষধালয়ে স্বদেশীয় উপকরণ হইতে বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য প্রণালীতে ঔষধাদি প্রস্তুত হয়, এবং পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উক্ত ঔষধ সমূহ বিদেশীয় দ্রব্য অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে বরং সমধিক ফলপ্রদ। ইহাদের কৃত "মেওরেস" আজকাল নিজগুণে ভারত বিখ্যাত। আমরা দেশীয়দিগের এরূপ সদুদ্যমের পক্ষপাতী এবং ইহার পরিচালক বর্গের উন্নতি কামনা করি।

***

বালকের রচনা। "মৌমাছি" :—মাছি অনেক প্রকারের আছে কিন্তু মৌমাছি সব এক রকম। তাহাদের পেটে হলুদের রেখা আছে বলিয়া আমরা চিনিতে পারি। মৌমাছি বড় শ্রমশীল, কারণ যাহারা পরিশ্রম করে না তাহাদিগকে উহারা মারিয়া ফেলে। ইহারা মধু এবং মোম তৈয়ার করে। কিন্তু ইহাদের মোমের বাতি অপেক্ষা চর্ব্বির বা কেরোসিনের বাতি সস্তা। ইহারা পুষ্প হইতে মধু চুরি করে এজন্য ফুল শুখাইয়া যায়। এই অসদুপায়ে অর্জ্জিত মধু কিন্তু ইহারা হজম করিতে পারে না। এই মধুর গন্ধে ভালুক এবং বাঁদর আসিয়া ইহাদের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে ও মধু খাইয়া যায়। ইহা ভালুক এবং বাঁদরের বড় অন্যায়, কারণ মৌমাছি নিরীহ ক্ষুদ্র প্রাণী। ভালুকের দোষ নাই কারণ তাহার বুদ্ধি বাঁদরের ন্যায়। মৌমাছি নিরীহ নহে তাহাদের ব্যবহার মশার অপেক্ষা ইতর। দুই একটা মৌমাছি খাবারওয়ালার দোকানকে ফুল বাগান মনে করিয়া মধু লুটিতে আসে; কিন্তু ফাঁকি দিয়া পলাইবার সময় রসে পড়িয়া হাবু ডুবু খায়।

সমাপ্ত।